বাংলা দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : SSC-2651

সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম

(এসএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : SSC-2651

সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম

(এসএসসি প্রোগ্রাম)

রচনা ও সংকলনে

মেহেরীন মুনজারীন রত্না

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

তাওহিদা জাহান

কুদরত-ই-হুদা

সম্পাদক

ড. মো. চেঙ্গীশ খান

ড. হাকিম আরিফ

কোর্স সমন্বয়কারী

মেহেরীন মুনজারীন রত্না

ড. মো. চেঙ্গীশ খান

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

বাংলা

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : SSC-2651

এসএসসি প্রোগ্রাম

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০১৭
পুনর্মুদ্রণঃ এপ্রিল, ২০১৮
পুনর্মুদ্রণঃ জানুয়ারি, ২০১৯
পুনর্মুদ্রণঃ জানুয়ারি, ২০২০
অনলাইন ভার্সনঃ জানুয়ারি, ২০২২

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

প্রচ্ছদ গ্রাফিক্স
আব্দুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ সিদ্দিকুল ইসলাম

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 984-34-3000-x

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর–১৭০৫

মুদ্রণ
বর্ণশোভা মুদ্রায়ন
মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী
ঢাকা।

কোর্সবই অনুসরণ করার নির্দেশনা

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : বাংলা দ্বিতীয় পত্র **কোর্স কোড : (SSC-2651)**

এসএসসি প্রোগ্রামের বাংলা দ্বিতীয় পত্র বইটি দ্বিতীয় বর্ষের জন্য পাঠ্য। বইটি দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত হয়েছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হল স্বনির্ভর পাঠ-ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এটি একইসাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সরাসরি সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। এ কারণেই বইটির বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব নিজে পড়ে বোঝার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। প্রতি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা দেয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র এ ইউনিটগুলো পড়লে বিশিষ্ট কোন্ দিকগুলো জানা যাবে তা ইউনিটের উদ্দেশ্যে বলা আছে। আবার, প্রতিটি পাঠের শুরুতে ঐ পাঠের শিখনফল/উদ্দেশ্য যুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী শিখনফল অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হলো কি-না তা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষার্থীকে প্রতিটি মূলপাঠ অবশ্যই বুঝে-বুঝে পড়তে হবে। শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন এবং রচনামূলক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নবম-দশম শ্রেণির 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' বইটিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে বইটি পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারেন সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হলো :

- ইউনিটের শিরোনাম ও ভূমিকা পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- পাঠের সব 'উদ্দেশ্য' পড়ে এই পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর মূলপাঠ ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হলো কি-না তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যপোযোগী করতে আপনার পাঠ্যপুস্তকটির সকল অধ্যায়কে ততটি অংশে ভাগ করে নিন। প্রথম টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত প্রথম অংশটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। কোনো অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনে টিউটরের সাহায্য নিন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সবগুলো পাঠ অধ্যয়ন শেষ করুন।
- পাঠশেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। ইউনিটের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভালো করে পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। এরপর চূড়ান্ত মূল্যায়ন অংশের বহু নির্বাচনি বা সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আছে কি-না দেখুন। জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট অংশ আবার পড়ুন।
- ওপেন স্কুলের এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশগ্রহণ করুন।

জাতীয় জীবনের উন্নয়নে ও গতিশীল জাতি গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই। সুশিক্ষিত জনশক্তি ছাড়া দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা ও প্রাথমিক স্তরের অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে গড়ে তোলা। পাঠ্যপুস্তকটির বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে এটি দূরশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

কোর্সটি অধ্যয়নের পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে পুরো কোর্স মড্যুলের কোনটি শিখনফল, কোনটি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোনটি পাঠোত্তর মূল্যায়ন, কোনটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইনকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

কোর্স /ইউনিট সমাপ্তির সময়	উদ্দেশ্য	মূলপাঠ	শব্দার্থ	সারসংক্ষেপ	পাঠোত্তর মূল্যায়ন
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	অ্যাসাইনমেন্ট	উত্তরমালা	ভিডিও বা দেখা	অডিও বা শোনা	সাহায্য/প্রয়োজন

কোর্স সমাপ্তির সময়	কোর্সটি সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩২ সপ্তাহ

অডিও/ভিডিও	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

	সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন– আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর	**ড. মো. চেঙ্গীশ খান** অধ্যাপক (বাংলা) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইমেইল : chenggish@bou.ac.bd এবং **মেহেরীন মুনজারীন রত্না** সহকারী অধ্যাপক (বাংলা) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইমেইল : munjarin81@gmail.com

সূচিপত্র

ব্যাকরণ	পাঠ		পৃষ্ঠা
ইউনিট–০১	ভাষা : বাংলা ভাষা		
	পাঠ–১.১	ভাষা	০১
	পাঠ–১.২	বাংলা ভাষারীতি	০৩
	পাঠ–১.৩	বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয়	০৬
ইউনিট–০২	ধ্বনিতত্ত্ব : বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ		
	পাঠ–২.১	বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ	০৮
	পাঠ–২.২	ধ্বনির উচ্চারণবিধি	১২
	পাঠ–২.৩	ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ	১৫
	পাঠ–২.৪	ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান	২১
	পাঠ–২.৫	ধ্বনি পরিবর্তন	২৪
	পাঠ–২.৬	সন্ধি : স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি	২৮
ইউনিট–০৩	শব্দ প্রকরণ		
	পাঠ–৩.১	পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ	৩৭
	পাঠ–৩.২	দ্বিরুক্ত শব্দ	৪৪
	পাঠ–৩.৩	সংখ্যাবাচক শব্দ	৪৮
	পাঠ–৩.৪	বচন	৫২
	পাঠ–৩.৫	পদাশ্রিত নির্দেশক	৫৬
	পাঠ–৩.৬	সমাস	৫৯
	পাঠ–৩.৭	উপসর্গ	৬৯
	পাঠ–৩.৮	ধাতু প্রকরণ	৭৬
	পাঠ–৩.৯	প্রত্যয় : কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়	৮১
	পাঠ–৩.১০	শব্দের শ্রেণিবিভাগ : গঠনমূলক, অর্থমূলক, উৎসমূলক	৯৩
ইউনিট–০৪	পদ প্রকরণ		
	পাঠ–৪.১	পদ ও এর শ্রেণিবিভাগ	৯৮
	পাঠ–৪.২	ক্রিয়াপদ	১০৮
	পাঠ–৪.৩	কাল, পুরুষ ও কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ	১১৩
	পাঠ–৪.৪	সমাপিকা ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ	১১৭
	পাঠ–৪.৫	বাংলা অনুজ্ঞা	১২১
	পাঠ–৪.৬	ক্রিয়া বিভক্তি	১২৪
	পাঠ–৪.৭	অনুসর্গ ও কর্মপ্রবচনীয় শব্দ	১৩৩
ইউনিট–০৫	বাক্য প্রকরণ		
	পাঠ–৫.১	বাক্য	১৩৬
	পাঠ–৫.২	বাক্যের প্রকারভেদ	১৩৯
	পাঠ–৫.৩	কারক ও বিভক্তি এবং সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ	১৪১
	পাঠ–৫.৪	বাচ্য ও বাচ্য পরিবর্তন	১৫১
	পাঠ–৫.৫	উক্তি পরিবর্তন	১৫৪
	পাঠ–৫.৬	যতি বা ছেদচিহ্নের ব্যবহার	১৫৭

পাঠ–৫.৭	বাগধারা	১৬১
পাঠ–৫.৮	শব্দের বিশিষ্ট অর্থের প্রয়োগ	১৬৮
পাঠ–৫.৯	প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ	১৭৪
পাঠ–৫.১০	এক কথায় প্রকাশ (বাক্য সংক্ষেপ)	১৭৯
নির্মিতি		
ইউনিট–০৬	**ভাব-সম্প্রসারণ**	১৮৯
ইউনিট–০৭	**সারাংশ ও সারমর্ম**	২০৩
ইউনিট–০৮	**পত্রলিখন** (১. ব্যক্তিগত পত্র, ২. আবেদনপত্র বা দরখাস্ত, ৩. সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র, ৪. মানপত্র ও স্মারকলিপি, ৫. বাণিজ্যিকপত্র বা ব্যবসায়িকপত্র, ৬. আমন্ত্রণপত্র বা নিমন্ত্রণপত্র)	২২১
ইউনিট–০৯	**অনুবাদ**	২৪৩
ইউনিট–১০	**প্রবন্ধ রচনা**	২৫৩
ইউনিট–১১	**অনুচ্ছেদ**	২৮৬
নমুনা প্রশ্ন		২৯২

মানবণ্টন (SSC-2651)

মানবণ্টন : পূর্ণমান : ১০০

ক. রচনামূলক প্রশ্ন – ৬০ নম্বর
খ. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন – ৪০ নম্বর

ক. রচনামূলক প্রশ্ন – ৬০ নম্বর

১. অনুবাদ :	২টি অনুচ্ছেদ থাকবে; যে কোনো ১টির অনুবাদ করতে হবে।	১×০৫ = ০৫
২. অনুচ্ছেদ :	২টি প্রশ্ন থাকবে; যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১×০৫ = ০৫
৩. পত্রলিখন :	২টি প্রশ্ন থাকবে; যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১×০৫ = ০৫
৪. সারাংশ ও সারমর্ম :	২টি অংশ দেওয়া থাকবে; যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১×০৫ = ০৫
৫. ভাব-সম্প্রসারণ :	২টি অংশ দেওয়া থাকবে; যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১×১০ = ১০
৬. প্রতিবেদন প্রণয়ন :	২টি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে; যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১×১০ = ১০
৭. প্রবন্ধ রচনা :	৫টি প্রবন্ধের উল্লেখ থাকবে; যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে।	১×২০ = ২০

খ. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন – ৪০ নম্বর

মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে। সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ব্যাকরণ অংশ থেকে এবং নির্মিতি অংশের বাগধারা, বাক্য সংকোচন, প্রবাদ-প্রবচন থেকে প্রশ্ন থাকবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান ১ (এক) নম্বর।

১. ব্যাকরণ অংশ থেকে মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে ৪০×১ = ৪০

ইউনিট ১
ভাষা : বাংলা ভাষা

পাঠ-১.১ : ভাষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ভাষার সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- ভাষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভাষা

মানুষ সামাজিক জীব। তাই মানুষ একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করে। অপরের সঙ্গে ভাব আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজন হয় ভাষার। অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমেই মানুষ একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই ভাষা উৎপাদনের জন্য মানুষ তার শরীরের প্রত্যঙ্গের ব্যবহার করে থাকে। মানুষের অঙ্গের কোনো কোনো প্রত্যঙ্গ এই বাক্ বা ভাষা উৎপাদনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তাই যেসব প্রত্যঙ্গ ভাষা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় বাক্-প্রত্যঙ্গ। মানব ভাষার ধ্বনি উৎপাদনে যেসব প্রত্যঙ্গসমূহ ব্যবহৃত হয় তাকে বাক্-প্রত্যঙ্গ বলে।
আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা হলো বাংলা। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা হলো বাংলা। বাংলা ছাড়াও বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মাতৃভাষা রয়েছে; যেমন– চাকমা, মারমা, গারো, পাত্র, হাজং, ত্রিপুরা প্রভৃতি।

পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী রয়েছে। বাংলা ভাষা পৃথিবীর বৃহত্তম ভাষাগোষ্ঠী ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের শতম শাখা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই ভাষাবংশ খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ইউরোপে, এশিয়ার ইরান ও ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে বিকাশ লাভ করে।

বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে বর্তমানে সাড়ে তিন হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে বাংলা ভাষা অন্যতম। ভাষাভাষীর সংখ্যার দিক থেকে বাংলা ভাষার অবস্থান চতুর্থ। বাংলাদেশ ছাড়াও আসাম, ত্রিপুরা, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভাষা হলো বাংলা। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে বাংলাভাষী মানুষ রয়েছে। বর্তমানে বাংলা ভাষায় কথা বলে এমন লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ কোটি।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো বাংলাদেশসহ ২৭টি দেশের সমর্থন নিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং ২০০১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার যে মর্যাদা বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইউনেস্কোর এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা ও সম্মান আরো সুদৃঢ় হলো।

ভাষার সংজ্ঞা

ভাষা মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। ভাষাবিদগণ একে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিচে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

১. 'মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে' (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)

২. '... মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।' (সুকুমার সেন)

৩. 'মনুষ্য জাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনি-সকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তাহার নাম ভাষা ।' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্)

৪. 'মানুষ তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, ওষ্ঠ, দন্ত, নাসিকা, মুখবিবর প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে অপরের বোধগম্য যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির উচ্চারণ করিয়া থাকে, সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে ভাষা বলা হয়।' (মুহাম্মদ এনামুল হক)

অর্থাৎ ভাষা হলো মানুষের মুখ-নিঃসৃত অর্থবোধক ধ্বনির সমষ্টি, যা মনের ভাব অন্যের শ্রবণপথে পৌঁছে সেই ভাবের প্রতিবিধান নিশ্চিত করে।

ভাষার বৈশিষ্ট্য:

ওপরে উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য পাই-

১. ভাষা হচ্ছে মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টি
২. ভাষা অর্থবহ ধ্বনির সমষ্টি
৩. ভাষার ধ্বনিসমূহ অন্যের বোধগম্য
৪. ভাষার সাহায্যে মানুষ মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে
৫. ভাষা মানুষের সমাজ-নির্ভর

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. বর্তমান বিশ্বের কত কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে?

ক. ২৪ কোটি খ. ২৫ কোটি
গ. ২৬ কোটি ঘ. ৩০ কোটি

২. কত সালে প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়?

ক. ২০০০ খ. ২০০১
গ. ২০০২ ঘ. ২০০৩

৩. বাংলা ভাষা কোন ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে?

ক. ইন্দো-ইউরোপীয় খ. ইন্দো-ইরানীয়
গ. ইন্দো-আর্য ঘ. কোনটিই নয়।

৪. মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টিকে কী বলে?

ক. বর্ণ খ. ভাষা
গ. ধ্বনি ঘ. অক্ষর

উত্তরমালা : ক.

১. ঘ ২. খ ৩. ক ৪. খ

পাঠ-১.২ : বাংলা ভাষারীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সাধু, চলতি ও আঞ্চলিক ভাষা কী তা বলতে পারবেন।
- সাধু, চলতি ও আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাধু ও চলতি ভাষার পার্থক্য করতে পারবেন।

সাধু ও চলতি

আমরা যারা বাংলাদেশের মানুষ, তারা সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলি। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সকলের ভাষা ব্যবহার এক নয়। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের জনগণ নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষায় কথা বলে। এগুলোকে আঞ্চলিক কথ্যভাষা বা উপভাষা বলে। পৃথিবীর সব ভাষারই উপভাষা আছে। এক অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার সঙ্গে অপর অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ফলে এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণের কথ্যভাষা দিনাজপুর বা রংপুরের মানুষদের পক্ষে খুব সহজবোধ্য নয়। এ ধরনের আঞ্চলিক ভাষাকে বলার ও লেখার ভাষা হিসেবে সর্বজনীন স্বীকৃতি দেওয়া সুবিধাজনক নয়। কারণ, তাতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে অন্তরায় দেখা দিতে পারে। সে কারণে, দেশের শিক্ষিত ও পণ্ডিতসমাজ একটি আদর্শ ভাষা ব্যবহার করেন। বাংলাভাষী শিক্ষিত জনগণ এ আদর্শ ভাষাতেই পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার কথ্যরীতির সমন্বয়ে শিষ্টজনের ব্যবহৃত এ ভাষাই আদর্শ চলতি ভাষা।

বাংলা, ইংরেজি, আরবি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় মৌখিক বা কথ্য এবং লৈখিক বা লেখ্য এই দুটি রূপ দেখা যায়। কথ্য থেকে কথা অর্থাৎ যে ভাষায় আমরা সবসময় কথা বলি তাকে বলা কথ্যভাষা। ভাষার মৌখিক বা কথ্য রূপের আবার রয়েছে একাধিক রীতিঃ একটি প্রমিতরীতি (Standard Colloquial language), অপরটি আঞ্চলিক কথ্যরীতি (Regional Colloquial Style)।

প্রমিত কথ্যরীতি : কথ্য ভাষারীতি মার্জিত হয়ে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য যে রূপ লাভ করেছে, সেই শিক্ষিত লোকের ভাষাকেই প্রমিত কথ্যভাষা বলা হয়।

আঞ্চলিক ভাষা : বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপকে আঞ্চলিক ভাষা বলে।

লেখ্য থেকে লেখা এসেছে। যে ভাষায় আমরা বক্তব্য লিখি বা সাহিত্য রচনা করি তাকে লেখ্য বা লৈখিক ভাষা বলে। বাংলা ভাষার লৈখিক বা লেখ্য রূপেরও রয়েছে দুটো রীতি : একটি চলতিরীতি (Standard Colloquial language) অপরটি সাধুরীতি (Standard Written form)।

সাধু-রীতি : যে ভাষারীতিতে তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি এবং ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়, তাকে সাধুরীতি বলে; যেমন– করিয়াছি, তাহারা ইত্যাদি।

চলতিরীতি : যে ভাষারীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয় তাকে চলতিরীতি বলে; যেমন– করেছি, তারা ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার প্রকারভেদ বা রীতিভেদ এভাবে দেখানো যায়–

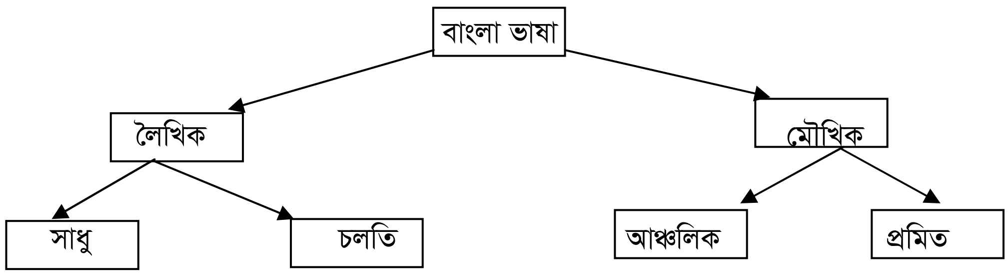

সাধু ও চলতিরীতির উদাহরণ :

সাধু রীতি :

'বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নতুন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়াছিল; স্থির হইল : সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

চলতি রীতি :

'পুল পেরিয়ে সামনে একটা বাঁশ বাগান পড়ল। তারি মধ্যে দিয়ে রাস্তা। মচ্‌মচ করে শুকনো বাঁশ পাতার রাশ ও বাঁশের খোসা জুতোর নিচে ভেঙে যেতে লাগল। পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় বুনো গাছপালা লতা ঝোপের ঘন সমাবেশ। সমস্ত ঝোপটার মাথা জুড়ে সাদা সাদা তুলোর মত রাধালতার ফুল ফুটে রয়েছে।' (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

সাধুরীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১. সাধুরীতি ব্যাকরণ নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলে।
২. সাধুরীতি তৎসম শব্দবহুল ও গুরুগম্ভীর।
৩. সাধুরীতিতে ক্রিয়ার পুর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : পড়িতেছি, লিখিতেছি ইত্যাদি।
৪. সাধুরীতিতে সর্বনামের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: তাহারা, উহারা ইত্যাদি।
৫. সাধুরীতিতে অব্যয়ের তৎসম রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : তথাপি, যদ্যপি ইত্যাদি।
৬. এই রীতিতে সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার বেশি। যেমন : রসনেন্দ্রিয়, মহাবুদ্ধিসম্পন্ন ইত্যাদি।
৭. সাধুরীতি নাটক, বক্তৃতা, সংলাপের উপযোগী নয়।

চলতিরীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১. চলতিরীতি ব্যাকরণের সুনির্ধারিত নিয়ম মেনে চলে না।
২. চলতিরীতিতে ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : পড়ছি, লিখছি ইত্যাদি।
৩. চলতিরীতিতে সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: ওরা, তারা ইত্যাদি।
৪. চলতিরীতিতে অব্যয়ের তদ্ভব রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: তবু, যদিও ইত্যাদি।
৫. চলতিরীতি পরিবর্তনশীল।
৬. চলতিরীতিতে সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।
৭. চলতিরীতি বক্তৃতা, নাটক ও সংলাপের উপযোগী।

গুরুচণ্ডালী দোষ:

একই লেখায় সাধু ও চলতি উভয় ভাষা অসঙ্গত রূপে মিশ্রিত হলে তাকে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে। বাংলা কবিতায় অনেক সময় সাধু ও চলতিরীতি এক সঙ্গে দেখা যায়। তবে গদ্যের ক্ষেত্রে যে-কোনো একটি রীতি অনুসরণ করতে হয়।

সাধু ও চলতি ভাষারীতির মধ্যকার পার্থক্য :

সাধু ভাষারীতি	চলতি ভাষারীতি
সাধু ভাষারীতি প্রাচীন ও পুরনো বৈশিষ্ট্যের অনুসারী	চলতি ভাষারীতি আধুনিক ও নতুন বৈশিষ্ট্যের অনুসারী
সাধু ভাষার রীতি ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	চলতি ভাষার রীতি ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।
সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পুর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় সাধু ভাষারীতিতে। যেমন– তাহারা, করিয়া প্রভৃতি।	চলতি ভাষারীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পুর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় না। যেমন– তারা, করে প্রভৃতি।
সাধু ভাষারীতিতে তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি।	চলতি ভাষায় তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের প্রয়োগ বেশি।
সাধু ভাষারীতি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়।	চলতি ভাষারীতি পরিবর্তনশীল।
সাধু ভাষারীতি সংলাপ, বক্তৃতা ও অপিনিহিতির ব্যবহার নেই।	চলতি ভাষারীতি বক্তৃতা, নাটক ও সংলাপের জন্য উপযোগী।
সাধু ভাষায় অনুসর্গের পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : হইতে, নিকট, দিয়া ইত্যাদি।	চলতি ভাষারীতিতে অনুসর্গের পূর্ণাঙ্গ রুপ ব্যবহৃত হয় না। যেমন : হতে, কাছে, দিয়ে ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. গুরুচণ্ডালী দোষ কী?

ক. সাধু ও চলতিরীতি মিশ্রণ
খ. সাধু ও আঞ্চলিক রীতির মিশ্রণ
গ. চলতি ও আঞ্চলিক রীতির মিশ্রণ
ঘ. কোনটিই নয়।

২. সাধুরীতিতে সর্বনামের কীরূপ ব্যহৃত হয়?

ক. সংক্ষিপ্ত
খ. পূর্ণাঙ্গ
গ. উভয়
ঘ. কোনটিই নয়।

৩. চলতিরীতিতে ক্রিয়াপদের কীরূপ ব্যহৃত হয়?

ক. সংক্ষিপ্ত
খ. পূর্ণাঙ্গ
গ. উভয়
ঘ. কোনটিই নয়।

৪. অঞ্চলভেদে ভাষার পার্থক্যকে কী বলে?

ক. সাধু ভাষা
খ. চলতি ভাষা
গ. আঞ্চলিক ভাষা
ঘ. কোনোটিই নয়।

উত্তরমালা : ক

১. ক ২. খ ৩. ক ৪. গ

পাঠ-১.৩ : বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যাকরণ

ব্যাকরণ (বি+আ+√কৃ+অন) শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

সংজ্ঞা : যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিচার বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা : ভাষা শিখনে ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। একটি ভাষা যথাযথভাবে শিখতে হলে একজন ভাষীর চারটি দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এগুলো হলো– কথন, পঠন, লেখন ও শ্রবণ। বাংলা ভাষা অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা হওয়ায় কথন ও শ্রবণ দক্ষতা ভাষী তার চারপাশের পরিবেশ থেকে আয়ত্ত পারে। অনেকে মনে করেন, ব্যাকরণ না জেনেও ভাষা বলা যেতে পারে কিংবা আয়ত্ত করা যেতে পারে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও আংশিক সত্য। এর পুরোটা সত্য তখনই দেখা যায় যখন একটি শিশু ক্রুটিপূর্ণ ভাষিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে এবং ভাষাকে ধারণ করে। প্রমিত বাংলা কথন-দক্ষতা অর্জনের জন্য অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন। আর এই যে ভাষার ধারণ-লালন তা শুধু ব্যাকরণের অনুশাসনের জন্যই সম্ভব হয়ে থাকে। ব্যাকরণ পাঠ করে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠনপ্রকৃতি ও সেসবের সুষ্ঠু ব্যবহারবিধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং লেখায় ও কথায় ভাষা প্রয়োগের সময় শুদ্ধি নির্ধারণ সহজ হয়।

বাংলা ব্যাকরণ : যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করা যায় তাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়:

প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যেমন–

১. ধ্বনি (Sound)

২. শব্দ (Word)

৩. বাক্য (Sentence)

৪. অর্থ (Meaning)

সব ভাষারই ব্যাকরণে প্রধানত নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়।

১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

২. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology)

৩. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax)

৪. অর্থতত্ত্ব (Semantics)

এ ছাড়া অভিধানতত্ত্ব (Lexicography), ছন্দ ও অলংকার প্রভৃতিও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

১. ধ্বনিতত্ত্ব

মানুষের বাক-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ কণ্ঠনালী, মুখবিবর, জিহ্বা, আল-জিহ্বা, কোমল তালু, শক্ত তালু, দাঁত, মাড়ি, চোয়াল, ঠোঁট ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে ‘ধ্বনি’ বলা হয়। বাক-প্রত্যঙ্গজাত ধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশ বা একককে (Unit) ধ্বনিমূল (phoneme) বলা হয়।

বর্ণ: বাক-প্রত্যঙ্গজাত প্রত্যেকটি ধ্বনি এককের জন্য প্রত্যেক ভাষারই লেখার সময় এক একটি প্রতীক বা চিহ্ন (Symbol) ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এ প্রতীক বা চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ (Letter)। যেমন–বাংলায় 'বক' কথাটির প্রথম ধ্বনিটির প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়েছে 'ব', ইংরেজিতে সে ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয় B বা b (বি), আবার আরবি, ফারসি ও উর্দুতে একই ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয় (বে) । ধ্বনির উচ্চারণপ্রণালী, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস, ধ্বনিসংযোগ বা সন্ধি, ধ্বনির পরিবর্তন ও লোপ, ণত্ব ও ষত্ব বিধান ইত্যাদি বাংলা ব্যাকরণে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

২. রূপতত্ত্ব

এক বা একাধিক ধ্বনির অর্থবোধক সম্মিলনে শব্দ তৈরি হয়, ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একককে বলা হয় রূপমূল (morpheme)। রূপমূল গঠন করে শব্দ। সেই জন্য শব্দতত্ত্বকে রূপতত্ত্ব (Morphology) বলা হয়। ব্যাকরণের এ অংশে শব্দ ও পদের ব্যুৎপত্তি-গঠন, বচন, লিঙ্গ, উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, কারক, সমাস, ধাতুরূপ, কাল (সময়) ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়।

৩. বাক্যতত্ত্ব

কতগুলো শব্দ একত্রিত হয়ে যদি সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে বলা বাক্য। বাক্যের সঠিক গঠনপ্রণালী, বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন, বিয়োজন, এদের সার্থক ব্যবহারযোগ্যতা, বাক্যমধ্যে শব্দ বা পদের স্থান বা ক্রম, পদের রূপ পরিবর্তন, বাগধারা, বাক্য সংকোচন, বিরামচিহ্ন ইত্যাদি বিষয় বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়। বাক্যের মধ্যে কোন পদের পর কোন পদ বসে, কোন পদের স্থান কোথায় বাক্যতত্ত্বে এসবের পূর্ণ বিশ্লেষণ থাকে। এজন্য কখনো কখনো বাক্যতত্ত্বকে পদক্রমও বলা হয়।

৪. অর্থতত্ত্ব

অর্থের যে শাখায় অর্থের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে বলা হয় অর্থতত্ত্ব। শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ, যেমন– মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ ইত্যাদি অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. প্রত্যেক ভাষার কয়টি মৌলিক অংশ থাকে?

ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪

২. প্রত্যেক ভাষা লেখার সময় যে চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করা হয় তাকে কী বলে?

ক. বর্ণ খ. ধ্বনি
গ. শব্দ ঘ. বাক্য

৩. ধ্বনি পরিবর্তন ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়।

ক. ধ্বনিতত্ত্বে খ. বাক্যতত্ত্বে
গ. রূপতত্ত্বে ঘ. অর্থতত্ত্বে

খ. রচনামূলক প্রশ্ন:

১. ভাষা বলতে কী বোঝেন? সাধু ও চলতিরীতির পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।
২. ব্যাকরণ কাকে বলে? ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
৩. বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়গুলো আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : ক.

১. ঘ ২. ক ৩. ক

ইউনিট ২
ধ্বনিতত্ত্ব : বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ

পাঠ-২.১ : বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ-প্রক্রিয়া লিখতে পারবেন।
- বাংলা বর্ণমালা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মৌলিক ও যৌগিক স্বরধ্বনি চিহ্নিত করতে পারবেন।

ধ্বনি : মানুষ বাগযন্ত্রের সাহায্যে যা উচ্চারণ করে তা-ই ধ্বনি (Sound)। বাগযন্ত্রের সাহায্যে নানা রকমের ধ্বনি সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু এসব ভাষার ধ্বনি নয়। ভাষার ধ্বনি বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয় এবং তা অর্থপূর্ণ (meaningful)। বাগধ্বনি দু-প্রকার। যথা–

স্বরধ্বনি (vowel) ও
ব্যঞ্জনধ্বনি (consonant)।

স্বরধ্বনি : যেসব বাগধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস আগত বাতাস মুখের মধ্যে কোথাও কোনো ধরনের বাধা পায় না সেগুলিই স্বরধ্বনি (Vowel)। যেমন–অ, আ, ই, ও, উ ইত্যাদি। কিছু স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস নির্গত বাতাস কোনো রকম বাধা ছাড়াই একই সঙ্গে নাক ও মুখ দিয়ে বের হয়। যেমন– অঁ, আঁ, উঁ, এঁ ইত্যাদি। এগুলিকে বলা হয় আনুনাসিক স্বরধ্বনি (Nasalized Vowel)। স্বরধ্বনি সাধারণত ঘোষ (voiced) হয়। বাংলা ভাষায় সব স্বরধ্বনিই ঘোষ।

ব্যঞ্জনধ্বনি : যেসব বাগধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস আগত বাতাস মুখের মধ্যে কখনো সম্পূর্ণ কখনো আংশিক বাধা পেয়ে উচ্চারিত হয় তাকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন– ক্‌, খ্‌, র্‌, ল্‌, শ্‌, স্‌ ইত্যাদি। কিছু ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে বাতাস প্রথমে মুখের মধ্যে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়, তারপর নাক দিয়ে বের হয়। যেমন–[ম্‌, ন্‌, ঙ্‌]।

বর্ণ : ধ্বনি লেখার জন্য যেসব প্রতীক বা সংকেত (symbol) ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় বর্ণ (Alphabet) ।

স্বরবর্ণ : স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় স্বরবর্ণ। যেমন– অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ। যেমন– ক, চ, ট, ত, প, ইত্যাদি।

বর্ণমালা : যে-কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা বলা হয় (alphabets)।

***জ্ঞাতব্য* :** উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি ‘অ’ স্বরধ্বনিটি যোগ করে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। যেমন– গ্‌+অ= গ, ইত্যাদি। স্বরধ্বনি যুক্ত না হলে অর্থাৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জনের নিচে ‘হস্‌’ বা ‘হল্‌’ চিহ্ন (্) দিয়ে লিখতে হয়।

বাংলা বর্ণমালা : বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশ (৫০)টি বর্ণ রয়েছে। এর মধ্যে স্বরবর্ণ এগার (১১)টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ঊনচল্লিশ (৩৯)টি।

বর্ণের নাম	বর্ণ পরিচিতি	সংখ্যা
স্বরবর্ণ	অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ	১১টি
	ক খ গ ঘ ঙ	৫টি
	চ ছ জ ঝ ঞ	৫টি
	ট ঠ ড ঢ ণ	৫টি
ব্যঞ্জনবর্ণ	ত থ দ ধ ন	৫টি
	প ফ ব ভ ম	৫টি
	য র ল	৩টি
	শ ষ স হ	৪টি
	ড় ঢ় য় ৎ	৪টি
	ং ঃ ঁ	৩টি
	মোট বর্ণমালা	৫০টি

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ঐ, ঔ–এ-দুটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বরধ্বনির চিহ্ন। যেমন– অ + ই = ঐ, অ + উ= ঔ।
উপর্যুক্ত বর্ণসমূহকে মাত্রার উপর ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

- **মাত্রাহীন বর্ণ :** বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা ১০ টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ ৪টি এ, ঐ, ও, ঔ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৬টি (ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ,ঁ)।
- **অর্ধমাত্রার বর্ণ :** বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ ৮টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ ১টি (ঋ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৭টি (খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ)।
- **পূর্ণমাত্রার বর্ণ :** বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণ মাত্রার বর্ণ ৩২টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ ৬টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি।

মৌলিকতা অনুযায়ী, স্বরধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

মৌলিক স্বরধ্বনি : যে স্বরধ্বনিকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে মৌলিক স্বর বলে। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ৭টি। যেমন– ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ। বাংলা বর্ণমালায় 'অ্যা' ধ্বনিজ্ঞাপক কোনো বর্ণ নেই।

দ্বিস্বরধ্বনি :পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চরণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয় যা দ্বিস্বর নামে পরিচিত। অর্থাৎ একসঙ্গে উচ্চারিত দুটো মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর বা দ্বি–স্বর বলা হয়। দ্বিস্বরে দুটি স্বর থাকে একটি পূর্ণ, আর একটি অপূর্ণ। বাংলায় পরের স্বরটিই সাধারণত অর্ধ হয়। বাংলা ভাষায় ২৫টি যৌগিক স্বরধ্বনি রয়েছে। বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ রয়েছে : ঐ এবং ঔ। উদাহরণ : কৈ, বৌ। অন্য যৌগিক স্বরের চিহ্ন স্বরূপ কোনো বর্ণ নেই।

দ্বিস্বর	উচ্চারণ	উদাহরণ	দ্বিস্বর	উচ্চারণ	উদাহরণ	দ্বিস্বর	উচ্চারণ	উদাহরণ
আ+ই	আই	যাই, ভাই	ই+উ	ইউ	শিউলি	এ+আ	এয়া	কেয়া, দেয়া
আ+উ	আউ	লাউ	ই+এ	ইয়ে	বিয়ে	এ+ই	এই	সেই, নেই
আ+এ	আয়	যায়, খায়	ই+ও	ইও	নিও, দিও	এ+ও	এও	খেও
আ+ও	আও	যাও, খাও	উ+ই	উই	উই, শুই	ও+ও	ওও	শোও
ই+ই	ইই	দিই	উ+আ	উয়া	কুয়া			

স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্তরূপ

কার : স্বরবর্ণের এবং কতগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের দুটি রূপ রয়েছে। স্বরবর্ণ যখন নিরপেক্ষ বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় না, তখন এর পূর্ণরূপ লেখা হয়। একে বলা হয় প্রাথমিক বা পূর্ণরূপ। যেমন– অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ। এই রূপ শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত যে-কোনো অবস্থানে বসতে পারে। স্বরধ্বনি যখন ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়, তখন সে স্বরধ্বনিটির বর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত

হয়। **স্বরবর্ণের এ সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত স্বর বা ‘কার’**। যেমন– ‘আ’–এর সংক্ষিপ্ত রূপ (া)। ‘ম’-এর সঙ্গে ‘আ’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ ‘া’ যুক্ত হয়ে ‘মা’ হয়। বানান করার সময় বলা হয় ম এ আ–কার (মা)। স্বরবর্ণের নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়। যেমন–

আ–কার (া) ই–কার (ি) ঈ–কার (ী) উ–কার (ু) ঊ–কার (ূ)
ঋ–কার (ৃ) এ–কার (ে) ঐ–কার (ৈ) ও–কার (ো) ঔ–কার (ৌ)।

- বাংলা বর্ণমালায় ‘অ’-এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ বা কার নেই।

আকার (া) এবং ঈ-কার (ী) ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত হয়। ই-কার (ি), এ-কার (ে) এবং ঐ-কার (ৈ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে যুক্ত হয়। উ-কার (ু), ঊ-কার (ূ) এবং ঋ-কার (ৃ) ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে যুক্ত হয়। ও-কার (ো), ঔ-কার (ৌ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে ও পরে দুই দিক যুক্ত হয়।

উদাহরণ : মা, মী, মি, মে, মৈ, মু, মূ, মৃ, মো, মৌ।

ফলা : স্বরবর্ণ যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয়, তেমনি কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণও কোনো কোনো স্বর কিংবা অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয় এবং কখনো কখনো সংক্ষিপ্তও হয়। যেমন– ম্য, ম্র ইত্যাদি। **স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে যেমন ‘কার’ বলা হয়, তেমনি ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় ‘ফলা’**। এভাবে যে ব্যঞ্জনটি যুক্ত হয়, তার নামানুসারে ফলার নামকরণ করা হয়। যেমন– ম–এ–য ফলা = ম্য, ম–এ র–ফলা = ম্র, ম–এ ল–ফলা= ম্ল, ম–এ ব–ফলা = ম্ব। র–ফলা ব্যঞ্জনবর্ণের পরে হলে লিখতে হয় নিচে ‘ম্র’; আবার ‘র’ যদি ম–এর আগে উচ্চারিত হয়। যেমন– ম–এ রেফ ‘র্ম’ তবে লেখা হয় ওপরে, ব্যঞ্জনটির মাথায় রেফ (র্) দিয়ে। ‘ফলা’ যুক্ত হলে যেমন, তেমনি ‘কার’ যুক্ত হলেও বর্ণের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। যেমন– হ-এ উ-কার =হু, গ-এ উ-কার = গু, শ-এ উ–কার =শু, স-এ উ-কার = সু, র-এ উ-কার = রু, হ-এ ঋ-কার=হৃ।

ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি স্পর্শধ্বনিকে উচ্চারণস্থানের দিক থেকে পাঁচটি গুচ্ছ বা বর্গে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নামানুসারে সে গুচ্ছের সবগুলো ধ্বনিকে বলা হয় বর্গীয় ধ্বনি। বর্গভুক্ত বলে এ ধ্বনির চিহ্নগুলোকেও ঐ বর্গীয় নামে অভিহিত করা হয়। যেমন–

বর্গ	বর্গীয় বর্ণ	বর্গের ভাষাবৈজ্ঞানিক নাম
ক	ক খ গ ঘ ঙ	কণ্ঠ্য
চ	চ ছ জ ঝ ঞ	তালব্য
ট	ট ঠ ড ঢ ণ	মূর্ধন্য
ত	ত থ দ ধ ন	দন্ত্য
প	প ফ ব ভম	ওষ্ঠ্য

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে কী বলা হয়?

ক. স্বরবর্ণ খ. ব্যঞ্জনবর্ণ
গ. বর্ণমালা ঘ. মৌলিক স্বরধ্বনি

২. বাংলা ভাষায় মোট বর্ণ কয়টি?

ক. ৫০টি খ. ৩৯টি
গ. ১১টি ঘ. ২৪টি

৩. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?

ক. ১১টি খ. ৭টি
গ. ৮টি ঘ. ৩২টি

৪. বাংলা ভাষার মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি?

ক. ২৪টি
খ. ১১টি
গ. ৩২টি
ঘ. ১০টি

৫. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলা হয়?

ক. কার
খ. ফলা
গ. মৌলিক স্বর
ঘ. দ্বিস্বর

৬. ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলা হয়?

ক. কার
খ. ফলা
গ. মৌলিক স্বর
ঘ. বর্ণমালা

উত্তরমালা : ক.

১. গ ২. ক ৩. খ ৪. ঘ ৫. ক ৬. খ

পাঠ-২.২ : ধ্বনির উচ্চারণবিধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- স্বরধ্বনি উচ্চারণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- স্বরধ্বনির সঠিক উচ্চারণ করতে পারবেন।

স্বরধ্বনির উচ্চারণ

সাধারণত তিনটি মানদণ্ড দ্বারা স্বরধ্বনির উচ্চারণগত চরিত্র বিচার করা হয়, যথা–জিভের উচ্চতা (Tongue Height), জিভের অবস্থান (Tongue Position)এবং ঠোঁটের আকৃতি (Lip Attitude)। এছাড়া আরও কিছু মানদণ্ড আছে, বাংলা স্বরধ্বনি উচ্চারণে এগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট। যেমন– (ক) কোমল তালুর অবস্থা(State of Soft Palate): কোমল তালুর অবস্থা অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলিকে মৌখিক (Oral)ও আনুনাসিক (Nasal)স্বর হিসেবে নির্দেশ করা হয়। (খ) স্বরের উচ্চারণকালের দৈর্ঘ্য (length) : সে-অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে হ্রস্ব (Short)ও দীর্ঘ (Long)স্বর হিসেবে ভাগ করা হয়।

১. জিভের উচ্চতা : বিশেষ বিশেষ স্বরধ্বনির উচ্চারণকালে জিভ কতটা উপরে ওঠে বা নামে সে-অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলিকে উচ্চ (high), উচ্চ-মধ্য (high-mid), নিম্ন-মধ্য (low-mid) ও নিম্ন (low)স্বরধ্বনি হিসেবে নির্দেশ করা হয়।

- উচ্চ-স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ সবচেয়ে উপরে ওঠে। যেমন– /ই, উ/।
- জিভ সবচেয়ে নিচে থাকা অবস্থায় উচ্চারিত হয় নিম্ন স্বরধ্বনি। যেমন– /আ/।
- উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনির তুলনায় উপরে এবং উচ্চ-স্বরধ্বনির তুলনায় নিচে থাকে। যেমন–/এ, ও/।
- নিম্ন–মধ্য স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিভ উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনির চেয়ে নিচে ও নিম্ন স্বরধ্বনির তুলনায় উপরে ওঠে। যেমন– /অ্যা, অ/।

উচ্চ	ই		উ
উচ্চ-মধ্য	এ		ও
নিম্ন-মধ্য	অ্যা		অ
নিম্ন		আ	

২. জিভের অবস্থান : স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিভের যে অংশ সক্রিয় থাকে, সেই অংশের ভূমিকা অনুযায়ী স্বরধ্বনি বিচার করা হয়। সে-অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলি সম্মুখ (front), মধ্য (center), ও পশ্চাৎ (back) স্বরধ্বনি হিসেবে গণ্য হয়।

- **সম্মুখ স্বরধ্বনি** : জিভের সামনের অংশের সাহায্যে উচ্চারিত হয়। যেমন– /ই, এ, অ্যা/।
- **মধ্য-স্বরধ্বনি** : জিভ স্বাভাবিক অবস্থায় থেকে অর্থাৎ, সামনে কিংবা পেছনে না-সরে উচ্চারিত হয়। যেমন– /আ/
- **পশ্চাৎ স্বরধ্বনি** : জিভ পিছিয়ে যায় এবং পেছনের অংশ সক্রিয় হয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন–/অ, ও, উ/।

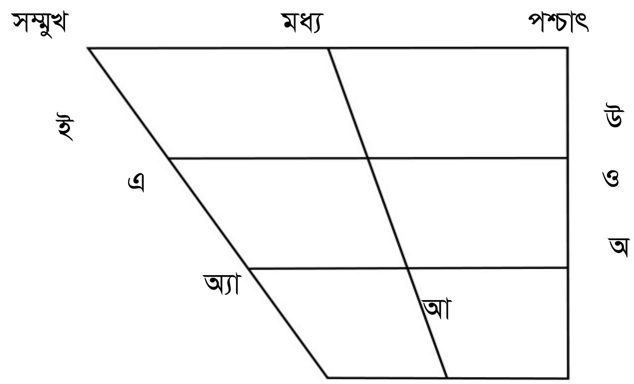

৩. ঠোঁটের গোলাকৃতি অনুযায়ী বাংলা স্বরধ্বনি :স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট দুটি কখনও গোল কখনও ছড়ানো অবস্থায় থাকতে পারে। সে-অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে গোলাকৃত (round)ও অগোলাকৃত (unround) স্বর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
ক. গোলাকৃত স্বরধ্বনি : ঠোঁট গোল হয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন– /অ, ও, উ/।
খ. অগোলাকৃত স্বরধ্বনি : ঠোঁট গোল না-হয়ে বিস্তৃত অবস্থায় থেকে উচ্চারণ করা হয়। যেমন– /ই, এ, অ্যা/।

৪. কোমল তালুর অবস্থান : কোমল তালুর অবস্থা অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলিকে মৌখিক (Oral)ও আনুনাসিক (Nasal)এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মৌখিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাস কেবল মুখ দিয়ে বের হয়। যেমন–/ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ/। অন্যদিকে আনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাস একইসঙ্গে মুখ ও নাক দিয়ে বের হয়। ৭টি মৌলিক স্বরেরই সাতটি আনুনাসিক রূপ বা বৈচিত্র্য রয়েছে। /ইঁ, এঁ, অ্যাঁ, আঁ, অঁ, ওঁ, উঁ/।

৫. স্বরের উচ্চারণকালের দৈর্ঘ্য : স্বরের উচ্চারণকাল অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে হ্রস্ব (Short)ও দীর্ঘ (Long)স্বর হিসেবে ভাগ করা হয়। বাংলা লিপিতে দুটি; [ঈ] এবং [ঊ] দীর্ঘ স্বর রয়েছে। দীর্ঘস্বর তখনই গণনা করা হয় যখন হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের জন্য দুটি ভিন্ন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়। যেমন–ইংরেজি βιτ [βιτ], βεατ [βι⌉τ]. কিন্তু বাংলায় এ জাতীয় উচ্চারণ নেই। নদী শব্দের হ্রস্ব বা দীর্ঘ যে-উচ্চারণই করি না কেন তাতে অর্থের পার্থক্য ঘটে না। বাংলা বর্ণমালায় দীর্ঘস্বরের চিহ্ন আছে কিন্তু উচ্চারণ নেই।

৬. জ্ঞাতব্য
আ : বাংলায় আ–ধ্বনি একটি বিবৃত স্বর। এর উচ্চারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ দু–ই হতে পারে। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি ফাদার (Father) ও কাম (Calm)শব্দের আ (a)–এর মতো। যেমন– আপন, বাড়ি, মা, দাতা ইত্যাদি। বাংলায় একাক্ষর (Monosyllabic) শব্দে আ দীর্ঘ হয়। যেমন– কাজ ও কাল শব্দের আ দীর্ঘ। এরূপ– যা, পান, ধান, সাজ, চাল, চাঁদ, বাঁশ।
ই ঈ : বাংলায় সাধারণত হ্রস্ব ই–ধ্বনি এবং দীর্ঘ ঈ–ধ্বনির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। একাক্ষর শব্দের ই এবং ঈ–দুটোই দীর্ঘ হয়। যেমন–বিষ, বিশ, দীন, দিন, শীত।
উ ঊ : বাংলায় উ এবং ঊ ধ্বনির উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। ই ঈ–ধ্বনির মতো একাক্ষর শব্দে এবং বহু অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের বদ্ধাক্ষর বা প্রান্তিক যুক্তাক্ষর উচ্চারণ সামান্য দীর্ঘ হয়। যেমন– চুল (দীর্ঘ), চুলা (হ্রস্ব), ভূত, মুক্ত, তুলতুলে, তুফান, বহু, অজু, করুণ প্রভৃতি।
ঋ : স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হলেও ঋ–এর উচ্চারণ 'রি' অথবা 'রী'–এর মতো হয়। আর ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে র–ফলা + ই–কার এর মতো হয়। যেমন– ঋণ, ঋতু, (রীন, রীতু), মাতৃ (মাত্রি), কৃষ্টি (ক্রিষ্টি)। বাংলায় ঋ–ধ্বনিটিকে স্বরধ্বনি বলা চলে না। সংস্কৃতে এই ধ্বনিটি স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারেই বাংলা বর্ণমালায় এটি স্বরবর্ণের মধ্যে রক্ষিত আছে।
ঐ : ঐ ধ্বনিটি একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ+ই কিংবা ও+ই, ওই। অ এবং ই–এ দুটো স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ঐ–ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন– ক্+অ+ই = কই, কৈ; ব্+ই+ধ = বৈধ ইত্যাদি। এরূপ– বৈদেশিক, ঐক্য, চৈতন্য।

ও : বাংলা একাক্ষর শব্দে ও–দীর্ঘ হয়। যেমন– গো, জোর, রোগ, ভোর, কোন, বোন ইত্যাদি। অন্যত্র সাধারণ হ্রস্ব হয়। যেমন– সোনা, কারো, পুরোভাগ। ও–এর উচ্চারণ ইংরেজি বোট (boat) শব্দের (oa)–এর মতো।
এ : এ–ধ্বনির উচ্চারণ দুই রকম। সংবৃত ও বিবৃত। যেমন– মেঘ, সংবৃত, খেলা–(খ্যালা), বিবৃত।

স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা : স্বরধ্বনির উচ্চারণকালে সময়ের স্বল্পতা ও দৈর্ঘ্য অনুসারে হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়। যেমন– ইংরেজি full–পূর্ণ এবং fool–বোকা। শব্দ দুটোর প্রথমটির উচ্চারণ হ্রস্ব ও দ্বিতীয়টির উচ্চারণ দীর্ঘ। হ্রস্ব বর্ণের উচ্চারণ যে দীর্ঘ হয় এবং দীর্ঘ বর্ণের উচ্চারণ যে হ্রস্ব হয়, কয়েকটি উদাহরণে তা স্পষ্ট হবে। যেমন– ইলিশ, তিরিশ, উচিত, নতুন, লিখিত হয়েছে হ্রস্ব ই–কার ও হ্রস্ব–উ–কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে দীর্ঘ। আবার দীন, ঈদুল ফিতর, ভূমি, লিখিত হয়েছে দীর্ঘ ঈ–কার এবং দীর্ঘ উ–কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণে হ্রস্ব হয়ে যাচ্ছে। একটি মাত্র ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণ সবসময় দীর্ঘ হয়। যেমন– দিন, তিল, পুর ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. জিভের সামনের অংশের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিকে কী বলে?
ক. মধ্যস্বরধ্বনি খ. পশ্চাৎ স্বরধ্বনি
গ. সম্মুখ স্বরধ্বনি ঘ. গোলাকৃত স্বরধ্বনি

২. ‘ঐ’ স্বরধ্বনিটি–
ক. যৌগিক স্বরধ্বনি খ. মৌলিক স্বরধ্বনি
গ. নিম্ন স্বরধ্বনি ঘ. উচ্চ স্বরধ্বনি

৩. বাংলা লিপিতে কয়টি দীর্ঘস্বর আছে?
ক. ৫টি খ. ৪টি
গ. ৩টি ঘ. ২টি

৪. জিভের অবস্থা অনুযায়ী ‘ও’ কোন শ্রেণির স্বরধ্বনি?
ক. সম্মুখ খ. মধ্য
গ. পশ্চাৎ ঘ. কোনোটিই নয়।

৫. ঠোঁটের অবস্থা অনুযায়ী ‘অ’ কোন শ্রেণির স্বরধ্বনি?
ক. গোলাকৃত খ. অগোলাকৃত
গ. ক ও খ উভয়ই ঘ. কোনোটিই নয়।

উত্তরমালা : ক.

১. গ ২. ক ৩. ঘ ৪. গ ৫. ক

পাঠ-২.৩ : ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্থান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণরীতি সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- যুক্ত ব্যঞ্জন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- উচ্চারণ স্থান ও রীতি অনুযায়ী ব্যঞ্জন ধ্বনির বিভাজন করতে পারবেন।

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যথা–ধ্বনিগুলির উচ্চারণস্থান (place of Articulation) ও ধ্বনিগুলির উচ্চারণরীতি (Manner of Articulation)। যে বাগযন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তা-ই উচ্চারণস্থান। ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে উচ্চারণস্থান অনুযায়ী দ্বি-ওষ্ঠ্য (Bilabial); দন্ত্য (Dental), দন্তমূলীয় (Alveolar), প্রতিবেষ্টিত (Retroflex), তালব্য-দন্তমূলীয় (Palato-alveolar), তালব্য (Palatal), জিহ্বামূলীয় (Velaric), কণ্ঠনালীয় (Glottal) প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. **দ্বি-ওষ্ঠ্য :** দুই ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত ব্যঞ্জনগুলিই দ্বি-ওষ্ঠ্য। যেমন : /প/ পাপ, /ফ/ লাফ, /ব/ ডাব, /ম/ আম।

খ. **দন্ত্য :** জিভের সামানের অংশ উপরের পাটির কর্তন দাঁতকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। যেমন : /ত/ পাত, /থ/ পথ, /দ/ পদ।

গ. **দন্তমূলীয় :** জিভের সামনের অংশ ও উপরের পাটির দাঁতের মূলকে স্পর্শ করে উচ্চারিত ব্যঞ্জনগুলিই দন্তমূলীয়। যেমন– /স/ কাসতে, আসমান, /ন/ কান, /র/ ধার, /ল্/ লাল

ঘ. **প্রতিবেষ্টিত :** জিভের সামনের অংশ সামনে বা পেছনে কুঞ্চিত হয়ে উৎপাদিত ব্যঞ্জন হলো প্রতিবেষ্টিত। যেমন–/ড়/ গাড়, /ঢ়/ আষাঢ় প্রভৃতি। হিন্দি, তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম ভাষায় এ ধ্বনির অধিক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

ঙ. **তালব্য-দন্ত্যমূলীয় :** জিভের সামনের অংশ উপরে গিয়ে শক্ত তালুকে স্পর্শ করে এ জাতীয় ব্যঞ্জন উচ্চারিত হয়। যেমন : /ট/ পটপট, /ঠ/ ঠকঠক, /ড/ ডগডগ, /ঢ/ ঢকঢক।

চ. **তালব্য :** জিভের সামনের অংশ শক্ততালু স্পর্শ করে তালব্য ব্যঞ্জন উচ্চারণ করতে হয়। যেমন–/ছ/ ছলছল, /জ/ জগজ্জয়, /ঝ/ ঝকঝক।

ছ. **জিহ্বামূলীয় :** জিভের পেছনের অংশ উঁচু হয়ে আলজিভের মূলের কাছাকাছি নরম তালুকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। যেমন– /ক্/ টিকটিক, /খ্/ খনখন, /গ্/ টগবগ, /ঘ্/ ঘন-ঘন. /ঙ/ রঙচঙ (রংচং)।

জ. **কণ্ঠনালীয় :** কণ্ঠনালির মধ্যে ধ্বনিবাহী বাতাস বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এ ব্যঞ্জন উচ্চারিত হয়। বাংলায় এ ধরনের ব্যঞ্জন একটি : /হ/ হনহন।

এছাড়াও ব্যঞ্জধ্বনির উচ্চারণ রুদ্ধ (Stops), মৌখিক (Oral), নাসিক্য (Nasal), ঘর্ষণজাত (Fricative), কম্পনজাত (Rolling/Trill), তাড়নজাত (Flap/Tap), পার্শ্বিক (Lateral), নৈকট্যমূলক (Approximant) প্রভৃতি রকমের হতে পারে।

ক. **রুদ্ধ :** বাতাস মুখের মধ্যে প্রথমে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে ও পরে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে উচ্চারিত হয়। রুদ্ধ ব্যঞ্জনগুলিকে বায়ুপ্রবাহ কৌশল অনুযায়ী দু-শ্রেণিতে বদ্ধ করা হয়– মৌখিক (Oral) ও নাসিক্য (Nasal)।

১. মৌখিক : যেসব ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় বাতাস প্রথমে মুখের মধ্যে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয় এবং পরে কেবল মুখ দিয়ে বের হয় সেগুলিই মৌখিক রুদ্ধ ব্যঞ্জন। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী এ শ্রেণির বাংলা রুদ্ধ ব্যঞ্জনগুলি হলো : দ্বি–ওষ্ঠ্য : /প্, ফ্, ব্, ভ,/, দন্ত্য : /ত্, থ্, দ্, ধ্/, জিহ্বামূলীয় : /ক্, খ্, গ্, ঘ্/।

২. নাসিক্য : বাতাস মুখের মধ্যে প্রথমে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়, তারপর নাক ও মুখ দিয়ে বাতাস বেরিয়ে গিয়ে এ জাতীয় ব্যঞ্জন তৈরি হয়। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বাংলা নাসিক্য ব্যঞ্জন হলো : দ্বি–ওষ্ঠ্য : /ম্/ : দন্তমূলীয় /ন্/ জিহ্বামূলীয় /ঙ্/।

খ. **ঘর্ষণজাত :** এ ধ্বনি উচ্চারণের সময় দুটি বাগযন্ত্র খুব কাছাকাছি আসে; কিন্তু একসঙ্গে যুক্ত হয় না। ফলে বাতাস বাধা পায় ও সংকীর্ণ পথে বের হওয়ার সময় ঘর্ষণের সৃষ্টি করে বলে এগুলি ঘর্ষণজাত ধ্বনি বলা হয়। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বাংলা ঘর্ষণজাত ধ্বনি হচ্ছে : **দন্তমূলীয়** /স্/ : বস্ত্, কাস্তে, **তালব্য :** /শ/ দাশ, রাশ,হ্রাস, **কণ্ঠনালীয় :** /হ্/ হাট, হনহন।

গ. **তাড়নজাত :** জিভ উলটিয়ে এ ধ্বনি তৈরি হয়। উচ্চারণের সময় জিভের সামনের অংশ উপরের শক্ত তালুতে একটিমাত্র টোকা দেয় বলে এগুলিকে টোকাজাত ধ্বনিও বলে। এ জাতীয় বাংলা **প্রতিবেষ্টিত** ব্যঞ্জন দুটি : /ড়্/ ধড়ফড়, বাড়, /ঢ়্/, গাঢ়, নিগূঢ়।

ঘ. **কম্পনজাত :** জিভ কম্পিত হয়ে বা দন্তমূল বারবার আঘাত করে উচ্চারিত হয় বলে এ-জাতীয় ব্যঞ্জনগুলিকে বলে কম্পনজাত। এ শ্রেণির বাংলা ব্যঞ্জন একটি : /র্/ যেমন– বার, ধার।

ঙ. **পার্শ্বিক :** বাতাস জিভের এক পাশ বা দু-পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় বলে এসব ব্যঞ্জনকে বলে পার্শ্বিক। বাংলায় এ শ্রেণির ধ্বনি একটি : /ল্/ = তাল, শাল

চ. **নৈকট্যমূলক :** বাতাসের বাধার স্বাতন্ত্র্যের কারণে যেসব ধ্বনির উচ্চারণ স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনির নিকটবর্তী সেগুলিই এ শ্রেণিতে পড়ে। বাংলা এ ধ্বনি আছে তিনটি : /ওয়া/ (অন্তস্থ-ব), হয় শব্দের [য়] (অন্তস্থ য়)।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি

উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণরীতি ছাড়াও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে স্বরতন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বরতন্ত্রের অবস্থা (State of Soft Palate) অনুযায়ী বাগধ্বনিগুলির ঘোষ ও অঘোষ উচ্চারণ রয়েছে।

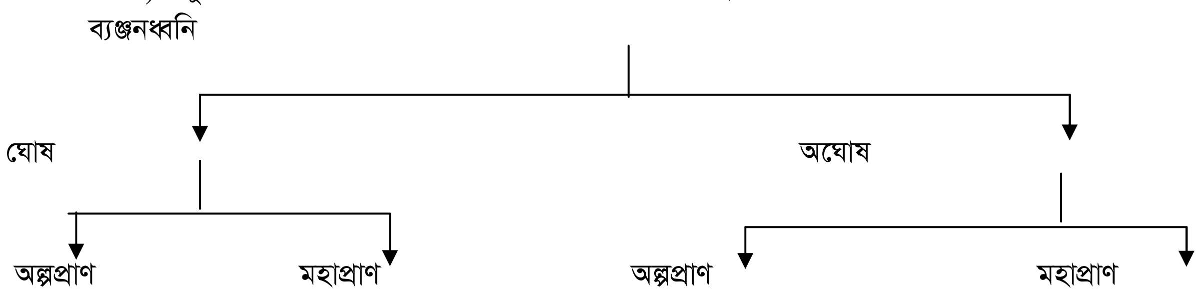

অঘোষ ধ্বনি : যেসব ধ্বনির উচ্চারণে স্বরতন্ত্র কম্পিত হয় না সেগুলিকে **অঘোষ ব্যঞ্জন** (Unvoiced) বলে। যেমন–ক্ খ্ চ্ ছ্ ট্ ঠ্ ত্ থ্ প্ ফ্ ।

ঘোষ ধ্বনি : যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্র কম্পিত হয় সেগুলিই **ঘোষ ধ্বনি** (Voiced)। যেমন–গ্ ঘ্ ঙ্ জ্ ঝ্ ড্ ঢ্ দ্ ধ্ ন্ ব্ ভ্ ম্ র্ ল্ ড় ঢ় হ্ ইত্যাদি।

এছাড়া মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া বাতাসের আধিক্য ও নিচের চোয়ালের মাংস পেশির চাপ অনুযায়ী ব্যঞ্জনগুলির মহাপ্রাণ (Aspirate) ও অল্পপ্রাণ (Unapirated) উচ্চারণ রয়েছে।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখ দিয়ে কম বাতাস বের হয় ও নিচের চোয়ালের মাংসপেশিতে অল্প চাপ পড়ে তাকে **অল্পপ্রাণ ধ্বনি** বলা হয়। যেমন–/ক্ গ্ চ্ জ্/।

মহাপ্রাণ ধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখ দিয়ে অধিক বাতাস বের হয় ও নিচের চোয়ালে বেশি চাপ প্রয়োগ করতে হয় তাকে **মহাপ্রাণ ধ্বনি** বলা হয়। যেমন– /খ্ ঘ্ ছ্ ঝ্/।

ধ্বনি উচ্চারণে দুটি বাক-প্রত্যঙ্গ জড়িত থাকে– সক্রিয় প্রত্যঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় প্রত্যঙ্গ। সচল প্রত্যঙ্গটিই সক্রিয় প্রত্যঙ্গ (Active Articulator)। তুলনামূলকভাবে অনড় প্রত্যঙ্গটিই নিষ্ক্রিয় প্রত্যঙ্গ (Passive Articulator) হিসেবে পরিচিত। ধ্বনির নামকরণ সাধারণত নিষ্ক্রিয় প্রত্যঙ্গটির নামে হয়।

ধ্বনি	**সক্রিয় উচ্চারক/প্রত্যঙ্গ**	**নিষ্ক্রিয় উচ্চারক/প্রত্যঙ্গ**
দ্বি-ওষ্ঠ্য	নিচের ঠোঁট	উপরের ঠোঁট
দন্ত্য	জিভের ডগা	উপরের দাঁত
দন্তমূলীয়	জিভের ডগা	দন্তমূল
প্রতিবেষ্টিত	কুঞ্চিত জিভের ডগা	দন্তমূলের পেছনের অংশ
তালব্য-দন্তমূলীয়	জিভের পাতা	দন্তমূলের পেছনের অংশ
তালব্য	জিভের সামনের অংশ	শক্ত তালু
জিহ্বামূলীয়	জিভের সামনের অংশ	কোমল তালু
কণ্ঠনালীয়	স্বররন্ধ্র	কণ্ঠনালি

বাক্–প্রত্যঙ্গ : ধ্বনি উচ্চারণের জন্য যে প্রত্যঙ্গগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে বলা হয় বাক্-প্রত্যঙ্গ। ধ্বনি উচ্চারণে ব্যবহৃত বাক্-প্রত্যঙ্গগুলো হলো– ঠোঁট, দাঁতের পাটি, দন্তমূল, অগ্রদন্তমূল, শক্ত তালু, নরম তালু, আলজিভ, জিহবাগ্র, সম্মুখ জিহ্বা, পশ্চাৎ জিহ্বা, নাসা-গহ্বর, স্বরতন্ত্রী ও ফুসফুস।

নিচে উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণরীতি অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাজন দেখানো হলো :

উচ্চারণরীতি → **উচ্চারণ স্থান ↓**		**ওষ্ঠ্য**	**দন্ত্য**	**মূর্ধন্য**	**তালব্য**	**জিহ্বামূলীয়**	**কণ্ঠনালীয়**
স্পৃষ্ট	অঘোষ	প ফ	ত থ	ট ঠ	চ ছ	ক খ	
	ঘোষ	ব ভ	দ ধ	ড ঢ	জ ঝ	গ ঘ	
নাসিক্য		ম	ন			ঙ	
তাড়নজাত				(ড়)			
কম্পনজাত			র				
পার্শ্বিক		ল					
উষ্ম			(স)	(ষ)	শ		হ

জ্ঞাতব্য

১. ঙ ঞ ণ ন ম–এ পাঁচটি বর্ণ এবং ং ঃ ঁ যে বর্ণের সঙ্গে লিখিত হয় সে বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস নিঃসৃত বায়ু মুখবিবর ছাড়াও নাসারন্ধ্র দিয়ে রেব হয়; অর্থাৎ এগুলোর উচ্চারণে নাসিকার সাহায্য প্রয়োজন হয়। তাই এগুলোকে বলে আনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি, আর এগুলোর বর্ণকে বলা হয় আনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ।

২. স্পর্শধ্বনি : যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাস মুখবিবরের কোথাও না কোথাও বাধা পেয়ে যায় এবং বাধা পেয়ে স্পষ্ট হয়, তাকে স্পর্শ ধ্বনি বলে। ক থেকে ম পর্যন্ত এ পঁচিশটি স্পর্শধ্বনি।

৩. **উষ্মধ্বনি :** শ, ষ, স, হ – এ চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা শ্বাস যতক্ষণ খুশি রাখতে পারি। এগুলোকে বলা হয় উষ্মধ্বনি বা শিশধ্বনি। এ বর্ণগুলোকে বলা হয় উষ্মবর্ণ। শ ষ স–এ তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ, আর 'হ' ঘোষ মহাপ্রাণ।

৪. **পরাশ্রয়ী ধ্বনি :** ং, ঃ ঁ এ তিনটি স্বাধীন ভাবে স্বতন্ত্র্য বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। তাই এ বর্ণগুলোকে বলা হয় পরাশ্রয়ী বর্ণ। ং এর উচ্চারণ ঙ–এর উচ্চারণের মতো। যেমন– রং (রঙ), বাংলা (বাংলা) ইত্যাদি। উচ্চারণে অভিন্ন হয়ে যাওয়ায় ং–এর বদলে ঙ এবং ঙ–এর বদলে ং–এর ব্যবহার খুবই সাধারণ।খণ্ড–ত (ৎ)–কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি 'ত' বর্ণের হস্-চিহ্ন যুক্ত (ত্)-এর রূপভেদ মাত্র। ং ঃ ঁ –এ তিনটি বর্ণ স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। এ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অন্য ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে উচ্চারিত হয়। তাই এ বর্ণগুলোকে বলা হয় পরাশ্রয়ী বর্ণ।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ

দুটি বা তার চেয়ে বেশি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে সে ব্যঞ্জনধ্বনি দুটি বা ধ্বনি কয়টি একত্রে উচ্চারিত হয়, তাকে বলা হয় সংযুক্ত ব্যঞ্জন। এরূপ যুক্তব্যঞ্জনধ্বনির দ্যোতনার জন্য দুটি বা অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রিত হয়ে সংযুক্ত বর্ণ (Ligature) গঠিত হয়। সাধারণত এরূপ গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মূল বা আকৃতি পরিবর্তিত হয়। যেমন– তক্তা (ত্ + অ + ক্ + ত্ + আ)। এখানে দ্বিতীয় বর্ণ ক ও ত– এর মূল রূপ পরিবর্তিত হয়ে ক্ত হয়েছে। বাংলা ভাষায় সাধরণত তিনভাবে সংযুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হতে পারে। যথা–

ক. কার সহযোগে
খ. ফলা সহযোগে
গ. ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণ (ফলা ব্যতীত) সহযোগে।

ক. কার সহযোগে :স্বরবর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বলে 'কার'। অ-ভিন্ন অন্য দশটি স্বরধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ হয়। সুতরাং বাংলায় কার দশটি। এগুলো যথাক্রমে :

আ–কার (া)– মামা, বাবা, মা, পাখা, চাকা;
ই–কার (ি)– বিশ্ব, মিথ্যা, পানি, চিনি, গাড়ি;
ঈ–কার (ী)– শীতল, মন্ত্রী, নীতি, পত্নী, পরীক্ষা;
উ–কার (ু)–বুবু, খুকু, ফুফু;
ঊ–কার (ূ)– মূল্যবান, পূর্তি, অপূর্ব, পূজা, চূর্ণ;
ঋ–কার (ৃ)– নৃত্য, বৃথা, বৃষ্টি, গৃহ, কৃতী;
এ–কার (ে)– দেশ, শেষ, মেঘ, মেয়ে, ছেলে;
ঐ–কার (ৈ)– মৈত্রী, দৈত্য, সৈন্য, চৈত্র, বৈশাখ;
ও–কার (ো)– খোলা, দোলনা, বোকা, খোকা, ধোকা;
ঔ–কার (ৌ)–নৌকা, ভৌত, পৌষ, কৌতুক, যৌথ।
জ্ঞাতব্য : অ–এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ বা 'কার' নেই।

খ. ফলা সহযোগে : ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে ফলা। ফলা যুক্ত হলে বর্ণের আকারে পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের ফলা ছয়টি। যেমন–

ণ/ন–ফলা (ণ/ন) প্রত্ন, অপরাহ্ন, মধ্যাহ্ন, চিহ্ন।
ব–ফলা (ব) – বিশ্ব, অশ্ব, নিঃস্ব, আশ্বাস, বিশ্বাস।
ম–ফলা (ম)– মৃন্ময়ী, পদ্মা, আত্ম, স্মৃতি, তন্ময়।
র–ফলা (্র)– গ্রহণ, ঘ্রাণ, স্রষ্টা, প্রণাম, প্রথম।
য–ফলা (্য)– ব্যঞ্জন, ইত্যাদি, লক্ষ্য, অ্যালবাম।
(র্ রেফ)–কর্ণ, ধর্ম, বর্ণ, বিতর্ক, অর্ক।
ল–ফলা (ল)– অক্লান্ত, অম্ল, উল্লাস, প্লাবন, পল্লব।

বাংলা স্বরবর্ণের সঙ্গেও ফলা যুক্ত হয়। যথা– অ্যালবাম, অ্যালামনাই, অ্যালার্ম, অ্যাটম, অ্যাটর্নি, অ্যাপোলো ইত্যাদি।

গ. ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণ (ফলা ব্যতীত) সহযোগে।

বাংলা যুক্ত ব্যঞ্জনের সাথেও কার এবং ফলা যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়। যেমন–সন্ধি, সন্ধ্যা, প্লাবন, মূর্খ, সন্ন্যান ইত্যাদি। নিচে কতিপয় সংযুক্ত ব্যঞ্জন, তাদের গঠন ও উদাহরণ দেখানো হলো :

বর্ণ	গঠন	উদাহরণ
ক্ক	ক্+ক = ক্ক	সক্কাল, ধাক্কা, পাক্কা, বৃক্ক, ছক্কা
ক্ব	ক্+ব = ক্ব	পক্ব, নিক্বণ
ক্ত	ক্+ত = ক্ত	শক্ত, ভক্ত, রক্ত, বিরক্ত, ডাক্তার
ক্স	ক্+স = ক্স	রিক্সা, বাক্স
ক্ষ	ক্+ষ = ক্ষ	সুরক্ষা, ভিক্ষা, শিক্ষা, কক্ষ, দক্ষ
হ্ম	হ্+ম = হ্ম	ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্ম
জ্ঞ	জ্+ঞ = জ্ঞ	জ্ঞান, বিজ্ঞান, অবিজ্ঞান, অজ্ঞান, সংজ্ঞা
ঞ্জ	ঞ্+জ = ঞ্জ	অঞ্জন, গঞ্জনা, গঞ্জ, রঞ্জন, কুঞ্জ
ঞ্চ	ঞ্+চ = ঞ্চ	অঞ্চল, পঞ্চম, প্রপঞ্চ, সঞ্চয়, কঞ্চি
ষ্ণ	ষ্+ণ =ষ্ণ	উষ্ণ, কৃষ্ণ
ট্ট	ট্+ট = ট্ট	চট্টগ্রাম, হট্টগোল
ট্র	ট্ + র-ফলা (্র) = ট্র	রাষ্ট্র, উষ্ট্র,
ত্ত	ত্ + ত = ত্ত	উত্তাল, মত্ত, সত্তা, বিত্ত, বৃত্ত
ত্ন	ত্ + ন	যত্ন, রত্ন, প্রত্ন
ত্র	ত্ + র = ত্র	যাত্রী, পাত্র, ছাত্র, মিত্র, গোত্র
ক্র	ক্ + র = ক্র	ক্রম, ক্রয়, বিক্রয়, বক্র, ক্রিয়া
ত্থ	ত্ + থ = ত্থ	উত্থান, অশ্বত্থ
দ্ব	দ্ + ব ফলা = দ্ব	উদ্বেল, সদ্ব্যবহার
দ্ধ	দ্ + ধ = দ্ধ	বদ্ধ, উদ্ধার
গ্ধ	গ্ + ধ = গ্ধ	দগ্ধ, মুগ্ধ
ন্ধ	ন্ + ধ = ন্ধ	অন্ধ, বন্ধ
ব্ধ	ব্ + ধ = বদ্ধ	উপলব্ধি, ক্ষুব্ধ
হ্ণ	হ্ + ণ = হ্ণ	অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ
হ্ন	হ্ + ন =হ্ন	চিহ্ন, আহ্নিক, মধ্যাহ্ন
হ্য	হ + ্য = হ্য	বাহ্যজ্ঞান, ঐতিহ্য
গ্ন	গ্ + ন = গ্ন	অগ্নি, মগ্ন
ণ্ড	ণ্ + ড = ণ্ড	কাণ্ড, কাণ্ডারী
ন্থ	ন্ + থ = ন্থ	পন্থা, মন্থর
স্থ	স্ + থ = স্থ	অস্থির, দুস্থ
স্ক	স্ + ক = স্ক	পুরস্কার, বয়স্ক
ষ্ক	ষ্ + ক = ষ্ক	শুষ্ক, নিষ্ক্রিয়
ণ্ণ	ণ্ + ণ = ণ্ণ	অক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ
ন্ন	ন্ + ন = ন্ন	অন্ন, ছন্ন
ম্ন	ম্ + ন = ম্ন	নিম্ন
ম্ম	ম্ + ম = ম্ম	সম্মতি, সম্মান
ন্ম	ন্ + ম = ন্ম	উন্মাদ, উন্মথিত
স্ট	স্ + ট = স্ট	মাস্টার, আগস্ট
ব্দ	ব্ + দ = ব্দ	জব্দ, শব্দ, অব্দ,
প্স	প্ + স = প্স	অভীপ্সা, লিপ্সা
দ্দ	দ্ + দ = দ্দ	উদ্দেশ্য, উদ্দীপক
ণ্ট	ণ্ + ট = ণ্ট	বণ্টন, ঘণ্টা
ল্ক	ল্ + ক = ল্ক	পাল্কি,মিল্কি, উল্কা
স্প	স্ + প = স্প	স্পন্দন, স্পষ্ট

স্ফ	স্ + ফ = স্ফ	স্ফটিক, প্রস্ফুটিত
ন্ত	ন্ + ত = ন্ত	অনন্ত, অন্তর
ন্দ	ন্ + দ = ন্দ	অভিনন্দন, আনন্দ
ন্তু	ন্ + ত্ + উ = ন্তু	কিন্তু, জন্তু, তন্তু
স্তু	স্ + ত্ + উ = স্তু	বস্তু, প্রস্তুত
ত্রু	ত্ + র + উ = ত্র + উ = ত্রু	শত্রু, ত্রুটি
ক্ষ্ম	ক্ + ষ্ + ম– ফলা = ক্ষ্ম	সূক্ষ্ম
ন্ত্র্য	ন্ + ত্ + র– ফলা = ন্ত্র্য	স্বাতন্ত্র্য

ধ্বনিসংযুক্তি : উচ্চারণের সময়ে বিভিন্ন ধ্বনি একত্রে উচ্চারণ হয়, সেগুলিই ধ্বনিসংযুক্তি। এর অর্থ একটি ধ্বনির সঙ্গে আরেকটি ধ্বনিকে সংযুক্ত করা। এই ধ্বনিসংযুক্তি কখন ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি মিলে হয়, যেমন– উষ্ট্র (উ + ষ্ + ট + র্ + অ)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. দুই ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে কী বলে?
ক. দ্বি-ওষ্ঠ্য　　খ. দন্তমূলীয়
গ. প্রতিবেষ্টিত　　ঘ. তালব্য

২. ‘র’ কোন জাতীয় ব্যঞ্জন?
ক. ঘর্ষণজাত　　খ. তাড়নজাত
গ. কম্পনজাত　　ঘ. পার্শ্বিক

৩. যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্র কম্পিত হয় তাকে কী বলে?
ক. অঘোষ ধ্বনি　　খ. ঘোষ ধ্বনি
গ. অল্পপ্রাণ ধ্বনি　　ঘ. মহাপ্রাণ ধ্বনি

৪. ‘ঞ্জ’ এই যুক্ত ব্যঞ্জনের গঠন কী?
ক. জ্+ঞ　　খ. ঞ+চ
গ. ঞ+জ　　ঘ. ঞ+ণ

৫. উচ্চারণের সময় বিভিন্ন ধ্বনি একত্রে উচ্চারণ করা হলে তাকে কী বলে?
ক. ধ্বনিসংযুক্তি　　খ. ঘৃষ্ট
গ. নৈকট্যমূলক　　ঘ. মৌখিক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন :

১. ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য লিখুন।
২. মৌলিকতা অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় আলোচনা করুন।
৩. উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণগুলি কী কী?
৪. দ্বি-স্বর কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।
৫. টীকা লিখুন– স্পর্শধ্বনি, উষ্মধ্বনি, যুক্তবর্ণ, নাসিক্য ধ্বনি, তাড়নজাত, পার্শ্বিক।

উত্তরমালা : ক

১. ক　২. গ　৩. খ　৪. গ　৫. ক

পাঠ-২.৪ : ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ণ-ত্ব বিধান কী সে সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ণ-ত্ব–বিধানের নিয়ম সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- ষ-ত্ব বিধান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ষ-ত্ব বিধানের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।

ণ-ত্ব বিধান

যে রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানে 'ন' (দন্ত্য-ন) স্থানে 'ণ' (মূর্ধন্য-ণ) ব্যবহৃত হয় তাকে ণ-ত্ববিধান বলে। অর্থাৎ তৎসম শব্দের বানানে ণ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণ-ত্ব বিধান। যেমন– ঋণ, কারণ, মরণ, ভীষণ, ভাষণ ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ণ ধ্বনির ব্যবহার নেই। সেজন্য বাংলা (দেশি), তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য বর্ণ (ণ) লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য-ণ এবং দন্ত্য-ন –এর ব্যবহার আছে। তা বাংলায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়।

ণ-ত্ব–বিধানের নিয়ম

১. ঋ, র, ষ– এর পরে মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন– ঋণ, ঘৃণা, অরণ্য, বর্ণ, চূর্ণ, পাষাণ, কৃষাণ ইত্যাদি।

২. ট–বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে সংযুক্ত আকারে তৎসম শব্দে সব সময় মূর্ধন্য 'ণ' যুক্ত হয়। যেমন–কণ্টক, ঘণ্টা, অকুণ্ঠ, কাণ্ড, খণ্ড ইত্যাদি।

৩. ঋ, র, ষ–এর পরে স্বরধ্বনি, য় ব হ ং এবং ক–বর্গীয় ও প–বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী ন মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন– কৃপণ (ঋ–কারের পরে প্, তারপরে ণ), হরিণ (র–এর পরে ই, তার পরে ণ, অর্পণ (র্ + প্ + অ + ণ্), লক্ষণ (ক্ + ষ্ + অ + ন্)। এরূপ –তর্পণ, বর্ষণ, সমর্পণ, রুক্মিণী, ব্রাক্ষণ ইত্যাদি।

৪. পরি, প্র, নির–এ তিনটি উপসর্গের পর ণ-ত্ব বিধি অনুসারে ন–ধ্বনি লিখতে মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন–পরিণত, পরিবহণ, প্রমাণ, প্রবণ, পরিণয়, প্রণত।
   ব্যতিক্রম : পরিনির্বাণ, নির্নিমেষ, প্রনষ্ট, পরিবহন বানানও শুদ্ধ।

৫. উত্তর, পর, পার, রবীন্দ্র, চন্দ্র, নার শব্দের পরে 'অয়ন'/'আয়ন' প্রত্যয় হলে দন্ত্য ন পাল্টে মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন– উত্তর + অয়ন = উত্তরায়ণ, পর + অয়ন = পরায়ণ, রবীন্দ্র + অয়ন = রবীন্দ্রায়ণ, চন্দ্র + অয়ন = চন্দ্রায়ণ, নর + অয়ন = নারায়ণ ইত্যাদি।

৬. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই ণ হয়

চাণক্য মাণিক্য গণ　　বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি　　স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী　　নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্কণ তূণ　　কফণি (কনুই) বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

ণ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়

ক. সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে 'ন' হয়। যেমন–ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্নীতি, দুর্নাম, দুর্নিবার, পরনিন্দা, অগ্রনায়ক।

খ. ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন কখনো ণ হয় না, ন হয়। যেমন– অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন।

গ. বাংলা (দেশি), তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য বর্ণ (ণ) লেখার প্রয়োজন হয় না।

ষ–ত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ষ ধ্বনির ব্যবহার নেই। তাই দেশি, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ' লেখার প্রয়োজন হয় না। কেবল কিছু তৎসম শব্দে ষ–এর প্রয়োগ রয়েছে। যে-সব তৎসম শব্দে 'ষ' রয়েছে তা বাংলায় অবিকৃত আছে। যে রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ'–এর ব্যবহার হয় তাকে ষ-ত্ব–বিধান বলে। অর্থাৎ তৎসম শব্দের বানানে ষ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ষ-ত্ব বিধান। যেমন– কৃষক, বিষ, বর্ষণ আষাঢ়, আভাষ ইত্যাদি।

ষ–ত্ব বিধানের নিয়ম

১. ঋ বা ঋ-কারের পরে মূর্ধন্য-ষ হবে। যেমন– কৃষক, বৃষ্টি, ঋষি, কৃষ্ণ, দৃষ্টি ইত্যাদি (ব্যতিক্রম : কৃশ্ ধাতু জাত কৃশ, কৃশতা, কৃশকায়)।
২. তৎসম শব্দে 'র'-এর পর 'ষ' হয়। যেমন– বর্ষণ, ঘর্ষণ, বর্ষা ইত্যাদি।
৩. রেফ-এর পরে মূর্ধন্য-ষ হবে। যেমন– আকর্ষণ, বর্ষ, মুমূর্ষু, বার্ষিক, সপ্তর্ষি।
৪. র–ধ্বনির পরে যদি অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার পরে 'ষ' হয়। যথা– পরিষ্কার। অ, আ স্বরধ্বনি থাকলে স হয়। যথা– পুরস্কার।
৫. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যয়ের স ষ হয়। যেমন– ভবিষ্যৎ (ভ্ + অ + ব্ + ই +) এখানে ব-এর পরে ই-এর ব্যবধান), চিকীর্ষা, চক্ষুষ্মান, মুমূর্ষু ইত্যাদি।
৬. ই–কারান্ত এবং উ–কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়। যেমন– প্রতিসেধক > প্রতিষেধক, প্রতিস্থান > প্রতিষ্ঠান, অনুস্থান > অনুষ্ঠান, বিসম > বিষম, অভিসেক > অভিষেক, সুসুপ্ত > সুষুপ্ত, অনুসঙ্গ > অসুষঙ্গ, সুসমা > সুষমা ইত্যাদি।
৭. ট–বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে 'ষ' যুক্ত হয়, যথা– অনিষ্ট, চেষ্টা, নষ্ট, বৈশিষ্ট্য, অনুষ্ঠান, কনিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠান, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।
৮. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়। যেমন–

ভাষা ঊষা ষট্ আষাঢ় ভাষণ কষিত পাষাণ ইষু পাষণ্ড
কোষ কাষায় কাষ্ঠ কষ্ট আভাষ বাষ্প মানুষ অষ্ট
পৌষ পুষ্প কলুষ ঔষধ ভাষ্য ষড়যন্ত্র ভূষণ দ্বেষ ঋড়ঋতু
ষ-ত্ব–বিধির করে না দাস্য।

ষ–ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়

ক. আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে ষ হয় না। এ সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে। যেমন– পোস্ট, মাস্টার, জিনিস, পোশাক ইত্যাদি।

খ. সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদেও ষ হয় না। যেমন– ভূমিসাৎ, ধুলিসাৎ, অগ্নিসাৎ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. 'ণ'-ত্ব বিধান' এর অর্থ কী?

ক. ন ব্যবহারের নিয়ম খ. ণ ব্যবহারের নিয়ম
গ. সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম ঘ. ণ-এর অপব্যবহার

২. ণ-ত্ব বিধান কোন শব্দের জন্য প্রযোজ্য?
ক. বাংলা শব্দ
খ. বিদেশি শব্দ
গ. সংস্কৃত শব্দ
ঘ. আরবি শব্দ

৩. ণ-ত্ব বিধান মতে ঋ, র, ষ এর পরে যুক্ত হয়–
ক. ন
খ. ণ
গ. ন অথবা ণ
ঘ. কোনো নিয়ম নেই

৪. কোন বর্গের আগে কখনও ণ হয় না?
ক. ট বর্গ
খ. প বর্গ
গ. ব বর্গ
ঘ. ত বর্গ

৫. ষ-ত্ব বিধান দ্বারা জানা যায়
ক. দেশি শব্দে মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহার
খ. বিদেশি শব্দে মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহার
গ. মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহার
ঘ. সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহার

৬. ঋ ও র এর পর বসে
ক. তালব্য-শ
খ. দন্ত্য-স
গ. মূর্ধন্য-ষ
ঘ. যে-কোনো স-ধ্বনি

৭. "ষ-ত্ব বিধান" এর অর্থ কী?
ক. মূর্ধন্য ষ ব্যবহারের নিয়ম
খ. বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম
গ. অধিকার সম্পর্কিত
ঘ. মূর্ধন্য ষ-এর অনিয়ম

৮. ট ও ঠ এর সঙ্গে সংযুক্ত আকারে বসে–
ক. তালব্য-শ
খ. দন্ত্য-স
গ. মূর্ধন্য-ষ
ঘ. যে কোনো একটি স-ধ্বনি

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ণ-ত্ব বিধান কাকে বলে? ণ-ত্ব বিধানের ৫টি নিয়ম লিখুন।
২. ষ-ত্ব বিধান কাকে বলে? ষ-ত্ব বিধানের ৫টি নিয়ম লিখুন।

উত্তরমালা : ক

১. খ ২. গ ৩. খ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. গ ৭. ক ৮. গ

পাঠ-২.৫ : ধ্বনি পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ধ্বনি পরিবর্তন কী তা বলতে পারবেন।
- ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ধ্বনি পরিবর্তন

উচ্চারণের সময় সহজীকরণের প্রবণতায় শব্দের মূল ধ্বনির যেসব পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় ধ্বনিপরিবর্তন।

ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া

ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। ধ্বনিপরিবর্তন নানা প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। নিচে তা উল্লেখ করা হলো–

১. আদি স্বরাগম (Prothesis) : উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে বলে আদি স্বরাগাম। যেমন– স্কুল >ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন। এরূপ, আস্তাবল, আস্পর্ধা ইত্যাদি।

২. স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বা মধ্য স্বরাগম (Anaptyxis) :উচ্চারণের সুবিধার জন্য সময় সময় যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। ধ্বনি পরিবর্তনের এই ধারাকে বিপ্রকর্ষ বলে। অর্থাৎ ছন্দ ও সুরের প্রয়োজনে কিংবা চলিত ভাষায় সহজ করে উচ্চারণের প্রবণতাবশত সংযুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙে তার মাঝে স্বরধ্বনি আনয়নের রীতিকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বা মধ্যস্বরাগম বলে। যেমন–

- **ই– স্বরের আগম** : প্রীতি >পিরীতি, ক্লিপ >কিলিপ, বর্ষণ > বরিষণ, ত্রিশ > তিরিশ, প্রীতি > পিরীতি, ফিল্ম > ফিলিম ইত্যাদি।
- **এ– ধ্বনির আগম** : ধ্যান >ধেয়ান, ব্যাকুল > বেয়াকুল, প্রায় > পেরায়, ঘ্রাণ > ঘেরান, স্রেফ >সেরেফ, গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক ইত্যাদি।
- **অ– স্বরধ্বনির আগম** : ভক্তি >ভকতি, ধর্ম > ধরম, শক্তি > শকতি, লগ্ন >লগন, রত্ন >রতন, হর্ষ >হরষ, দর্শন >দরশন ইত্যাদি।
- **উ– ধ্বনির আগম** : ভ্রু> ভুরু, শুক্রবার >শুক্কুরবার, দুর্জন >দুরুজন, মুক্তা >মুকুতা, তুর্ক >তুরুক ইত্যাদি।
- **ও– ধ্বনির আগম** : কুর্ক > কোরোক, শ্লোক > শোলোক, মুরগ > মুরোগ > মোরগ ইত্যাদি।

৩. অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis) :কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে। এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম। যেমন– দিশ্>দিশা, পোখত্> পোক্ত, বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য >সত্যি ইত্যাদি।

৪. অপিনিহিতি (Apenthesis) : পরের ই–কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই–কার বা উ–কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন– বাক্য >বাইক্য, সত্য >সইত্য, চারি > চাইর, মারি > মাইর, আজি > আইজ, সাধু >সাউধ, রাখিয়া > রাইখা ইত্যাদি।

৫. অসমীকরণ (Dissimilation) : একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে বলে অসমীকরণ। যেমন– ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ ইত্যাদি।

৬. স্বরসঙ্গতি (Vowel Hermony) : একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বরের প্রভাবে শব্দের মধ্যে অপর স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে প্রভাবকারী স্বরের সঙ্গে সঙ্গতি

রক্ষা করলে, এই রীতিকে বলা হয় স্বরসঙ্গতি। যেমন– ইচ্ছা > ইচ্ছে, দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, মূলা > মূলো ইত্যাদি। প্রধানত চারটি পদ্ধতিতে স্বরসঙ্গতি হয়ে থাকে। যথা–

- **প্রগত স্বরসঙ্গতি (Progressive) :** পূর্ববতী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরের পরিবর্তন তথা আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে প্রগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন– শিকা > শিকে, তুলা > তুলো, মিথ্যা >মিথ্যে, জুতা > জুতো, পুত্র >পুত্তুর, বিলাতি > বিলিতি, ভিখারি > ভিখিরি ইত্যাদি।
- **পরাগত স্বরসঙ্গতি (Regressive) :** পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন তথা অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে পরাগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন– আখো > আখুয়া >এখো, দেশি > দিশি, শুনা > শুনো, লিখা > লেখা, দেশি > দিশি, খেলা > খ্যালা ইত্যাদি।
- **মধ্যগত স্বরসঙ্গতি (Mutual) :** আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন– ভিখারি >ভিখিরি, জিলাপি > জিলিপি, বিলাতি > বিলিতি ইত্যাদি।
- **অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি (Reciprocal) :** পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্বর তথা আদ্যস্বর ও অন্তস্বর পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন– পোষ্য > পুষ্যি, মোজা > মুজো, ধোঁকা > ধুঁকো ইত্যাদি।
  চলতি বাংলা ভাষায় স্বরসঙ্গতি : মিলামিশা > মেলামেশা, মিঠা > মিঠে, ইচ্ছা > ইচ্ছে, গিলা > গেলা ইত্যাদি। পূর্বস্বর উ–কার হলে পরবর্তী স্বর আ– কার হয় না, ও –কার হয়। যেমন– মাড়া > মুড়ো, চুলা >চুলো ইত্যাদি। বিশেষ নিয়মে –উড়ানি >উড়নি, এখনি >এখুনি হয়।

৭. সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ : দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ। যেমন– আটমেসে >আটাসে, বসতি > বস্‌তি, কুটুম্ব > কুটুম, জানালা >জান্‌লা ইত্যাদি।

- **আদিস্বর লোপ (Aphesis) :** ধ্বনিলোপের ক্ষেত্রে শব্দের প্রথমের স্বরধ্বনির লোপ হলে তাকে আদিস্বর লোপ বলে। যেমন– অলাবু >লাবু >লাউ, উদ্ধার >উধার > ধারইত্যাদি।
- **মধ্যস্বর লোপ (Syncope) :** সুবর্ণ >স্বর্ণ, আগুরু> অগ্রু ইত্যাদি।
- **অন্ত্যস্বর লোপ (Apocope) :** ধ্বনিলোপের ক্ষেত্রে শব্দের শেষের স্বরধ্বনি উচ্চারণ থেকে বাদ গেলে তাকে অন্ত্যস্বর লোপ বলে। যেমন– আশা >আশ, আজি > আজ, চারি >চার, সন্ধা >সঞ্ঝা >সাঁঝ, লজ্জা >লাজ, চাকা >চাক ইত্যাদি।

৮. ধ্বনি বিপর্যয় :শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর স্থান পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় (Metathesis) বলে। যেমন– বাক্‌স >বাস্‌ক, রিকসা >রিসকা, অনুরূপ পিশাচ >পিচাশ, লাফ >ফাল, মুকুট >মুটুক ইত্যাদি।

৯. সমীভবন (Assimilation) : শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করলে, তাকে বলা হয় সমীভবন। যেমন– জন্ম >জম্ম, কাঁদনা > কান্না ইত্যাদি। সমীভবন তিন রীতিতে হয়, যথা–

- **প্রগত সমীভবন (Progressive) :** পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মতো হয়, একে বলে প্রগত সমীভবন। যেমন– পক্ব > পক্ক, চন্দন > চন্নন, গলদা > গল্লা, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন >লগ্‌গ, চক্র> চক্কর, রাজ্য > রাজ্জ, স্বর্ণ >সন্ন ইত্যাদি।
- **পরাগত সমীভবন (Regressive) :** পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হলে তাকে পরাগত সমীভবন বলে। যেমন– কাঁদনা > কান্না, কর্ম >কম্ম, কর্তা > কত্তা, ধর্ম > ধম্ম, করতাল > কত্তাল, পাঁচসের > পাঁশ্‌সের, ডাকঘর > ডাগ্‌ঘর, তৎ + জন্য >তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ >উন্মুখ ইত্যাদি।
- **অন্যোন্য সমীভবন (Mutual) :** যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তিত হয় তখন তাকে বলে অন্যোন্য সমীভবন, যেমন– বৎসর > বচ্ছর, মহোৎসব >মোচ্ছব, চিকিৎসা > চিকিচ্ছা, বিশ্রি >বিচ্ছিরি, কুৎসিত > কুচ্ছিত। সত্য > সচ্চ, বিদ্যা > বিজ্জা ইত্যাদি।

১০. বিষমীভবন (Dissimilation) : দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন– তরবার > তরোয়াল, লাঙ্গল >নাঙ্গল, শরীর > শরীল, লালা > নাল ইত্যাদি।

১১. দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বা (Long Consonant) : কখনো কখনো জোর দেয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বা। যেমন– সকাল > সক্কাল, পাকা > পাক্কা, মুলুক > মুল্লুক, বড় > বড্ড, ছোট > ছোট্ট, কিছু > কিচ্ছু ইত্যাদি।

১২. ব্যঞ্জন বিকৃতি : শব্দের মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি। অর্থাৎ পদের অন্তর্গত কোনো বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করলে তাকে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে। যেমন– শাক > শাগ, ধোবা > ধোপা, কবাট > কপাট, ধাইমা > দাইমা ইত্যাদি।

১৩. ব্যঞ্জনচ্যুতি : পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি। যেমন– বড়দাদা >বড়দা, বউদিদি >বউদি ইত্যাদি।

১৪. অন্তর্হতি : পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি। যেমন– ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা, ফাল্গুন > ফাগুন ইত্যাদি।

১৫. অভিশ্রুতি (Umlaut) : অভিশ্রুতি অপিনিহিতির পরবর্তী পর্যায়। বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে অভিশ্রুতি। যেমন– করিয়া থেকে অপিনিহিতির ফলে 'কইরিয়া' কিংবা বিপর্যয়ের ফলে 'কইরা' থেকে অভিশ্রুতিজাত 'করে'। এরূপ–রাখিয়া > রাইখা, করিয়া >কইরা, শুনিয়া >শুইনা > শুনে, বলিয়া > বইলা > বলে, হাটুয়া >হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মাউছুয়া >মেছো ইত্যাদি।

১৬. র–কার লোপ : আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র–কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন– তর্ক >তক্ক, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কল্লাম ইত্যাদি।

১৭. হ–কার লোপ : আধুনিক চলতি বাংলায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ–কার লোপ হয়। যেমন– পুরোহিত >পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু >সাহু >সাউ, আরবি আল্লাহ্>বাংলা আল্লা, ফারসি শাহ্>বাংলা শা ইত্যাদি।

১৮. য়–শ্রুতি ও ব–শ্রুতি (Euphonic glides = Yglide ওW-glide) : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বি–স্বর (যৌগিক স্বর) হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ 'য়' [y] বা অন্তঃস্থ 'ব' [w]উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়–শ্রুতি ও ব– শ্রুতি। যেমন– মা + আমার = মা (য়) আমার > মায়ামার, যা + আ = যা (ও) য়া = যাওয়া, ভাই + এ = ভাই (য়) এ = ভায়ে, খা + আ >খাওয়া, ধো + আ = ধোওয়া ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে কী বলে?

ক. স্বরভক্তি　　খ. অপিনিহিতি
গ. অসমীকরণ　　ঘ. আদি স্বরাগাম

২. একটি স্বরের প্রভাবে শব্দের অন্য শব্দের পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে?

ক. স্বরসঙ্গতি　　খ. স্বরলোপ
গ. অভিশ্রুতি　　ঘ. ব্যঞ্জন বিকৃতি

৩. সুবর্ণ>স্বর্ণ কিসের উদাহরণ?

ক. আদিস্বর লোপ　　খ. মধ্যস্বর লোপ

গ. অন্ত্যস্বর লোপ　　ঘ. কোনটিই নয়।

৪. সত্য>সইত্য কিসের উদাহরণ?

ক. অপিনিহিতি　　খ. অসমীকরণ

গ. স্বরসঙ্গতি　　ঘ. সমীভবন

৫. স্টেশন>ইস্টিশন কিসের উদাহরণ?

ক. স্বরভক্তি　　খ. অন্তস্বরাগম

গ. আদিস্বরাগম　　ঘ. অপিনিহিতি

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ধ্বনি পরিবর্তন কী? ধ্বনি পরিবর্তনের কয়েকটি প্রক্রিয়া সম্পর্কে লিখুন।

উত্তরমালা : ক.

১. ঘ　২. ক　৩. খ　৪. ক　৫. গ

পাঠ-২.৬ : সন্ধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সন্ধি কী তা বলতে পারবেন।
- সন্ধির উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- সন্ধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সন্ধির প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধির বিচ্ছেদ করতে পারবেন।

সন্ধি শব্দের অর্থ 'মিলন'। দ্রুত উচ্চারণের ফলে পরস্পর সন্নিহিত দুটো ধ্বনির মিলনে যে ধ্বনিগত পরিবর্তন হয় তকেই বলা হয় **সন্ধি**। যেমন– আশা + অতীত = আশাতীত। হিম + আলয় = হিমালয়। প্রথমটিতে আ + অ = আ (া) হয়েছে। আবার, তৎ + মধ্যে = তন্মধ্যে, এখানে ত্ + ম = ন্ম হয়েছে। এরূপ রবীন্দ্র, চিন্ময়, উদ্ধত ইত্যাদি।

সন্ধির উদ্দেশ্য

সন্ধির প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্বাভাবিক **উচ্চারণে সহজপ্রবণতা** ও **ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন**। যেমন– 'রত্ন' ও 'আকর' উচ্চারণে যে আয়াস প্রয়োজন, 'রত্নাকর' তার চেয়ে কম আয়াসে উচ্চারিত হয়। সেরূপ পিতৃ আলয় বলতে যেরূপ শোনা যায়, 'পিত্রালয়' তার চেয়ে সহজে উচ্চারিত ও শ্রুতিমধুর। তাহলে দেখা যাচ্ছে সন্ধির প্রধান সুবিধা উচ্চারণের। তবে যে ক্ষেত্রে আয়াসের লাঘব হয় কিন্তু ধ্বনি-মাধুর্য রক্ষিত হয় না, সেক্ষেত্রে সন্ধি করার নিয়ম নেই। যেমন– কচু + আদা + আলু = কচ্চাদালু হয় না। অথবা কচু + আলু + আদা =কচ্চাল্বাদা হয় না।

সন্ধির প্রয়োজনীয়তা

ভাষা বলতে ও লিখতে গেলে সন্ধির নিয়মগুলো জানা একান্ত প্রয়োজন। বাস্তব জীবনে আমার বিভিন্ন ভাবে সন্ধির ব্যবহার করে থাকি। কাজেই সন্ধির প্রয়োজনীয়তা বহুবিধ–

১. নতুন শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে সন্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
২. ধ্বনি-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সন্ধি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৩. শব্দের আকার ছোট করতেও সন্ধির প্রয়োজন পড়ে।
৪. সন্ধির ফলে ভাষা সাবলীল ও শ্রুতিমধুর হয়।
৫. উচ্চারণ সহজ করার জন্য সন্ধির প্রয়োজন রয়েছে।

সর্বোপরি ভাষার উচ্চারণের সৌকর্য ও শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি; ভাষাকে প্রাঞ্জল ও সংক্ষিপ্ত করতে সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সন্ধির প্রকারভেদ

বাংলা সন্ধি দুই প্রকার; যথা– স্বরসন্ধি এবং ব্যঞ্জনসন্ধি। এছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত সন্ধিতে স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি এবং বিসর্গ সন্ধি এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

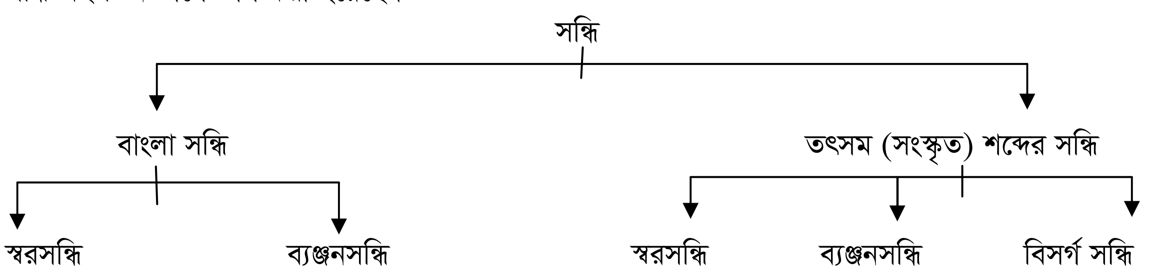

বাংলা শব্দের সন্ধি : বাংলা শব্দের সন্ধি স্বরসন্ধি এবং ব্যঞ্জনসন্ধি এই দুই ভাগে বিভক্ত।

১. স্বরসন্ধি : স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে। অর্থাৎ স্বরধ্বনি + স্বরধ্বনি।

১. সন্ধিতে দুটি সন্নিহিত স্তরের একটির লোপ পায়। যেমন−

ক. ই+ এ = ই (এ লোপ)। যেমন− নদী + এর = নদীর, আশি + এর = আশির, কুড়ি + এক =কুড়িক। এরূপ ধনিক, গুটিক ইত্যাদি।

খ. অ + এ = এ (অ লোপ)। যেমন− শত + এক = শতেক, এরূপ−কতেক।

গ. আ + আ + আ (একটি আ লোপ)। যেমন− শাঁখা + আরি = শাঁখারি, এরূপ রূপা + আলি = রূপালি।

ঘ. আ + উ = উ (আ লোপ)। যেমন− মিথ্যা + উক = মিথ্যুক। এরূপ−নিন্দুক, হিংসুক।

২. কোনো কোনো স্থলে পাশাপাশি দুটি স্বরের শেষেরটি লোপ পায়। যেমন− যা + ইচ্ছা + তাই = যাচ্ছেতাই। এখানে (আ+ই) এর মধ্যে ই লোপ পেয়েছে। এরূপ, ছেলে + আমি = ছেলেমি (আ− লোপ), মেয়ে + আলি = মেয়েলি (আ−লোপা), গুটি + এক = গুটিক (এ−লোপ) ইত্যাদি।

২. ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বরে-ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে-স্বরে ও ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি সমীভবন (Assimilation)−এর নিয়মেই হয়ে থাকে। আর তা-ও মূলত কথ্যরীতিতে সীমাবদ্ধ।

১. প্রথম ধ্বনি অঘোষ এবং পরবর্তী ধ্বনি ঘোষ হলে, দুটি ঘোষ মিলে দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ সন্ধিতে ঘোষ ধ্বনির পূর্ববর্তী অঘোষ ধ্বনিও ঘোষ হয়। যেমন− ছোট + দা = ছোটদা।

২. হলন্ত র্‌ (বদ্ধ অক্ষর বিশিষ্ট) ধ্বনির পরে অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে র্‌ লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনি দ্বিত্ব হয়। যেমন− চার + টি = চাট্টি, ধর্‌ + না + ধন্না, দুর্‌ + ছাই = দুচ্ছাই, আর্‌ + না = আন্না, ইত্যাদি।

৩. চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে যদি ত−বর্গীয় ধ্বনি আসে তাহলে, ত-বর্গীয় ধ্বনি লোপ হয় এবং চ-বর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ তবর্গীয় ধ্বনি ও চ-বর্গীয় ধ্বনি পাশাপাশি এলে প্রথমটি লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনিটি দ্বিত্ব হয়। যেমন− হাত + ছানি = হাচ্ছানি, বদ্‌ + জাত = বজ্জাত, নাত + জামাই = নাজ্‌জামাই (ত্‌ + জ্‌ = জ্জ)।

৪. ‘প’-এর পরে ‘চ’ এবং ‘স’-এর পরে ‘ত’ এলে চ ও ত এর স্থলে শ হয়। যেমন− সাত + শ = সাশ্‌শ, পাঁচ + সিকা = পাঁশ্‌শিকা, পাঁচ + শ = পাঁশ্‌শ ইত্যাদি।

৫. হলন্ত ধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে স্বরের লোপ হয়। যেমন− চুন + আরি = চুনারি, বোন + আই = বোনাই, তিল + এক = তিলেক, বার + এক = বারেক, তিন + এক = তিনেক ইত্যাদি।

৬. স্বরধ্বনির পর ব্যঞ্জনসন্ধি এলে স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয়। যেমন− নাতি + বৌ = নাতবৌ, কাঁচা + কলা = কাঁচকলা, ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়গাড়ি, ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়দৌড় ইত্যাদি।

তৎসম শব্দের সন্ধি : বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এসব শব্দই তৎসম (তৎ = তার + সম = সমান)। তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। এ শ্রেণির শব্দে সন্ধি সংস্কৃত ভাষার নিয়মেই সম্পাদিত হয়ে এসেছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সন্ধি তিন প্রকার : ১. স্বরসন্ধি ২. ব্যঞ্জন সন্ধি ৩. বিসর্গ সন্ধি।

১. স্বরসন্ধি : স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বরসন্ধি।

১. অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয় মিলে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন−

অ + অ = আ	নর + অধম = নরাধম। **এরূপ**−হিতাহিত, হিমাচল, হস্তান্তর, প্রণাধিক ইত্যাদি।
অ + আ = আ	হিম + আলয় = হিমালয়। **এরূপ**−সিংহাসন, দেবালয়, রত্নাকর ইত্যাদি।
আ + অ = আ	যথা + অর্থ = যথার্থ। **এরূপ**−মহার্ঘ, আশাতীত, কথামৃত ইত্যাদি।
আ + আ = আ	বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়। এরূপ− মহাশয়, সদানন্দ, কারাগার ইত্যাদি।

২. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয় মিলে এ-কার হয়; এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন–

আ + ই = এ শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা। **আ + ই = এ** যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট।

অ + ঈ = এ পরম + ঈশ= পরমেশ। **আ + ঈ = এ** মহা + ঈশ = মহেশ

এরূপ– রমেশ. নরেন্দ্র, নরেশ, স্বেচ্ছা, শ্রবণেন্দ্রিয়, পূর্ণেন্দু ইত্যাদি।

৩. অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয় মিলে ও-কার হয়; ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + উ =ও সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়। **আ + উ = ও** যথা + উচিৎ = যথোচিত।

অ + ঊ = ও গৃহ + ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব। **আ + ঊ = ও** গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি।

এরূপ–প্রশ্নোত্তর, হিতোপদেশ, পরোপকার, যথোপযুক্ত, নবোঢ়া, ফলোদয়, মহোৎসব, নীলোৎপল, চলোর্মি ইত্যাদি।

৪. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয় মিলে 'অর' হয় এবং তা রেফ (́) রূপে পরবর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন–

অ + ঋ = অর্ দেব + ঋষি = দেবর্ষি। **আ + ঋ = অর্** মহা + ঋষি = মহর্ষি।

এরূপ– সপ্তর্ষি, রাজর্ষি, উত্তমর্ণ, অধমর্ণ ইত্যাদি।

৫. অ-কার কিংবা আ-কারের পর 'ঋত'– শব্দ থাকলে (অ, আ + ঋ) উভয় মিলে 'আর' হয় এবং বানানে পূর্ববর্তী বর্ণে আ ও পরবর্তী বর্ণে রেফ লেখা হয়। যেমন–

অ + ঋ = আর শীত + ঋত = শীতার্ত। **আ + ঋ = আর** তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত।

এরূপ–ক্ষুধার্ত, ভয়ার্ত ইত্যাদি।

৬. অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয় মিলে ঐ-কার হয়; ঐ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + এ = ঐ মত + ঐক্য = মতৈক্য। **অ + এ = ঐ** জন + এক = জনৈক।

আ + এ =ঐ সদা + এব = সদৈব। **আ + ঐ = ঐ** মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য।

এরূপ– সর্বৈব, হিতৈষী, অতুলৈশ্বর্য ইত্যাদি।

৭. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয় মিলে ঔ-কার হয়; ঔ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + ও = ঔ বন + ওষধি = বনৌষধি। **অ + ঔ = ঔ** পরম + ঔষধ = পরমৌষধ।

আ + ও = ঔ মহা + ওষধি = মহৌষধি। **আ + ঔ = ঔ** মহা + ঔষধ = মহৌষধ।

৮. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয় মিলে দীর্ঘ ঈ-কার হয়। দীর্ঘ ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

ই + ই = ঈ অতি + ইত = অতীত। **ই + ঈ = ঈ** পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা।

ঈ + ই = ঈ সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র। **ঈ + ঈ =ঈ** সতী + ঈশ = সতীশ।

এরূপ– রবীন্দ্র, প্রতীত, দিল্লীশ্বর, প্রতীক্ষা, অতীব, পৃথ্বীশ, শ্রীশ, মহীন্দ্র, গিরীন্দ্র, ক্ষিতীশ ইত্যাদি।

৯. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ই বা ঈ স্থানে 'য' বা য (্য) ফলা হয়। য-ফলা লেখার সময় পূববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে লেখা হয়। যেমন–

ই + এ = য্ + এ প্রতি + এক = প্রত্যেক। **ই + উ = য্ + উ** অতি + উক্তি = অত্যুক্তি।

ই + অ = য্ + অ অতি + অন্ত = অত্যন্ত। **ই + আ = য্ + আ** ইতি + আদি = ইত্যাদি।

ঈ + অ = য্ + আ নদী + অম্বু = নদ্যম্বু। **ঈ + আ = য্ + আ** মসী + আধার = মস্যাধার।

এরূপ– অভ্যুত্থান, অত্যাশ্চর্য, প্রত্যুপকার, যদ্যপি, আদ্যন্ত, প্রত্যহ, অত্যধিক, গত্যন্তর, প্রত্যাশা, প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি।

১০. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার থাকলে উভয় মিলে ঊ-কার হয়; ঊ–কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

উ + উ = ঊ মরু + উদ্যান = মরূদ্যান। **উ + ঊ = ঊ** বহু + উর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব।

ঊ + উ = ঊ বধূ + উৎসব = বধূৎসব। **ঊ + ঊ = ঊ** ভূ + উর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।

১১. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার ও ঊ-কার ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে উ বা ঊ স্থানে ব-ফলা হয় এবং লেখার সময় ব–ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন–

উ + ই = ব + ই অনু + ইত = অন্বিত।

উ + এ = ব + এ অনু + এষণ = অন্বেষণ।

উ + অ = ব + অ সু + অল্প = স্বল্প।

উ + আ = ব + আ সু + আগত = স্বাগত।

উ + ঈ = ব + ঈ তনু + ঈ = তন্বী।

এরূপ– অন্বয়, মন্বন্তর, পশ্বাচার, পশ্বধম ইত্যাদি।

১২. ঋ-কারের পর ঋ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে 'ঋ' স্থানে 'র' হয় এবং তা র-ফলা রূপে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন– পিতৃ + আদেশ =পিত্রাদেশ, পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়।

১৩. এ, ঐ, ও, ঔ-কারের পর এ, ঐ স্থানে যথাক্রমে অয়, আয়, এবং ও, ঔ স্থানে যথাক্রমে অব্ ও আব্ হয়। যেমন–

ঔ + অ = আব্ + অ পৌ + অক = পাবক।

ও + আ = আব্ + আ গো + আদি = গবাদি।

ও + এ = আব্ + এ গো + এষণা = গবেষণা।

ও + ই = আব্ + ই পো + ইত্র = পবিত্র।

ঔ + ই = আব্ + ই নৌ + ইক = নাবিক।

ঔ + উ = আব্ + উ ভৌ + উক = ভাবুক।

এ + অ = অয়্ + অ নে + অন = নয়ন। শে + অন = শয়ন।

ঐ + অ = আয়্ + অ নৈ + অক = নায়ক। গৈ + অক = গায়ক।

ও + অ = অব্ + অ পো + অন = পবন। লো + অন = লবণ।

জ্ঞাতব্য

কতগুলো সন্ধি কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না, এগুলোকে বলা হয় নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি। যেমন– গো + অক্ষ = গবাক্ষ, শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন, মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড, প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ়, কুল + অটা = কুলটা ইত্যাদি।

২. ব্যঞ্জনসন্ধি

স্বরে আর ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরে মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। ব্যঞ্জন সন্ধিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি

খ. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি এবং

গ. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি।

ক. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি

১. ক্, চ্, ট্, ত্, প্ –এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ্, জ্, ড্ (ড়্), দ্, ব্ হয়। পরবর্তী স্বরধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন–

ক্ + অ = গ দিক্ + অন্ত = দিগন্ত।

চ্ + অ = জ ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত।

ট্ + আ = ড় ষট্ + আনন = ষড়ানন।

ত্ + অ = দ তৎ + অবধি = তদবধি।

প্ + অ = ব সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত।

এরূপ– সদানন্দ, বাগাম্বর, কৃদন্ত, সদুপায়, সদুপদেশ, জগদিন্দ্র, তদন্ত, বাগীশ ইত্যাদি।

২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

স্বরধ্বনির পর ছ থাকলে উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটি দ্বিত্ব (চ্ছ) হয়, যথা–

ই + ছ = চ্ছ পরি + ছদ = পরিচ্ছদ।

অ + ছ = চ্ছ এক + ছত্র = একচ্ছত্র।

আ + ছ = চ্ছ কথা + ছলে = কথাচ্ছলে।

এরূপ– বৃক্ষচ্ছায়া, পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ, অঙ্গচ্ছেদ, আলোকচ্ছটা, প্রতিচ্ছবি, প্রচ্ছদ, আচ্ছাদন, স্বচ্ছন্দে, মুখচ্ছবি, বিচ্ছেদ ইত্যাদি।

৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

ক. **১** ত্ (ৎ) ও দ্ –এর পর চ্ ও ছ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যেমন–

ত্ + চ = চ্চ সৎ + চিন্তা = সচ্চিন্তা।

ত্ + ছ = চ্ছ উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।

দ্ + চ = চ্চ বিপদ্ + চয় = বিপচ্চয়।

দ্ + ছ = চ্ছ বিপদ্ + ছায়া = বিপচ্ছায়া।

২. ত্(ৎ) ও দ্–এরপর জ্ ও ঝ্ থাকলে ত্ ও দ্–এর স্থানে জ্ হয়। যেমন–

দ্ + জ = জ্জ বিপদ্ + জাল = বিপজ্জাল।

ত্ + জ = জ্জ সৎ + জন = সজ্জন।

ত্ + ঝ = জ্ঝ কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা।

এরূপ– যাবজ্জীবন, তজ্জন্য, জগজ্জীবন, উজ্জ্বল ইত্যাদি।

৩. ত্(ৎ) ও দ্ –এরপর শ্ থাকলে ত্ ও দ্–এর স্থানে চ্ এবং শ্–স্থলে ছ উচ্চারিত হয়। যেমন–

ত্ + শ = চ্ + ছ = চ্ছ উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস।

এরূপ– উচ্ছৃঙ্খল, চলচ্ছক্তি ইত্যাদি।

৪. ত্(ৎ) ও দ্–এর পর ড্ থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থানে ড্ হয়। যেমন–

ত্ + ড = ড্ড উৎ + ডীন = উড্ডীন। এরূপ– বৃহড্ঢক্কা।

৫. ত্(ৎ) ও দ্ এর পর হ্ থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থলে দ এবং হ এর স্থলে ধ্ হয়। যেমন–

দ্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ পদ্ + হতি = পদ্ধতি।

ত্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ উৎ + হার = উদ্ধার।

এরূপ– উদ্ধত, তদ্ধিত, উদ্ধৃত ইত্যাদি।

৬. ত্(ৎ) ও দ্ এর পর ল্ থাকলে ত্ ও দ্–এর স্থলে 'ল' উচ্চারিত হয়। যেমন–

ত্ + ল = ল্ল উৎ + লাস = উল্লাস।

এরূপ– উল্লেখ্য, উল্লঙ্ঘন, উল্লেখ, উল্লিখিত ইত্যাদি।

খ (১). ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের যে কোনো বর্গের অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পর যে কোনো বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি, (য>জ), ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য ধ্বনি (বা), ঘোষ কম্পনজাত দন্তমূলীয় ধ্বনি (র) কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি (ব) থাকলে প্রথমে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারিত হয়। যথা–

ট্ + য = ড্ + য ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র।

ত্ + ব = দ্ + ব উৎ + বন্ধন = উদ্বন্ধন।

ত্ + র = দ্ + ও তৎ + রূপ = তদ্রূপ।

ক্ + দ = গ্ + দ বাক্ + দান = বাগদান।

ত্ + ঘ = দ্ + ঘ উৎ + ঘাটন = উদ্ঘাটন।
ত্ + য = দ্ + য উৎ + যোগ = উদ্যোগ।

২. ঙ, ঞ, ণ, ন, ম পরে থাকলে পূর্ববর্তী অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি সেই বর্গীয় ঘোষ স্পর্শধ্বনি কিংবা নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন–

ত্ + ম = দ/ন + ম তৎ + মধ্যে = তদ্মধ্যে বা তন্মধ্যে।
ক্ + ন = গঙ + ন দিক্ + নির্ণয় = দিগ্নির্ণয় বা দিঙ্নির্ণয়।

অনুরূপ : তৎ + ময় = তন্ময়, মৃৎ + ময় = মৃন্ময়, বাক্ + ময় = বাঙ্ময়, জগৎ + নাথ = জগন্নাথ ইত্যাদি।

৩. ম্-এর পরে যে কোনো বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ ধ্বনিটি সেই বর্গের নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন–

ম্ + চ্ = ঞ + চ্ সম্ + চয় = সঞ্চয়।
ম্ + ক্ = ঙ + ক্ শম্ + কা = শঙ্কা।
ম্ + ত্ = ন্ + ত্ সম্ + তাপ = সন্তাপ।

এরূপ– সম্মান, সন্ন্যাস, সন্ধান, কিন্নর, সন্দর্শন, কিম্ভূত ইত্যাদি।

৪. ম্-এর পর অন্তস্থ ধ্বনি য, ও, ল, ব কিংবা শ, ষ, স, হ থাকলে, ম্ স্থলে অনুস্বার (ং) হয়। যেমন–

সম্ + হার = সমাহার। সম্ + সার = সংসার ।
সম্ + লাপ = সংলাপ। সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ।
সম্ + বাদ = সংবাদ। সম্ + যম = সংযম।
সম্ + শয় = সংশয়।

এরূপ– সংযোগ, সংশোধন, স্বয়ংবরা, সংবরণ, কিংবা, বারংবার, সর্বংসহা। ব্যতিক্রম : সম্রাট (সম্ + রাট)।

৫. চ্ ও জ্-এর পরে নাসিক্য ধ্বনি তালব্য হয়। যেমন–

জ্ + ন = জ্ + ঞ যজ্ + না = যজ্ঞ।
চ্ + ন = চ্ + ঞ যাচ্ + না = যাচ্ঞা, রাজ্ + নী = রাজ্ঞী।

৬. দ্ ও ধ্ এর পরে ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ, থাকলে দ্ ও ধ্ স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। যেমন–

দ্>ত্ তদ্ + কাল = তৎকাল।
ধ্>ত্ক্ষুধ্ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা।

এরূপ– হৃৎকম্পন্ন, তৎপর, তত্ত্ব ইত্যাদি।

৭. দ্ কিংবা ধ্ –এর পরে স্ থাকলে, দ্ ও ধ্ স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। যেমন–

বিপদ্ + সংকুল = বিপৎসংকুল। এরূপ– তৎসম।

৮. ষ্ –এর পরে ত্ বা থ্ থাকলে, যথাক্রমে ত্ ও থ্ স্থানে ট ও ঠ হয়। যেমন–

ষষ্ + থ্ = ষষ্ঠ কৃষ্ + তি = কৃষ্টি।

৯. বিশেষ নিয়মে সাধিত কিছু সন্ধি হলো :

সম্ + কৃত = সংস্কৃত। উৎ + স্থাপন = উত্থাপন।
সম্ + কার = সংস্কার। উৎ + স্থান = উত্থান।

এরূপ : পরিষ্কৃত, সংস্কৃতি ইত্যাদি।

১০. কতগুলো সন্ধি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যেমন–

পৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি। বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি। বন্ + পতি = বনস্পতি।
এক্ + দশ = একাদশ। গো + পদ = গোষ্পদ। আ + চর্য = আশ্চর্য।
ষট্ + দশ = ষোড়শ মনস্ + ঈষা = মনীষা। পর্ + পর = পরম্পর।
তৎ + কর = তস্কর।

৩. বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গের সাথে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে। বস্তুত বিসর্গ র্ এবং স্ এর সক্ষিপ্তরূপ। বিসর্গকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

১. র্-জাত বিসর্গ এবং
২. স্-জাত বিসর্গ।

১. র্ জাত বিসর্গ : ও স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে র–জাত বিসর্গ বলে। যেমন– পুনর–পুনঃ , অন্তর–অন্তঃ, প্রাতর –প্রাতঃ ইত্যাদি।

২. স্– জাত বিসর্গ : স্ স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে স্–জাত বিসর্গ। যেমন– পুরস্ – পুরঃ, নমস্ – সমঃ, শিরস্– শিরঃ ইত্যাদি।

বিসর্গ সন্ধি দুইভাবে সাধিত হয়। যথা–

১. বিসর্গ + স্বরধ্বনি
২. বিসর্গ + ব্যঞ্জনধ্বনি

১. বিসর্গ ও স্বরের সন্ধি

অ–ধ্বনির পরস্থিত (অঘোষ উষ্মধ্বনি) বিসর্গের পর অ ধ্বনি থাকলে অ + ঃ + অ – এ তিনে মিলে ও–কার হয়। যেমন– ততঃ + অধিক = ততোধিক।

২. বিসর্গ ও ব্যঞ্জনের সন্ধি

১. অ-কারের পরস্থিত স্-জাত বিসর্গের পর ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি, নাসিক্য ধ্বনি কিংবা অন্তস্থ-য, অন্তস্থ ব, ও, ল, হ থাকলে অ-কার ও স্-জাত বিসর্গ উভয় স্থলে ও-কার হয়। যেমন– তপঃ + বন =তপোবন, মনঃ + হার = মনোহর, তিরঃ + ধান = তিরোধান, মনঃ + রম = মনোরম ইত্যাদি।

২. অ-কারের পরস্থিত র-জাত বিসর্গের পর উপর্যুক্ত ধ্বনিসমূহের কোনোটি থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন– পুনঃ + আয় = পুনরায়, পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত, অহঃ + অহ = অহরহ, অন্তঃ + গত = অন্তর্গত, অন্ত + ধান = অন্তর্ধান ইত্যাদি।

৩. অ ও আ ভিন্ন অন্য স্বরের পরে বিসর্গ থাকলে এবং তার সঙ্গে অ, আ বর্গীয় ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মাহপ্রাণ নাসিক্য ধ্বনি কিংবা য, ও, ল, ব, হ-এর সন্ধি হলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন– দুঃ + যোগ= দুর্যোগ, আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ, নিঃ + আকার = নিরাকার। **এরূপ–** নির্জন, দুরন্ত, বহির্গত, দুর্লোভ, প্রাদুর্ভাব, জ্যোতির্ময়, নিরাকরণ ইত্যাদি। **ব্যতিক্রম :** ই কিংবা উ ধ্বনির পরের বিসর্গের সঙ্গে 'র' এর সন্ধি হলে বিসর্গের লোপ হয় ও বিসর্গের পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন– নিঃ+রস = নীরস, নিঃ + রব = নীরব ইত্যাদি।

৪. বিসর্গের পর অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গের স্থলে তালব্য শিশ ধ্বনি হয়, অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ মূর্ধন্য ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গ স্থলে মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি হয়, অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ব্যঞ্জনের স্থলে দন্ত্য শিশ ধ্বনি হয়। যেমন–

ঃ + চ/ছ = শ + চ/ছ	নিঃ + চয় = নিশ্চয়, শিরঃ ছেদ = শিরচ্ছেদ।
ঃ + ট/ঠ = ষ + ট/ঠ	ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার, নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর।
ঃ + ত/থ = স + ত/থ	দুঃ + তর = দুস্তর, দুঃ + থ = দুস্থ।

৫. অঘোষ অল্পপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ কণ্ঠ্য কিংবা ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন (ক, খ, প, ফ) পরে থাকলে অ বা আ ধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ দন্ত্য শিশ ধ্বনি (স্) হয় এবং অ বা আ ব্যতীত অন্য স্বরধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থালে অঘোষ মূর্ধন্য শিশ্ ধ্বনি (ষ) হয়। যেমন–

অ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = স্ + ক	নমঃ + কার = নমস্কার
অ এর পরে বিসর্গ ঃ + খ = স্ + খ	পদঃ + খলন =পদস্খলন।

ই এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক নিঃ + কর = নিষ্কর।
উ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক দুঃ + কর = দুষ্কর।

এরূপ– ভাস্কর, বাচস্পতি, চতুষ্কোণ, আবিষ্কার, দুষ্কৃতি, বিহিষ্কৃত, দুষ্প্রাপ্য, নিষ্পাপ, নিষ্ফল, চতুষ্পদ, রিতস্কার, মনস্কামনা, পুরস্কার ইত্যাদি।

৬. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ধির বিসর্গ লোপ পায় না। যেমন–

শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল।

৭. যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি স্ত, স্থ কিংবা স্প পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ অবিকৃত থাকে অথবা লোপ পায়। যেমন– নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ কিংবা নিস্পন্দ, দুঃ + স্থ = দুঃস্থ কিংবা দুস্থ, নিঃ + স্তব্ধ = নিঃস্তব্ধ কিংবা নিস্তব্ধ ইত্যাদি। কয়েকটি বিশেষ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ :

অহঃ + অহ = অহরহ অহঃ + নিশ = অহর্নিশ,
ভাঃ + কর = ভাস্কর বাচঃ + পতি = বাচস্পতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. **সঠিক উত্তরটি লিখুন।**

১. সন্ধি শব্দের অর্থ কী?

ক. চুক্তি খ. ঐক্য
গ. সম্মিলন ঘ. মিলন

২. সন্ধির উদ্দেশ্য কী?

ক. উচ্চারণ দীর্ঘ করা খ. উচ্চারণ সহজ করা
গ. উচ্চারণ সহজ ও শ্রুতি মধুর করা ঘ. মাধুর্য সৃষ্টি করা

৩. বাংলা শব্দের সন্ধি কত প্রকার?

ক. এক প্রকার খ. দুই প্রকার
গ. চার প্রকার ঘ. বহু প্রকার

৪. স্বরধ্বনি সংগে স্বরধ্বনি মিলিত হলে তাকে কি সন্ধি বলে?

ক. স্বরধ্বনি সন্ধি খ. স্বরসন্ধি
গ. ব্যঞ্জন সন্ধি ঘ. মিশ্রসন্ধি

৫. আ এর পর আ থাকলে উভয়ে মিলে কি হয়?

ক. অ খ. ও
গ. আ ঘ. ই

৬. তৎসম সন্ধি কত প্রকার?

ক. পাঁচ প্রকার খ. চার প্রকার
গ. তিন প্রকার ঘ. দুই প্রকার

৭. ই-কারের সঙ্গে ই-কারের যুক্ত হলে হয়-

ক. ও-কার খ. ই-কার
গ. ঈ-কার ঘ. উ-কার

৮. শীতার্ত শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয়-

ক. শিত + আর্ত খ. শীত + ঋত
গ. শীতা + আর্ত ঘ. শীতল + আর্ত

৯. বিসর্গ সন্ধি কত প্রকার?

ক. এক প্রকার খ. চার প্রকার
গ. অনেক প্রকার ঘ. দুই প্রকার

১০. র এর স্থানে বিসর্গ হলে তাকে বলে-

ক. স-জাত বিসর্গ　　খ. অ-জাত বিসর্গ

গ. র-জাত বিসর্গ　　ঘ. ম-জাত বিসর্গ

১১. অ+ ঃ + অ মিলে কী হয়?

ক. অ　　খ. আ

গ. ও　　ঘ. ই

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. সন্ধি বলতে কী বোঝায়? বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কী? উদাহরণসহ লিখুন।

২. সন্ধি কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখুন।

৩. খাঁটি বাংলা ও তৎসম সন্ধির পার্থক্য কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখুন।

৪. **সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :**

বারেক, নিন্দুক, হিতাহিত, স্বেচ্ছা, সূর্যোদয়, ক্ষুধার্ত, মতৈক্য, অত্যধিক, অন্বেষণ, গায়ক, লবণ, দিগন্ত, পরিচ্ছদ, উচ্ছেদ, উদ্ধার, ষড়যন্ত্র, সঞ্চয়, সংযোগ, ষোড়শ, কিংবা, মনোযোগ, নিরাকার, নিষ্ঠুর, কথামৃত, মহাশয়, রাজর্ষি, ক্ষুধার্ত, জনৈক, মহৌষধ, তন্বী, ভাবুক, উদ্যোগ, দিগ্বিজয়, সঞ্চয়, সংবাদ, সম্রাট, তৎপর, আশ্চর্য, শঙ্কা, কিংবা, রাজ্ঞী, সংস্কার, ষোড়শ।

৫. **সন্ধি করুন :**

মহা + ঔষধ; ইতি + আদি; পরি + ঈক্ষা; মরু + উদ্যান; সু + আগত; ভো + অন; সৎ + চিন্তা; উৎ + লেখ; উৎ + যোগ; শম্ +কা; রাজ + নী; ষষ্ + থ; বন + পতি; মনঃ + হর; অন্তঃ+ গত; মনঃ + কষ্ট, গো + এষণা, নৌ + ইক, অনু + ইত, রবি + ইন্দ্র, মহা + ঋষি, যথা + ইচ্ছা, বাক্ + ঈশ, বাক্ + আড়ম্বর, সৎ + উপায়, উৎ +হত, তরু + ছায়া, পদ্ + হতি, সৎ + জন, উৎ + লাস, ততঃ + অধিক, মনঃ + রম, অন্তঃ + ধান, পুনঃ + বার, দুঃ + যোগ, নিঃ + লোভ, মনঃ + কষ্ট, নিঃ + স্তব্ধ।

উত্তরমালা : ক

১. ঘ　২. গ　৩. খ　৪. খ　৫. গ　৬. গ　৭. গ　৮. খ　৯. ঘ　১০. গ　১১. গ

ইউনিট-৩

শব্দ প্রকরণ

পাঠ-৩.১ : পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলায় পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দের প্রকারভেদ লিখতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দের ব্যবহারের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় লিঙ্গ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাংলা ভাষায় পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দকে এক কথায় লিঙ্গ বলা হয়ে থাকে। এই লিঙ্গ শব্দের অর্থ হলো ব্যাকরণিক চিহ্ন বা বিধি, যা দ্বারা একটি লৈঙ্গিক বৈশিষ্টকে নির্দেশ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই লিঙ্গবিধি একেক রকম। অর্থাৎ বিভিন্ন ভাষায় শব্দ প্রকরণে লিঙ্গ বা পুরুষ ও স্ত্রীবাচকতা বোঝানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার রয়েছে। বাংলা ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা ভাষায় লিঙ্গভেদের এই পার্থক্য সহজেই শব্দ দ্বারা নির্ণয় করা যায়। বিশেষ করে, এ ভাষায় অনেক বিশেষ্য পদ রয়েছে তাদের মধ্যে কোনোটি পুরুষ বুঝায়, আবার কোনোটি দ্বারা প্রকাশিত হয় স্ত্রীবাচকতা। পাঠটিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১. পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দের সংজ্ঞা

সংজ্ঞা : সংক্ষেপে বলা যায়, যে সব শব্দ দ্বারা পুরুষ বোঝায় তাকে বলা হয় পুরুষবাচক শব্দ। এসব শব্দের উদাহরণ হলো ছেলে, ঠাকুর, কাকা, নাপিত, মামা ইত্যাদি। আর যে সব শব্দ দ্বারা স্ত্রী বোঝায় তাকে বলা হয় স্ত্রীবাচক শব্দ। স্ত্রীবাচক শব্দের উদাহরণ হলো বোন, চাকরানী, মা, মামী ইত্যাদি।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়েরমতে, ‘জগতে বা প্রকৃতিতে বস্তুসমূহ পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক বা ক্লীব– এই তিন জাতি বা শ্রেণিতে পড়ে। বহু স্থলে ভাষাতেও প্রাকৃতিক অবস্থাঅনুসারে নাম-বাচক শব্দগুলিকেও এই শ্রেণিতে ফেলা হয়। পুরুষ-জাতীয় বস্তুর নামকে পুংলিঙ্গ, স্ত্রী-জাতীয় বস্তুর নামকে স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীব বা নপুংসক জাতীয় বস্তুর নামকে ক্লীবলিঙ্গ বলা হয়।’

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীরমতে, ‘সব ভাষায় লিঙ্গভেদে শব্দ আছে, বাংলা ভাষায়ও আছে। বাংলা ভাষায় বহু বিশেষ্য পদ রয়েছে যাদের কোনোটিতে পুরুষ ও কোনোটিতে স্ত্রী বোঝায়। যে শব্দে পুরুষ বোঝায় তাকে পুরুষবাচক শব্দ, আর যে শব্দে স্ত্রী বোঝায় তাকে স্ত্রীবাচক শব্দ বলে। যেমন– বাপ-মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে কেউই মৃত্যুর সময় কাছে ছিল না। এ বাক্যে বাপ, ভাই ও ছেলে পুরুষবাচক শব্দ আর মা, বোন ও মেয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ।’

বাংলা ব্যাকরণের লিঙ্গ আলোচনায় তৎসম শব্দের প্রভাব বিদ্যমান থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম বাংলা ভাষার লিঙ্গ প্রকরণে প্রযোজ্য হয় না। যেমন– তৎসম পুরুষবাচক শব্দের পুরুষবাচক বিশেষণ এবং স্ত্রীবাচক বিশেষ্য শব্দের স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– বিদ্বান পুরুষ এবং বিদুষী নারী। এখানে ‘পুরুষ’ পুরুষবাচক বিশেষ্য এবং ‘নারী’ স্ত্রীবাচক বিশেষ্য। পাশাপাশি ‘বিদ্বান’ পুরুষবাচক বিশেষণ এবং ‘বিদুষী’ স্ত্রীবাচক বিশেষণ। কিন্তু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনেক সময় প্রযোজ্য হয় না। যেমন– সংস্কৃতে সুন্দর বালক ও সুন্দরী বালিকা ব্যবহৃত

হলেও বাংলায় বিশেষণের পরিবর্তন হয় না। বাংলায় ব্যবহৃত হয় যথাক্রমে সুন্দর বালক ও সুন্দর বালিকা। বাংলা ভাষার শব্দভেদ বা লিঙ্গভেদের কারণে এমনটি হয়ে থাকে।

'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ চিহ্ন। এটি সংস্কৃত শব্দ এবং এর ব্যুৎপত্তি হলো লিঙ্গ+অ = লিঙ্গ। লিঙ্গ শব্দের ভিন্ন অর্থ থাকলেও ব্যাকরণে এটি শব্দের শ্রেণিবিশেষ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। লিঙ্গের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– যে সকল শব্দ দ্বারা বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী বা ভিন্ন জাতি বোঝায় তাকে লিঙ্গ বলে।

২. বাংলায় পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ ও লিঙ্গের প্রকারভেদ

বাংলা ভাষার পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে; এগুলি হলো– ক) পতি ও পত্নিবাচক অর্থে ব্যবহৃত শব্দ এবং খ) পুরুষ ও মেয়ে বা স্ত্রী জাতীয় অর্থে ব্যবহৃত শব্দ। স্বামী ও পত্নীবাচক অর্থে ব্যবহৃত শব্দের উদাহরণ হলো চাচ-চাচী, মামা-মামী, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ভাই-ভাবী ইত্যাদি। পুরুষ ও মেয়ে বা স্ত্রী জাতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়– পাগল-পাগলী, খোকা-খুকী, মোরগ-মুরগী, বালক-বালিকা দেবর-ননদ ইত্যাদি শব্দ। তবে বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ চার প্রকার লিঙ্গ হলো–

ক) পুংলিঙ্গ খ) স্ত্রীলিঙ্গ গ) ক্লীবলিঙ্গ ও ঘ) উভয়লিঙ্গ

ক) পুংলিঙ্গ : যে সব নামবাচক শব্দের সাহায্যে পুরুষজাতিকে বোঝায়, তাদেরকে বলা হয় পুংলিঙ্গ। এসব নামবাচক শব্দের উদাহরণ হলো– কাকা, চাচা, ছেলে, বালক, নানা, বাবা, গোয়ালা, কিশোর, প্রবীণ ইত্যাদি।

খ) স্ত্রীলিঙ্গ : যে সব নামবাচক শব্দের সাহায্যে স্ত্রীজাতিকে বোঝায়, সেসব শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। এসব স্ত্রীবাচক শব্দের উদাহরণ হলো– কাকী, মামী, চাচী, মা, আম্মা, কিশোরী, প্রবীণা ইত্যাদি।

গ) ক্লীবলিঙ্গ : যে সব শব্দের সাহায্যে পুরুষ ও স্ত্রীজাতি কোনোটিই বোঝায় না, সেসব শব্দকে বলা হয় ক্লীবলিঙ্গ। এসব শব্দের উদাহরণ হলো– গাছ, পাহাড়, পর্বত, বই, টেবিল, ফুল, ফল, চেয়ার ইত্যাদি।

ঘ) উভয় লিঙ্গ : যে সব শব্দের সাহায্যে স্ত্রী ও পুরুষজাতি উভয়ই বোঝায়, তাকে বলা হয় উভয়লিঙ্গ। উভয়লিঙ্গের উদাহরণ হলো– শিল্পী, ডাক্তার, শিশু, মানুষ, কবি ইত্যাদি।

৩. লিঙ্গ পরিবর্তন বা লিঙ্গান্তরের নিয়ম

বাংলা ভাষার লিঙ্গান্তর নিম্নলিখিতভাবে হয়ে থাকে–

১) পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে প্রত্যয় যোগ করে।

২) স্ত্রীবাচক শব্দ আগে বা পরে বসিয়ে এবং

৩) ভিন্ন শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে।

নিচে নিয়মগুলো উল্লেখ করা হলো।

১) পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে প্রত্যয় যোগ করে :

ক. অ-কারান্ত পুংলিঙ্গের শেষে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে লিঙ্গ পরিবর্তন হয়–

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	অনাথ	অনাথা
মহাশয়	মহাশয়া	কুটিল	কুটিলা
শিষ্য	শিষ্যা	মনোহর	মনোহরা
উত্তম	উত্তমা	সহোদর	সহোদরা
কৃপণ	কৃপণা	জীবিত	জীবিতা
কোকিল	কোকিলা	আত্মীয়	আত্মীয়া
কুটিল	কুটিলা	প্রিয়	প্রিয়া
মূর্খ	মূর্খা	সুনয়ন	সুনয়না
জটিল	জটিলা	দীন	দীনা

প্রথম	প্রথমা	চতুর	চতুরা
প্রবীণ	প্রবীণা	মাননীয়	মাননীয়া
মলিন	মলিনা	সেবক	সেবিকা
অগ্রজ	অগ্রজা	সুনীল	সুনীলা

খ. পুরুষবাচক শব্দের শেষে -ঈ প্রত্যয় যোগ করে :

অ-কারান্ত এবং আ-কারান্ত বিশেষ্য পদের শেষে -ঈ প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়ে থাকে। যেমন-

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
মানব	মানবী	সাধু	সাধবী
কপোত	কপোতী	সম্রাট	সম্রাজ্ঞী
ত্রয়োদশ	ত্রয়োদশী	নেতা	নেত্রী
তাপস	তাপসী	ময়ূর	ময়ূরী
সুন্দর	সুন্দরী	দানব	দানবী
স্নেহময়	স্নেহময়ী	শূকর	শূকরী
ঈশ্বর	ঈশ্বরী	নদ	নদী
মামা	মামী	একাদশ	একাদশী
ঘটক	ঘটকী	শিয়াল	শিয়ালী
বেটা	বেটী	চতুর্দশ	চতুর্দশী
ষোড়শ	ষোড়শী	তরুণ	তরুণী
দেব	দেবী	নর্তক	নর্তকী
হরিণ	হরিণী	শঙ্কর	শঙ্করী
মৃণ্ময়	মৃণ্ময়ী	সিংহ	সিংহী
দাতা	দাত্রী	সখা	সখী
কিশোর	কিশোরী	চতুর্থ	চতুর্থী
দুলাল	দুলালী	কুমার	কুমারী
রজক	রজকী	নট	নটী
পাগল	পাগলী	নর	নারী

গ. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'অক' থাকলে তা ইকা করে তার সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করতে হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
নায়ক	নায়িকা	গায়ক	গায়িকা
বাহক	বাহিকা	সম্পাদক	সম্পাদিকা
সাধক	সাধিকা	প্রচারক	প্রচারিকা
শিক্ষক	শিক্ষিকা	চালক	চালিকা
নাটক	নাটিকা	বালক	বালিকা
প্রেরক	প্রেরিকা	অভিভাবক	অভিভাবিকা

লেখক	লেখিকা	গ্রাহক	গ্রাহিকা
শ্যালক	শ্যালিকা	ঘাতক	ঘাতিকা
পাচক	পাচিকা	ভক্ষক	ভক্ষিকা

ঘ. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে -আনী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়-

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
চাকর	চাকরাণী	অরণ্য	অরণ্যানী
মেথর	মেথরাণী	চৌধুরী	চৌধুরাণী
মোঘল	মোঘলানী	নাপিত	নাপিতানী
শূদ্র	শূদ্রাণী	বন	বনানী
পণ্ডিত	পণ্ডিতানী	মাতুল	মাতুলানী

ঙ. কতগুলো পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে -ইনী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
গোয়ালা	গোয়ালিনী	বাঘ	বাঘিনী
কাঙাল	কাঙালিনী	ভাগা	অভাগিনী
বিহঙ্গ	বিহঙ্গিনী	চাতক	চাতকিনী
মালী	মালিনী	পাগল	পাগলিনী
সন্ন্যাস	সন্ন্যাসিনী	শ্বেতাঙ্গ	শ্বেতাঙ্গিনী
সাপ	সাপিনী	গোপ	গোপিনী
রজক	রজকিনী	মাতঙ্গ	মাতঙ্গিনী

চ. নিচের পুরুষবাচক শব্দগুলোর শেষে -নী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
কামার	কামারনী	জেলে	জেলেনী
ধোপা	ধোপানী	মজুর	মজুরনী
ভিখারী	ভিখারিনী	মায়াবী	মায়াবিনী
ডাক্তার	ডাক্তারনী	ননদাই	ননদিনী
কৃষাণ	কৃষাণী	বেদে	বেদেনী
নাতি	নাতনী	বিদেশী	বিদেশিনী
কুমার	কুমারনী	প্রেত	প্রেতনী

ছ. বান, মান, আন, অতী, য়সী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
বিদ্যাবান	বিদ্যাবতি	মহিয়ান	মহিয়সী
মতিমান	মতিয়সী	ভূয়ান	ভূয়সী
শ্রীমান	শ্রীমতি	গরিয়ান	গরিয়সী

জ্ঞানবান	জ্ঞানবতী	শ্রেয়ান	শ্রেয়সী

জ. পুরুষবাচক শব্দের শেষে -ন প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
নাতি	নাতিন	ঠাকুর	ঠাকুরণ

ঝ. পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে -আইন প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
বেয়াই	বেয়াইন	হুজুর	হুজুরাইন
দুলহান	দুলহাইন		

ঞ. পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে -বিনী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
তেজস্বী	তেজস্বিনী	যশস্বী	যশস্বিনী
পয়স্বী	পয়স্বিনী		

ট. পুরুষবাচক শব্দের শেষে প্রযুক্ত অস, বান, বিন, চর, ইক, নয়, দৃশ, ঈশ শব্দাংশের শেষে -ঈ প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গকরা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
গরিয়ান	গরিয়সী	জলচর	জলচরী
ধীমান	ধীমতি	হিতকর	হিতকরী
মানিন	মানিনী	খেচর	খেচরী
মধুকর	মধুকরী	শুভঙ্কর	শুভঙ্করী
প্রেয়স	প্রেয়সী	দয়াময়	দয়াময়ী
মায়াবিন	মায়াবিনী	তাদৃশ	তাদৃশী

২) স্ত্রীবাচক শব্দ আগে বা পরে বসিয়ে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়:

ক. পুরুষবাচক শব্দের আগে বা পরে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
ভাই	ভাই বৌ	ভাগনে	ভাগনে বউ
সৈন্য	মহিলা সৈন্য	নাতি	নাতি বৌ/নাত বৌ
প্রতিনিধি	মহিলা প্রতিনিধি		

খ. শব্দের আগে বা পরে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ বসিয়ে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়–

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	**পুংলিঙ্গ**	**স্ত্রীলিঙ্গ**
এঁড়ে বাছুর	বকনা বাছুর	মর্দা উট	মাদী উট
ষাঁড় গরু	গাই গরু	হুল বিড়াল	মাদী/ মেদী বিড়াল
বেটা ছেলে	মেয়ে ছেলে	পুরুষ মানুষ	মেয়ে মানুষ

৩) ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে লিঙ্গ পরিবর্তন করা হয়–

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কুলি	কামিন	ভাই	ভাবী/ বোন
দেবর	ননদ/ জা	বিপত্নীক	বিধবা
পুত্র	কন্যা	খানসামা	আয়া
আব্বা	আম্মা	গোলাম	বাঁদী
পুরুষ/নর	নারী	চাকর	ঝি
সম্রাট	সম্রাজ্ঞী	সাধু	সাধবী
ভূত	পেত্নী	ফুফা	ফুফু
খান	খানম	শূক	শারি
বাদশা	বেগম	বর	কনে
স্বামী	স্ত্রী	খালু	খালা
বিদ্বান	বিদুষী	এঁড়ে	বকনা

৪. স্ত্রীবাচক ও পুরুষবাচক শব্দের জন্য কিছু বিশেষ নিয়ম

ক. যেসব পুরুষবাচক শব্দের শেষে তা রয়েছে, স্ত্রীবাচক বোঝাতে সেসব শব্দে ত্রী হয়। যেমন : নেতা– নেত্রী, কর্তা– কত্রী, শ্রোতা– শ্রোত্রী, ধাতা– ধাত্রী ইত্যাদি।

খ. পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত, বান, মান, ঈয়ান থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দ করার জন্য যথাক্রমে অতী, বতী, মতি, ঈয়সী হয়। যেমন : শ্রীমান– শ্রীমতি, গুণবান– গুণবতী, রূপবান– রূপবতী, বুদ্ধিমান– বুদ্ধিমতি ইত্যাদি।

গ. কোনো কোনো পুরুষবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন : বন্ধু-বান্ধবী, নর-নারী, পতি-পত্নী, সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি।

ঘ. নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ : এসব শব্দের পুরুষবাচক রূপ নেই। যেমন– সধবা, বিধবা, সতীন, ললনা, পোয়াতী, লক্ষ্মী, সুজলা, সুফলা, অধীরা, গর্ভিনী, ডাইনী, পেত্নী, শাকচুন্নী, কুলটা, বিমাতা ইত্যাদি।

ঙ. উভয়লিঙ্গ শব্দ : সন্তান, মন্ত্রী, ঋষি, সৈন্য, পুলিশ, শিশু, হাতি, মানুষ, গরু, আমি, তুমি, তুই, আপনি, সে, তিনি,ইনি, উনি, জল, পাখি ইত্যাদি।

চ. কিছু পুরুষবাচক শব্দের দুটো করে স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে। যথা– দেবর-ননদ (দেবরের বোন)/ জা (দেবরের স্ত্রী), ভাই– বোন এবং ভাবী (ভাইয়ের স্ত্রী), শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী (পেশা অর্থে), এবং শিক্ষক পত্নী (শিক্ষকের স্ত্রী), বন্ধু-বান্ধবী (মেয়ে বন্ধু) এবং বন্ধুপত্নী (বন্ধুর স্ত্রী), দাদা-দিদি (বড় বোন) এবং বৌদি (দাদার স্ত্রী) ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. লিঙ্গ ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

ক) রূপতত্ত্বে   খ) ধ্বনিতত্ত্বে
গ) বাক্যতত্ত্বে   ঘ) অর্থতত্ত্বে

২. লিঙ্গ কত প্রকার ?

ক) তিন   খ) চার
গ) পাঁচ   ঘ) ছয়

৩. কোনটির লিঙ্গান্তর হয় না?

ক) বেয়াই খ) সাহেব

গ) সঙ্গী ঘ) কবিরাজ

৪. গরিয়ান শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?

ক) গরিয়সী খ) গরিয়ানী

গ) গরিয়নী ঘ) গরিয়াসী

৫. বাংলা ব্যাকরণ কোন পদে সংস্কৃতের লিঙ্গের নিয়ম মানা হয় না?

ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ

গ) সর্বনাম ঘ) ক্রিয়া

৬. মানুষ কোন লিঙ্গ?

ক) পুংলিঙ্গ খ) স্ত্রীলিঙ্গ

গ) ক্লীবলিঙ্গ ঘ) উভয়লিঙ্গ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ বলতে কী বোঝেন? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

২. নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দের ৫টি উদাহরণ দিন।

উত্তরমালা : ক

১. ক ২. খ ৩. ঘ ৪. ক ৫. খ ৬. ঘ

পাঠ-৩.২ : দ্বিরুক্ত শব্দ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- দ্বিরুক্ত শব্দ বলতে কী বোঝায় তা লিখতে পারবেন।
- দ্বিরুক্ত শব্দের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার লিখতে পারবেন।

একই শব্দের পর পর দুই বার ব্যবহারকে দ্বিরুক্তি শব্দ বলা হয়। কেননা আক্ষরিক অর্থে দ্বিরুক্তি বা দুই বার উক্ত হওয়া। দ্বিরুক্ত শব্দের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়। অর্থাৎ কোনো শব্দের একাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দের নতুন অর্থ প্রকাশ পায় ও শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে। এ কারণে দ্বিরুক্ত শব্দকে নতুন শব্দ গঠনের উপায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিরুক্ত শব্দের মাধ্যমে কীভাবে বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ তৈরি হয়, তা জানতে হলে এ শব্দ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ প্রয়োজন। এই পাঠে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত দ্বিরুক্ত শব্দসমূহের সাংগঠনিক ও ব্যবহারগত বিষয়ের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

সংজ্ঞা

দ্বিরুক্ত শব্দের অর্থ হলো যা দুইবার উক্ত। কোনো শব্দ বা পদকে পাশাপাশি যদি দুইবার ব্যবহার করে, কিংবা শব্দ বা পদটির পাশাপাশি তার অনুচর শব্দ বা পদ ব্যবহার করা হয়, এই ব্যবহারের ফলে বাক্যে ধ্বনি-মাধুর্য আনা বা অর্থের পরিবর্তন সম্ভব হয়, তাহলে এরূপে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে বলা হয় দ্বিরুক্ত শব্দ। যেমন–

পাখিটাকে মরা দেখলাম।

পাখিটাকে মরা মরা অবস্থায় দেখলাম।

দ্বিতীয় বাক্যের 'মরা মরা' দ্বারা মৃত পাখিটিকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, পাখিটার অবস্থা যে মৃত্যুর কাছাকাছি তাই বোঝানো হয়েছে। শব্দের এরূপ ব্যবহারই হলো দ্বিরুক্ত শব্দ বা শব্দদ্বৈত।

দ্বিরুক্ত শব্দ বাংলা ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব অংশে আলোচিত হয়ে থাকে। বাংলা ভাষার শব্দগঠনে এসব শব্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

দ্বিরুক্ত শব্দের প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত দ্বিরুক্ত শব্দকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

ক. শব্দের দ্বিরুক্তি

খ. পদের দ্বিরুক্তি ও

গ. অনুকার/ধ্বনাত্মক দ্বিরুক্তি

ক) শব্দের দ্বিরুক্তি

একই শব্দ যখন অবিকৃতভাবে দুইবার উচ্চারিত হয় তখন তাকে শব্দের দ্বিরুক্তি বলে। শব্দের দ্বিরুক্তিতে কোনো শব্দের পরিবর্তন হয় না, কেবল অর্থের পরিবর্তন হয়। যেমন– দিন দিন, রোজ রোজ, দিন দিন, কালো কালো, হালকা হালকা, পাকা পাকা ইত্যাদি। শব্দের দ্বিরুক্তি নিম্নোক্তভাবে হতে পারে–

১) একই শব্দ দুইবার ব্যবহারের মাধ্যমে : বছর বছর, বাড়ি বাড়ি, দিন দিন, গাড়ি গাড়ি ইত্যাদি।

২) একই শব্দের সঙ্গে সমার্থক অন্য একটি শব্দ যোগ করে : খেলাধুলা, লালনপালন, ধন-দৌলত ইত্যাদি।

৩) সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দযোগে : ধনী-গরিব, টাকা-পয়সা, লেন-দেন, দেনা-পাওনা ইত্যাদি।

৪) দ্বিরুক্ত শব্দের দ্বিতীয় শব্দের আংশিক পরিবর্তনের মাধ্যমে : রকম-সকম, বকা-ঝকা, মিটমাট, তোড়-জোড় ইত্যাদি

খ) পদের দ্বিরুক্তি

বাক্যে একই পদ বার বার ব্যবহার করাকে বলা হয় পদের দ্বিরুক্তি। বাংলা ভাষায় পদের দ্বিরুক্তির মাধ্যমে নিম্নলিখিত উপায়ে শব্দ গঠন করা হয়–

১) বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি : বাংলা ভাষায় বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি নিম্নলিখিত অর্থে হয়ে থাকে–

ক) আধিক্য বোঝাতে : রাশি রাশি ধান, থোকা থোকা জাম।

খ) সামান্য বোঝাতেঃ আমি আজ জ্বর জ্বর অনুভব করছি।

গ) পরম্পরতা বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে : তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। সে বাড়ি বাড়ি থেকে চাঁদা তুলছে।

ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ বোঝাতেঃ সে ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে তাকায়।

ঙ) অনুরূপ বোঝাতে : তার সঙ্গী-সাথী কেউ নেই।

চ) আগ্রহ বোঝাতে : সে মা মা বলে কাঁদছে।

২) বিশেষণ পদের দ্বিরুক্তি : বাংলা ভাষায় বিশেষণ পদের দ্বিরুক্তি নিম্নোলিখিত উপায়ে ব্যবহৃত হয়–

ক) আধিক্য বোঝাতে : ভালো ভালো লিচু নিয়ে এসো। পুকুর থেকে বড় বড় মাছ ধর।

খ) তীব্রতা বা সঠিকতা বোঝাতে : গরম গরম জিলাপি খেতে মজা। নরম নরম হাত দিয়ে সে রোগীর সেবা করছে।

গ) সামান্যতা বোঝাতে : কালো কালো চেহারা। পচা পচা আম।

৩) সর্বনাম পদের দ্বিরুক্তি : আধিক্য বা বহুবচন বোঝাতে :

সে সে লোক গেল কোথায়?

কেউ কেউ এ ব্যাপারে ভিন্ন মত দিয়েছেন।

৪) ক্রিয়াবাচক পদের দ্বিরুক্তি : বাংলা ভাষায় ক্রিয়াবাচক পদ নিম্নোক্ত অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়–

ক) বিশেষণরূপে : এত খাই খাই করা ভালো নয়। তোমার নেই নেই ভাব আর গেল না।

খ) স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে : দেখতে দেখতে আকাশে মেঘ জমা হয়ে গেল।

গ) ক্রিয়া-বিশেষণ বোঝাতে : সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখছে। দেখে দেখে যাও।

ঘ) পৌণপুনিকতা বোঝাতে : তোমাকে ডেকে ডেকে আমি হয়রান হয়ে গেলাম।

৫) অব্যয় পদের দ্বিরুক্তি : বাংলা ভাষায় অব্যয় পদের দ্বিরুক্তি নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহৃত হয়–

ক) ভাবের গভীরতা বোঝাতে : হায় হায় করে লাভ কী? ছি, ছি! তুমি কী করছ?

খ) অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে : ভয়ে গা ছম ছম করছে।

গ) ধ্বনি ব্যঞ্জনা বোঝাতে : ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

ঘ) বিশেষণ বোঝাতে : বাতি জ্বলে মিটির মিটির।

গ) অনুকার/ধনাত্মক দ্বিরুক্তি : কোনো কিছুর স্বাভাবিক আওয়াজ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত শব্দকে ধনাত্মক দ্বিরুক্তি বা অনুকার দ্বিরুক্তি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যেসব ধ্বনিসূচক দ্বিরুক্ত শব্দ কোনো ধ্বনি বা আওয়াজের অনুসারে দ্বিরুক্ত প্রকাশ করে, তাদেরকে অনুকার বা ধনাত্মক অব্যয়ের দ্বিরুক্তি বলে। যেমন– টিপ টিপ, টিক টিক, শন শন, ভন ভন ইত্যাদি। ধনাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দকে তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে–

১) মানুষ বা অন্য প্রাণি, বস্তু বা ক্রিয়া-কর্মের শ্রুতিগ্রাহ্য স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণজাত দ্বিরুক্ত শব্দগুলোকে সাধারণ ধনাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ বা সাধারণ ধনাত্মক শব্দদ্বৈত বলা হয়। যেমন– খল খল, কা কা, ঘেউ ঘেউ, মচ মচ, ঢং ঢং ইত্যাদি।

২) শ্রুতিগাহ্য ধ্বনির ভাব ছাড়া : চোখ, ত্বক, হৃদয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি ভাব প্রকাশক অনুকারজাত দ্বিরুক্তশব্দকে অনুভূতিমুলক ধনাত্মক শব্দদ্বৈত বলে। যেমন– কনকনে, কুসুম কুসুম, টনটন, ছট ফট, দুরু দুরু ইত্যাদি।

৩) কতগুলো ধনাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ দিয়ে স্থায়ী গুণ বোঝানো হয়। এগুলো গুণ প্রকাশক দ্বিরুক্ত শব্দ বলে। যেমন– খাঁ খাঁ, ঝাঁ ঝাঁ, থৈ থৈ ইত্যাদি।

শ্রুতিগাহ্য স্বাভাবিক বা ধনাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ নিম্নলিখিত অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়–

হাসির শব্দ : হি হি, হো হো, খিল খিল, ফিক ফিক ইত্যাদি।

কান্নার শব্দ : হাউ মাউ, ঘ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান, মেউ মেউ

কাশির শব্দ : খুক খুক, খক খক, গড় গড়

সম্মতি বা অসম্মতিসূক শব্দ : হ্যা-হ্যা, না-না, হু-হু ইত্যাদি।

অন্যান্য প্রাণির অনুকার : কোকিলের ডাক– কুহুকুহু, কাকের ডাক– কা কা, বানরের ডাক– কিচির মিচির, কুকুরের ডাক– ঘেউ ঘেউ, গাভীর ডাক– হাম্বা-হাম্বা, বিড়ালের ডাক– মিউ মিউ, মাছির ডাক– ভন ভন ইত্যাদি।

বস্তুর ধ্বনির অনুকার : দা, ছুরি, কাচি প্রভৃতি দিয়ে কাটার শব্দ– কচ-কচ, কচাকচ, কট কট, কটাকট, ক্যাচ ক্যাচ, ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ ইত্যাদি।

পড়া, চলা ইত্যাদি ক্রিয়া ধ্বনির অনুকার : ধপ-ধপ, ধপাধপ, ধপাস-ধপাস, টপ-টপ, টপাটপ, পটাস-পটাস, টুপ-টুপ, মট-মট, মড়-মড় ইত্যাদি।

অনুভূতিসূচক ধনাত্মক বা দ্বিরুক্ত শব্দ :

ক) অনুভূতিসূচক : ছম ছম, ম্যাজ ম্যাজ, রি রি, চিন চিন, ধড় পড়, উস খুস।

খ) দৃষ্টির অনুভূতিসূচক : চক চক, ঝল মল, টল টল, টুক টুকে, ডগ ডগে, কুচ কুচে, দগ দগে।

গ) ত্বকের অনুভূতিসূচক : কুট কুট, খস খস, চট চট, হিড় হিড়।

ঘ) গুণ প্রকাশক ধনাত্মক শব্দ : ফিন ফিনে, ঝর ঝরে, থৈ থৈ, লক লকে, ফুর ফুরে।

ধনাত্মক দ্বিরুক্ত গঠন :

১) **একই শব্দের অবিকৃত প্রয়োগ :**টপ টপ, ঝন ঝন, পট পট।

২) **প্রথম শব্দের শেষে আ যোগ করে :** গপাগপ, টপাটপ, পটাপট।

৩) **দ্বিতীয় শব্দের শেষে ই প্রত্যয় যোগ করে :** ধরাধরি, ঝমঝমি, ঝনঝনি।

৪) **যুগ্মরীতিতে গঠিত ধনাত্মক শব্দ :** কিচির মিচির, টাপুর টাপুর, হাপুস হুপুস।

বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ :

১. ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো। (সতর্কতা)

২. ভুলগুলো তুই আনরে বাছা বাছা । (ভাবের প্রগাঢ়তা)

৩. থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে। (কালের বিস্তার)

৪. লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান। (আধিক্য)

৫. খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে, পরশে মুখে মুখে, নীরবে চোখে চোখে চায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন

১. দ্বিরুক্ত শব্দ কাকে বলে?

ক) একবার উক্ত হয়েছে এমন শব্দ বা পদ
খ) তিনবার উক্ত হয়েছে এমন শব্দ বা পদ
গ) দুবার উক্ত হয়েছে এমন শব্দ বা পদ
ঘ) চারবার উক্ত হয়েছে এমন শব্দ বা পদ

২. জ্বর-এর সাথে কোন শব্দের দ্বিরুক্তিতে সামান্য অর্থ প্রকাশ পায়?

ক) জারি
খ) বিকার
গ) জ্বর
ঘ) ব্যাধি

৩. দ্বিরুক্ত শব্দকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

ক) দুই ভাগে
খ) তিন ভাগে
গ) চার ভাগে
ঘ) পাঁচ ভাগে

৪. রাশি শব্দের দ্বিরুক্তিতে কোন অর্থ প্রকাশ পায়?

ক) সামান্য
খ) আধিক্য
গ) শূন্য
ঘ) আতিশয্য

৫. এখানে লাল লাল ফুল আছে– বাক্যে লাল কী অর্থে দ্বিরুক্ত হয়েছে–

ক) ইষৎ
খ) শূন্য
গ) একবচন
ঘ) বহুবচন

৬. কোন দ্বিরুক্তিটি ধনাত্মক শব্দ?

ক) শন শন
খ) শীত শীত
গ) পড়ো পড়ো
ঘ) হাতে নাতে

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. দ্বিরুক্ত শব্দ বলতে কী বোঝেন? দ্বিরুক্ত শব্দের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
২. বাংলা ভাষায় পদের দ্বিরুক্তির মাধ্যমে ৫টি শব্দ গঠন করুন।
৩. ধনাত্মক দ্বিরুক্তি কাকে বলে? এর বিভিন্ন প্রয়োগ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : ক

১. গ ২. গ ৩. খ ৪. খ ৫. ঘ ৬. ক

পাঠ-৩.৩ : সংখ্যাবাচক শব্দ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সংখ্যাবাচক শব্দের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- সংখ্যাবাচক শব্দ কত প্রকার ও কী কী তা লিখতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় সংখ্যাবাচক শব্দ কীভাবে ব্যবহৃত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংখ্যা বা পরিমাণের একক নির্দেশ করে, এমন শব্দকে বলা হয় সংখ্যাবাচক শব্দ। পৃথিবীর সব ভাষাতেই এই সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার বিদ্যমান। বাংলা ভাষায়ও এরূপ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলা ভাষার সংখ্যাবাচক শব্দগুলি শব্দ আলোচনায় বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। আলোচ্য পাঠে সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সংজ্ঞা

এক কথায় বলা যায়, যে শব্দ দিয়ে সংখ্যা বোঝায় তাকে সংখ্যাবাচক শব্দ বলে। অঙ্কে, পূরণে, গণনায় ও তারিখ নির্দেশে এসব সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। সংখ্যা মানে গণনা বা গণনা দ্বারা পাওয়া ধারণা। সংখ্যা গণনার মূল একক হলো এক। কাজেই সংখ্যাবাচক শব্দে এক, একাধিক, প্রথম, প্রাথমিক ইত্যাদি ধারণা পাওয়া যায়। যেমন– এক টাকা, দশ টাকা। এক টাকাকে এক এক করে দশবার নিলে দশ টাকা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সংখ্যা প্রকাশ করে এমন শব্দকে বলা হয় সংখ্যাবাচক শব্দ। অন্যভাবে বলা যায়, যে সব শব্দ দ্বারা সংখ্যা গণনা করা হয়, বা যে শব্দগুলো দ্বারা সংখ্যা বোঝানো হয়, তাকে সংখ্যাবাচক শব্দ বলে। যেমন– ১,২,৩,৪ অথবা এক,দুই, তিন, চার, অথবা পহেলা, দোসরা, তেসরা ইত্যাদি।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ন্যায় বাংলাতেও সংখ্যাবাচক শব্দ রয়েছে। বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দগুলোর প্রায়ই তদ্ভব। এর মধ্যে যেসব শব্দ তদ্ভব নয়, তা এসেছে বিদেশি ভাষা থেকে অথবা দেশি শব্দ থেকে। যেমন– কুড়ি (২০) কোল ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, হাজার (১০০০) ফারসি ভাষা থেকে আগত শব্দ।

সংখ্যাবাচক শব্দের প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক শব্দগুলোকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে–

ক) অঙ্কবাচক শব্দ– ১,২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ইত্যাদি।
খ) পরিমাণ বা গণনাবাচক শব্দ– এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট ইত্যাদি।
গ) ক্রম বা পূরণবাচক শব্দ– প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ইত্যাদি।
ঘ) তারিখবাচক শব্দ– পহেলা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা, পাঁচই, ছয়ই, সাতই, আটই ইত্যাদি।

ক) অঙ্কবাচক শব্দ

যে শব্দ দ্বারা অঙ্কবাচক শব্দ নির্দেশ করা হয় তাকে বলা হয় অঙ্কবাচক শব্দ। আমাদের ভাষায় সংখ্যার একক হলো 'এক'। সুতরাং কোনো শব্দকে ভাঙতে হলে এক সংখ্যাকে একক হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন– তিন টাকা বলতে এক টাকার তিনটি একক বা এককের সমষ্টি বোঝায়। অতএব 'তিন' সংখ্যাকে আমরা ভাঙতে পারি এভাবে এক+এক+এক। এভাবে এক থেকে একশ পর্যন্ত গণনা করা যায়।

এক থেকে একশ পর্যন্ত গণনা করার পদ্ধতিকে বলা হয় দশ গুণোত্তর পদ্ধতি। এক থেকে দশ পর্যন্ত আমরা এভাবে লিখে থাকি : এক (১), দুই (২), তিন (৩), চার (৪), পাঁচ (৫), ছয় (৬), সাত (৭), আট (৮), নয় (৯), দশ (১০)। এখানে যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোকে বলে অঙ্ক। এক থেকে নয় পর্যন্ত অঙ্কে লিখিত। দশ লিখতে এক

লিখে তার ডানে একটি শূন্য (১০) ব্যবহার করতে হয়। এই শূন্যের অর্থ বাম দিকে লিখিত পূর্ণ সংখ্যার দশগুণ। এটিই দশ গুণোত্তর পদ্ধতির নিয়ম।

এ ধরনের প্রতিটি দশকে একক ধরে আমরা বিশ কুড়ি (২০), ত্রিশ (৩০), চল্লিশ (৪০), পঞ্চাশ (৫০), ষাট (৬০), সত্তর (৭০), আশি (৮০), নব্বই (৯০) পর্যন্ত গণনা করা হয়। এরপরের দশকের একককে বলা হয় একশ (১০০)। এভাবে দশের গুণন ও এককের সাহায্যে বিভিন্ন সংখ্যা লেখা যায়। যেমন– এক দশ এক= এগার (১০+১=১১), এক দশ চার চৌদ্দ (১০+৪=১৪) ইত্যাদি।

এভাবে দশকের ঘরে দুই(২) হলে আমরা বলি দুই দশ= বিশ (১০+১০=২০) এবং দুই দশ এক একুশ (১০+১০+১=২১)। এরূপ তিন দশ এক একত্রিশ, চার দশ এক একচল্লিশ, পাঁচ দশ এক একান্ন, ছয় দশ এক একষট্টি ইত্যাদি।

খ) পরিমাণ বা গণনা বাচক সংখ্যা

যে সংখ্যার সাহায্যে পরিমাণ নির্ণয় বা গণনা করা হয় সেসব শব্দকে বলা হয় পরিমাণ বা গণনা বাচক সংখ্যা। অন্যভাবে বলা যায়, একাধিক বার একই একক গণনা করলে যে সমষ্টি পাওয়া যায়, তা-ই পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা। যেমন– সপ্তাহ বলতে আমরা সাতদিনের সমষ্টিকে বুঝিয়ে থাকি। যেমন–

সপ্ত (সাত), অহ (দিনক্ষণ) = সপ্তাহ। এখানে 'দিন' একটি একক। এরূপ সাতটি দিন বা একক মিলে হয়েছে সপ্তাহ।

গুণবাচক সংখ্যাকে আবার পূর্ণসংখ্যা, অধিক ও ন্যূন– এ তিনভাগে ভাগ করা যায়।

'পূর্ণসংখ্যা' বলতে একটি পূর্ণ সংখ্যাকে অপর একটি পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা গুণ করা বুঝায়। যথা–

১ = ১ x ১   ৬ = ৩ x ২   ২ = ২ x ২   ৯= ৩ x ৩   ১২= ৪ x ৩   ১৫= ৫ x ৩

'ন্যূন' বলতে কোনো ভাগের অংশ বুঝায়। যেমন–

১/৪ = চার ভাগের এক ভাগ = চৌথাই, সিকি বা পোয়া
১/৩ = তিন ভাগের এক ভাগ = তেহাই
১/২ = দুই ভাগের এক ভাগ = অর্ধ বা আধা
১/৮ = আট ভাগের এক ভাগ = অষ্টমাংশ ইত্যাদি।

'অধিক' বলতে কোনো সংখ্যা অপর সংখ্যা থেকে ছোট বা বড় বোঝায়। যথা–

সওয়া = ১ ১/৪ (সওয়া বা সোয়া এক) বা সপাদ অর্থাৎ পাদ (+ পোয়া+১/৪ সহ (এক) = সওয়া >সওয়া। এরূপ আড়াই, দেড় ইত্যাদি।

গ) ক্রমবাচক সংখ্যা

একই দল, সারি বা শ্রেণিতে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যার ক্রম বা পূরণবাচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। যেমন– দ্বিতীয়জনকে খবরটি দাও।

এখানে গণনার একজনের পরের লোকটিকে বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়জনের আগের লোকটিকে বলা হয় প্রথম আর পরের লোকটিকে বলা হয় তৃতীয়। এরূপ পরবর্তী ক্রম হলো চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ইত্যাদি।

ঘ) তারিখবাচক শব্দ

তারিখ বোঝাতে যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয় এক কথায় সেসব শব্দকে বলা হয় তারিখবাচক শব্দ।

বাংলা ভাষায় তারিখবাচক শব্দ রয়েছে। এগুলি বাংলায় প্রতিদিনের তারিখ নির্দেশে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

পয়লা (পহেলা) বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ, তেইশে শ্রাবণ, চব্বিশে বৈশাখ, একুশে ভাদ্র, পহেলা মাঘ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তারিখবাচক শব্দগুলির মধ্যে ১ থেকে ৪ পর্যন্ত হিন্দি নিয়মে সাধিত হয়। নিচে সংখ্যাবাচক শব্দের রূপভেদ উল্লেখ করা হলো–

অঙ্কবাচক	গণনাবাচক	পূরণবাচক	তারিখবাচক	অঙ্কবাচক	গণনাবাচক	পূরণবাচক	তারিখবাচক
১	এক	প্রথম	পয়লা	২	দুই	দ্বিতীয়	দোসরা
৩	তিন	তৃতীয়	তোসরা	৪	চার	চতুর্থ	চৌঠা
৫	পাঁচ	পঞ্চম	পাঁচই	৬	ছয়	ষষ্ঠ	ছয়ই
৭	সাত	সপ্তম	সাতই	৮	আট	অষ্টম	আটই
৯	নয়	নবম	নয়ই	১০	দশ	দশম	দশই
১১	এগারো	একাদশ	এগারই	১২	বারো	দ্বাদশ	বারই
১৩	তেরো	ত্রয়োদশ	তেরই	১৪	চৌদ্দ	চতুর্দশ	চৌদ্দই
১৫	পনেরো	পঞ্চদশ	পনেরই	১৬	ষোলো	ষোড়শ	ষোলই
১৭	সতেরো	সপ্তদশ	সতেরই	১৮	আঠারো	অষ্টাদশ	আঠারই
১৯	উনিশ	উনবিংশ	উনিশে	২০	বিশ	বিংশ	বিশে
২১	একুশ	একবিংশ	একুশে	২২	বাইশ	দ্বাবিংশ	বাইশে
২৪	চব্বিশ	চতুর্বিংশ	চব্বিশে	২৫	পঁচিশ	পঞ্চবিংশ	পঁচিশে
২৬	ছাব্বিশ	ষড়বিংশ	ছাব্বিশে	২৭	সাতাশ	সপ্তবিংশ	সাতাশে
২৮	আটাশ	অষ্টবিংশ	আটাশে	২৯	উনত্রিশ	উনত্রিংশ	উনত্রিশে
৩০	ত্রিশ	ত্রিংশ	ত্রিশে	৩১	একত্রিশ	একত্রিংশ	একত্রিশে
৩২	বত্রিশ	বত্রিংশ	নেই	৩৩	তেত্রিশ	ত্রংত্রিশ	নেই
৩৪	চৌত্রিশ	চর্তুত্রিংশ	নেই	৩৫	পঁয়ত্রিশ	পঞ্চত্রিংশ	নেই
৩৬	ছত্রিশ	ষষ্ঠত্রিংশ	নেই	৩৭	সাইত্রিশ	সপ্তত্রিংশ	নেই
৩৮	আটত্রিশ	অষ্টত্রিংশ	নেই	৩৯	উনচল্লিশ	ঊনচত্বারিংশ	নেই
৪০	চল্লিশ	চত্বারিংশ	নেই	৪১	একচল্লিশ	একচত্বারিংশ	নেই
৪২	বিয়াল্লিশ	দ্বিচত্বারিংশ	নেই	৪৩	তেতাল্লিশ	ত্রিচত্বারিংশ	নেই
৪৪	চুয়াল্লিশ	চতুচত্বারিংশ	নেই	৪৫	পঁয়তাল্লিশ	পঞ্চচত্বারিংশ	নেই
৪৬	ছেচল্লিশ	ষষ্ঠচত্বারিংশ	নেই	৪৭	সাতচল্লিশ	সপ্তসত্বারিংশ	নেই
৪৮	আটচল্লিশ	অষ্টচত্বারিংশ	নেই	৪৯	উনপঞ্চাশ	ঊনপঞ্চাশতম	নেই
৫০	পঞ্চাশ	পঞ্চাশতম	নেই	৬০	ষাট	ষষ্ঠিতম	নেই
৭০	সত্তর	সপ্ততিতম	নেই	৮০	আশি	অষ্টতিতম	নেই
৯০	নব্বই	নব্বতিতম	নেই	১০০	একশ	শততম	নেই

ভগ্নাংশবাচক শব্দ

কতগুলো শব্দ দ্বারা কোনো পূর্ণ সংখ্যা না বুঝিয়ে এদের অংশ বুঝায়। এসবশব্দকে বলা হয় ভগ্নাংশবাচক শব্দ। যেমন– ১/২ অর্ধাংশ, ১/৩ এক তৃতীয়াংশ, ১/৬ ষষ্ঠাংশ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. সংখ্যা মানে কী ?

ক) সমষ্টি খ) শ্রেণি

খ) গণনা ঘ) সবগুলো

২. সংখ্যাবাচক শব্দগুলোকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) দুই ভাগে খ) তিনভাগে

গ) চারভাগে ঘ) পাঁচভাগে

৩. কোনটি পরিমাণবাচক শব্দ?

ক) একুশ খ) একবিংশতি

গ) একবিংশ ঘ) একুশে

৪. অঙ্কবাচক সংখ্যা কোনটি?

ক) নয় খ) ষষ্ঠ

গ) সপ্তম ঘ) আটই

৫. সংখ্যা গণনার মূল একক কোনটি?

ক) এক খ) দুই

গ) তিন ঘ) চার

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. অঙ্কবাচক ও ক্রমবাচক শব্দের পার্থক্য লিখুন।

২. ১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যার অঙ্কবাচক, গণনাবাচক ও তারিখবাচক রূপ লিখুন।

৩. নিচের সংখ্যাগুলোকে পূরণবাচক শব্দে দেখান।

৩, ৬, ৪, ৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৯, ২০।

উত্তরমালা : ক

১. খ ২. ঘ ৩. খ ৪. ক ৫. ক

পাঠ-৩.৪ : বচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বচন শব্দটির অর্থ ও সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- বচনের প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বচনের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বচন ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। পারিভাষিক শব্দ মানে হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণে ‘বচন’ শব্দটি শুধু একটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সেটি হচ্ছে ‘বচন’ পরিভাষা দিয়ে বাংলা ব্যাকরণে নির্দিষ্ট সংখ্যার ধারণার প্রকাশ করা হয়। এই ‘নির্দিষ্ট’ শব্দটি বিশেষ অর্থ বহন করে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলায় বচন দিয়ে নাম শব্দের একটি বা অনেক সংখ্যাকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচনভেদ হয়। এসব পদে বচন ব্যবহারের কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতি রয়েছে। এই পাঠে বাংলা ব্যাকরণে ব্যবহৃত বচনের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও ব্যবহার নির্দেশ করা হয়েছে।

অর্থ ও সংজ্ঞা

‘বচন’ শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। সংস্কৃতে শব্দটির ব্যুৎপত্তি হচ্ছে √বচ+অন। এর সাধারণ অর্থ হলো কথা, বাক্য,উক্তি, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি। কিন্তু ব্যাকরণ শাস্ত্রে এটি ‘এক’ বা ‘বহু’ পরিমাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বচনের সংজ্ঞায় বলা হয়– যা দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা নির্দেশ করা হয় তাকে বলা হয় বচন। অন্যভাবে বলা যায়, যা একত্বের বা বহুত্বের ধারণা দেয়, তাকে বলা হয় বচন।

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বচনের সংজ্ঞায় বলেন, ‘বচন ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা। ব্যাকরণে বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যাগত ধারণা প্রকাশের উপায়কে বচন বলে।’

জ্যোতিভূষণ চাকী বলেন, ‘বচন মানে, যা সংখ্যা বলে দেয়, শব্দের যে রূপের দ্বারা তার সংখ্যা বোধ হয় তাকে বচন বলে।’

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ‘যাহার দ্বারা পদার্থের সংখ্যার বিষয়ে আমাদের বোধ জন্মে, তাহাকে বচন বলে। বচন–দ্যোতক প্রত্যয় বা শব্দের দ্বারা কোনো বস্তুর একত্ব বোঝা যায়।’

বচনের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ব্যাকরণে বচন দুই প্রকার– ক. একবচন ও খ. বহুবচন।

ক. একবচন

যে বচন বা পরিভাষিক শব্দের সাহায্যে একক কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করা হয় তাকে বলা হয় একবচন। একবচনের উদাহরণ হলো একটি বই, একজন খেলোয়াড়, একটি গোলাপ ফুল, একখানা জামা ইত্যাদি।

১. বাক্যে প্রয়োগ

আদিব একজন খেলোয়াড়, আকিব একজন ছাত্র, সে একটি বই কিনেছে, আমার একখানা ছাতা দরকার ইত্যাদি।

২. একবচনের বৈশিষ্ট্য

একবচনের উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো–

ক) একবচন দ্বারা একক ব্যক্তি বা বস্তু প্রকাশিত হয়। যেমন– এক আসমান, একটি মোবাইল, একজন মানুষ ইত্যাদি।

খ) একবচন প্রকাশের জন্য পৃথক কোনো বিভক্তি নেই। শব্দের মূল রূপটিতেই এককত্ব প্রকাশ পেতে পারে। যেমন– হাঁস, ফুল, ফল, খাতা, চেয়ার ইত্যাদি

গ) শব্দের আগে একটি, একটা, একখানা প্রভৃতি শব্দ যোগ করে এবং বিশেষ্য পদের শেষে টি, টা, খানা, খানি, গাছা, গাছি, ইত্যাগি যোগ করে একবচন বুঝানো হয়। যেমন : কলমটি, কুকুরটা, মুখখানি, মালাগাছি, মেয়েটা, ছেলেটি ইত্যাদি।

খ. বহুবচন

যে বচন বা পারিভাষিক শব্দের সাহায্যে একের অধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়, তাকে বলা হয় বহুবচন। বহুবচনের উদহারণ–

মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। আমাকে দুটি কলম দিন। তিনজন লোক একসঙ্গে গান গাইছে। ইত্যাদি।

বাংলায় বহুবচন প্রকাশের জন্য রা, এরা, গুলি, গুলা, গুলো, দিগ, দের, প্রভৃতি যুক্ত হয় এবং সব, সকল, সমুদয়, কূল, বৃন্দ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। সমষ্টিবোধক শব্দগুলোর অধিকাংশই তৎসম বা সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত।

একবচন থেকে বহুবচন প্রকাশের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়ম মেনে চলা হয়–

১. রা, এরা, গুলি, গুলা, গুলো ইত্যাদি বহুবচন প্রকাশক প্রত্যয় একবচনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহুবচন প্রকাশ করে। যেমন– বালকেরা, মেয়েরা, ছেলেরা, কুমড়াগুলো, কাকগুলি, আমগুলো ইত্যাদি।

উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের শব্দের সঙ্গে রা বিভক্তি ব্যবহার করা হয়। যেমন–

শ্রমিকেরা কাজ করছে। তারা সবাই একসঙ্গে একে অপরকে সাহায্য করে। শিক্ষকেরা জ্ঞান দান করেন।

মনে রাখতে হবে, 'রা' এবং 'এরা' একই অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'রা' এবং 'এরা' ব্যবহারের নিয়ম রয়েছে। স্বরান্ত শব্দের শেষে রা ব্যবহৃত হয়। যেমন– ছেলেরা, মেয়েরা ইত্যাদি। অন্যদিকে, ব্যঞ্জনান্ত শব্দের শেষে রা যুক্ত হয়। যেমন– বালকেরা, মানুষেরা, পুরুষেরা ইত্যাদি।

তবে কবিতা বা অন্যান্য প্রয়োজনে অপ্রাণি ও ইতর প্রাণিবাচক শব্দেও রা, এরা যুক্ত হয়। যেমন– পাখিরা আকাশে উড়ে দেখিয়া হিংসায় পিপীলিকারা বিধাতার কাছে পাখা চায়। কাকেরা এক বিরাট সভা করল ইত্যাদি।

গুলা, গুলি, গুলো– এই তিনটি বদ্ধরূপমূলের মধ্যে 'গুলা' আঞ্চলিক বাংলায় ব্যবহৃত হয় এবং 'গুলি', 'গুলো' মান বাংলায় ব্যবহৃত হয়। গুলি, গুলো বদ্ধরূপমূল দুটি প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে যুক্ত হয়। যেমন– অতগুলো আম কোথায় পেলে? টাকাগুলো আমাকে দাও। কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করছে ইত্যাদি।

২. উন্নত প্রাণিবাচক মানুষ প্রকাশক বহুবচনে নিম্নলিখিত বদ্ধরূপমূল ব্যবহৃত হয়–

গণ : জনগণ, শিক্ষকগণ, দেবগণ, নরগণ ইত্যাদি।

বৃন্দ : শিক্ষকবৃন্দ, সুধীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ ইত্যাদি।

মণ্ডলি : সম্পাদকমণ্ডলি, শিক্ষকমণ্ডলি ইত্যাদি।

বর্গ : পণ্ডিতবর্গ, মন্ত্রিবর্গ ইত্যাদি।

৩. শব্দের আগে অনেক, সব ইত্যাদি ব্যবহার করে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন– সব কথা শুনতে নেই। অনেক লোক এখানে সমবেত হয়েছে।

৪. ইতর প্রাণিবাচক শব্দের শেষে এরা, সমূহ, সকল, সম, পাল, কুল, ব্যবহার করে একবচন থেকে বহুবচন করা হয়। যেমন– গরুগুলি, পাখিরা, পাখিসব, বাচ্চাগুলো, গরুরপাল ইত্যাদি।

৫. বস্তুবাচক শব্দের শেষে সমূহ, সকল, রাজি, গুচ্ছ, মালা, রাশি, পুঞ্জ ইত্যাদি যোগ করে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন– বইসমূহ, বৃক্ষরাজি, পুষ্পগুচ্ছ, কেশরাশি, মেঘপুঞ্জ ইত্যাদি।

৬. সংখ্যা বা পরিমাণ বুঝায় এমন শব্দের শেষে অজস্র, প্রচুর, ব্যাপক, বেশুমার, বেশি ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন– প্রচুর ধনসম্পত্তি, প্রচুর পানি, প্রচুর আয়োজন, ব্যাপক আয়োজন, বেশুমার লোক ইত্যাদি।

৭. সংখ্যাবাচক শব্দ আগে বা পরে বসিয়ে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন– সাত সমুদ্র, তের নদী, মণ চারেক, ঘণ্টা তিনেক ইত্যাদি।

৮. কোনো কোনো সর্বনামকে পর পর দুইবার বসিয়ে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন : কেউ কেউ হয়ত এ কাজটি করে থাকবে। কোন কোন সময় সে বেশি কথা বলে।

৯. বিশেষ্যপদকে পর পর দুইবার বসিয়ে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন– অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার, ডালে ডালে আম ঝুলছে, বনে বনে পাখি গান গাইছে, দলে দলে লোক মাঠে জমায়েত হচ্ছে।

১০. জাতিবাচক শব্দের একবচনেই বহুবচনের অর্থ প্রকাশ পায়। যেমনঃ মাছ (সব মাছ) পানিতে থাকে, বনে হরিণ (সব হরিণ) বিচরণ করে।

১১. বিশেষণ পদ পর পর দুইবার ব্যবহার করে বহুবচন করা হয়। যেমন– বড় বড় লোকের কথা শুনে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি, শিশুদের নরম নরম খাবার দিতে হয়, বেশি বেশি কাজ করলে লোকের কদর মেলে।

১২. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য পদেও বহুবচনের অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন– সেনাদল, সভা, লিচুর থোকা ইত্যাদি।

১৩. নিম্নলিখিত সমষ্টিবাচক শব বা শব্দাংশ একবচনের সঙ্গে যুক্ত করে বহুবচন প্রকাশ করা হয়। যেমন :

আবলি : অপ্রাণিবাচক শব্দে– পদাবলি, রচনাবলি, ব্রজাবলি ইত্যাদি।

উচ্চয় : প্রাণি ও অপ্রাণিবাচক শব্দে– শিলোচ্চয়, পুষ্পোচ্চয় ইত্যাদি।

কুল : প্রাণিবাচক শব্দে– জীবকুল, প্রাণিকুল, মনুষ্যকুল ইত্যাদি।

গণ : প্রাণিবাচক শব্দে– মানুষগণ, বন্ধুগণ ইত্যাদি।

গুচ্ছ : অপ্রাণিবাচক শব্দে– কেশগুচ্ছ, পুষ্পগুচ্ছ ইত্যাদি।

গ্রাম : অপ্রাণিবাচক শব্দে– গুণগ্রাম

চয় : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– বন্ধুচয়, পুষ্পচয়।

জাল : অপ্রাণিবাচক শব্দে : বিপজ্জাল, শরজাল।

দল : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– সৈন্যদল, কারাতদল, শ্রমিকদল।

দাম : অপ্রাণিবাচক বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন– শৈবালদাম, পুষ্পদাম।

নিকর : অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়। যেমন– কমলনিকর।

নিচয় : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– বুধচয়, পুষ্পচয়।

পাল : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– মৃগপাল, মেষপাল, ছাগপাল ইত্যাদি।

পুঞ্জ : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– কবিপুঞ্জ, লেখকপুঞ্জ, মেঘপুঞ্জ ইত্যাদি।

বৃন্দ : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– প্রজাবৃন্দ, লেখকবৃন্দ, কবিবৃন্দ ইত্যাদি।

ব্রজ : অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়। যেমন– ভূধরব্রজ।

ব্রাত : প্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়। যেমন– মধুকরব্রাত।

মণ্ডল : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– সারস্বতমণ্ডল, বুধমণ্ডল।

মণ্ডলি : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– শিক্ষকমণ্ডলি, নক্ষত্রমণ্ডলি।

মহল : প্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়। যেমন– মহিলামহল, গুণিমহল।

মালা : অপ্রাণিবাচক শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– মেঘমালা, পর্বতমালা।

যুথ : প্রাণিবাচক শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– গজযুথ, মৃগযুথ।

রাজি : অপ্রাণিবাচক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– বৃক্ষরাজি, মেঘরাজি, পুষ্পরাজি।

রাশি : অপ্রাণিবাচক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– পত্ররাশি, পুষ্পরাশি।

শ্রেণি : প্রাণিবাচক এবং অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– দ্বিজশ্রেণি, পাদপশ্রেণি।

সংঘ : প্রাণিবাচক শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– ব্রতিসঙ্ঘ, বিদ্বৎসংঘ।

সমূহ : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন– পুস্তকসমূহ, জাতিসমূহ।

১৪. অনেক ক্ষেত্রেই প্রাণি ও অপ্রাণিভেদে ব্যতিক্রম দেখা যা, বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে এ প্রবণতা লক্ষণীয়। মধুসূধদনের কবিতায় এ ধরনের উদাহরণ পাওয়া যায়–

কে না জানে ফুলকুল বিরসবেদনা,
চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি ইত্যাদি।
চুম্বিতাম, মজুরিত যবে
দম্পতি মঞ্জরী বৃন্দে।

১৫. সমষ্টিবাচক শব্দের বিচ্ছিন্নতা প্রয়োগ, সম্বন্ধবাচক পদের সঙ্গে–

রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে। –মদন মোহন
ছিড়িয়া পড়িল খসি
অশ্রু মুকুতার রসি। –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ। –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬. শব্দদ্বৈত অনেক সময় বহুবচন বুঝায়। যেমন– বাড়ি বাড়ি আনন্দ, ঘরে ঘরে উৎসব।

১৭. বহুবচনের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য–

ক) বিশেষ্য শব্দের একবচনের ব্যবহারেও অনেক সময় বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন: সিংহ বনে থাকে (একবচন ও বহুবচন উভয়ই বোঝায়)। পোকা আক্রমণে ফসল নষ্ট হয় (বহুবচন)। হাটে লোক জমা হয়েছে (একবচন ও বহুবচন উভয়ই বোঝায়)।

খ) বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন : বহুবচন বিশেষ্য ও সর্বনাম– ছেলেরা কানাকানি করছে। এটাই আদিবাদের বাড়ি। নজরুলরা প্রতিদিন জন্মায় না। সবাই সব খবর রাখে না।

গ) কতিপয় বিদেশি শব্দে, সে ভাষায় অনুসরণে বহুবচন হয়। যেমন : আন যোগে– বুজুর্গ-বুজর্গান, সাহেব-সাহেবান ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. বচন ব্যাকরণের কিরূপ শব্দ?
ক) অব্যয়সূচক শব্দ
খ) প্রাতিপদিক শব্দ
গ) পারিভাষিক শব্দ
ঘ) কারকসূচক শব্দ

২. বচন কয় প্রকার?
ক) দুই
খ) তিন
গ) চার
ঘ) পাঁচ

৩. বাংলা ব্যাকরণে কোন বচন নেই?
ক) একবচন
খ) দ্বিবচন
গ) বহুবচন
ঘ) কোনটিই নয়।

৪. কোন দুটি পদের বচনভেদ হয়?
ক) বিশেষ্য ও সর্বনাম
খ) বিশেষ্য ও বিশেষণ
গ) সর্বনাম ও অব্যয়
ঘ) ক্রিয়া ও অব্যয়

৫. বচন অর্থ কী?
ক) গণনার ধারণা
খ) পরিমাণের ধারণা
গ) ক্রমের ধারণা
ঘ) সংখ্যার ধারণা

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বচন কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী আলোচনা করুন।
২. বহুবচন কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।
৩. প্রাণিবাচক শব্দে যে সমষ্টিবাচক শব্দসমূহ যুক্ত হয়ে বহু বচন হয় এমন যে কোনো ৫টি শব্দ যোগে বাক্য রচনা করুন।
৪. বিশেষ নিয়মে বহুবচন গঠনের কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করুন।

উত্তরমালা : ক

১. গ ২. ক ৩. খ ৪. ক ৫. ঘ

পাঠ-৩.৫ : পদাশ্রিত নির্দেশক

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- পদাশ্রিত নির্দেশকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- বাংলা ভাষার পদাশ্রিত নির্দেশকগুলো কী কী তা লিখতে পারবেন।
- বাংলা ভাষার পদাশ্রিত নির্দেশকগুলো কী অর্থে ব্যবহৃত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভাষায় কিছু পদ আছে যেগুলো অন্য পদের নির্দিষ্টতা বুঝিয়ে থাকে। নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনকারী এই পদগুলো সাধারণত নামপদের পরে বসে বা আশ্রয়ে থাকে। তাই বাংলা ব্যাকরণে এদেরকে পদাশ্রিত নির্দেশক বলা হয়ে থাকে। তবে এই নির্দেশক পদের ব্যবহারের কতিপয় নিয়মও রয়েছে। আবার বাংলা ভাষার শব্দগঠনের পদাশ্রিত নির্দেশকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পদাশ্রিত নির্দেশকগুলো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দিষ্ট করে প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। এই পাঠে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত এসব পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংজ্ঞা

যে সব অব্যয় বা প্রত্যয় বিশেষ্য ও সর্বনাম পদকে নির্দেশ করার জন্য বিশেষ্য বা সর্বনামের সঙ্গে যুক্ত হয়, সেগুলোকে পদাশ্রিত নির্দেশক বলা হয়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> কোনো বিশেষ্য দ্বারা দ্যোতিত পদার্থের রূপ, প্রকৃতি অথবা তৎসম্বন্ধে বক্তার মনের ভাব প্রকাশ করার একটা বিশেষ উপায় বাঙ্গালা ভাষায় আছে। টা, টি, টুকু, টুক, খানা, খানী (খানি) জল প্রভৃতি কতগুলো শব্দ বা শব্দাংশ আছে যেগুলি বিশেষ্যের সহিত (অথবা বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক বিশেষণের সহিত) সংযুক্ত হইয়া যায়। পদার্থ বা বস্তুর গুণ বা প্রকৃতি নির্দেশ করে। এই রূপ শব্দ বা শব্দাংশকে পদাশ্রিত বলা যাইতে পারে। (ভাষা প্রকাশ-বাঙ্গালা ব্যাকরণ)

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত পদাশ্রিত নির্দেশক : বাংলা ভাষার ব্যবহৃত পদাশ্রিত নির্দেশকের মধ্যে টি, টা, টো, টুকু, টুকুন, টু, টুক, খান, খানা, খানি, খানেক, খানিক, গাছ, গাছি, গাছা, গোটা, গুলি, গুলো, গুলান ইত্যাদি বহুল প্রচলিত।

বাংলা পদাশ্রিতনির্দেশকের ধরন

বাংলা ভাষায় বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশক বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন–

ক. একবচন প্রকাশে : টি, টা, খানা, খানি, গাছা, গাছি ইত্যাদি। উদাহরণ– কলমটি, বইটা, বৈঠকখানা, ইত্যাদি।

খ. বহুবচন প্রকাশে : গুলি, গুলা, গুলো ইত্যাদি। উদাহরণ– আমগুলি, ফলগুলো, গরুগুলো, কুকুরগুলো, বিড়ালগুলা প্রভৃতি।

গ. কোনো সংখ্যা বা পরিমাপের স্বল্পতা প্রকাশে: টে, টুকু, টুকুন ইত্যাদি। উদাহরণ– তিনটে চাল, ভাতটুকু, পায়েস টুকুন, এতটুকুন মেয়ে প্রভৃতি।

ঘ. অনির্দেশক প্রত্যয়: টি, টা, এক, জন, খান ইত্যাদি দ্বারা নিদিষ্ট কাউকে বোঝায় না। তাই এসব প্রত্যয় অনির্দেশক প্রত্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। উদাহরণ– একটা গল্প বলি, চারটি ভাত দাও, জন চারেক লোক হলেই চলবে, এক যে ছিল রাণী, গোটা কয়েক সমস্যা ইত্যাদি।

৩. পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার

ক) টি, টা-র ব্যবহার

১) এক শব্দের সঙ্গে টা, টি যুক্ত হলে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন– একটি দোকান, লোকটা কী কাণ্ডই না করলো।

২) নির্দেশক সর্বনামের পরে টা, টি যুক্ত হলে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন– এটি যেন কার বাড়ি? ওটা নয়, ঐটা আন। এটিই আমার প্রিয় বই।

৩) নিরর্থক ভাবেও নির্দেশক টা, টি ব্যবহৃত হয়। যেমন– সারাটি দিন তোমার অপেক্ষায় আছি, ন্যাকামিটা এখন রাখ।

৪) বড় জিনিস সম্বন্ধে অবজ্ঞা, অপ্রিয়তা ইত্যাদি বোঝাতে টা ব্যবহৃত হয়। যেমন– ছাতাটা কোথায়?

৫) প্রাণিবাচক শব্দের পরে অনাদর বা ঔদাসীন্য বোঝাতে টা ব্যবহৃত হয়। যেমন– ছেলেটা কেমন! বেয়াদবটা গেল কোথায়?

৬) অতি ঘনিষ্ঠতা বোঝাতে টা ব্যবহৃত হয়। যেমন– আকিবটা বেশ চটপটে। মেয়েটা বেশ ভদ্র।

৭) কোনো বস্তুর আকারের পূর্ণতা বোঝাতে টা ব্যবহৃত হয়। যেমন– বাড়িটা হাহাকার করছে। কবিতা বেশ বড়।

খ) টু-এর ব্যবহার

১. অল্প অর্থে টু ব্যবহৃত হয়। যেমন– আমার ফিরতে একটু দেরি হবে। তার মন আগের চেয়ে ভালো।

২. আদর বোঝাতে টু ব্যবহৃত হয়। যেমন– একটু কাছে এস বাবা। একটু খেয়ে দুধ খাও।

গ) টুকু-এর ব্যবহার

সংস্কৃত 'তনুক' শব্দ থেকে 'টুকু' শব্দের উদ্ভব। মৈথিলী সাহিত্যে তনুক শব্দের ব্যবহার রয়েছে। এ শব্দটি এখনও হিন্দিতে ব্যবহৃত হয়। টুকু ব্যবহারের কয়েকটি নিয়ম–

১. অল্প বোঝাতে টুকু ব্যবহৃত হয়। যেমন– এতটুকু ছেলে, কিন্তু কথায় পাকা।

২. আদর বোঝাতে টুকু ব্যবহৃত হয়। যেমন– দুধটুকু খেয়ে নাও।

৩. অরূপ পদার্থবাচক বিশেষ্য পদে টুকু ব্যবহার করা হয়। যেমন– হাওয়াটুকু, কৌশলটুকু, ভারটুকু ইত্যাদি।

৪. যে জিনিসকে টুকরো করলে তার বিশেষেত্ব নষ্ট হয় না, সে সম্বন্ধে টুকু ব্যবহৃত হয়। যেমন– কাগজটুকু, বৈঠকটুকু ইত্যাদি।

ঘ) 'গাছা' ও 'গাছি'–র ব্যবহার

১. খানি, খানা যেমন মোটের ওপর চওড়া জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তেমনি সরু জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় গাছা। যেমন– লাঠিগাছা, ছড়িগাছা, সুতোগাছা, মালাগাছা, শিকলগাছা ইত্যাদি।

২. জীববাচক পদার্থ বোঝাতে গাছা ও গাছি ব্যবহৃত হয় না। যেমন– কেচোগাছি বলা যায় না।

৩. সরু জিনিস লম্বা ছোট হলে সেক্ষেত্রে গাছা ও গাছি ব্যবহৃত হয়। যেমন– দড়িগাছা হয়, কিন্তু গোঁফগাছা হয় না। চুলগাছি যখন বলা হয় তখন চুলের লম্বা দিককেই নির্দেশ করা হয়।

ঙ) খানেক– এর ব্যবহার

১. অনির্দেশক প্রত্যয়রূপে খানেক ব্যবহৃত হয়। যেমন– আমাকে শ খানেক টাকা দাও। চল, মাইল খানেক হেঁটে আসি।

২. স্বতন্ত্র শব্দের পরেও খানেক ব্যবহৃত হয়। যেমন– ঘণ্টা খানেক পরে দেখা করো।

চ) গোটা বচনবাচক শব্দের আগে বসে এবং খানা, খানি পরে বসে। এগুলো নির্দেশক ও অনির্দেশক উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। গোটা শব্দ আগে বসে এবং সংশ্লিষ্ট পদটি নির্দিষ্টতা না বুঝিয়ে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন– গোটা বাড়িটাই খা খা করছে। গোটা পঞ্চাশ টাকা হলেই হয়। দুখানা কমলালেবু দাও। গোটা দশেক কাঁঠাল আন। একখানা চেয়ার নিয়ে এসো।

তবে অনেক সময় কবিতায় শৈলী প্রকাশে বিশেষ অর্থে খানি নির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন– 'আমি অভাগা এনেছি বহিয়া নয়ন জলে ব্যর্থ সাধনখানি।'

ছ) টাক, টুক, টুকু, টো ইত্যাদি পদাশ্রিত নির্দেশক নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– পোয়াটাক মধু দাও। সবটুকু ভাত খেয়ে ফেল।

জ) বিশেষ অর্থে, নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনে কয়েকটি শব্দ : কেতা, তা, পাটি ইত্যাদি। যেমন–

১. কেতা : এ তিন কেতা জমির দাম মাত্র এক লক্ষ টাকা। বিশ টাকার দশ কাতা নোট।
২. তা : ছয় তা কাগজ দাও।
৩. পাটি : তার উপরের পাটি দাঁত নেই।

ঝ) ইংরেজিতে This, my প্রভৃতি সর্বনাম বিশেষণ পদ থাকলে বিশেষ্যের পূর্বে article বসে না। কিন্তু বাংলায় এক্ষেত্রে টি বসে। যেমন– আমার বইটি কোথায়? তোমার কলমটি কোথায় রাখলে?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন

১. যে প্রত্যয় নির্দিষ্টতা বোঝায় তাকে কী বলে?
ক) সংখ্যা খ) লিঙ্গ
গ) পদাশ্রিত নির্দেশক ঘ) অনুসর্গ

২. কোনটি ভেদে পদাশ্রিত নির্দেশক বিভিন্নতর হয়?
ক) কালভেদে খ) বচনভেদে
গ) পুরুষভেদে ঘ) পদভেদে

৩. বিশেষ অর্থে নির্দিষ্টতা বোঝায় কোনটি?
ক) টি খ) টুকু
গ) পাটি ঘ) খানা

৪. নির্দেশক সর্বনামের সাথে টা, টি যুক্ত হলে তা কী হয়?
ক) উৎকৃষ্ট খ) নিকৃষ্ট
গ) সুনির্দিষ্ট ঘ) অস্পষ্ট

৫. নির্দিষ্টতা বোঝাতে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে কোনটি যুক্ত হয়?
ক) এক খ) টুকু
গ) গোটা ঘ) টি

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পদাশ্রিত নির্দেশক বলতে কী বোঝেন? উদাহরণসহ লিখুন।
২. টা, টি, খানা, খানি, গাছা, এই পদাশ্রিত নির্দেশকগুলোর প্রয়োগ দেখিয়ে বাক্য রচনা করুন।

উত্তরমালা : ক

১. গ ২. খ ৩. গ ৪. গ ৫. ঘ

পাঠ-৩.৬ : সমাস

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সমাসের সংজ্ঞা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সমাসের কয়েকটি পরিভাষা লিখতে পারবেন।
- সমাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় দুই বা ততোধিক পদকে একপদে পরিণত করার অন্যতম উপায় হচ্ছে সমাস। সমাসের মাধ্যমে বাংলায় নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়। কারণ দুই বা ততোধিক পদের এক সাথে মিলিত হয়ে যে ভিন্ন আরেকটি পদ তৈরি হয়, সেটি নতুন শব্দ হিসেবেও ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। এছাড়া সমাস একটি কৌশল যার মাধ্যমে বহু শব্দকে সংক্ষেপিত রূপে বাক্যে ব্যবহার করা যায়। এই সমাসীকরণের রীতি সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে। তবে কিছু খাঁটি বাংলা সমাসের অস্তিত্বও বাংলা ব্যাকরণে লক্ষণীয়। এই ইউনিটে সমাসের সার্বিক ব্যাকরণগত ও ব্যবহারিক রূপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংজ্ঞা

পরস্পর অর্থ সঙ্গতিবিশিষ্ট দুই বা বহুপদের একপদে পরিণত হওয়াকে বলা হয় সমাস।

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' (২০১৫) গ্রন্থে সমাসের সংজ্ঞায় বলেছেন– 'সমাস মানে সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। অর্থসম্বন্ধ আছে এমন একাধিক পদের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে'।

সমাসের কয়েকটি পরিভাষা

ক. সমস্যমান পদ: যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেককে সমস্যমান পদ বলে। যেমন– সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন। এ বাক্যে সিংহ, চিহ্নিত, আসন– এ তিনটি হচ্ছে সমস্যমান পদ।

খ. সমস্ত পদ : সমস্যমান পদগুলো মিলিত হয়ে যে একপদে পরিণত হয়, তাকে সমস্ত পদ বলে। একে আবার সমাসবদ্ধ পদও বলা হয়। যেমন– সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন। এখানে সিংহাসন হচ্ছে সমস্ত পদ।

গ. ব্যাসবাক্য : সমাসবদ্ধ পদটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য যে বাক্য তৈরি করা হয় তাকে ব্যাসবাক্য বলে। 'ব্যাস' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ। একে ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্যও বলা হয়। উপরের বাক্যে 'সিংহ চিহ্নিত আসন' হলো সিংহাসন শব্দের ব্যাসবাক্য।

ঘ. পূর্বপদ ও পরপদ : সমাস যুক্ত পদের প্রথম অংশকে বলা হয় পূর্বপদ এবং শেষ অংশকে বলা হয় পরপদ বা উত্তরপদ। সিংহাসন শব্দের সিংহ হলো পূর্বপদ, আর আসন হলো পরপদ বা উত্তরপদ।

সমাসের প্রয়োজনীয়তা

বাংলা ব্যাকরণে রূপতত্ত্ব অংশে সমাস আলোচিত হয়েছে। শব্দগঠনের তিনটি প্রক্রিয়া সংযোজন, বিয়োজন ও অর্থপরিবর্তন– এ তিনটির মধ্যে সমাস হলো সংযোজন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপণ, মিলন ও একাধিক পদের একপদীকরণ। সমাস শব্দের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য হলো একত্রে অবস্থান বা সংক্ষেপণ। সুতরাং ভাষায় সমাসের প্রধান কাজ হলো শব্দ ও বাক্য সংক্ষিপ্তকরণ। সমাস ভাষাকে শ্রুতিমধুর করে। ভাষার অলঙ্করণ, গুণ সংযোজন ও পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে সমাসের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। তাই বলা যায়, বাংলাভাষাকে সংক্ষিপ্ত, শ্রুতিমধুর ও সাবলীল করার জন্য সমাসের ভূমিকা অপরিসীম।

সমাসের মাধ্যমেই বাক্য ও ভাষা সহজ, সরল, সুন্দর ও শ্রুতিমধুর হয়। যেমন– বিলাত থেকে ফেরত= বিলাতফেরত। এ বাক্যের শব্দগুলো সংক্ষিপ্ত হয়ে সমাসবদ্ধ পদ হিসেবে 'বিলাতফেরত'-এ হওয়ায় যেমন সংক্ষিপ্ত হয়েছে, তেমনি হয়েছে সাবলীল ও শ্রুতিমধুর। অতএব সমাস বাক্যকে সংক্ষিপ্ত, সুন্দর ও শ্রুতিমধুর করে। এছাড়া অলঙ্করণ ও শব্দগঠনের ক্ষেত্রেও সমাসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। নতুন শব্দ গঠনে সমাস কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট একাধিক পদের একপদে পরিণত হওয়াকে কী বলে?
ক) সমাস খ) কারক
গ) বচন ঘ) বাচ্য

২. সমাস শব্দের অর্থ কী?
ক) বিশ্লেষণ খ) সংক্ষেপণ
গ) সংযোজন ঘ) সংশ্লেষণ

৩. সমাসের রীতি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে?
ক) আরবি খ) ফারসি
গ) সংস্কৃত ঘ) ইংরেজি

৪. যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটির নাম কী?
ক) সমস্যমান পদ খ) ব্যাসবাক্য
গ) সমাসবাক্য ঘ) সমস্তপদ

৫. সমাস নিষ্পন্ন পদটির নাম কী?
ক) ব্যাসবাক্য খ) বিগ্রহবাক্য
গ) সমস্যমান পদ ঘ) সমস্ত পদ

উত্তরমালা : ক

১. ক ২. খ ৩. গ ৪. ক ৫. ঘ

পাঠ-৩.৬.২ : সমাসের প্রকারভেদ– দ্বন্দ্ব, কর্মধারয় ওতৎপুরুষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সমাসের প্রকারভেদ বলতে পারবেন।
- দ্বন্দ্ব, কর্মধারয় ও তৎপুরুষ সমাস বর্ণনা করতে পারবেন।

সমাসের প্রকারভেদ

বাংলা ব্যাকরণে সমাস ছয় প্রকার; যথা–
দ্বন্দ্ব সমাস, কর্মধারয় সমাস, তৎপুরুষ সমাস, দ্বিগু সমাস, অব্যয়ীভাব সমাস এবং বহুব্রীহি সমাস।

দ্বন্দ্ব সমাস

সংজ্ঞা : যে সমাসে সমস্যমান প্রত্যেক পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে তাকে বলা হয় দ্বন্দ্ব সমাস। যেমন–
ছেলে ও মেয়ে = ছেলেমেয়ে, স্বর্গ ও নরক = স্বর্গ-নরক ইত্যাদি

দ্বন্দ্ব মানে জোড়া। এ সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাক্যে ও, এবং, আর– এ তিনটি অব্যয়পদ সংযোজক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ক. প্রকারভেদ

দ্বন্দ্ব সমাসকে নিম্নোক্ত কয়েক প্রকার হতে পারে–

১. **মিলনার্থক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে দুটি পদের পরস্পর মিলন ঘটে এবং এদের অর্থের দিক থেকেও মিল থাকে সে দ্বন্দ্ব সমাসকে বলা হয় মিলনার্থক দ্বন্দ্ব। যেমন– ভাই-বোন, মা-বাপ, মাসি-পিসি, চা-বিস্কুট, লতা-পাতা, মাছ-ভাত, পিতা-পুত্র ইত্যাদি।

২. **বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব :** অর্থের দিক থেকে যে দ্বন্দ্ব পরস্পরের মধ্যে বিরোধ তৈরি করে তাকে বলা হয় বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব। যেমন– ভালোমন্দ, সাদাকালো, দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক, দেবদানব, ধনীগরিব ইত্যাদি।

৩. **বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পরপদটি পূর্বপদের বিরোধী ভাব বা অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– ভালোমন্দ, দিনরাত, টকমিষ্টি, দেশেবিদেশে, ছেলেবুড়ো, আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, লাভ–লোকসান ইত্যাদি।

৪. **অঙ্গবাচক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসের সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে নির্দেশ করা হয় তাকে বলা হয় অঙ্গবাচক দ্বন্দ্বসমাস। যেমন– নাক-মুখ, মাথা-মুণ্ড, বুক-পিঠ, নাক-কান, হাত-পা ইত্যাদি।

৫. **বহুপদবিশিষ্ট দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে দুই বা ততোধিক পদ মিলে দ্বন্দ্ব সমাস হয় তাকে বলা হয় বহুপদবিশিষ্ট দ্বন্দ্ব সমাস। যেমন– কায়, মনো এবং বাক্যে= কায়মনোবাক্যে, সাহেব, গোলাম এবং বিবি = সাহেব-গোলাম-বিবি, আমি, তুমি এবং সে = আমরা, স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল = স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ইত্যাদি।

৬. **সংখ্যাবাচক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ উভয় দ্বারা সংখ্যা বোঝায় তাকে বলা হয় সংখ্যাবাচক দ্বন্দ্ব। যেমন– সাত-পাঁচ, ছয়-নয়, নয়-ছয়, ঊনিশ-বিশ. সাত-সতের, লক্ষ– কোটি, দশ-বারো ইত্যাদি।

৭. **সমার্থক দ্বন্দ্ব :** একই জাতীয় বস্তুর সাহায্যে যে দ্বন্দ্ব বা মিলনবাচক সমাস হয় অর্থাৎ যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপর একই অর্থ বহন করে, তাকে সমার্থক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন– ঘরদুয়ার, ঘরবাড়ি, কলকারখানা, বইপুস্তক, গাছগাছালি, শাকসবজি, কাগজপত্র, চিঠিপত্র, হাটবাজার ইত্যাদি।

৮. **একশেষ দ্বন্দ্ব :** যে সমাসে অন্যান্য পদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে প্রধান পদটির সঙ্গে শেষপদটির সামঞ্জস্য রচিত হলে তাকে বলা হয় একশেষ দ্বন্দ্ব। যেমন– জায়া ও পতি = দম্পতি, তুমি ও সে = তোমরা ইত্যাদি।

৯. **অলুক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তির লোপ হয় না তাকে বলা হয় অলুক দ্বন্দ্ব। যেমন– দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, মায়ে-ঝিয়ে, ঘরে-বাইরে, আগে-পরে, ধনেজনে, বনে-জঙ্গলে, বুকেপিঠে, হাতেকলমে ইত্যাদি।

দ্বিগু সমাস

সংখ্যাবাচকশব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাসহয়, তাকেবলাহয় দিগু সমাস। উদাহরণ–

চারপদেরসমাহার= চুতুষ্পদ, চার অঙ্কের সমাহার= চতুরঙ্গ, ত্রি (তিন) ফলেরসমাহার= ত্রিফলা, ত্রি (তিন) প্রান্তরেরসমাহার= তেপান্তর, ত্রি (তিন) রত্নেরসমাহার = ত্রিরত্ন, ত্রি (তিন) ভুজেরসমাহার = ত্রিভুজ,ত্রি (তিন) জগতেরসমাহার= ত্রিজগৎ, ত্রি (তিন) মাথারসমাহার = তেমাথা, ত্রি (তিন) পায়েরসমাহার = তেপায়া, নব (নয়) রত্নেরসমাহার = নবরত্ন, পাঁচ সেরেরসমাহার= পশুরী, পঞ্চনদেরসমাহার= পঞ্চনদ। সে (তিন) তারেরসমাহার= সেতার, সপ্তঅহেরসমাহার= সপ্তাহপ্রভৃতি।

কর্মধারয় সমাস

সংজ্ঞা : কর্মধারয় শব্দটির ব্যুৎপত্তি হলো– কর্ম + ধৃ+ ণিচ + আ = কর্মধারয়। এতে সমান বিভক্তিযুক্ত বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের মিলন হয় এবং পরপদে বিশেষ্যের অর্থ প্রধান থাকে। অর্থাৎ যে সমাসে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাকে বলা হয় কর্মধারয় সমাস। যেমন– নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম, যে শান্ত সেই শিষ্ট = শান্তশিষ্ট, যা কাঁচা তাই পাকা= কাঁচাপাকা ইত্যাদি।

প্রকারভেদ

কর্মধারয় সমাসে নিম্নোক্ত কয়েকভাগে ভাগ করা হয়েছে−

১. **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস :** যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ পায় তাকে বলা হয় মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস। যেমন− পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন, সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, প্রীতিসূচক উপহার = প্রীতিউপহার, মৌ আশ্রিত মাছি = মৌমাছি, সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা, ঘরে আশ্রিত জামাই =ঘরজামাই, সাম্য বিষয়ক বাদ = সাম্যবাদ, স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি।

২. **উপমান কর্মধারয় সমাস :** যার সাথে তুলনা করা হয় তাকে বলা হয় উপমান কর্মধারয় সমাস। উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে বলা হয় উপমান। উপমান ও উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। যেমন− ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণকেশ। এখানে ভ্রমর উপমান এবং কেশ উপমেয়। কৃষ্ণত্ব হলো সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন− তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশ্রভ্র, অরুণের ন্যায় রাঙা= অরুণরাঙা প্রভৃতি। উপমান কর্মধারয় সমাসের আরও কয়েকটি উদাহরণ− নিমতিতা, মিশকালো, বিড়ালতপস্বী, বজ্রকঠোর, ইস্পাতকঠিন, শশব্যস্ত, তুষারশীতল, কুসুমকোমল ইত্যাদি।

৩. **উপমিত কর্মধারয় সমাস :** প্রত্যক্ষ বস্তুর সাথে পরোক্ষ বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয় বা উপমিত। যেমন− মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র, পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ, চরণ কোমলের ন্যায় = চরণকোমল, অধর কোমলের ন্যায় = অধরকোমল, ফুল বাবুর ন্যায় = ফুলবাবু, ফুল কুমারীর ন্যায় = ফুলকুমারী, কর কমল সদৃশ =করকমল, পদ পল্লবের ন্যায় = পদপল্লব ইত্যাদি।

৪. **রূপক কর্মধারয় সমাস :** উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে তাকে বলা হয় রূপক কর্মধারয় সমাস। এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে এবং উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যমান পদে 'রূপ' অথবা 'ই' যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়। যেমন− মন রূপ মাঝি= মনমাঝি, বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু, ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল, মন রূপ বাউল = মনবাউল, দিল রূপ দরিয়া= দিলদরিয়া, নীল রূপ দরিয়া = নীলদরিয়া, স্নেহ রূপ সুধা = স্নেহসুধা, প্রাণ রূপ পাখি= প্রাণপাখি, জীবন রূপ স্রোত = জীবনস্রোত, ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল, জীবন রূপ তরী = জীবনতরী, সংসার রূপ সাগর = সংসারসাগর, শোক রূপ অনল = শোকানল, ভব রূপ নদী = ভবনদী, ক্ষুধা রূপ অনল = ক্ষুধানল, শোক রূপ সিন্ধু= শোকসিন্ধু, সমর রূপ অনল = সমরানল ইত্যাদি।

তৎপুরুষ সমাস

সংজ্ঞা : তৎপুরুষ শব্দটির ব্যুৎপত্তি হলো তন+ অদ= তৎ, অর্থাৎ সে বা তিনি। আর পৃ+ উষ = পুরুষ। এক্ষেত্রে এর শাব্দিক অর্থ 'তার সম্পর্কীয় পুরুষ'। এতে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি পদ থাকে। দুটি পদই বিশেষ্য হতে পারে। এর মধ্যে প্রথমটি দ্বিতীয়টির অর্থকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। প্রথমটির অব্যয় পরবর্তীটির সাথে কর্মরূপে, করণরূপে, সম্প্রদানরূপে, অপাদানরূপে, সম্বন্ধরূপে অথবা অধিকরণরূপে ঘটে। দ্বিতীয় পদটির অর্থ প্রধান অর্থ হয়ে থাকে। তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞায় বলা হয় 'পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পেয়ে এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে যে সমাস গঠিত হয়, তাকে বলা হয় তৎপুরুষ সমাস।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, 'যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় এবং উত্তরপদের অর্থ প্রধানরূপে বুঝায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।'

তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত যে কোনো বিভক্তি থাকতে পারে আর পূর্বপদের বিভক্তি হিসেবে এদের নামকরণ হয়। যেমন− বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি কে লোপ পেয়েছে বলে এর নাম হয়েছে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস।

প্রকারভেদ

তৎপুরুষ সমাস গঠনে বিভক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভক্তির ভিত্তিতে তৎপুরুষ সমাসকে নিম্নোক্ত নয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস, তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস, চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস, পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস, ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস, সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস, নঞ তৎপুরুষ সমাস, উপপদ তৎপুরুষ সমাস এবং অলুক তৎপুরুষ সমাস। নিচে উদাহরণসহ এসব তৎপুরুষ সমাস আলোচনা করা হলো।

১. **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তাকে বলা হয় দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস। যথা–
দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, পরলোকে গত = পরলোকগত, লোককে অতীত = লোকাতীত, স্বর্গকে প্রাপ্ত = স্বর্গপ্রাপ্ত, ধর্মকে সংক্রান্ত = ধর্মসংক্রান্ত, অশ্বকে আরুঢ় = অশ্বারুঢ়, সংখ্যাকে অতীত = সংখ্যাতীত, বিস্ময়কে আপন্ন= বিস্ময়াপন্ন, স্মরণকে অতীত = স্মরণাতীত, গৃহকে প্রবিষ্ট = গৃহপ্রবিষ্ট, ক্ষমতাকে প্রাপ্ত = ক্ষমতাপ্রাপ্ত, শরণকে গত = শরণাগত, দেশকে আশ্রিত = দেশাশ্রিত, ভারকে প্রাপ্ত = ভারপ্রাপ্ত ইত্যাদি। এছাড়া যথা, তথা, রূপে, ভাবে ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়ে থাকে। যেমন– আধ রূপে পাকা= আধপাকা, নিমভাবে রাজি= নিমরাজি, ধীর যথা তথা গামী = ধীরগামী, অর্ধরূপে মৃত = অর্ধমৃত, অবশ্য যথা তথা কর্তব্য =অবশ্যকর্তব্য ইত্যাদি।
আবার ব্যাপ্তি অর্থে কালবাচক পদের সাথে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন–
অর্ধরূপে স্ফুট = অর্ধস্ফুট, চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী, চিরকাল ব্যাপী স্মরণীয় = চিরস্মরণীয়, চিরকাল ব্যাপিয়া কুমারী = চিরকুমারী, চিরকাল ব্যাপী স্থায়ী = চিরস্থায়ী, ক্ষণকাল ব্যাপীয়া স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী প্রভৃতি।

২. **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস :** যে সমাসে পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, তে ইত্যাদি) লোপ পায়, তাকে বলা হয় তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস। যেমন– মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা, শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ, বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত = বস্ত্রাচ্ছাদিত, লাঠি দ্বারা খেলা = লাঠিখেলা, রক্ত দ্বারা সিক্ত = রক্তসিক্ত, স্নেহ দ্বারা অন্ধ = স্নেহান্ধ, ধামা দ্বারা চাপা = ধামাচাপা, অস্ত্র দ্বারা উপচার = অস্ত্রোপাচার, জরা দ্বারা জীর্ণ = জরাজীর্ণ, স্বনাম দ্বারা ধন্য = স্বনামধন্য, ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য = ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, দৃষ্টি দ্বারা হীন = দৃষ্টিহীন, বিনয় দ্বারা অবনত = বিনয়াবনত, বাগ দ্বারা দত্তা = বাগদত্তা, মন দ্বারা গড়া = মনগড়া, শোক দ্বারা আর্ত = শোকার্ত, গুণ দ্বারা মুগ্ধ = গুণমুগ্ধ, তৈল দ্বারা আক্ত = তৈলাক্ত, শোক দ্বারা আকুল = শোকাকুল, মধুতে মাখা = মধুমাখা, বিপদ দ্বারা সঙ্কুল = বিপদসঙ্কুল প্রভৃতি।

৩. **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস :** পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, রে, জন্য, তরে, নিমিত্ত) লোপের মাধ্যমে যে সমাস হয়, তাকে বলা হয় চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস। যেমন– গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি, আরামের জন্য কেদারা = আরামকেদারা, বসতের জন্য বাড়ি = বসতবাড়ি, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা, হজ্বের জন্য যাত্রা = হজ্বযাত্রা, পাগলের নিমিত্তে গারদ = পাগলাগারদ, মরণের নিমিত্তে কাঠি = মরণকাঠি, শিশুর জন্য সাহিত্য = শিশুসাহিত্য, শয়নের নিমিত্তে কক্ষ = শয়নকক্ষ, রান্নার জন্য ঘর = রান্নাঘর, ছাত্রের জন্য আবাস = ছাত্রাবাস, ছাত্রীর জন্য নিবাস = ছাত্রীনিবাস, জীবনের নিমিত্তে কাঠি = জীবনকাঠি, ডাকের জন্য মাশুল = ডাকমাশুল প্রভৃতি।

৪. **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস :** যে সমাসে পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তির (হইতে, থেকে, চেয়ে) লোপ পায় তাকে বলা হয় পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস। সাধারণত পুত, জাত, আগত, ভীত, গৃহীত, নিয়ত, মুক্ত, উত্তীর্ণ, চালানো, ভ্রষ্ট ইত্যাদি পরস্পরের ফলে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন– বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত, প্রাণের চেয়ে অধিক = প্রাণাধিক, সত্য থেকে ভ্রষ্ট = সত্যভ্রষ্ট, প্রাণের চেয়ে প্রিয় = প্রাণপ্রিয়, জেল থেকে মুক্ত= জেলমুক্ত, জেল থেকে খালাস = জেলখালাস, পণ হতে মুক্তি = পণমুক্তি, আগা থেকে গোড়া = আগাগোড়া, পদ থেকে চ্যুত = পদচ্যুত প্রভৃতি।
কোনো কোনো সময় পঞ্চমী তৎপুরুষের ব্যাসবাক্য এর, চেয়ে ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার হয়। যেমন– প্রাণের চেয়ে প্রিয় = প্রাণপ্রিয়, পরাণের চেয়ে প্রিয় = পরাণপ্রিয় ইত্যাদি।

৫. **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস :** যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ পায় তাকে বলা হয় ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলা হয়। যেমন– চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, খেয়ার ঘাট= খেয়াঘাট, ছাত্রের সমাজ = ছাত্রসমাজ, দেশের সেবা = দেশসেবা, দিল্লীর ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর, পাটের ক্ষেত = পাটক্ষেত, ছবির ঘর = ছবিঘর, বিড়ালের ছানা = বিড়ালছানা প্রভৃতি। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের কতিপয় নিয়ম-

ক) ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে রাজা স্থলে রাজ, পিতা, মাতা, ভ্রাতা স্থলে যথাক্রমে পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ হয়। যেমন– দিল্লীর রাজা = দিল্লীরাজ, গজনীর রাজা= গজনীরাজ, রাজার পুত্র= রাজপুত্র, পিতার ধন = পিতৃধন, মাতার সেবা = মাতৃসেবা, ভ্রাতার পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি।

খ) পরপদে সহ,তুল্য, খায়, প্রতিম, এ সমস্ত শব্দ থাকলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন– পত্নীর সহ= পত্নীসহ বা সপত্নীক, কন্যার সহ = কন্যাসহ, সহোদরের প্রতিম= সহোদরপ্রতিম ইত্যাদি।

গ) কালের কোনো কোনো অংশবোধক শব্দ পরে থাকলে তা পূর্বে বসে। যেমন– অহ্নের (দিনের) পূর্বভাগ = পূর্বাহ্ন। পরপদে রাজি, গ্রাম, বৃন্দ, গণ, সূর্য ইত্যাদি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন– ছাত্রের বৃন্দ = ছাত্রবৃন্দ, গুণের গ্রাম = গুণগ্রাম, হস্তির যূথ = হস্তিযূথ ইত্যাদি।

ঘ) অর্ধ শব্দ পরপদ হলে সমস্ত পদে তা পূর্বপদ হয়। যেমন– পথের অর্ধ = অর্ধপথ ইত্যাদি।

ঙ) শিশু, দুগ্ধ ইত্যাদি শব্দ পরে থাকলে স্ত্রীবাচক পূর্বপদ পুরুষবাচক হয়। যেমন– মৃগীর শিশু = মৃগশিশু, ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ ইত্যাদি।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের আরও কয়েকটি উদাহরণ–

ফুলের গাছ = ফুলগাছ, খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট, চায়ের বাগান = চাবাগান, চায়ের দোকান = চাদোকান, সূর্যের আলোক = সূর্যালোক, পিতার তুল্য = পিতৃতুল্য, জাতিদের সংঘ = জাতিসংঘ, যমের আলয় = যমালয়, নাটকের অভিনয় = নাটকাভিনয়, মনের রথ = মনোরথ, দীনের বন্ধু = দীনবন্ধু, বাদরের নাচ = বাদরনাচ, বিড়ালের ছানা = বিড়ালছানা, নদীর জল = নদীজল, শিক্ষার মন্দির = শিক্ষামন্দির, দূতের আবাস = দূতাবাস, ভাইয়ের পো = ভাইপো, ঠাকুরের বাড়ি = ঠাকুরবাড়ি, কবিদের গুরু = কবিগুরু প্রভৃতি।

৬. **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস :** যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য় , তে) লোপ পায়, তাকে বলা হয় সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস। যেমন– গাছে পাকা = গাছপাকা, অকালে মৃত্যু = অকালমৃত্যু, দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা, ভোজনে পটু = ভোজনপটু, পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব, দানে বীর = দানবীর, বস্তাতে পচা = বস্তাপচা, বনে বাস = বনবাস, পাপে আসক্ত = পাপাসক্ত, বাক্সতে বন্দী = বাক্সবন্দী, তালে কানা = তালকানা, নামাযে রত = নামাযরত, গোলায় ভরা = গোলাভরা, পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব, বাকে পটু = বাকপটু, মনে মরা = মনমরা, অকালে পক্ব= অকালপক্ব, পূর্বে শ্রুত = আশ্রুতপূর্ব ইত্যাদি।

৭. **নঞ তৎপুরুষ সমাস :** নাবাচক নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– নয় সুখ = অসুখ, নয় উচিত = অনুচিত, নেই বিশ্বাস = অবিশ্বাস, নেই মিল = অমিল, ন কাতর = অকাতর, নয় অতি দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ, নয় সত্যি = অসত্যি, নয় সত্য = অসত্য, নেই ভুল = নির্ভুল, নাই হায়া = বেহায়া, নয় = অচল, নাই বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি, ন আচার = অনাচার, নয় অতি খর্ব = নাতিখর্ব, নয় হাজির = গরহাজির প্রভৃতি।

এছাড়া সংস্কৃত নঞ অব্যয়ের বাংলা প্রতিরূপ রূপে অ, অন, আনা, গর, বে, বি, ন, না, নি ইত্যাদি এসেছে। যেমন–
নাই আহার = অনাহার, নয় জোড় = বিজোড়, নয় অতি দূর = নাতিদূর, নয় হাজির = গরহাজির, নাই সীমা = অসীম, নাই খুঁত = নিখুঁত, নয় বালক = নাবালক, নয় সৃষ্টি = অনাসৃষ্টি ইত্যাদি।

৮. উপপদ তৎপুরুষ সমাস : কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদকে বলা হয় কৃদন্ত পদ। কৃদন্ত পদের পূর্বের পদকে বলা হয় উপপদ। উপপদের সাথে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয়, তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলা হয়। যেমন– পঙ্কে জন্মে যে = পঙ্কজ, যাদু করে যে = যাদুকর, ইন্দ্রকে জয় করেছে যে = ইন্দ্রজিৎ, ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা, পকেট মারে যে = পকেটমার, স্থলে চলে যে = স্থলচর, চিত্র আঁকে যে = চিত্রকর, মানুষ খায় যে = মানুষখেকো, জল দেয় যে = জলদ, সত্য কথা বলে যে = সত্যবাদী, জলে চরে যে =জলচর, মধু পান করে = মধুপ, মদ পান করে যে = মদ্যপ ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে বর্ণচোরা, গলাকাটা, পা-চাটা, পাড়াবেড়ানী, ছা-পোষা, হাড়ভাঙা, ঘরপোড়া, মাছিমারা ইত্যাদি।

৯. অলুক তৎপুরুষ সমাস : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে বিভক্তি লোপ পায় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলা হয়। যেমন– ঘানি তেল = ঘানিরতেল, ঘি দিয়ে ভাজা = ঘিয়েভাজা, গোড়ায় গলদ = গোড়ায়গলদ, তেলে ভাজা = তেলেভাজা, হাতে কাটা = হাতেকাটা, কল দ্বারা ছাঁটা = কলেছাঁটা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. 'আমরা' কোন সমাসের উদাহরণ?

ক) মিলনার্থক দ্বন্দ্ব খ) বহুপদী দ্বন্দ্ব
গ) বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব ঘ) সমার্থক দ্বন্দ্ব

২. যে সমাসে অন্যান্য পদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে প্রধান পদটির সঙ্গে শেষ পদটির সামঞ্জস্য বুঝায় তাকে কোন সমাস বলে?

ক) বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব খ) অলুক দ্বন্দ্ব
গ) একশেষ দ্বন্দ্ব ঘ) বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব

৩. 'মৌমাছি' কোন সমাসের উদাহরণ?

ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ) উপমান কর্মধারয়
গ) উপমিত কর্মধারয় ঘ) রূপক কর্মধারয়

৪. 'শিশুসাহিত্য'এর ব্যাসবাক্য কী?

ক) শিশু ও সাহিত্য খ) শিশু দিয়ে সাহিত্য
গ) শিশুর জন্য সাহিত্য ঘ) শিশু কালের সাহিত্য

৫. 'চা বাগান' কোন সমাসের উদাহরণ?

ক) চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস খ) পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস
গ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস ঘ) সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস

উত্তরমালা : ক

১. খ ২. ক ৩. ক ৪. গ ৫. গ

পাঠ-৩.৬.২ : সমাসের প্রকারভেদ– অব্যয়ীভাব, বহুব্রীহি ও দ্বিগু

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- অব্যয়ীভাব, বহুব্রীহি ও দ্বিগু সমাসের সংজ্ঞা বলতে পারেন।
- উক্ত সমাসের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

অব্যয়ীভাব সমাস

সংজ্ঞা : যে সমাসের পূর্বপদে অব্যয় থাকে এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধানরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বলা হয় অব্যয়ীভাব সমাস। অন্যভাবে বলা যায়, পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে অর্থের প্রাধান্য থাকলে, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসের ব্যাসবাক্যে অব্যয় উল্লেখ হয় না, কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি গঠিত হয়। যেমন– জানু পর্যন্ত লম্বিত = আজানুলম্বিত (কাছে), মরণ পর্যন্ত = আমরণ ইত্যাদি।

বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ নিচে দেয়া হলো-

সামীপ্য (উপ) : কূলের সমীপে = উপকূল, নগরীর সমীপে = উপনগরী, শহরের সমীপে = উপশহর, কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ, অক্ষির সমীপে =সমক্ষ, ক্ষুদ্র মহাদেশ =উপমহাদেশ ইত্যাদি।

বীপ্সা (অনু, প্রতি): রোজ রোজ = হররোজ, ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ, বছর বছর = ফিবছর, দিন দিন = প্রতিদিন, ক্ষণ ক্ষণ = প্রতিক্ষণ, হপ্তা হপ্তা = ফিহপ্তা ইত্যাদি।

অভাব (নিঃ, নির): ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ, মিলের অভাব = গরমিল, ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা, জয়ের অভাব পরাজয়, জলের অভাব = নির্জল, আমিষের অভাব = নিরামিষ, উৎসাহের অভাব = নিরুৎসাহ, জীবন পর্যন্ত = আজীবন ইত্যাদি।

পর্যন্ত (আ) : কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ, পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক, জীবন পর্যন্ত = আজীবন ইত্যাদি।

সাদৃশ্য (উপ) : বনের সদৃশ =উপবন, শহরের সদৃশ = উপশহর, গ্রামের সদৃশ = উপগ্রাম, গ্রহের সদৃশ = উপগ্রহ, দ্বীপের সদৃশ = উপদ্বীপ, নদীর সদৃশ = উপনদী, ভাষার সদৃশ = উপভাষা ইত্যাদি।

অনতিক্রমতা (যথা): সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য, শক্তিকে অতিক্রম না করে = যথাশক্তি, শাস্ত্রকে অতিক্রম না করে = যথাশাস্ত্র, রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি, ইচ্ছাকে অতিক্রম না করে = যথাইচ্ছা ইত্যাদি।

অতিক্রান্ত (উৎ) : বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল, শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল ইত্যাদি।

বিরোধ (প্রতি) : বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল, বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ ইত্যাদি।

পশ্চাৎ (অনু) : গমনের পশ্চাৎ = অনুগমন, ক্রমের পশ্চাৎ = অনুক্রম, তাপের পশ্চাৎ =অনুতাপ, ধাবনের পশ্চাৎ = অনুধাবন প্রভৃতি।

ঈষৎ (আ) : ঈষৎ নত = আনত, ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম প্রভৃতি।

ক্ষুদ্র অর্থে (উপ) : ক্ষুদ্র শাখা = প্রশাখা, ক্ষুদ্র বিভাগ = উপবিভাগ, ক্ষুদ্র অঙ্গ = প্রত্যঙ্গ, ক্ষুদ্র নদী = উপনদী ইত্যাদি।

যোগ্যতা অর্থে : গুণের যোগ্য = অনুগুণ, প্রেরণার যোগ্য = অনুপ্রেরণা, ভোগের যোগ্য = উপভোগ, রূপের যোগ্য = অনুরূপ, ভাবের যোগ্য = অনুভব, জ্ঞানের যোগ্য = অভিজ্ঞ ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাস

সংজ্ঞা : বহুব্রীহি শব্দটির ব্যুৎপত্তি হলো বংহ (বুদ্ধি) +উ = বহু; বৃহ +ই = ব্রীহি। এর অর্থ বহু ধান আছে যার এমন লোককে বোঝানো হয়। বাংলা ব্যাকরণে এটি সমাসরূপে পরিচিত। বহুব্রীহি সমাসের সংজ্ঞায় বলা হয়, যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনো অর্থ প্রকাশ করে, তাই বহুব্রীহি সমাস। যেমন– পোড়া কপাল যার = পোড়াকপাল। এখানে কপাল আক্ষরিক অর্থে আগুনে পুড়ে গেছে এমন কাউকে না বুঝিয়ে মন্দভাগ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রকারভেদ :

বহুব্রীহি সমাস নিম্নোক্ত কয়েক ভাগে বিভক্ত–

১. **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস :** পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন– হত হয়েছে যার শ্রী = হতশ্রী, খোশ মেজাজ যার = খোশমেজাজ, সুন্দর শ্রী যার = সুশ্রী, পুণ্য আত্মা যার = পুণ্যাত্মা, পীত অম্বর যার = পীতাম্বর, নীল বসন যার = নীলবসনা (স্ত্রী), হত ভাগ্য যার = হতভাগ্য, গৌর অঙ্গ যার = গৌরাঙ্গ, নত হয়েছে জানু যার = নতজানু, দশ আনন যার = দশানন ইত্যাদি।

২. **ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস :** বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয়, তবে তাকে বলা হয় ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস। যেমন– আশীতে (দাঁতে) বিষ যার = আশীবিষ, কথা সর্বস্ব যার = কথাসর্বস্ব, পাপে মতি যার = পাপমতি, পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ, ধর্মে মতি যার = ধর্মমতি, নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ, দুষ্টু মতি যার = দুষ্টমতি, নদী মাত যার = নদীমাতৃক, ধর্মে প্রাণ আছে যার = ধর্মপ্রাণ, ঊর্ণ নাভিতে যার = ঊর্ণনাভ, বীণা পাণিতে যার = বীণাপাণি ইত্যাদি।
পরপদ কৃদন্ত বিশেষ্য হলেও ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন– দুই কান কাটা যার = দুকানকাটা, ধামা ধরে যে = ধামাধরা, বোঁটা খসেছে যার = বোঁটাখসা, পা চাটে যে = পা-চাটা ইত্যাদি।

৩. **ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস :** ক্রিয়ার পারস্পরিকতা বুঝাতে যে সমাস হয়, তাকে বলা হয় ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস। এ সমাসে পূর্বপদে আ এবং পরপদে ই যুক্ত হয়। যেমন– হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা =

কানাকানি, চুলে চুলে যে লড়াই = চুলাচুলি, গালে গালে যে লড়াই = গালাগালি, লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি, ঘুষিতে ঘুষিতে যে লড়াই = ঘুষাঘুষি, কোলে কোলে যে মিলন = কোলাকুলি, দন্তে দন্তে যে যুদ্ধ = দন্তাদন্তি ইত্যাদি।

৪. **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস :** বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্ত পদে লোপ পায়, তবে তাকে বলা হয় মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস। যেমন– বিড়ালের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী, হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি, গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ ইত্যাদি।

৫. **নঞ বহুব্রীহি সমাস :** বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ (না অর্থবোধক) অব্যয়যোগে বহুব্রীহি সমাস করা হলে তাকে নঞ বহুব্রীহি সমাস বলে। নঞ বহুব্রীহি সমাসে সাধিত পদটি বিশেষণ হয়। যেমন– ন (নাই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান, না (নাই) চারা (উপায়) = নাচার, নি (নাই) ভুল যার = নির্ভুল, না (নয়) জানা যা = নাজানা, অ (নাই) আদি যার = অনাদি, বে (নাই) ঈমান যার = বেঈমান, অ (নাই) সীমা যার = অসীম, অ (অন্ত) নাই যার = অনন্ত, নির (নাই) মূল যার = নির্মূল, বে (নাই) হুঁ যার = বেহুঁশ, নি (নাই) ভয় যার = নির্ভীক ইত্যাদি।

৬. **প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস :** যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস। যথা– এক দিকে চোখ বা দৃষ্টি যার = একচোখা, ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো, নিঃ (নেই) খরচ যার = নি-খরচ, দো টানা যার = দোটানা, দুই তলা যার = দোতলা, দুই দিকে টান যার = দোটানা, দুই দিকে মন যার = দোমনা ইত্যাদি।

৭. **অলুক বহুব্রীহি সমাস :** যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে বলা হয় অলুক বহুব্রীহি সমাস। এ সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয়। যেমন– মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি, গলায় গামছা যার = গলায়গামছা, হাতে ছড়ি যার = হাতে-ছড়ি, কানে কলম যার = কানে-কলম, গায়ে পড়ে যে = গায়ে-পড়া, হাতে বেড়ি যার = হাতে-বেড়ি, মুখে ভাত যার = মুখে-ভাত, কানে খাটো যে = কানে-খাটো ইত্যাদি।

৮. **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস :** পূর্বপদে সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্ত পদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে। এ সমাসে সমস্ত পদে আ, ই বা ঈ যুক্ত হয়। যেমন– দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি, চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা, চৌ কাঠ যার = চৌকাঠ, তিন পায়া যার = তেপায়া, চৌ রাস্তা যার = চৌরাস্তা, দুই নল যার = দুনলা, দশ আনন যার = দশানন, সে (তিন) তারের যন্ত্র = সেতার, পঞ্চ আনন যার = পঞ্চানন ইত্যাদি।

৯. **নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস :** যে বহুব্রীহি সমাস কোনো নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, তাকে বলা হয় নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস। যেমন–দুই দিকে অপ যার = দ্বীপ, অন্তর্গত অপ(জল) যার = অন্তরীপ, নরাকারের পশু যে = নরপশু, জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত, পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. ‘উপশহর’ কোন সমাস?

ক) তৎপুরুষ   খ) অব্যয়ীভাব
গ) বহুব্রীহি   ঘ) দ্বিগু

২. পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে কোন সমাস হয়?

ক) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি   খ) ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি
গ) ব্যতিহার বহুব্রীহি   ঘ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

৩. যে বহুব্রীহি সমাস কোনো নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না তাকে কী বলে?

ক) নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি   খ) অলুক বহুব্রীহি
গ) নঞ বহুব্রীহি   ঘ) ব্যতিহার বহুব্রীহি

৪. 'অনাদি' কোন সমাস?

ক) অব্যয়ীভাব খ) তৎপুরুষ
গ) বহুব্রীহি ঘ) কর্মধারয়

৫. 'প্রতিকূল' কোন সমাসের উদাহরণ?

ক) অব্যয়ীভাব খ) তৎপুরুষ
গ) বহুব্রীহি ঘ) কর্মধারয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন :

১. সমাসের সাহায্যে কীভাবে নতুন শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ আলোচনা করুন।
২. সমাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
৩. উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দিন।
৪. অব্যয়ীভাব সমাস কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।
৫. তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।
৬. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন−
জীবন্মৃত, মুখেভাত, গায়েহলুদ, অসীম, নীলকণ্ঠ, উপনদী, অনুক্রম, হাতেকাটা, গরহাজির, ছেলেধরা, অর্ধপথ, দূতাবাস, পাটক্ষেত, শোকার্ত, মধুমাখা, বিপদাপন্ন, ফুলকুমারী, পলান্ন, জীবনস্রোত, চিঠিপত্র, অহি-নকুল।

উত্তরমালা : ক

১. খ ২. ক ৩. ক ৪. গ ৫. ক

পাঠ-৩.৭ : উপসর্গ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- উপসর্গের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- উপসর্গের শ্রেণিকরণ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন উপসর্গের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন বাক্যে এসব উপসর্গের প্রয়োগ দেখাতে পারবেন।

বাংলা ব্যাকরণে কিছু শব্দাংশ ব্যবহৃত হয় যাদের কোনো নিজস্ব অর্থ নেই। কিন্তু নিজস্ব অর্থ না থাকলেও এদের অর্থদ্যোতকতা আছে। অর্থাৎ এই শব্দাংশগুলি অন্য শব্দের পূর্বে বসে শব্দগুলির অর্থের সংকোচন, প্রসারণ, পরিবর্ধন, পরিবর্তন সবই করতে পারে। এভাবে এই শব্দগুলি বাংলা ভাষায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন শব্দ তৈরিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। এই অর্থবিহীন শব্দাংশগুলোকে উপসর্গ বলা হয়। তবে কোন উপসর্গগুলি কোন শব্দের সঙ্গে যুক্ত হবে সে বিষয়ে বাংলা ব্যাকরণে রয়েছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও বিধিমালা। এই পাঠে বাংলা ভাষায় প্রচলিত উপসর্গের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগবিধি আলোচনা করা হয়েছে।

উপসর্গের অর্থ, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

সংজ্ঞা

উপসর্গ হলো কতগুলো বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি। যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না, ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, তাদের উপসর্গ বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বাংলা ভাষায় যেসব অব্যয়সূচক শব্দাংশ ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে বিভিন্ন অর্থের সৃষ্টি করে, তাকে উপসর্গ বলে। যেমন– উপ + হার = উপহার, বি + হার = বিহার, প্র+ হার = প্রহার ইত্যাদি; এখানে উপ, বি, প্র হলো উপসর্গ।

উপসর্গ শব্দের পূর্বে বসে শব্দের অর্থকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে। ফলে বাংলা ভাষার শব্দগঠনে উপসর্গের ভূমিকা রয়েছে।

উপসর্গের বৈশিষ্ট্য

উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে। অর্থাৎ কোনো শব্দ বা পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এরা সংযুক্ত শব্দ বা পদের অর্থের নানারকম পরিবর্তন ঘটায়। নিচে উপসর্গের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো–

১. উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই।
২. এরা নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে।
৩. উপসর্গগুলো বদ্ধরূপমূল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৪. উপসর্গগলো অর্থের সংকোচন, অর্থ পরিবর্তন, অর্থের প্রসার ঘটায়।
৫. এগুলো নামবাচক ও কৃদন্ত শব্দের পূর্বে বসে।

উপসর্গের প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। এ তিন প্রকার উপসর্গ হলো–

ক. তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ
খ. বাংলা উপসর্গ ও
গ. বিদেশি উপসর্গ

তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ

সংজ্ঞা :

যেসব উপসর্গ সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে সেসব উপসর্গকে বলা হয় তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত উপসর্গ বিশটি। এগুলো হলো– প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির, দুর, বি, অধি, সু, উদ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ।

নিচে অর্থসহ সংস্কৃত উপসর্গের ব্যবহার দেখানো হলো–

উপসর্গ	**ব্যবহৃত অর্থ**	**উদাহরণ**
প্র	সম্যক	প্রভাব, প্রচলন
	উৎকর্ষ অর্থে	প্রজ্ঞা, প্রভাত, প্রদর্শন
	আধিক্য অর্থে	প্রখর, প্রতাপ, প্রবল, প্রকোপ
	খ্যাতি অর্থে	প্রভাব, প্রখ্যাত, প্রশংসা, প্রকীর্তি
	গতি অর্থে	প্রস্থান, প্রকাশ, প্রচলন, প্রদান
পরা	বিপরীত অর্থে	পরাজয়, পরাভব, পরাধীন, পরাহত
	আতিশয্য অর্থে	পরাকাষ্ঠা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ, পরাক্রম
অপ	বিপরীত অর্থে	অপমান, অপকার, অপচয়
	অপকর্ষ অর্থে	অপচয়, অপচেষ্টা, অপকর্ম, অপপ্রচার
	বিকৃত অর্থে	অপমৃত্যু, অপপাঠ, অপভাষা, অপভ্রংশ
	নিকৃষ্ট অর্থে	অপকর্ম, অপযশ, অপসৃষ্টি
	স্থানান্তর অর্থে	অপহরণ, অপসরণ, অপনোদন
সম	সম্যক অর্থে	সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণ, সমাদর, সংবাদ
	আধিক অর্থে	সংক্রম, সন্তাপ, সমৃদ্ধ, সম্যস্যক
	মিলন অর্থে	সম্মিলন, সম্মেলন, সংকলন, সঞ্চয়
নি	নেই অর্থে	নিখাদ, নিখুঁত, নিখোঁজ, নিটোল, নিভাঁজ
অব	সম্যক অর্থে	অবরোধ, অবগাহন, অবগত, অবদমন, অবগুণ্ঠিত
অনু	পশ্চাৎ অর্থে	অনুশোচনা, অনুগামী, অনুজ, অনুচর, অনুতাপ
	পৌনঃপুণিকতা অর্থে	অনুক্ষণ, অনুদীন, অনুশীলন
নির	অভাব অর্থে	নিরক্ষর, নির্জীব, নিরাশ্রয়, নির্ধন, নিরন্ন
	বাহির অর্থে	নির্গত, নিঃসরণ, নির্বাসন
	নিশ্চয় অর্থে	নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর, নির্দেশ, নিরুদ্ধ
দুর	কষ্টসাধ্য অর্থে	দুর্গম, দুরূহ, দুর্জয়, দুর্নিবার
	মন্দ অর্থে	দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম, দুর্ঘটনা, দুজন
বি	বিশেষ অর্থে	বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান, বিচিত্র, বিজ্ঞ, বিগন্ধ
	অভাব অর্থে	বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিফল, বিকর্ণ, বিদেহ
	বিপরীত অর্থে	বিকর্ষণ, বিকল, বিক্রয়, বিদেশ, বিরাগ
সু	উত্তম অর্থে	সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়, সুনীল, সুশীল, সুজন
	সহজ অর্থে	সুগম, সুসাধ্য, সুলভ, সুবোধ্য
	আতিশয্য অর্থে	সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুদক্ষ
উৎ	ঊর্ধ্বমুখিতা অর্থে	উদ্যম, উন্নতি, উত্তোলন, উদগ্রীব
	প্রাবল্য অর্থে	উচ্ছ্বাস, উত্তপ্ত, উত্তেজনা, উন্মুক্ত
	অপকর্ষ অর্থে	উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট, উচ্ছেদ, উত্তেজনা
অধি	আধিপত্য অর্থে	অধিকার, অধিপতি, অধিকর্তা, অধিনায়ক

	আয়ত্ত অর্থে	অধিকৃত, অধিগত, অধিভুক্ত, অধিবাসী
	ব্যাপ্তি অর্থে	অধিবাস, অধিগতি
পরি	বিশেষরূপে	পরিপূর্ণ, পরিবর্তন, পরিত্যাগ, পরিপক্ব
	সুন্দর অর্থে	পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, পরিমার্জিত, পরিস্কার
	চতুর্দিক অর্থে	পরিক্রমণ, পরিমণ্ডল, পরিবৃত্ত, পরিবেশ
প্রতি	সদৃশ অর্থে	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি, প্রতিকৃতি, প্রতিনিধি
	বিরোধ অর্থে	প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বি, প্রতিকার
	পৌণঃপুনিকতা অর্থে	প্রতিদিন, প্রতিমাস, প্রতিগ্রাম, প্রতিঘর
উপ	সম্যক অর্থে	উপকরণ, উপক্রম, উপচার, উপদেশ, উপহার
	ক্ষুদ্র	উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা, উপনদী, উপজেলা
	সামীপ্য অর্থে	উপকণ্ঠ, উপকূল, উপনগর
	সদৃশ অর্থে	উপদ্বীপ, উপবন
অভি	সম্যক অর্থে	অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিসার, অভিনিবেশ
	বিশেষ অর্থে	অভিধান, অভিনয়, অভিনেতা, অভিভাবক
	গমন অর্থে	অভিযান, অভিকেন্দ্র, অভিবাসী, অভিবাসন
অতি	অধিক অর্থে	অতিকায়, অতিচালাক, অতিভক্তি, অতিবৃষ্টি
	আতিশয্য অর্থে	অত্যাচার, অতিশয়
	স্বাভাবিকতার বাইরে	অতিপ্রাকৃত, অতিঅলৌকিক
	অতিক্রম অর্থে	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত
অপি	ব্যাকরণের সূত্র	অপিনিহিতি
	আরও অর্থে	অপিচ
আ	পর্যন্ত অর্থে	আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র
	ঈষৎ অর্থে	আরক্ত, আভাস
	বিপরীত অর্থে	আদান, আগমন

বাংলা উপসর্গ

সংজ্ঞা : যেসব অব্যয় জাতীয় শব্দ বা শব্দাংশ বাংলা শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে তাদেরকে বাংলা উপসর্গ বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য

১. বাংলা উপসর্গগুলোকে খাঁটি বাংলা উপসর্গ নামে অভিহিত করা হয়।
২. বাংলা ভাষায় কিছু অব্যয় জাতীয় শব্দ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না।
৩. এগুলো সাধারণত নাম শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়।
৪. এদের খাঁটি বাংলা উপসর্গ বলা হয়।

বাংলা উপসর্গ একুশটি। এগুলি হলো–

অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, ঊনা, কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

খাঁটি বাংলা উপসর্গের ব্যবহার

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
অ	নিন্দিত অর্থে	অকাজ, অকেজো, অকাল, অপয়া, অকাট, অপাত্র ইত্যাদি
	অভাব অর্থে	অচিন, অজানা, অথৈ
	না অর্থে	অখুশি, অদেখা, অচেনা, অমিল, অমর, অবলা, অযাচিত
	পরিমাণ অর্থে	অঢেল, অগুনতি, অফুরন্ত

অঘা	বোকা অর্থে	অঘারা, অঘাচণ্ডী, অঘাকাণ্ড, অঘামারা
অজ	নিতান্ত মন্দ অর্থে	অজপাড়া গাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর
অনা	অভাব অর্থে	অনাবৃষ্টি, অনাচার, অনাদায়
	ব্যতীত অর্থে	অনাসৃষ্টি, অনাদৃষ্টি
আ	না অর্থে	আকাড়া, আলুনি, আচালা, আঁছাকা, আঢাকা
	নিকৃষ্ট অর্থে	আকাঠ, আগাছা, আকথা, আকাল,আঘাটা
আড়	প্রায় অর্থে	আড়মোড়, আড়পাগলা
	বিশিষ্ট অর্থে	আড়কোলা, আড়গড়া, আড়কাঠি
আন	নতুন অর্থে	আনকোরা, আনাড়ি
	বিক্ষিপ্ত অর্থে	আনচান, আনমনা
আব	অস্পষ্টতা	আবছায়া, আবজাল
ইতি	এর অর্থে	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে
	পুরান অর্থে	ইতিকথা, ইতিহাস
ঊন	কম অর্থে	ঊনিশ, ঊনবর্ষা, ঊনপাঁজুরে
কদ	নিন্দিত অর্থে	কদবেল, কদাকার
কু	কুৎসিত অর্থে	কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর, কুকাম, কুকাজ
নি	নাই অর্থে	নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিরেট, নির্দয়
পাতি	ক্ষুদ্র অর্থে	পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল, পাতিনেতা, পাতিকাক
বি	নাই অর্থে	বিপথ, বিকল, বিকাল, বিফল
ভর	পূর্ণতা অর্থে	ভরপেট, ভরপুর, ভরদুপুর, ভরযৌবন
রাম	বড় অর্থে	রামছাগল, রামশিঙ্গা, রামদা, রামবোকা
স	সঙ্গে	সলাজ, সরব, সঠিক, সপাট, সস্ত্রীক
সা	উৎকৃষ্ট অর্থে	সাজিরা, সাজোয়ান
সু	উত্তম অর্থে	সুনজর, সুখবর, সুনাম, সুদিন
হা	অভাব অর্থে	হাভাতে, হাঘরে, হাকপাল, হাহুতাশ

বিদেশি উপসর্গ

সংজ্ঞা

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি শব্দের সঙ্গে যেসব উপসর্গ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাদেরকে বিদেশী উপসর্গ বলা হয়। এসব বিদেশি উপসর্গের মধ্যে আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি ইত্যাদি ভাষার উপসর্গ বহুলভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এসব উপসর্গ ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষার সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে। বাংলা ভাষায় ঠিক কতগুলো বিদেশী উপসর্গ ব্যবহৃত তা জানা নেই।

নিচে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশি উপসর্গের ব্যবহার দেখানো হলো–

ইংরেজি উপসর্গ

উপসর্গ	**ব্যবহৃত অর্থ**	**উদাহরণ**
সাব	অধীন অর্থে	সাব অফিস, সাব এডিটর, সাবজজ
ফুল	সম্পূর্ণ অর্থে	ফুলশার্ট, ফুলবাবু, ফুলহাতা, ফুলপ্যান্ট
হেড	প্রধান অর্থে	হেড অফিস, হেডমাস্টার, হেড পণ্ডিত
হাফ	অর্ধেক অর্থে	হাফ প্যান্ট, হাফ শার্ট, হাফ স্কুল, হাফ টিকিট

ফারসি উপসর্গ

ফি	প্রত্যেক অর্থে	ফি-বছর, ফি হপ্তা, ফি– রোজ, ফি– সব

না	না অর্থে	নামঞ্জুর, নারাজ, নাচার
ব	সাথে অর্থে	বনাম, বকলম, বমাল
কম	অল্প অর্থে	কমবখত, কমআক্কেল, কমজোর
বে	না অর্থে	বেকার, বেয়াদব, বেকসুর, বেহায়া, বেঠিক
বর	মন্দ অর্থে	বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ
বদ	খারাপ অর্থে	বদমাশ, বদহাল, বদমেজাজ, বদরাগী, বজ্জাত
নিম	অর্ধেক অর্থে	নিমরাজি, নিমমোল্লা
দর	অধীন অর্থে	দরপাট্টা, দরখাস্ত, দরপাওনা, দাদালান
কার	কাজ অর্থে	কারচুপি, কারবার, কারসাজি, কারদানি, কারখানা

আরবি উপসর্গ

আম	সাধারণ অর্থে	আমদরবার, আমমোক্তার
খাস	বিশেষ অর্থে	খাসমহল, খাসদখল, খাসকামরা, খাসদরবার
লা	না অর্থে	লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা
গর	অভাব অর্থে	গরমিল, গরহাজির, গররাজি

হিন্দি উপসর্গ

হর	প্রত্যেক অর্থে	হররোজ, হরকিসিম, হরেক, হরহামেশা

উপসর্গের বাক্যে প্রয়োগ

ক) বাংলা উপসর্গ

১. **অ– অকাজ** : তার এরকম অকাজ আমি পছন্দ করি না।
২. **আ– আগাছা** : আগাছা পরিষ্কার মানুষ রোবট আবিষ্কারের কথা ভাবছে।
৩. **অনা– অনাবৃষ্টি** : এবার অনাবৃষ্টির কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।
৪. **আন– আনকোরা** : রহমান সাহেব আজ আনকোরা পাঞ্জাবি পরে অফিসে যাচ্ছে।
৫. **অজ– অজপাড়াগাঁ** : অজপাড়াগাঁয়ের মুস্তাফিজুর রহমান এখন ক্রিকেটের বিস্ময়।
৬. **পাতি– পাতিনেতা** : পাতিনেতারা এখন দলের জন্য হুমকিস্বরূপ।
৭. **নি– খরচা** : কাজের জন্য টাকা প্রয়োজন হয়, নিখরচে চলে না।
৮. **রাম– রামছাগল** : তার মত রামছাগল দিয়ে এরূপ মহৎ কাজ অসম্ভব।
৯. **বি– বিকল** : এই গাড়ির ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেছে।
১০. **হা– হাভাতে** : হাড়– হাভাতের দল এখানে এসেছে আমাকে ভীষণ বিপদে ফেলেছে।

খ) সংস্কৃত উপসর্গ

১. **প্র-প্রভাত** : আজি প্রভাতে রবির কর/ কেমনে পশিল প্রাণের পর।
২. **পরা– পরাজিত** : সে জীবনযুদ্ধে একজন পরাজিত সৈনিক।
৩. **অপ– অপমান** : কারো অপমান করা ঠিক নয়।
৪. **সু– সুকোমল** : সুকোমল বিছানায় শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।
৫. **পরি– পরিচয়** : তার পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হলাম।
৬. **প্রতি– প্রতিদান** : খারাপ কাজের প্রতিদান ভালো হয় না।
প্রতিবেশী : প্রতিবেশীর সাথে খারাপ ব্যবহার করা ঠিক নয়।
প্রতিবাদ : অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিৎ।
৭. **অভি– অভিনয়** : সংসারে অনেককেই অভিনয় করতে হয়।
অভিসন্ধি : তার অভিসন্ধি বুঝতে আমাদের দেরী হলো না।

অভিযোগ : সে শুধু সবার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে।

৮. **অতি– অতিবক্তি** : অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।

অতিক্রম : এই বাধা অতিক্রম করা তার পক্ষে সহজ হবে না।

অতিশয় : সে অতিশয় ভালো লোক।

৯. **অনু– অনুশোচনা** : লোকটি খারাপ কাজ করে এখন অনুশোচনায় দগ্ধ।

অনুরাগ : লোকে বলে রাগ নাকি অনুরাগের আয়না।

১০. **উপ– উপদেশ** : শিক্ষকের উপদেশ মানা ছাত্রদের কর্তব্য।

উপভোগ : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে তিনি মুগ্ধ হলেন।

উপজাতি : বাংলাদেশে বিভিন্ন উপজাতি বাস করে।

গ) বিদেশি উপসর্গ

১. **কার– কারবার** : তার কাজ-কারবার আমার পছন্দ হচ্ছে না।

২. **দর– দরখাস্ত** : আকিব জামান ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছে।

৩. **না– নাবালক** : নাবালক ছেলেকে বিশ্বাস করে সে ভুল করেছে।

৪. **নিম– নিমরাজি** : মনি বিয়েতে নিমরাজি হয়ে আছে।

৫. **ফি– ফি-সন** : ফি-সন এই সময়েই লোকটি টাকা চাইতে আসে।

৬. **বদ– বদরাগী** : বড় সাহেব খুব বদরাগী, কথায় কথায় সে রাগ করে।

৭. **বে– বেকায়দা** : আদিব জামান কাজটা নিয়ে বড় বেকায়দায় আছে।

৮. **ব– বমাল** : চোর বমাল গ্রেফতার হলো।

৯. **কম– কমজোর** : ভাল খেয়ে না খেয়ে তার শরীরে কম– জোর।

১০. **আম– আমদরবার** : জনতার আমদরবারে যাব এবং এই অন্যায়ের বিচার হবে।

১১. **খাস– খাসকামরা** : রাজার খাসকামরায় মন্ত্রি প্রবেশ করল।

১২. **লা– লা-জওয়াব** : খুব তো পণ্ডিতি দেখালো, এখন দেখছি স্যারের সামনে লা-জওয়াব।

১৩. **বাজে– বাজে কথা** : তোমার বাজে কথায় কান দেয়ার মতো সময় আমার নেই।

১৪. **গর– গরমিল** : হিসেবে গরমিল থাকায় বড় সাহেব চুক্তিতে সই করেননি।

১৫. **ফুল– ফুলহাতা** : আসলাম সাহেব আজ ফুলহাতা শার্ট পরেছেন।

১৬. **হাফ– হাফহাতা** : গরমকালে হাফহাতা শার্ট পরাই ভালো।

১৭. **হাফনেতা** : আজকাল হাফনেতার দাপট বেশি।

১৮. **হর– হরতাল** : হরতালে দেশের অর্থনেতিক অবস্থা নাজুক করে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. **উপসর্গের কাজ কী?**

ক) ভাবের পার্থক্য নিরুপণ — খ) নতুন শব্দ গঠন

গ) সংস্করণ — ঘ) যতি সংস্করণ

২. **শব্দের পূর্বে বসে কোনটি?**

ক) বিভক্তি — খ) প্রত্যয়

গ) উপসর্গ — ঘ) অনুসর্গ

৩. **উপসর্গকে কোন জাতীয় শব্দাংশ বলা হয়?**

ক) বিশেষ্য — খ) সর্বনাম

গ) বিশেষণ — ঘ) অব্যয়

৪. কার অর্থবাচকতা আছে কিন্তু অর্থদ্যোতকতা নেই?

ক) কারকের খ) অনুসর্গের
গ) উপসর্গের ঘ) সমাসের

৫. বাংলা ভাষায় কত ধরনের উপসর্গ প্রচলিত আছে?

ক) ৩ খ) ২
গ) ১ ঘ) ৪

৬. উপসর্গ প্রধানত কয় প্রকার?

ক) তিন প্রকার খ) চার প্রকার
গ) পাঁচ প্রকার ঘ) ছয় প্রকার

৭. খাঁটি বাংলা উপসর্গ কোনটি?

ক) আম খ) রাম
গ) নিম ঘ) বাম

৮. বিজ্ঞান শব্দের বি উপসর্গ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক) বিশেষ খ) অভাব
গ) সাধারণ ঘ) গতি

৯. খাঁটি বাংলা উপসর্গ মোট কয়টি?

ক) ১০টি খ) ২০ টি
গ) ১৫টি ঘ) ২১ টি

১০. কোনটি ইংরেজি উপসর্গ?

ক) ফুল খ) আম
গ) গর ঘ) নিম

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গ কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির দুটো করে উদাহরণ দিন।
২. বাংলা ভাষায় উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা কেন উদহারণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৩. নিচের শব্দগুলো প্রত্যেকটির তিনটি ভিন্ন উপসর্গযোগে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে বাক্যরচনা করুন : শ্বাস, লয়, বাস, বাদ, মান।
৪. নিচের শব্দগুলো থেকে বাংলা, সংস্কৃত ও বিদেশী উপসর্গ যুক্ত শব্দ পৃথক করে দেখান:
প্রণাম, আলুনি, অবেলা, বেহাল, নিখুঁত, গরমিল, সম্পূর্ণ, নিযুক্ত, আজন্ম, পরিপক্ব, খোশ মেজাজ, হরবোলা।
৫. উপসর্গের স্বাধীন অর্থ নেই, কিন্তু নতুন অর্থ সৃষ্টির গুণ আছে। উদাহরণসহ উক্তিটির সভ্যতা যাচাই করুন।
৬. নিচের শব্দগুলো দেয়া হল, বাক্য রচনা নিজে তৈরি করুন।

শ্বাস : বিশ্বাস, নিঃশ্বাস, আশ্বাস
বাদ : অপবাদ, প্রতিবাদ, বিবাদ
লয় : আলয়, প্রলয়, নিলয়
বাস : আবাস, নিবাস, প্রবাস, উপবাস
খান : অপমান, অভিমান, অভিযান

নিজেরা আরও উপসর্গযোগে শব্দ চিন্তা করুন।

উত্তরমালা : ক.

১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. গ ৫. ক ৬. ক ৭. খ ৮. ক ৯. ঘ ১০. ক

পাঠ-৩.৮ : ধাতু প্রকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ধাতুর সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- ধাতুর প্রকারভেদ করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধাতুর গঠন-বিন্যাস বর্ণনা করতে পারবেন।

ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্পর্ক রয়েছে। এই দুটি অংশের মধ্যে ক্রিয়াবিভক্তিটি বাদ দিলে যে অপরিহার্য অংশটি বর্তমান থাকে, সেটিই হচ্ছে ধাতু। ধাতু দিয়ে শুধু যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তা-ই নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়াপদের ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে তৈরি করা যায় সংশ্লিষ্ট অসংখ্য নতুন ক্রিয়াপদ। ফলে বাংলা ভাষার শব্দগঠনে ধাতুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান। এই পাঠে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধাতুসমূহের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও গঠনবিন্যাস আলোচনা করা হয়েছে।

ধাতুর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

সংজ্ঞা

ক্রিয়ার মূল অংশকে বলা হয় ধাতু। ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায়– একটি ধাতু বা ক্রিয়ামূল অপরটি ক্রিয়াবিভক্তি। ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়াবিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে তা-ই হলো ধাতু। অর্থাৎ ক্রিয়ামূলের আরেক নাম ধাতু। ড. এনামুল হক এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘ক্রিয়াপদের যে অবিভাজ্য অংশ এর অন্তর্নিহিত মূল ভাবটির দ্যোতনা করে তাকে ধাতু বলে।’ যেমন–

শাহীন কাজটি করছে। আমি কাজটি করছি। সে কাজটি করেছিল।

এ তিনটি বাক্যে করছে, করছি ও করেছিল এ তিনটি ক্রিয়াপদ। এই তিনটি ক্রিয়াপদ একটি ‘কর’ ধাতু দ্বারা সাধিত হয়েছে। নিচে তিনটি ক্রিয়াপদের ধাতুর রূপ দেখানো হল:

মূল ক্রিয়া	বিভক্তি	ক্রিয়াপদ
কর্+	ছি	করছি
কর্ +	ছে	করছে
কর্ +	ছিল	করছিল

এরকম ধর, কর, জান, যা, খা, ধো, কাঁদ ইত্যাদি হলো ক্রিয়ামূল বা ধাতু। ক্রিয়ামূলকে বা ধাতুকে আবার প্রকৃতিও বলা হয়। ক্রিয়ার মূল বা ধাতু বোঝাতে (√) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ লক্ষ করলে সহজেই ধাতু শনাক্ত করা যায়। কারণ এররূপ আর ধাতুর রূপ এক। যেমন–

(তুই) কর্, যা, খা, দেখ্, লেখ্ ইত্যাদি।

এগুলো যেমন ধাতু হিসেবে গণ্য হয়, তেমনি আবার মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় ক্রিয়াপদ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণবিদগণ সংস্কৃত ভাষার ধাতুর তালিকা দিয়েছেন। তাদের মতে, প্রায় দুই হাজার ধাতু রয়েছে। কিন্তু বেদ, ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সাতশতের বেশি ধাতুর উদাহরণ পাওয়া যায় না। এসব ধাতুকে বলা হয় ‘সিদ্ধ ধাতু’। বাংলা ভাষায় সিদ্ধ, সাধিত প্রভৃতি সকল প্রকারের ধাতুর সংখ্যা ১৫০০ বা এর অধিক। এই ১৫০০-র মধ্যে অনেকগুলো আবার বাংলায় লোপ পেয়েছে এবং নিয়মিতই পাচ্ছে।

ধাতুর প্রকারভেদ

প্রকৃতি ও উৎপত্তি বিচারে বাংলা ধাতুসমূহকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে–

ক) মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু (primary root)

খ) সাধিত ধাতু (derived root)ও
গ) যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু (compound root)

ক) মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু(primary root)

যে ধাতুকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না তাকে বলা হয় মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু। এসব ধাতুর রূপ গঠনের দিক থেকে ন্যূনতম একক। এসব ধাতু আবার স্বয়ংসিদ্ধ ধাতু নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। যেমন– কর, চল, দেখ, খি, যা, আস ইত্যাদি। বাংলা ভাষার মৌলিক ধাতুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১) খাঁটি বাংলা ধাতু ২) সংস্কৃত মূল ধাতু ও ৩) বিদেশি ধাতু

১. **খাঁটি বাংলা ধাতু :** যেসব ধাতুর মূল সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে আসেনি, কিন্তু অপভ্রংশ বা প্রাকৃতের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় এসে ব্যবহৃত হচ্ছে তাকে বলা হয় খাঁটি বাংলা ধাতু। এসব ধাতুকে ভিত্তি করেই বাংলা ক্রিয়াপদ, কৃদন্ত, বিশেষ্য, বিশেষণ ইত্যাদি শব্দ গঠিত হয়েছে। যেমন–
নাচ্– নাচা, কাট্– কাটা, কাঁদ্– কাঁদা ইত্যাদি।
বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক প্রয়োগ করে বাংলা ধাতু চেনা যায়। যেমন– তুই কর, তুই যা, তুই কাট ইত্যাদি।

২. **সংস্কৃত মূল ধাতু :** যে সব ক্রিয়াপদের মূল সংস্কৃত ভাষা থেকে এসে বাংলাভাষায় সরাসরি ব্যবহৃত হচ্ছে সেসব ধাতুকে বলা হয় সংস্কৃত মূল ধাতু। এসব ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ক্রিয়া বিশেষ্য বা ক্রিয়া বিশেষণ গঠিত হয়। যেমন– 'কৃ' ধাতুর সাহায্যে গঠিত পদ – কর, করা ইত্যাদি। আবার 'কৃ' থেকে গঠিত ক্রিয়াপদ– কৃত, কর্তব্য, করণীয়, কর্তৃত্ব ইত্যাদি। অনুরূপভাবে, 'গম' থেকে– গমন করা, গতি, গম, গত ইত্যাদি। 'দা' ধাতু থেকে– দান করা, দাতা, দান, দাতব্য। 'তাজ' ধাতু থেকে– ত্যাগ করা, ত্যাগ, ত্যাজ্য ইত্যাদি।
নিচে সংস্কৃত ধাতু ও এ থেকে গঠিত পদ এবং সংস্কৃত ধাতুর একই অর্থবোধক বাংলা ধাতু এবং তা থেকে গঠিত পদের উদাহরণ দেয়া হলো-

সংস্কৃত ধাতু	সাধিত ধাতু	বাংলা ধাতু	সাধিত ধাতু
অঙ্ক	অঙ্কন, অঙ্কিত	আঁক্	আঁকা
কথ্	কথ্য, কথিত	কহ্	কওয়া, কহন
কৃৎ	কর্তন, কর্তিত	কাট্	কাটা
ক্রন্দ	ক্রন্দন	কাঁদ্	কাঁদা, কাঁদুনে
ক্রী	ক্রয়, ক্রেতা	কিন্	কেনা, কেনাকাটা
খাদ্	খাদ্য, খাদক	খা	খাওয়া, খাওন
গঠ্	গঠিত	গড়্	গড়া, গড়ন
দৃশ্	দৃশ্য, দর্শন	দেখ্	দেখা, দেখন
পঠ্	পঠন, পাঠ্য, পঠিতপড়	পড়া, পড়ন	
স্থা	স্থান, স্থানীয়	থাক্	থাকা
হস্	হাস, হাসন	হাস্	হাসা, হাসি

৩. **বিদেশি ধাতু :** তৎসম এবং খাঁটি বাংলা ধাতু ছাড়া যেসব ধাতু বিদেশি ভাষা থেকে এসে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে সেসব ধাতুকে বলা হয় বিদেশি ধাতু। প্রধানত হিন্দি, আরবি, ফারসি ভাষা থেকে এসব ধাতু বাংলা ভাষায় এসেছে। যেমন– ভিক্ষে মেগে খায়– এ বাক্যে মাগ ধাতু হিন্দি 'মাঙ' থেকে এসে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে।
এছাড়া আরও কিছু ক্রিয়ামূল রয়েছে যাদের ক্রিয়ামূলের মূল ভাষা নির্ণয় করা কঠিন। এ ধরনের ক্রিয়ামূলকে অজ্ঞাতমূল ধাতু বলে। যেমন– হের ঐ দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে? এ বাক্যে 'হের' ধাতুটি কোন ভাষা থেকে এসেছে তা নির্ণয় করা যায়নি। তাই এটি অজ্ঞাতমূল ধাতু হিসেবে গণ্য হয়েছে। নিচে কয়েকটি বিদেশি ধাতুর উদাহরণ দেয়া হলো–

ধাতু	**ব্যবহৃত অর্থ**	**ধাতু**	**ব্যবহৃত অর্থ**
আঁট্	শক্ত করে বাঁধা	ফির্	পুনরাগমন, পুনরাবৃত্তি
খাট্	মেহনত করা	চাহ্	প্রার্থনা করা

টান্	আকর্ষণ	ডাক্	আহবান
টুট্	ছিন্ন হওয়া	লটক্	ঝুলানো
ডর্	ভীত হওয়া	বিগড়্	নষ্ট হওয়া
চেঁচ্	চিৎকার করা	ভিজ্	সিক্ত হওয়া
জম্	ঘনীভূত হওয়া	ঠেল্	ঠেলা

খ) সাধিত ধাতু

যেসব ধাতু বিশ্লেষণ করলে অন্য একটি ধাতু বা নাম শব্দ এবং এক বা একাধিক প্রত্যয় পাওয়া যায় তাকে বলা হয় সাধিত ধাতু। যেমন– দেখ্+আ = দেখা, পড়্ +আ = পড়া, বল্ + আা = বলা ইত্যাদি।

সাধিত ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষবাচক বিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন–

মা শিশুকে চাঁদ দেখায়। এখানে দেখ্ +আ + বর্তমান কালের সাধারণ নাম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তি য় = দেখায়। এরূপ শোনায়, বসায়, শেখায় ইত্যাদি।

গঠনরীতি ও অর্থের দিক থেকে সাধিত ধাতু তিন প্রকার। যথা–

১) নাম ধাতু ২) প্রযোজক (ণিজন্ত) ধাতু এবং ৩) কর্মবাচ্যের ধাতু।

১. **নাম ধাতু :** সাধিত ধাতুর মধ্যে যেগুলো বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধনাত্মক শব্দ থেকে গঠিত হয়, সেসব ধাতুকে নাম ধাতু বলা হয়। বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পরে আ প্রত্যয় যোগ করে নাম ধাতু গঠিত হয়। যেমন– লোকটি ঘুমাচ্ছে। এখানে ঘুম থেকে নাম ধাতু ঘুমা গঠিত হয়েছে।
   নাম ধাতু গঠনের কয়েকটি নিয়ম নিচে দেয়া হলো
   ১ : সাধারণ বিশেষ্য বা বিশেষণে আ প্রত্যয় যোগ করে নাম ধাতু গঠন করা হয়। যেমন– লাঠি– লাঠা, দুখ– দুখা, রঙ্গ– রঙ্গা, বাহির– বাহিরা, বিষ-বিষা, জুতা– জুতো ইত্যাদি।
   ২ : ড় বা ট প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্যের পরে আ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নাম ধাতু গঠিত হয়। যেমন– আঁকড়– আঁকড়া, আঁচড়– আঁচড়া, দাবড়– দাবড়া, হাতড়– হাতড়া, চুমড়– চুমড়া ইত্যাদি।
   ৩ : লা বা র প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্যের পরে আ প্রত্যয় যোগ করে নামধাতু গঠিত হয়। যেমন– আগল– আগলা, চুমর– চুমরা, হাঁকর– হাঁকরা, ডুকর– ডুকরা ইত্যাদি।
   ৪ : ম বা চ প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্যের পরে অ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নাম ধাতু গঠিত হয়। যেমন– ঝলস-ঝলসা, ধামস– ধামসা, ভামস– ভামসা, ভাঙ্গচ– ভাঙ্গচা ইত্যাদি।

২. **প্রযোজক বা ণিজন্ত ধাতু :** মৌলিক ধাতুর পরে আ, ওয়া প্রত্যয় যোগ করে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে বলা হয় প্রযোজক ধাতু বা ণিজন্ত ধাতু। এই আ প্রত্যয় এখানে মূলত প্রেরণা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–
   কর + আ = এখানে করা একটি ধাতু। বাক্যে প্রয়োগ– সেলিম কাজটি নিজে না করে অন্যকে দিয়ে করাবে।
   অনুরূপভাবে,
   পড় + আ = পড়া, বাক্যে প্রয়োগ– তিনি ছেলেকে পড়াচ্ছেন।

৩. **কর্মবাচ্যের ধাতু :** মৌলিক ধাতুর সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগ করে কর্মবাচ্যের ধাতু গঠিত হয়। এটি বাক্যে ব্যবহারের সময় বাক্যের ক্রিয়াপদকে অনুসরণ করে ব্যবহৃত হয়। যেমন–
   দেখ + আ = দেখা, বাক্যে প্রয়োগ– কাজটি ভালো দেখায় না।
   হার + আ = হারা, বাক্যে প্রয়োগ– যা কিছু হারায় গিন্নি বলে কেষ্টা বেটাই চোর।

গ) যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু

বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, দে, পা, খা, ছাড় ইত্যাদি মৌলিক ধাতু যুক্ত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয়, তাকে বলা হয় সংযোগমূলক ধাতু।

নিচে সংযোগমূলক ধাতু যোগে গঠিত কয়েকটি ক্রিয়াপদের উদাহরণ নিচে দেয়া হলো-

১. কর্– ধাতুযোগে–

ক) বিশেষ্যের সঙ্গে	ভয় কর্, লজ্জা কর্, গুণ কর্।
খ) বিশেষণের সঙ্গে	ভাল কর্, মন্দ কর্, সুখী কর্, সন্দেহ কর্।
গ) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে	ক্রয় কর্, দান কর্, দর্শন কর্, রান্না কর্।
ঘ) ক্রিয়াজাত (কৃদন্ত) বিশেষণের সঙ্গে	সঞ্চিত কর্, স্থগিত কর্।
ঙ) ক্রিয়া– বিশেষণের সঙ্গে	জলদি কর্, তাড়াতাড়ি কর্, একত্র কর্।
চ) অব্যয়ের সঙ্গে	না কর্, হ্যাঁ কর্, হায় হায় কর্, ছি ছি কর্।
ছ) ধনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে	খাঁ খাঁ কর্, বন বন কর্, টন টন কর্।
জ) ধনাত্মক শব্দসহ ক্রিয়া	চট কর্, ধাঁ কর্, হন হন কর্।

২. হ– ধাতুযোগে : বড় হ, ছোট হ, ভালো হ, রাজি হ, সুখী হ, খুশি হ।
৩. দে– ধাতুযোগে : উত্তর দে, ঢাকা দে, দাগা দে, জবাব দে, কান দে, দৃষ্টি দে।
৪. পা– ধাতুযোগে : কান্না পা, ভয় পা, দুঃখ পা, লজ্জা পা, ব্যথা পা, টের পা।
৫. খা– ধাতুয়োগে : মার খা, হিমশিম খা, ছ্যাঁক খা।
৬. কাট্ ধাতুযোগে : সাঁতার কাট্, ভেংচি কাট্, জিভ কাট্, চিমটি কাট্।
৭. ধর্ ধাতুযোগে : গলা ধর্, মাথা ধর্, গোঁ ধর্ ইত্যাদি।
৮. ছাড় ধাতুযোগে : গলা ছাড়, ডাক ছাড়, হাল ছাড়।

ধাতুর ব্যবহার বাংলা ব্যাকরণে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এসব ধাতু ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনে যেমন ভূমিকা পালন করে তেমনি তা বাক্যে ক্রিয়াকে ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে সক্ষম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন-

১. ধাতু কাকে বলে?
ক) পদের মূলকে খ) ভাষার মূলকে
গ) ক্রিয়ার মূলকে ঘ) শব্দের মূলকে

২. মৌলিক ধাতুর অপর নাম কী?
ক) নাম ধাতু খ) কর্ম ধাতু
গ) মৌলিক ধাতু ঘ) সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতু

৩. খাঁটি বাংলা ধাতু কোনটি?
ক) আঁক খ) অঙ্ক
গ) ডর ঘ) বধূ

৪. ধাতু কয় প্রকার?
ক) দুই খ) তিন
গ) চার ঘ) পাঁচ

৫. নিচের কোনটি অজ্ঞাতমূল ধাতু?
ক) হের খ) হাস
গ) খা ঘ) ঘষ

৬. নিচের কোনটি সংস্কৃত ধাতু?
ক. হর খ. দৃশ
গ. জম ঘ. কাট

৭. কোনটি খাঁটি বাংলা ধাতু?
ক. কৃ খ. টান

গ. হাস ঘ. আট

৮. **কোনটি বিদেশী ধাতু?**

ক. ডর খ. কৃৎ

গ. চিব্ ঘ. শুন

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. ধাতু কাকে বলে? ধাতু কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকার ধাতুর একটি করে উদাহরণ দিন।

২. সাধিত ধাতু কয় শ্রেণীতে বিভক্ত? প্রত্যেকটি শ্রেণীর সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দিন।

৩. মৌলিক ধাতু কয়প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখুন।

৪. বিভিন্ন পদের সঙ্গে 'হ', দে, খা, বাস ও পা ধাতুযোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ তৈরি করুন?

৫. সংস্কৃত মূল ধাতু ও বাংলা মূল ধাতুর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তরমালা : ক.

১. গ ২. ঘ ৩. ক ৪. খ ৫. ক ৬. খ ৭. গ ৮. ক

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর পাঠগুলো পড়ে নিজে তৈরি করুন।

পাঠ-৩.৯ : প্রত্যয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- প্রত্যয় কাকে বলে তা আপনি বলতে পারবেন।
- প্রত্যয়ের গঠন সম্পর্কে বলতে পারবেন।

প্রত্যয় ভাষার শব্দ গঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই প্রত্যয়ের আলোচনা আধুনিক ব্যাকরণে রূপতত্ত্ব অংশে স্থান পেয়েছে। বাংলা ভাষায় শব্দগঠনে প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান।

যেসব শব্দাংশ শব্দের পরে বসে নতুন শব্দগঠনে ভূমিকা পালন করে অথবা শব্দের প্রসারে ভূমিকা পালন করে তাকে বলা হয় প্রত্যয়।

প্রত্যয়ের প্রকারভেদ : প্রত্যয় সাধারণত দুই প্রকার–

কৃৎ প্রত্যয় ও
তদ্ধিত প্রত্যয়।

কৃৎ প্রত্যয় : উৎস অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কৃৎ প্রত্যয়সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো : বাংলা কৃৎ প্রত্যয় ও সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়। নিচে বিভিন্ন ধরনের কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া হলো।

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

অ √ধর্+অ= ধর
√মার্+অ = মার

অন (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)
√কাঁদ্+অন = কাঁদন
√নাচ্+অন = নাচন
√বাড়্+অন= বাড়ন
√ঝুল্+অন = ঝুলন
√দুল্+অন = দোলন ধাতুর শেষে 'আ-কার' থাকলে 'ওন' হয়। যেমন–
√খা+অন = খাওন
√ছা+অন = ছাওন
√দে+অন = দেওন

অনা √দুল্+অনা = দোলনা
√খেল্+অনা = খেলনা
অনি/উনি √চির+অনি = চিরনি > চিরুনি
√বাঁধ্+অনি = বাঁধুনি
√আঁট্+অনি = আঁটুনি

অন্ত
√উড়্+অন্ত = উড়ন্ত (বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)
√ডুব্+অন্ত = ডুবন্ত

অক √মুড়্+অক = মোড়ক

√ঝল্+অক = ঝলক

আ √পড়্+আ = পড়া

√রাঁধ্+আ = রাঁধা

√কেন্+আ = কেনা

√কাচ্+আ = কাচা

√ফুট্+আ = ফোটা?

আই

√চড়্+আই = চড়াই (ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√সিল্+আই = সিলাই

আও

√পাকড়্+আও = পাকড়াও (ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√চ্+আও = চড়াও

আন(আনো)

√জানা+আন = জানানো (প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পরে বসে)

√শোনা+আন = শোনানো

√ভাসা+আন = ভাসানো

√চাল+আন = চালানো/চালান

√মান+আন = মানান/মানানো

আনি

√জান্+আনি = জানানি

√শুন্+আনি = শুনানি

√উড়্+আনি = উড়ানি

(√উড়্+উনি = উড়ুনি)

আরি/আরী/রি/উরি

√ডুব্+আরি/উরি = ডুবুরি

√ধুন্+আরী = ধুনারী

√পূজা+আরী = পূজারী

আল

√মাত্+আল = মাতাল

√মিশ্+আল = মিশাল

ই

√ভাজ্+ই = ভাজি

√বেড়্+ই = বেড়ি

ইয়া/ইয়ে

√মর্+ইয়া = মরিয়া

√বল্+ইয়ে = বলিয়ে

√নাচ্+ইয়ে = নাচিয়ে

√গা+ইয়ে = গাইয়ে

√লিখ্+ইয়ে = লিখিয়ে

√বাজ্+ইয়ে = বাজিয়ে

√ক্+ইয়ে = কইয়ে

উ

√ডাক্+উ = ডাকু

√ঝাড়ু+উ = ঝাড়ু দ্বিত্বপ্রয়োগ : √উড়্+উ = উড়ুউড়ু

উয়া/ও

√পড়ু+উয়া = পড়ুয়া

√উড়ু+উয়া = উড়ুয়া > উড়ো/

√উড়ু+ও = উড়ো

তা

√ফির্+তা = ফিরতা > ফেরতা(বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√পড়ু+তা = পড়তা

√বহ্+তা = বহতা

তি

√ঘাট্+তি = ঘাটতি (বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√বাড়ু+তি = বাড়তি

√কাট্+তি = কাটতি

√উঠ্+তি = উঠতি

না

√কাঁদ্+না = কাঁদনা > কান্না (বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√রাঁধ্+না = রাঁধনা > রান্না

√ঝর্+না = ঝরনা

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

অন(ট)

√নী+অনট > নে+অন = নয়ন

√শ্রচ+অনট = শ্রবণ

√স্থা+অনট = স্থান

√ভোজ+অনট = ভোজন

√নৃত+অন = নর্তন

√দৃশ্+অন = দর্শন

√নন্দি+অনট = নন্দন

ক্ত

√জ্ঞা+ক্ত = জ্ঞাত

√খ্যা+ক্ত = খ্যাত

√পঠ্+ক্ত = পঠিত কিছু কিছু ধাতুর শেষে 'ই-কার' যুক্ত হয়।

√লিখ্+ক্ত = লিখিত

√বিদ্+ক্ত = বিদিত

√বেষ্ট+ক্ত = বেষ্টিত

√চল্+ক্ত = চলিত

ক্তি

√গম্+ক্তি = গতি — কিছু ধাতুর শেষের ব্যঞ্জন লোপ পায়।
√মন্+ক্তি = মতি
√রম্+ক্তি = রতি

√শ্রম্+ক্তি = শ্রান্তি — কিছু ধাতুর প্রথম ব্যঞ্জনে আ-কার যুক্ত হয়।
√শম্+ক্তি = শান্তি

√বচ্+ক্তি = উক্তি
√মুচ্+ক্তি = মুক্তি
√ভজ্+ক্তি = ভক্তি

তব্য

√কৃ+তব্য = কর্তব্য
√দা+তব্য = দাতব্য
√পঠ্+তব্য = পঠিতব্য

অনীয়

√কৃ+অনীয় = করণীয়
√রক্ষ+অনীয় = রক্ষণীয়
√দৃশ্+অনীয় = দর্শনীয়
√পান্+অনীয় = পানীয়
√শ্রু+অনীয় = শ্রবণীয়
√পালন+অনীয় = পালনীয়

তৃচ

√দা+তৃচ = দাতা
√মা+তৃচ = মাতা
√ক্রী+তৃচ = ক্রেতা
√যুধ্+তৃচ = যোদ্ধা

ণক

√পঠ্+ণক = পাঠক
√ণী+ণক > নৈ+অক = নায়ক
√গৈ+ণক = গায়ক

√লিখ্+ণক = লেখক — প্রযোজক ধাতুর শেষে 'ই-কার' থাকলে লোপ পায়।
√পূঁজি+ণক = পূজক
√জনি+ণক = জনক
√চালি+ণক = চালক
√স্তাবি+ণক = স্তাবক

√দা+ণক = দায়ক — ধাতুর শেষে 'আ-কার' থাকলে অতিরিক্ত 'য়' যুক্ত হয়।

য

√দা+য >√দে+য = দেয়
√হা+য >√হে+য = হেয়
বি+√ধা+য = বিধেয়
অ+√জি+য = অজেয়
পরি+√মা+য = পরিমেয়
অনু+√মা+য = অনুমেয়

√গম্+য = গম্য — শেষে ব্যঞ্জন থাকলে য-ফলা হয়।
√লভ্+য = লভ্য

ণিন

√গ্রহ+ণিন =গ্রাহী
√পা+ণিন = পায়ী
√কৃ+ণিন = কারী
√দ্রোহ+ণিন = দ্রোহী
সত্য+√বাদ+ণিন = সত্যবাদী
√ভাব্+ণিন = ভাবী
√স্থা+ণিন = স্থায়ী
√গম্+ণিন = গামী

√হন্+ণিন = ঘাতী — 'হন' ধাতুর ক্ষেত্রে
আত্ম+√হন+ণিন = আত্মঘাতী

ইন

√শ্রম+ইন =শ্রমী

অল

√জি+অল = জয়
√ক্ষি+অল = ক্ষয়
√নিচ্+অল = নিচয়
√বিন্+অল = বিনয়
√বিল্+অল = বিলয় — √হন+অল = বধ

ইষ্ণু

√চল্+ইষ্ণু = চলিষ্ণু
√ক্ষয়+ইষ্ণু = ক্ষয়িষ্ণু
√বর্ধ+ইষ্ণু = বর্ধিষ্ণু

বর

√ঈশ্+বর = ঈশ্বর
√ভাস্+বর = ভাস্বর
√নশ্+বর = নশ্বর
√স্থা+বর = স্থাবর

র

√হিন্‌+স+র = হিংস্র
√নম্‌+র = নম্র

উক/ঊক

√ভু+উক > ভৌ+উক = ভাবুক
√জাগৃ+ঊক = জাগরূক

শানচ

√দীপ্‌+শানচ = দীপ্যমান
√চল্‌+শানচ = চলমান
√বৃধ্‌+শানচ = বর্ধমান

ঘঞ

√বস্‌+ঘঞ = বাস
√যুজ্‌+ঘঞ = যোগ
√ক্রুধ্‌+ঘঞ = ক্রোধ
√খদ্‌+ঘঞ = খেদ

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

আ

চোর্‌+আ = চোরা
কেষ্ট+আ = কেষ্টা
ডিঙি+আ = ডিঙা
বাঘ্‌+আ = বাঘা
হাত্‌+আ = হাতা
লুন্‌+আ = লুনা > লোনা

আই

বড়্‌+আই = বড়াই

মিঠা+আই = মিঠাই
ঢাকা+আই = ঢাকাই
পাবনা+আই = পাবনাই
চোর+আই = চোরাই
মোগল+আই = মোগলাই

আমি/আম/
আমো/মি

ইতর+আমি = ইতরামি
পাগল+আমি = পাগলামি
চোর+আমি = চোরামি
বাঁদর+আমি = বাঁদরামি
ফাজিল+আমো = ফাজলামো
ঠক্‌+আমো = ঠকামো
ঘর্‌+আমি = ঘরামি

জেঠা+মি = জেঠামি
ছেলে+মি = ছেলেমি

ই/ঈ

বাহাদুর+ই = বাহাদুরি
উমেদার+ই = উমেদারি
ডাক্তার+ই = ডাক্তারি
মোক্তার+ই = মোক্তারি
পোদ্দার+ই = পোদ্দারি
ব্যাপার+ঈ = ব্যাপারী
সরকার+ই = সরকারি

ইয়া > এ

সেকাল+এ = সেকেলে
একাল+এ = একেলে
ভাদর+ইয়া = ভাদরিয়া > ভাদুরে
পাথর+ইয়া = পাথুরিয়া > পাথুরে
মাটি+ইয়া = মেটে
বালি+ইয়া = বেলে
জাল+ইয়া = জালিয়া > জেলে
মোট+ইয়া = মুটে খুন+ইয়া = খুনিয়া > খুনে
না+ইয়া = নাইয়া > নেয়ে
দেমাক+এ = দেমাকে

উয়া > ও

জ্বর+উয়া = জ্বরুয়া > জ্বরো
বাত+উয়া = বাতুয়া > বেতো
টাক+উয়া = টাকুয়া > টেকো
খড়+ও = খড়ো
ধান+উয়া = ধেনো
মাঠ+উয়া = মেঠো
গাঁ+উয়া = গাঁইয়া > গেঁয়ো

উ

ঢাল+উ = ঢালু
কল+উ = কলু

উক

লাজ+উক = লাজুক
মিশ+উক = মিশুক
মিথ্যা+উক = মিথ্যুক

আরি/আরী/আরু

ভিখ+আরী = ভিখারী
শাঁখ+আরী = শাঁখারী
বোমা+আরু = বোমারু

আলি/আলো/আল>এল

দাঁত+আল = দাঁতাল

লাঠি+আল = লাঠিয়াল > লেঠেল

তেজ+আল = তেজাল

ধার+আল = ধারাল

শাঁস+আল = শাঁসাল

জমক+আল = জমকালো

দুধ+আল = দুধাল > দুধেল

হিম+আল = হিমাল > হিমেল

চতুর+আলি = চতুরালি

ঘটক+আলি = ঘটকালি

সিঁদ+আল>এল = সিঁদেল

গাঁজা+আল>এল = গেঁজেল

উরিয়া>উড়িয়া/উড়ে/রে

হাট+উরিয়া = হাটুরিয়া > হাটুরে

সাপ+উড়িয়া = সাপুড়িয়া > সাপুড়ে

কাঠ+উরিয়া = কাঠুরিয়া > কাঠুরে

উড়

লেজ+উড় = লেজুড়

উয়া/ওয়া>ও

ঘর+ওয়া = ঘরোয়া

জল+উয়া = জলুয়া > জলো

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

ইত

কুসুম+ইত = কুসুমিত

তরঙ্গ+ইত = তরঙ্গিত

কণ্টক+ইত = কণ্টকিত

ইমন/ইমা

নীল+ইমন = নীলিমা

মহৎ+ইমন = মহিমা

ইল

পঙ্ক+ইল = পঙ্কিল

ঊর্মি+ইল = ঊর্মিল

ফেন+ইল = ফেনিল

ইষ্ঠ

গুরু+ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ

লঘু+ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ

ইন/ঈ/ইনী

জ্ঞান+ইন = জ্ঞানিন

সুখ+ইন = সুখিন

গুণ+ইন = গুণিন

তা/ত্ব

শত্রু+তা = শত্রুতা
বন্ধু+তা = বন্ধুতা
বন্ধু+ত্ব = বন্ধুত্ব
গুরু+ত্ব = গুরুত্ব
ঘন+ত্ব = ঘনত্ব
মহৎ+ত্ব = মহত্ত্ব

তর/তম

মধুর+তর = মধুরতর
প্রিয়+তর = প্রিয়তর
প্রিয়+তম = প্রিয়তম

নীন/ঈন(ন ইৎ)

সর্বজন+নীন = সর্বজনীন
কুল+নীন = কুলীন
নব+নীন = নবীন

নীয়/ঈয়(ন ইৎ)

জল+নীয় = জলীয়
রাজা+নীয় = রাজকীয়

বতুপ/মতুপ

বান/মান

গুণ+বতুপ = গুণবান
দয়া+বতুপ = দয়াবান
বুদ্ধি+মতুপ = বুদ্ধিমান

বিন/বী

মেধা+বিন = মেধাবী
মায়া+বিন = মায়াবী
তেজঃ+বিন = তেজস্বী
যশঃ+বিন = যশস্বী

র

মধু+র = মধুর
মুখ+র = মুখর

ল

শীত+ল = শীতল
বৎস+ল = বৎসল

ষ্ণ(অ)

মনু+ষ্ণ = মানব
যদু+ষ্ণ = যাদব
শিব+ষ্ণ = শৈব
জিন+ষ্ণ = জৈন
শক্তি+ষ্ণ = শাক্ত
বুদ্ধ+ষ্ণ = বৌদ্ধ

ষ্ণ্য(য)

মনুঃ+ষ্ণ্য = মনুষ্য
জমদগ্নি+ষ্ণ্য = জামদগ্ন্য
সুন্দর+ষ্ণ্য = সৌন্দর্য
পর্বত+ষ্ণ্য = পার্বত্য
বেদ+ষ্ণ্য = বৈদ্য

ষ্ণি(ই)

রাবণ+ষ্ণি = রাবণি
দশরথ+ষ্ণ্যি = দাশরথি

ষ্ণিক(ইক)

সাহিত্য+ষ্ণিক = সাহিত্যিক
বেদ+ষ্ণিক = বৈদিক
বিজ্ঞান+ষ্ণিক = বৈজ্ঞানিক
সমুদ্র+ষ্ণিক = সামুদ্রিক
নগর+ষ্ণিক = নাগরিক
মাস+ষ্ণিক = মাসিক
ধর্ম+ষ্ণিক = ধার্মিক
সমর+ষ্ণিক = সামরিক

ষ্ণেয়(এয়)

ভগিনী+ষ্ণেয় = ভাগিনেয়
অগ্নি+ষ্ণেয় = আগ্নেয়
বিমাতৃ+ষ্ণেয় = বৈমাত্রেয়

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

হিন্দি

ওয়ালা>আলা

বাড়ি+ওয়ালা = বাড়িওয়ালা
দিল্লি+ওয়ালা = দিল্লিওয়ালা
মাছ+ওয়ালা = মাছওয়ালা
দুধ+ওয়ালা = দুধওয়ালা

ওয়ান>আন

গাড়ি+ওয়ান = গাড়োয়ান
দার+ওয়ান = দারোয়ান

আনা>আনি

মুনশি+আনা = মুনশিআনা/মুন্সিয়ানা
বিবি+আনা = বিবিআনা/বিবিয়ানা
হিন্দু+আনি = হিন্দুআনি/হিন্দয়ানি

পনা

ছেলে+পনা = ছেলেপনা
গিন্নি+পনা = গিন্নিপনা
বেহায়া+পনা = বেহায়াপনা

দার

খবর+দার = খবরদার
তাঁবে+দার = তাঁবেদার
বুটি+দার = বুটিদার
দেনা+দার = দেনাদার
চৌকি+দার = চৌকিদার
পাহারা+দার = পাহারাদার

বাজ

কলম+বাজ = কলমবাজ
ধড়ি+বাজ = ধড়িবাজ
ধোঁকা+বাজ = ধোঁকাবাজ
গলা+বাজ = গলাবাজ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন।

১. বাংলা ভাষায় কৃৎ প্রত্যয় কত প্রকার?

ক. দুই প্রকার   খ. চার প্রকার
গ. তিন প্রকার   ঘ. পাঁচ প্রকার

২. 'দেনা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?

ক. দে+না   খ. দে+অনা
গ. দি+না   ঘ. দা+ইনি

৩. 'মাতা'র সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?

ক. মা+তা   খ. ম+আতা
গ. মাতৃ+আ   ঘ. মা+তৃচ

৪. 'মুক্ত'র সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?

ক. মুহ+ত   খ. মুচ+ক্ত
গ. মুক+ত   ঘ. মু+ক্ত

৫. তদ্ধিত প্রত্যয় কত প্রকার?

ক. দুই   খ. তিন
গ. চার   ঘ. পাঁচ

৬. শব্দের সঙ্গে যে সব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বলে-

ক. তদ্ধিত প্রত্যয়   খ. ধাতু প্রকৃতি
গ. কৃৎ প্রত্যয়   ঘ. নাম প্রকৃতি

৭. নাম প্রকৃতিকে এক অর্থে বলা যায়–

ক. যৌগিক শব্দ   খ. মৌলিক শব্দ
গ. তৎসম শব্দ   ঘ. বিদেশী শব্দ

৮. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে

ক. ক্রিয়া বিভক্তি বলে   খ. প্রত্যয় বলে
গ. ধাতু বলে   ঘ. প্রাতিপদিক বলে

৯. ধাতু বা শব্দের পর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে বর্ণ বা বর্ণসমূহ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সেগুলো

ক. সমাস খ. উপসর্গ
গ. প্রত্যয় ঘ. কারক

১০. কোন শব্দটি বিদেশী প্রত্যয়ের উদাহরণ?

ক. দাপট খ. ফুলদানি
গ. গমন ঘ. বিজ্ঞান

১১. কোন শব্দটিতে প্রত্যয় 'জাত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. পাবনাই খ. বড়াই
গ. ডাক্তার ঘ. লেজুড়

১২. কোন শব্দটিতে প্রত্যয় সাদৃশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. ছোয়াচ খ. চাঁদপানা
গ. লাজুক ঘ. পূজারী

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রত্যয় কাকে বলে ও কয় প্রকার উদাহরণসহ লিখুন। বাংলা সাহিত্যে প্রত্যয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।
২. কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের পার্থক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৩. কৃৎ প্রত্যয়ের পাঁচটি ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের পাঁচটি উদাহরণ লিখুন।
৪. নিচের প্রত্যয়গুলোর সাহায্যে শব্দগঠন করুন– অক, ইয়া, আনা, দার, ত্ব, তা, অনীয়, আন, অনা।
৫. নিচের শব্দগুলোর প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় করুন :
ঝাড়ন, পাওনা, দোলনা, রাঁধুনি, জীয়ন্ত, লড়াই, যাচাই, ডাকাত, ঘেরাও, ডুবুরি, ফলন্ত, ডুবুডুবু, শ্রবণ, জ্ঞাত, জটা, জমাট, মেটে, মৃন্ময়, মেছো, ছেলেমি, রাঘব, পাণ্ডব,নেতৃত্ব, ঘুষখোর, চাঁদাবাজ, প্রাচ্য, টেকসই, গ্রাম্য, মেধাবি, দৈনিক, সাংবাদিক, চপলতা, মধুর, দাতাগিরি, সাহিত্যিক, দর্শনীয়, শ্রদ্ধাবান, ধড়িবাজ, পানীয়, পার্থিব, পৌরহিত্য, জীয়ন্ত, কুশর, জ্যান্ত, ভূমিসাৎ, হলদে, ডাকাত, চড়াই, বাছাই, গন্তব্য, বসতি, চাহনী, শৈশব, বহতা, কাঁদুনে, জলো, তালব্য, সাংবাদিক, আর্থিক।

উত্তরমালা : ক

১. খ ২. ক ৩. খ ৪. ঘ ৫. ক ৬. ক ৭. খ ৮. ঘ ৯. গ ১০. খ ১১. ক ১২. খ

পাঠ-৩.১০ : শব্দের শ্রেণিবিভাগ– গঠনমূলক, অর্থমূলক ও উৎসমূলক

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- শব্দ কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন।
- অর্থ অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন।
- উৎপত্তি বা উৎস দিক থেকে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে বলা হয় শব্দ। এক বা একাধিক ধ্বনি একত্রিত হয়ে যখন মনের ভাব প্রকাশ করে, তখন তাকে বলা হয় শব্দ। শব্দ হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম একক। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শব্দের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'অর্থপূর্ণ ধ্বনিকে বলে শব্দ (word)। কোনো বিশেষ সমাজের নরনারীর কাছে যে ধ্বনির স্পষ্ট অর্থ আছে, সেই অর্থযুক্ত ধ্বনি আছে, সে সমাজের নরনারীর ভাষার শব্দ।'

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যা ব্যাপক ও বিস্তৃত। এর সংখ্যা যেমন কয়েক লক্ষে পৌঁছেছে, তেমনি বিষয়গত বৈচিত্র্যেও এরা অগণিত। মূলত দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদে বিপুল বাঙালি জনগোষ্ঠি প্রত্যহ তাদের বিচিত্র ভাবনা ও বিষয়কে প্রকাশ করতে হয়। আর এসব ভাবনা ও বিষয়ের জন্য রয়েছে বিচিত্র শব্দভাণ্ডার। এই শব্দভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলোর সাংগঠনিক ও অর্থগত রকমফের ও মাত্রা রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহ এসেছে উৎপত্তিগত তাৎপর্যও রয়েছে। অর্থাৎ এই শব্দগুলো বিভিন্ন ভাষা উৎস থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে। সে অনুযায়ী বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সকল শব্দকে তিন ভাগে ব্যাখ্যা করা যায়। যথা–

i. গঠন অনুসারে
ii. অর্থ অনুসারে ও
iii. উৎস অনুসারে

নিচে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের গঠনগত, অর্থগত ও উৎপত্তিগত শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করা হয়েছে।

গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ

গঠনগত দিক থেকে বাংলা শব্দকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে–

মৌলিক শব্দ : যে শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে বলা হয় মৌলিক শব্দ। উদাহরণ– আম, কলা, দেশ, গোলাপ, ভাই, বোন, হাত, পা, নাক, মাটি, ঘর, বউ ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ : যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায়, এক কথায় তাকেই বলা হয় সাধিত শব্দ। অন্যভাবে বলা যায়, মৌলিক শব্দ বা ধাতুর সাথে বিভিন্ন প্রকার প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ যোগ করে যে শব্দ গঠিত হয়, তাকে বলা হয় সাধিত শব্দ । যেমন– দেশি, মাটির, বোনের, হাতগুলো, বউটি, গোলাপী, ভাইয়ে ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ আবার তিনভাবে গঠিত হয়– সমাস সাধিত, প্রত্যয় সাধিত এবং উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ।

সমাস সাধিত : দু বা ততোধিক পদ এক পদের পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় সমাস। সমাসের সাহায্যে বাংলা ভাষায় বিভিন্নভাবে শব্দ গঠিত হয়। যেমন– তিন তারের সমাহার = সেতার, যিনি রাজা তিনিই ঋষি = রাজর্ষি। সমাসযোগে গঠিত আরও শব্দ হল ত্রিভূবন, ত্রিরত্ন, কানাকানি, বেয়াদব, হতভাগ্য, পীতাম্বর, নীলকণ্ঠ, ধামাধারা, ধর্মপ্রাণ, আশীবিষ, হাতাহাতি, কোলাকুলি, অসীম, যাদুকর, চিত্রকর, তেলেভাজা, শিক্ষামন্ত্রি, ধামাচাপা ইত্যাদি।

প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ : মোগলাই, টাকায়, ঢাকাই ইত্যাদি।

উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ : সুনাম, প্রহার, বিহার, আহার, উপসর্গ, উপহার, উপঢৌকন ইত্যাদি।

শব্দের অর্থগত শ্রেণিবিন্যাস

অর্থগতভাবে শব্দকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা– যৌগিক শব্দ, রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ এবং যোগরূঢ় শব্দ।

যৌগিক শব্দ : যেসব শব্দের অর্থ তাদের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ অনুযায়ী হয়ে থাকে, তাকে বলা হয় যৌগিক শব্দ। অন্যভাবে বলা যায়, যেসব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ এক, সেসব শব্দকে বলা হয় যৌগিক শব্দ। যেমন–

কৃ + তব্য = কর্তব্য, অর্থ– যা করা উচিত

বাবু + আনা = বাবুয়ানা, অর্থ– যিনি বাবুর ভাব নিয়ে চলেন।

পিতা + হীন = পিতৃহীন, অর্থ– যার পিতা নেই।

এরূপ আরও শব্দের উদাহরণ হলো– গুণবান, পাঠক, মিতালি, ভাড়াটে, সংবাদদাতা, বিদ্যালয়, পাচক, এরূপ শব্দ হলো গুণবান, পাঠক, মিতালি, ভাড়াটে, সংবাদদাতা, বিদ্যালয়, পাচক, চরণ, পক্ষী ইত্যাদি।

রূঢ় বা রূঢ়ী শব্দ : যে সব শব্দের অর্থ তাদের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থের অনুগামী না হয়ে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, সেসব শব্দকে বলা হয় রূঢ় বা রূঢ়ী শব্দ। উদাহরণ-

শব্দ	**মূল অর্থ**	**পরিবর্তিত অর্থ**
সন্দেশ	সংবাদ	মিষ্টান্ন
চিকন	চকচকে	সরু
জ্যাঠামি	জেঠার ভাব	চাপল্য
প্রবীণ	প্রকৃষ্ট বীণাবাদক	বয়স্ক ব্যক্তি

এরূপ আরও শব্দ হলো– অতিথি, কুশল, গবাক্ষ, দুহিতা, পাঞ্জাবি, বাঁশি, রাখাল, স্নাতক ইত্যাদি।

যোগরূঢ় শব্দ : সমাসনিষ্পন্ন যেসব শব্দ তার ব্যাসবাক্যের কোনো অর্থ প্রকাশ না করে, তৃতীয় কোনো অর্থ প্রকাশ করে, সেসব শব্দকে বলা হয় যোগরূঢ় শব্দ। যেমন–

জলদ– মূল অর্থ যে জল দেয়, ব্যবহারিক অর্থ হলো মেঘ,

পঙ্কজ– শব্দের অর্থ যা পঙ্কে জন্মে, কিন্তু ব্যবহারিক অর্থ পদ্ম।

এরূপ আরও উদাহরণ হলো– মন্দির, জলদ, রাজপুত, অন্ন, জলধি, মহাযাত্রা, সরোজ ইত্যাদি।

উৎস অনুসারে শব্দকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা–

১. তৎসম শব্দ,
২. অর্ধ-তৎসম শব্দ,
৩. তদ্ভব শব্দ,
৪. দেশি শব্দ ও
৫. বিদেশি শব্দ।

নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ক. তৎসম শব্দ : তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ [তৎ = তার, সম = সমান] তার সমান। এখানে 'তার' বলতে 'সংস্কৃত'র সমান বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার যেসব শব্দ সরাসরি এসে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ। উদাহরণ– চন্দ্র, সূর্য, ধর্ম, বৃক্ষ, মানব, পুত্র, রাত্রি, পর্বত, ভূমি, সিংহ, তাপসী, প্রশ্ন, পাত্র, জলধি ইত্যাদি।

খ. অর্ধ-তৎসম শব্দ : যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে আংশিক পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে সেসব শব্দকে বলা হয় অর্ধ-তৎসম শব্দ। লোকমুখে উচ্চারণের অপপ্রয়োগের ফলে তৎসম শব্দ বিকৃত হয়ে অর্ধ-তৎসম শব্দে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ–

তৎসম	**অর্ধ-তৎসম**	**তৎসম**	**অর্ধ-তৎসম**
চন্দ্র	চন্দর	রত্ন	রতন

গৃহস্থ	গেরস্থ	কুম্ভাকার	কুমার
তারকা	তারা	রৌদ্র	রোদ্দুর
বিশ্রী	বিচ্ছিরি	গাত্র	গতর
ছত্র	ছাতা	গৃহিনী	গিন্নী
শ্রী	ছিরি	বৃষ্টি	বিষ্টি
মিথ্যা	মিছে	ঘৃণা	ঘেন্না
কর্মকার	কামার	লৌহ	লোহা

গ. তদ্ভব শব্দ : তদ্ভব একটি পারিভাষিক শব্দ। এই 'তদ্ভব' পরিভাষার 'তৎ' = তার, এবং ভাব ('ভব') = উৎপন্ন অর্থ বুঝায়। এখানেও 'তার' বলতে 'সংস্কৃত'কে নির্দেশ করছে। অর্থাৎ যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, তাদেরকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ। উদাহরণ–

তৎসম	প্রাকৃত	তদ্ভব	তৎসম	প্রাকৃত	তদ্ভব
অগ্র	অগগ	আগ	বধূ	বহু	বউ
ভক্ত	ভত্ত	ভাত	গাত্র	গাআ	গা
ঘাত	ঘাআ	ঘা	অর্ধ	অদ্ধ	আধ
চন্দ্র	চান্দ	চাঁদ	হস্ত	হত্থ	হাত
অদ্য	অজ্জ	আজ	টঙ্ক	টঙ্কা	টাকা

ঘ. দেশি শব্দ : বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের ব্যবহৃত শব্দসমূহকে বাংলা ভাষয় বলা হয় দেশি শব্দ। বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের সংস্কৃতির কিছু কিছু শব্দ আর্যদের প্রভাবে পরিবর্তিত না হয়ে অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় রক্ষিত আছে, এসব শব্দকে বলা হয় দেশি শব্দ। দেশি শব্দগুলোকে নিম্লোক্তভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে-

১) **জীবজন্তু ও পশুপাখির নাম :** খেঁকশিয়াল, হুতুম, বাবুই, নেংটি, হোল, হাঁড়ি।

২) **ফলমূল ও খাদ্য-দ্রব্য :** বাতাসা, জারুল, হোগলা, মালপো, আমানি, কদু, উচ্ছে, ইচড়, জলপাই, ফোঁপড়, টেপারি, ধুন্দল, থোড়, লাউ, থানকুনি, নটে ইত্যাদি।

৩) **ঘরগৃহস্থালি ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের নাম :** দরজা, সেঁউতি, বাখারি, বাতা, বিচালি, চিমটা, ঢেঁকি, খালই, ঝাঁটা, চাড়ি।

৪) **মাছের নাম :** কাতলা, গজাল, টেংরা, চেলা, পারসে, পোনা, বাটা, লেঠা।

৫) **অন্যান্য শব্দ :** কুড়ি, ডাব, ঝোল, ডোম, মুড়ি, মুলো, টিকারা, দাবা, মল, আটি, ছোকরা, ডিগবাজি, মাঠ, ঠাট্টা, কচি, ঠাসা, পোকা, কানা, মই, যাতা, লাঠি, বাখারি, পেট, ঝাউ, ঝিনুক ইত্যাদি।

ঙ. বিদেশি শব্দ : অন্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় আগত শব্দকে এক কথায় বলা যেতে পারে বিদেশি শব্দ। সামাজিক, রাজৌনতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত কারণে ভিন দেশের অন্য ভাষার শব্দ বাংলা ভাষায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি, ইংরেজি, ফরাসি, ওলন্দাজ, জাপানি, চীনা, তুর্কি, বর্মী ইত্যাদি শব্দের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের তালিকা নিচে দেয়া হলো।

আরবি শব্দ :

ক)ধর্মসংক্রান্ত : আল্লাহ, আমানত, আয়াত, আকিদা, আখিরাত, ইবাদত, ওযু, ওয়াজিক, কবর, কালেমা, কোরআন, কিয়ামত, কোরবানি, জাহান্নাম, দুনিয়া, দোয়া, ফরয, মসজিদ, মাদ্রাসা, মুসলিম, মিনার, যাকাত, রসূল, সালাত, সাওম, সুন্নাহ, সীরাত, হারাম, হালাল, হজ্জ, হাওয়া ইত্যাদি।

খ)প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক শব্দ : আইন, আদালত, আলেম, আক্কেল, আমল, আমলা, আমানত, আমির, আসামি, ইন্তেকাল, ইসলাম, ইজ্জত, ঈদ, উকিল, এজলাস, এজাহার, ওয়ারিশ, দোয়াত, কলম, কিতাব, খাজনা, খেসারত, হিসাব, কবুল, কেতাব, খতম, খেয়াল, গায়েব, জনাব, জমায়েত, জরিপ, জরিমানা, জলদি, জলসা, জুলুম, তালাক, দায়রা, দুনিয়া, মসজিদ, ফাজিল, মালিক, মিনার, মোল্লা, হাজত, হুকুম, হেফাজত ইত্যাদি।

ফারসি শব্দ :

ক) ধর্মসংক্রান্ত শব্দ : খোদা, গুনাহ, দোযখ, নামায, ফেরেশতা, বেহেশত, রোযা ইত্যাদি।

খ) প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ : কারখানা, চশমা, তারিখ, তোশক, দোকান, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, বান্দা, বেগম, মেথর, রসদ ইত্যাদি।

গ) ফারসি ভাষার অন্যান্য শব্দ : আইন, আজাদ, আদমশুমারি, আমদানি, আসমান, একতারা, এলাচি, ওস্তাদ, কাগজ, কামান, কারবার, খরগোশ, খানসামা, খোশবু, খোশামোদ, গালিচা, গোমস্তা, গোরস্তান, গোলাপ, গ্রেপ্তার, চাকর, চাকরি, জাজিম, জানোয়ার, জিন্দাবাদ, তরমুজ, তোষামোদ, দরবার, দরবেশ, দারোগা, পাইকারি, পালোয়ান, পেশকার, মেহেরবান, রোজগার, সানাই, সৌখিন, সরকার, সালতামামি, হুঁশিয়ার ইত্যাদি।

ইংরেজি শব্দ :

অফিস, আর্ট, এনামেল, কফি, কার্নিস, কলেজ, কেটলি, কেয়ার, কেস, কোর্ট, কোম্পানি, ক্যামেরা, ক্লাব, ক্লাস, গেট, চেয়ার, জেল, টাইপ, জ্যাকেট, টিকিট, টিফিন, টাইপ, টেলিফোন, টেলিভিশন, টেন্ডার, টেলিগ্রাফ, ট্রেন, ডাক্তার, ডিপো, ড্রেন, ড্রাম, ফ্যাশন, ফ্ল্যাট, বোনাস, মাইল, মাস্টার, মিটার, ম্যানেজার, রেল, রেডিও, সার্জন, স্টার, স্টিমার, স্টেশন, হুক, হাইকোর্ট, হাসপাতাল ইত্যাদি।

পর্তুগীজ শব্দ :

আয়া, আচার, আনারস, আতা, আলমারি, আলপিন, আলকাতরা, ইস্পাত, কপি, কামিজ, কামরা, কেদারাা, কেরানি, গামলা. গির্জা, গুদাম, চাবি, জানালা, তামাক, তোয়ালে, নিলাম, পাউরুটি, পিস্তল, পেঁপে, পেয়ারা, ফিতা, বালতি, বারান্দা, বেহালা, বোমা, বোতাম, মালঞ্চ, মার্কা, মাস্তুল, মিস্তিরি, সাগু, সাবান ইত্যাদি।

তুর্কি শব্দ : চাকু, চাকর, দারোগা, কুলি, বাবুর্চি, কোর্মা, খাতুন, বেগম, লাশ ইত্যাদি।
চীনা শব্দ : চা, চিনি, কাগজ, এলাচি, তুফান, লিচু, টাইফুন, হোয়াংহো, নানচি ইত্যাদি।
ওলন্দাজ শব্দ : ইস্কাপন, টেক্কা, রুইতন, হরতন, তুরুপ ইত্যাদি।
ফরাসি শব্দ : আঁশ, ইংরেজ, কুপন, কার্তুজ, ক্যাফে, ওলন্দাজ, বিস্কুট, বুর্জোয়া, রেস্তোরা, শেমিজ ইত্যাদি।
জাপানি শব্দ : রিকসা, হারিকিরি, প্যাগোডা, সাম্পান, হাস্নাহেনা, নিপ্পন, টোকিও ইত্যাদি।
বর্মী শব্দ : লুঙ্গি, ফুঙ্গি, কিয়াং, আরাকান, ইয়াঙ্গুন ইত্যাদি।
রুশ শব্দ : বলশেভিক, সোভিয়েত, স্পুৎনিক ইত্যাদি।
ইতালিয় শব্দ : রোম, ম্যাজেন্টা।
গ্রিক শব্দ : দার্খমে– দাম, গোনোস– কোণ, কেন্টর– কেন্দ্র ইত্যাদি।
মিশরীয় শব্দ : মিসরি-মিছরি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. গঠন অনুসারে শব্দ কয় প্রকার?
ক) দুই　　খ) তিন
গ) চার　　ঘ) পাঁচ

২. যেসব শব্দকে ভাঙ্গা বা বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে কী শব্দ বলে?
ক) যৌগিক শব্দ　　খ) রূঢ়ি শব্দ
গ) তদ্ভব শব্দ　　ঘ) মৌলিক শব্দ

৩. ভাষার মূল উপকরণ কোন শব্দ?
ক) যৌগিক　　খ) মৌলিক
গ) তদ্ভব　　ঘ) সাধিত

৪. সাধিত শব্দ কয় প্রকার?

ক) তিন খ) চার

গ) পাঁচ ঘ) কোনটিই নয়

৫. অর্থগতভাবে বাংলা শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

ক) দুই খ) তিন

গ) চার ঘ) পাঁচ

৬. মহাযাত্রা শব্দের ব্যবহারিক অর্থ কোনটি?

ক) মহাসমারোহে যাত্রা খ) মৃত্য

গ) বিশাল পথের যাত্রা ঘ) দূরত্বের যাত্রা

৭. কোনটি রূঢ়ি শব্দ ?

ক) জলধি খ) বাঁশি

গ) কর্তব্য ঘ) মহাযাত্রা

৮. সমাসনিষ্পন্ন যেসব শব্দে তৃতীয় অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে কী শব্দ বলে?

ক) মৌলিক খ) যোগরূঢ়

গ) যৌগিক ঘ) রূঢ়ি

৯. কোনটি যোগরূঢ় শব্দ

ক) বাবুয়ানা খ) জলধি

গ) তৈল ঘ) পাঞ্জাবি

১০. তৎসম শব্দের অর্থ কী?

ক) তার (সংস্কৃতের) সমান খ) বাংলা ভাষার সমান

গ) সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন ঘ) অন্য ভাষার সমান

১১. প্রাকৃত শব্দের অর্থ কী ?

ক) প্রকৃত খ) পুরাতন

গ) স্বাভাবিক ঘ) যা করা হয়েছে

১২. হরতাল কোন ভাষার শব্দ ?

ক) গুজরাটি খ) তুর্কি

গ) হিন্দি ঘ) গুজরাটি

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শব্দ কাকে বলে? গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

২. অর্থ অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ব্যাখ্যা করুন।

৩. উৎপত্তি অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : ক.

১. ক ২. ঘ ৩. খ ৪. ঘ ৫. খ ৬. খ ৭. ক ৮. খ ৯. খ ১০. ক ১১. গ ১২. ক

ইউনিট ৪
পদ–প্রকরণ

পাঠ-৪.১ : পদ ও তার শ্রেণিবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- পদ কী তা বলতে পারবেন।
- পদের প্রকারভেদ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ

বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই অপর কোনো বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির সাথে যুক্ত হয়ে রূপান্তর লাভ করে পদে। শব্দের সাথে এরূপ বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ হলে এগুলোকে বলা হয় বিভক্তি। বিভক্তিযুক্ত শব্দই পদ।

বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই এক একটি পদ (Parts of speech)। সহজভাবে বলা যায়, বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে। যেমন– দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা মানুষের চিরন্তন কল্পনার রাজ্য চাঁদের দেশে পৌঁছেছেন এবং মঙ্গলগ্রহেও যাওয়ার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন। উপর্যুক্ত বাক্যটিতে 'রা' (অভিযাত্রী+রা), 'এর' (মানুষ+এর), 'র' (কল্পনা+র), 'এ' (মঙ্গলগ্রহ+এ) প্রভৃতি চিহ্নগুলোকে বিভক্তি বলা হয়। আর বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি বিভক্তিযুক্ত শব্দ মাত্রই এক একটি পদ।

পদের প্রকারভেদ

পদ প্রধানত দুই প্রকার: অব্যয় ও সব্যয়। সব্যয় পদ চার প্রকার : ১. বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া। সুতরাং পদ মোট পাঁচ প্রকার: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া এবং অব্যয়।

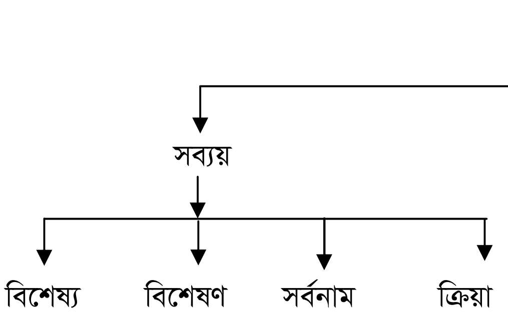

উপর্যুক্ত আলোচ্য বাক্যটি বিশ্লেষণ করলে পাঁচ ধরনের বাক্য ও এর সাথে ব্যবহৃত বিভক্তিগুলো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

পদের নাম	পদ	পদ ও বিভক্তিসহ বিশ্লেষণ	বিভক্তি
বিশেষ্য পদ	অভিযাত্রী, মানুষ, কল্পনা, রাজ্য, দেশ, মঙ্গলগ্রহ	অভিযাত্রী + রা, মানুষ +এর, কল্পনা +র, মঙ্গলগ্রহ + এ	রা, এর, র, এ
বিশেষণ পদ	দুঃসাহসী, চিরন্তন, প্রস্তুত		–
সর্বনাম পদ	তাঁরা		–

ক্রিয়াপদ	পৌঁছেছেন, হচ্ছেন, যাওয়ার (অসমাপিকা ক্রিয়া)		–
অব্যয় পদ	এবং, জন্য		–

ক. বিশেষ্য পদ

কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য পদ বলে। বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে।

বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ

বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার। যথা–

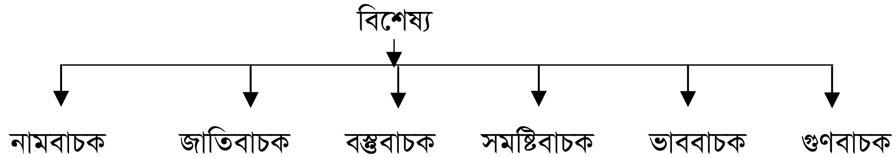

১. সংজ্ঞা বা নাম বাচক বিশেষ্য (Proper Noun): যে পদ দ্বারা ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থ বিশেষের নাম বিজ্ঞাপিত হয়, তাকে সংজ্ঞা বা নাম বাচক বিশেষ্য বলে। যেমন–

ব্যক্তির নাম : সারা, কনিকা, শিলা, মাসুদ, দেলোয়ার প্রভৃতি।

ভৌগোলিক অস্থানের নাম : কিশোরগঞ্জ, পটুয়াখালী, ঢাকা, আমেরিকা, লন্ডন প্রভৃতি।

ভৌগোলিক সংজ্ঞা : (নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি): করতোয়া, মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর প্রভৃতি।

গ্রন্থের নাম : কৃষ্ণকুমারী, অগ্নি-বীণা, গীতাঞ্জলি, পথের দাবী, সঞ্চিতা, সঞ্চয়িতা, বিশ্বনবী প্রভৃতি।

২. জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun) : যে পদ দ্বারা কোনো একজাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন– মানুষ, গরু, পাখি, পর্বত, নদী, ইংরেজ প্রভৃতি।

৩. বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য (Material Noun) : যে পদে কোনো উপাদানবাচক পদার্থের নাম বোঝায়, তাকে বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। এই জাতীয় বস্তুর সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। যথা– বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, পানি, লবণ প্রভৃতি।

৪. **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun) :** যে পদে ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়, তা–ই সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। যথা– সভা, জনতা, সমিতি, সমাজ, পঞ্চায়েত, মিছিল, ঝাঁক, বহর, দল ইত্যাদি।

৫. **ভাববাচক বিশেষ্য (Verbal Noun) :** যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যথা– যাওয়ার ভাব বা কাজ = গমন। তদ্রুপ : ভোজন, শয়ন, দর্শন, দেখা, শোনা প্রভৃতি। আবার ধাতুর বা প্রাতিপদিকের পর 'আই' প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য গঠিত হয়। √ চড় + আই = চড়াই, বড় + আই = বড়াই ইত্যাদি।

৬. **গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun) :** যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তা–ই গুণবাচক বিশেষ্য। যথা– মধুর মিষ্টত্বের গুণ = মধুরতা। তদ্রূপ : সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, তারুণ্য, তারল্য, তিক্ততা, সুখ, দুঃখ, উৎকর্ষ ইত্যাদি।

খ. বিশেষণ পদ

যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন– **ভাঙা** ঘর, **অন্ধকার** রাত, **চলন্ত** গাড়ি– এই উদাহরণগুলোর মধ্যে **ভাঙা, অন্ধকার, চলন্ত** পদগুলো বিশেষণ পদ। এগুলো ঘর, রাত, গাড়ি বিশেষ্য পদের পূর্বে বসে বিশেষ্য পদগুলোকে বিশেষিত করেছে। এ ধরনের উদাহরণগুলো হলো **বিশেষ্যের বিশেষণ**।

বিশেষণের প্রকারভেদ

বিশেষণ পদকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– নাম বিশেষণ এবং ভাব বিশেষণ। নাম বিশেষণকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– বিশেষ্যের বিশেষণ এবং সর্বনামের বিশেষণ। ভাব বিশেষণকে আবার চার ভাগে ভাগে করা যায় যথা– ক্রিয়া বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, অব্যয়ের বিশেষণ এবং বাক্যের বিশেষণ।

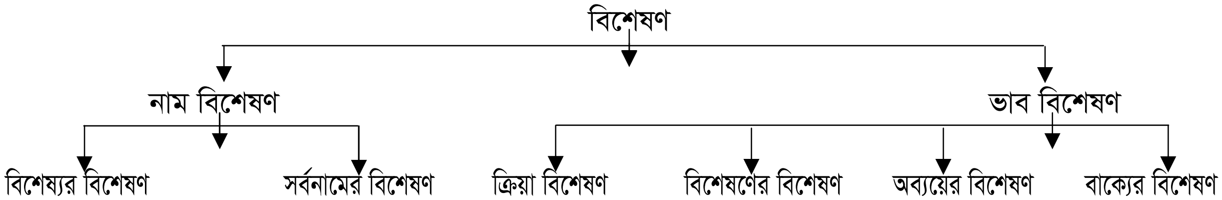

নাম বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যথা–

বিশেষ্যের বিশেষণ : সুস্থ সবল দেহকে কে না ভালবাসে ?

সর্বনামের বিশেষণ : সে **রূপবান** ও **গুণবান**।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ: নাম বিশেষণকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

- **রূপবাচক :** কালো মেঘ, নীল আকাশ, সবুজ মাঠ।
- **গুণবাচক :** দক্ষ কারিগর, ঠাণ্ডা হাওয়া, চৌকস লোক।
- **অবস্থাবাচক** : মোটা মেয়ে, রোগা ছেলে, তাজা মাছ, খোঁড়া পা।
- **সংখ্যাবাচক** : শ টাকা, হাজার লোক, দশ দশা।
- **ক্রমবাচক :** পঞ্চাশ পৃষ্ঠা, অষ্টম শ্রেণি, প্রথমা কন্যা।
- **পরিমাণবাচক** : এক কেজি চিনি, তিন কিলোমিটার রাস্তা, বিঘাটেক জমি, দশ শতাংশ ভূমি, হাজার টনী জাহাজ।
- **অংশবাচক** : ষোল আনা দখল, সিকি পথ, অর্ধেক সম্পত্তি।
- **উপাদানবাচক** : কাঠের জানালা, পাথরের মূর্তি, বেলে মাটি, মেটে কলসি।
- **প্রশ্নবাচক** : কেমন অবস্থা? কতদূর পথ?
- **নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক :** এই মেয়ে, ষোলই ডিসেম্বর ইত্যাদি।

বিশেষণ গঠন পদ্ধতি : বিভিন্নভাবে বিশেষণ গঠিত হতে পারে। যেমন–

- **ক্রিয়াজাত :** খাবার পানি, অনাগত দিন, হারানো সম্পতি।
- **অব্যয়জাত :** বড়লোক, আচ্ছা মানুষ, উপরি পাওনা।
- **সর্বনামজাত :** কোথাকার কে, কবেকার কথা, স্থায়ী সম্পত্তি।
- **সমাসসিদ্ধ :** জ্ঞানহারা, চৌচালা ঘর, বেকার, নিয়ম-বিরুদ্ধ।
- **বীপ্সামূলক :** ডুবুডুবু নৌকা, কাঁদকাঁদ চেহারা, হাসিহাসি মুখ।
- **অনুকার অব্যয়জাত :** টসটসে ফল, তকতকে মেঝে, কনকনে শীত, শনশনে হাওয়া, ধিকিধিকি আগুন।
- **কৃদন্ত :** অতীত কাল, জানাশোনা লোক, কৃতী সন্তান, পায়ে–চলা পথ, হৃত সম্পত্তি।
- **তদ্ধিতান্ত :** মেঠো পথ, জাতীয় সম্পদ, নৈতিক বল।
- **উপসর্গযুক্ত :** অপহৃত সম্পদ, নির্জলা মিথ্যে, নিখুঁত কাজ।
- **বিদেশি :** লাওয়ারিশ মাল, দরপত্তনি তালুক, লাখেরাজ সম্পত্তি, নাস্তানাবুদ অবস্থা।

ভাব বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তা–ই ভাব বিশেষণ। ভাব বিশেষণ চার প্রকার। যথা– ক্রিয়া বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ, অব্যয়ের বিশেষণ, বাক্যের বিশেষণ।

১. ক্রিয়ার বিশেষণ : যে পদ ক্রিয়া সংগঠনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাই ক্রিয়া বিশেষণ। যথা– বাতাস **ধীরে** বইছে। সে খুব **তাড়াতাড়ি** হাটল। **পরে** একবার এসো।

২. **বিশেষণীয় বিশেষণ** : যে পদ নাম-বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে বিশেষণীয় বিশেষণ বলে। যেমন– **সামান্য** একটু দুধ দাও, **অতিশয়** মন্দ কথা। রকেট **অতি** দ্রুত চলে।

৩. **অব্যয়ের বিশেষণ** : যে ভাব-বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে, তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যেমন– **ধিক্** তারে, **শত ধিক্** নির্লজ্জ যে জন।

৪. **বাক্যর বিশেষণ** : কখনো কখনো কোনো বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করতে পারে, তখন তাকে বাক্যে বিশেষণ বলা হয়। যেমন– **দুর্ভাগ্যক্রমে** প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। **বাস্তবিকই** আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

বিশেষণের অতিশায়ন

বিশেষণ পদ যখন দুইবা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তুলনায় একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন– যমুনা একটি **দীর্ঘ** নদী, **পদ্মা দীর্ঘতর**, কিন্তু মেঘনা বাংলাদেশের **দীর্ঘতম** নদী। সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে তুলনায় সূর্য **বৃহত্তম**, পৃথিবী চন্দ্রের চেয়ে **বৃহত্তর** এবং চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা **ক্ষুদ্রতর**।

তৎসম শব্দের অতিশায়ন

- তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে 'তর' এবং বহুর মধ্যে 'তম' প্রত্যয় যুক্ত থাকে। যেমন– দীর্ঘ–দীর্ঘতর–দীর্ঘতম।
- দুয়ের মধ্যে তুলনায় 'ঈয়স্' প্রত্যয় এবং বহুর মধ্যে তুলনায় 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হয়।
  লঘু– লঘিয়ন (দুয়ের তুলনায়) –লঘিষ্ঠ (বহুর তুলনায়),
  বৃদ্ধ– জ্যায়ান (দুয়ের তুলনায়) –জ্যেষ্ঠ (বহুর তুলনায়),
  শ্রেয়– শ্রেয়ান(দুয়ের তুলনায়) –শ্রেষ্ঠ (বহুর তুলনায়),
  অল্প– কনীয়ান(দুয়ের তুলনায়) – কনিষ্ঠ (বহুর তুলনায়)।

বাংলা শব্দের অতিশায়ন

- বাংলা শব্দের দুইয়ের মধ্যে অতিশায়নে চাইতে, চেয়ে, হইতে, হতে, অপেক্ষা, থেকে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা– গরুর **থেকে** ঘোড়ার দাম বেশি। **বাঘের চেয়ে** সিংহ বলবান।
- কখনো কখনো শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি– চেয়ে, থেকে প্রভৃতি শব্দের কার্যসাধন করে। যেমন– এ মাটি **সোনার** বাড়া।
- অতিশায়নে জোর দিতে বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম, অধিকতর প্রভৃতি বিশেষণীয় বিশেষণ যোগ করতে হয়। যথা– ঘিয়ের চেয়ে দুধ বেশি উপকারী।
- বহুর মধ্যে অতিশায়নের ক্ষেত্রে সবচাইতে, সবচেয়ে, সবথেকে, সর্বাপেক্ষা, সর্বাধিক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার হয়, যথা– ভাইদের মধ্যে রাকিবই **সবচাইতে** বিচক্ষণ।
- 'ঈয়স্' প্রত্যয়ান্ত কোনো কোনো শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ বাংলায় প্রচলিত আছে। যেমন– ভূয়সী প্রশংসা।

বাংলা ভাষায় একই পদ বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন–

পদ	বিশেষণ রূপে	বিশেষ্য রূপে
ভালো	**ভালো** বাড়ি পাওয়া কঠিন।	আপন **ভালো** সবাই চায়।
মন্দ	**মন্দ** কথা বলতে নেই।	এখানে কী **মন্দটা** তুমি দেখলে?
পুণ্য	তোমার এ **পূণ্য** প্রচেষ্টা সফল হোক।	**পুণ্যে** মতি হোক।
নিশীথ	**নিশীথ** রাতে বাজছে বাঁশি।	গভীর **নিশীথে** প্রকৃতি সুপ্ত।
শীত	**শীতকালে** কুয়াশ পড়ে।	**শীতের** সকালে চারদিকে কুয়াশায় অন্ধকার।
সত্য	**সত্য** পথে থেকে **সত্য** কথা বলবে।	এ এক বিরাট **সত্য**।

গ. সর্বনাম পদ

বিশেষ্যর পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে। যেমন– রাহাত ভালো ছেলে। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। উপর্যুক্ত উদাহরণের দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'সে' শব্দটি রাহাতের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। 'সে' হলো সর্বনাম।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ

বাক্যে বিভিন্নরূপে সর্বনাম পদের ব্যবহার হয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

- **ব্যক্তি বা পুরুষবাচক :** আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা।
- **আত্মবাচক :** স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।
- **সামীপ্যবাচক :** এ, এই, ইহারা, ইনি ইত্যাদি।
- **দূরত্ববাচক :** ঐ, ঐসব, সব।
- **সাকল্যবাচক :** সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ।
- **প্রশ্নবাচক :** কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে।
- **অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক :** কোন, কেহ, কেউ, কিছু।
- **ব্যতিহারিক :** আপনা আপনি, নিজে নিজে, পরস্পর ইত্যাদি।
- **সংযোগজ্ঞাপক :** যে, যিনি, যাঁরা, যারা, যাহারা ইত্যাদি।
- **অন্যাদিবাচক :** অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

সর্বনামের পুরুষ

'পুরুষ' একটি পারিভাষিক শব্দ। বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ারই পুরুষ আছে। বিশেষণ ও অব্যয়ের পুরুষ নেই। ব্যাকরণে পুরুষ তিন প্রকার। যথা– **উত্তম পুরুষ** (স্বয়ং বক্তাই উত্তম পুরুষ), **মধ্যম পুরুষ** (প্রত্যক্ষভাবে উদ্দীষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাই মধ্যম পরুষ) ও **নাম পুরুষ** (অনুপস্থিত অথবা পরোভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীই নাম পুরুষ)। ব্যক্তিবাচক সর্বনামের রূপ নিচে উপস্থাপিত হলো :

পুরুষভেদে ব্যক্তিবাচক সর্বনামগুলোর রূপ–

রূপ	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	নাম পুরুষ
সাধারণ	আমি, আমরা, আমাকে, আমাদিগকে, আমার, আমাদের; কবিতায়: মোর, মোরা	তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদিগকে, তোমার, তোমাদের	সে, তারা, তাহারা, তাকে, তাহাকে
সম্ভ্রমাত্মক		আপনি, আপনারা, আপনাকে, আপনার, আপনাদের	তিনি, তাঁরা, তাঁহারা, তাঁদের, তাঁহাদের, তাঁহাকে, তাঁকে, ইনি, এঁর, এঁরা, ইঁহাদের, এঁদের, ইঁহাকে, এঁকে, উনি, ওঁর, ওঁরা, ওঁদের
তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠতা-জ্ঞাপক			ইহা, ইহারা, এই, এ, এরা, উহা, উহারা, ও, ওরা, ওদের

সর্বনামের বিভক্তিগ্রাহী রূপ

বাংলা সর্বনামসূহ কর্তৃকারক ভিন্ন অন্যান্য কারকে বিভক্তিযুক্ত হওয়ারপূর্বে একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। সর্বনামের এ রূপটিকে বিভক্তিগ্রাহী রূপ বলা হয়। কর্তৃকারকে সর্বনামের মূল রূপটিই ব্যবহৃত হয় এবং একে প্রথমা বিভক্তিযুক্ত একবচন ধরা হয়।

	কর্তৃকারকে প্রথমার একবচন		**অন্যান্য কারকে বিভক্তিগ্রাহী রূপ**	
সাধারণ	সম্ভ্রমাত্মক	তুচ্ছার্থক	সম্ভ্রমাত্মক	তুচ্ছার্থক
আমি	X	X	X	X
তুমি	আপনি	তুই	আপনা	তোমা, তোর
সে	তিনি	X	তাঁহা, তাঁ	তাহা, তা
যে	যিনি	X	যাঁহা, যাঁ	যাহা, যা
X	ইনি	এ	ইঁহা, এঁ	ইহা, এ
X	উনি	উহা	উঁহা, ওঁ	উহা, ও
কে, কি, কী	X	কে, কি, কী	X	কাহা, কা

জ্ঞাতব্য

১. ক. চলিত ভাষায়– (ক) তুচ্ছার্থে তাহা স্থানে তা, যাহা স্থানে যা, কাহা স্থানে কা, ইহা স্থানে এ, উহা স্থানে ও আদেশ হয়।
   খ. সম্ভ্রমার্থে এগুলোর সাথে একটি চন্দ্রবিন্দু সংযোজিত হয়, যথা– তাহা + দের = তাহাদের (সাধু) >তাদের (চলিত)। (সম্ভ্রমার্থে) তাঁহা + দের = তাঁহাদের (সাধু) > তাঁদের (চলিত)।
২. করণ কারকে অনুসর্গ ব্যবহারের পূর্বে মূল সর্বনাম শব্দের সঙ্গে র, এর, বা কে বিভক্তি যোগ করে নিতে হবে। যেমন– তাহাকে দিয়া, তাকে দিয়ে, তাহার দ্বারা, তার দ্বারা, আমাকে দিয়ে।
৩. ষষ্ঠী বিভক্তি অর্থে ঈয়–প্রত্যয়যুক্ত সর্বনমজাত বিশেষণ শুধু তৎসম সর্বনামের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, যথা– মৎ + ঈয় = মদীয়, ভবৎ + ঈয় = ভবদীয়, তৎ + ঈয় = তদীয়।
৪. 'কী' সর্বনামটি কোনো কোনো কারকে 'কিসে' বা (ষষ্ঠী বিভিক্তিযুক্ত হয়ে) 'কীসের' রূপ গ্রহণ করে, যথা– কী + দ্বারা = কীসের দ্বারা, কী + থেকে = কীসে থেকে, কীসের থেকে।

সর্বনামের বিশিষ্ট প্রয়োগ

১. বিনয় প্রকাশে উত্তম পুরুষের এক বচনে দীন, অধম, বান্দা, সেবক, দাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা– **'আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে'**। **'দীনের আরজ'**।
২. ছন্দবদ্ধ কবিতায় সাধারণত 'আমার' স্থানে মম, 'আমাদের' স্থানে মোদের এবং 'আমার' স্থানে মোর ব্যবহৃত হয়। যেমন– 'কে বুঝিবে ব্যথা **মম**'। '**মোদের** গরব, **মোদের** আশা, আ মরি! বাংলা ভাষা'।'ক্ষুদ্র শিশু **মোরা**, করি **তোমারি** বন্দনা'।
৩. উপাস্যের প্রতি সাধারণত 'আপনি' স্থানে তুমি প্রযুক্ত হয়। যেমন– (উপাস্যের প্রতি ভক্ত) 'প্রভু, **তুমি** রক্ষা কর এ দীন সেবকে।'
৪. অভিনন্দনপত্র রচনায়ও অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিকে 'তুমি' সম্বোধন করা হয়।
৫. তুমি : ঘনিষ্ঠজন, আপনজন বা সমবয়স্ক সাথীদের প্রতি ব্যবহার্য।
   তুই : তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়, ঘনিষ্ঠতা বোঝাতেও আমরা তাই ব্যবহার করি।

ঘ. অব্যয় পদ

ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। অর্থাৎ যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের/বাক্যাংশের/বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে। অব্যয়ের সাথে কোনো বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হয় না, সেগুলোর একবচন বা বহুবচন হয়

না এবং সেগুলোর স্ত্রী ও পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না। অন্যভাবে বলা যায়, যে পদে বচনে-লিঙ্গে-বিভক্তিতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না, তা অব্যয়। বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে, যথা–

- **বাংলা অব্যয় শব্দ :** আর, আবার, ও, হ্যাঁ, না ইত্যাদি।
- **তৎসম অব্যয় শব্দ :** এবং, সুতরাং, যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত ইত্যাদি।
- **বিদেশি অব্যয় শব্দ :** আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।

অব্যয় শব্দের গঠন

বিবিধ উপায়ে অব্যয় শব্দ গঠিত হতে পারে। যথা–

১. **একটিমাত্র বর্ণ বা শব্দখণ্ড বা শব্দ দ্বারা :** তো, বটে, হু, হা ইত্যাদি।
২. **একাধিক অব্যয় শব্দযোগে :** কদাপি, নতুবা, অতএব, অথবা ইত্যাদি।
৩. **আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশক একই শব্দের দুইবার প্রয়োগ :** ছি ছি, ধিক্ ধিক্, বেশ বেশ ইত্যাদি।
৪. **দুটি ভিন্ন শব্দযোগে :** মোটকথা, হয়তো, যেহেতু, নইলে ইত্যাদি।
৫. **অনুকার শব্দযোগে :** কুহু কুহু, গুন গুন, ঘেউ ঘেউ, শন শন, ছল ছল, কন কন ইত্যাদি।
৬. **তৎসম প্রত্যয়ের সাথে 'ত' প্রত্যয় যোগ করে :** ধর্মত, প্রথমত, স্পষ্টত ইত্যাদি।

অব্যয়ের প্রকারভেদ

অব্যয় প্রধানত চার প্রকার। যথা–

১. **সম্বন্ধবাচক বা সমুচ্চয়ী :** যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে। সমুচ্চয়ী অব্যয় তিন প্রকার। যথা–

ক. সংযোজক অব্যয় : সংযোজক অব্যয়গুলো হলো– ও, এবং, তাই, আর, অধিকন্তু, সুতরাং ইত্যাদি। যেমন– সে রূপবান **ও** গুণবান।

খ. বিয়োজক অব্যয় : বিয়োজক অব্যয়গুলো হলো– কিংবা, বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো, কিন্তু (ক্ষেত্রবিশেষে) ইত্যাদি। যেমন– লেখা পড়া কর, **নতুবা** ফেল করবে। মন্ত্রের সাধন **কিংবা** শরীর পাতন।

গ. সংকোচক অব্যয় : সংকোচক অব্যয়গুলো হলো– অথচ, কিন্তু, বরং ইত্যাদি। যেমন– তিনি বিদ্বান **অথচ** সৎ ব্যক্তি নন।লোকটি দরিদ্র **কিন্তু** সৎ।

অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে, যদি, যদিও, যেন, প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সংযোজক অব্যয়ের কাজ করে থাকে বলে এগুলোকে অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। যেমন– আজ যদি (শর্তবাচক) পারি, একবার সেখানে যাব। তিনি এত পরিশ্রম করেন যে তার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা আছে। এভাবে চেষ্টা করবে যেন কৃতকার্য হতে পার প্রভৃতি।

২. **অনন্বয়ী অব্যয় :** যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীন ভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন–

- **উচ্ছ্বাস প্রকাশে : মরি মরি**! কী রূপমাধুরী!
- **স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে :হ্যাঁ,** আমি যাব। না, আমি যাব না।
- **সম্মতি প্রকাশে :** আমি আজ **আলবত** যাব। **নিশ্চই** পারব।
- **অনুমোদন বাচকতায় :** আপনি যখন বলছেন, **বেশ তো** আমি যাব।
- **সমর্থনসূচক জবাবে :** আপনি যা জানেন তা **তো** ঠিকই বটে।
- **যন্ত্রণা প্রকাশে : উঃ**! পায়ে বড্ড লেগেছে। **নাঃ**। এ কষ্ট অসহ্য।
- **ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে :** 'পথের কুকুরটি যে পিছনে লেগেই রয়েছে, **কী** বিপদ'। **ছিঃ** এমন কাজ তোর!
- **সম্বোধনে : 'ওগো,** আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।'
- **সম্ভাবনায় :** 'সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, **পাছে** লোকে কিছু বলে।'

- **বাক্যালংকার অব্যয় :** কতগুলো অব্যয় শব্দ বাক্যের শোভা বর্ধনে ব্যবহৃত হয়, এদের বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যেমন– এক **যে** ছিল রাজা। **কত না** হারানো স্মৃতি জাগে আজও মনে। '**হায়রে** ভাগ্য, **হায়রে** লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।'

৩. **অনুসর্গ অব্যয় :** যে সকল অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাদের অনুসর্গ অব্যয় বলে। যেমন– ধন **অপেক্ষা** মান বড় ('অপেক্ষা' অনুসর্গ অব্যয়)। ওকে **দিয়ে** এ কাজ হবে না ('দিয়ে' অনুসর্গ অব্যয়)। অনুসর্গ অব্যয় দুই প্রকার। যথা– বিভক্তিসূচক অব্যয় এবং বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত অনুসর্গ।

৪. **অনুকার/ধ্বন্যাত্মক অব্যয় :** যে অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার বা ধ্বনাত্মক অব্যয় বলে। অর্থাৎ ধ্বনির অনুকরণে যে অব্যয় হয়ে উঠেছে তাকে ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বা অনুকার অব্যয় বলে। যেমন–

১. মানুষের ধ্বনির অনুকার

- ভেউ ভেউ (মানুষের উচ্চস্বরে কান্নার ধ্বনি), ট্যা ট্যা, হি হি।

২. জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকার

- সিংহের গর্জন– গর গর
- ঘোড়ার ডাক– চিঁহি চিঁহি
- কুকুরের ধ্বনি–ঘেউ ঘেউ
- বিড়ালের ডাক– মিউ মিউ
- কাকের ডাক– কা কা
- কোকিলের রব – কুহু কুহু
- পাখির/বানরের শব্দ–কিচির মিচির

৩. বস্তুর ধ্বনির অনুকার

- বজ্রের ধ্বনি– কড় কড়
- বৃষ্টির তুমুল শব্দ– ঝম ঝম
- স্রোতের ধ্বনি– শন শন
- শুষ্ক পাতার শব্দ– মর মর
- নূপুরের আওয়াজ– রুম ঝুম
- মেঘের গর্জন– গুড় গুড়
- চুড়ির শব্দ– টুং টুং
- শুষ্ক পাতার শব্দ– মর মর
- বাতাস প্রবাহের শব্দ– হু হু
- ধান কাটার শব্দ– ঘচাঘচ
- গাছ ভেঙ্গে পড়ার শব্দ– মড় মড়
- বাতাসের গতি– শন শন
- বৃষ্টি পতনের শব্দ– টাপুর টুপুর

৪. অনুভূতিজাত কাল্পনিক

- শরীরের অস্বাভাবিক ভাব জ্ঞাপক– কুট কুট
- ঔজ্জ্বল্য– ঝিকিমিকি
- শূন্যতাবাচক– খাঁ খাঁ
- প্রখরতাবাচক– ঝাঁ ঝাঁ
- রোদের তীব্রতা– ঠা ঠা

এরূপ– কট কট, কচকচ, খট খট, চক চক, ছম ছম, ঝি ঝি, ঝাঁ ঝাঁ, ঝিম ঝিম, ঝল মল, টল মল, টন টন, পিট পিট, মিন মিন, সাঁ সাঁ, খট খট ইত্যাদি।

একই অব্যয় শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

অব্যয় শব্দ	**যে অর্থে ব্যবহৃত**	**উদাহরণ**
কী/কি	জিজ্ঞাসায়	তুমি কি বাড়ি যাচ্ছ? তুমি কি আমায় চেন?
	বিরক্তি প্রকাশে	কী ঘেন্না!। কী বিপদ, লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
	সাকল্য অর্থে	কি ধনী কি গরিব সবাইকে মরতে হবে।
	সংশয়	তুমি কি কথাটি শুনেছ?
	বিড়ম্বনা প্রকাশে	তোমাকে নিয়ে কী মুশকিলেই না পড়লাম।
না	নিষেধ অর্থে	ওকে ডেক না। এখন যেও না।
	বিকল্প প্রকাশে	তুমি কী খাবে–কলা না আম?
	আদর প্রকাশে বা অনুরোধে	আর একটি আপেল খাওনা খোকা। আর একটা গান গাও না।
	সম্ভাবনায়	তিনি না কি ঢাকায় যাবেন?
	বিস্ময়ে	কি না কি ব্যাপার!
	তুলনায়	ছেলে তো না, যেন একটা হিটলার।
	ক্রোধ প্রকাশে	তুই কি কাজ করবি, না মার খাবি?
	হ্যা–সূচক	তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে?
	প্রশ্ন	তুই না ফেল করেছিস?
আর	পুনরাবৃত্তি	আর না, যথেষ্ট হয়েছে। ও দিকে আর যাব না।
	নির্দেশ	বল, আর কী চাও?
	হতাশা/নিরাশায়	তা কি আর জন্মেও হবে। সে দিন কি আর আসবে?
	বাক্যালংকার	মানে, একটি তামাশা আর কি। আর কি বাজবে বাঁশি।
	গোপনীয়তা	শুধু তুমি আর আমি যাব।
যেন	উপমায়	চোখ তো নয় যেন ডিম। মুখ যেন পদ্মফুল।
	প্রার্থনায়	‘দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।’ খোদা যেন তোমার মঙ্গল করেন।
	তুলনায়	ইস্, ঠাণ্ডা যেন বরফ।
	অনুমানে	মেঘ দেখ, যেন বৃষ্টি হবে। লোকটা যেন আমার পরিচিত মনে হলো।
	সতর্কীকরণে/সাবধানতা	সাবধানে চল, যেন পা পিছলে না পড়।
	ব্যঙ্গ প্রকাশে	ছেলে তো নয় যেন ননীর পুতুল।
	আশীর্বাদ	ও যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসে।
	ক্রম	ওরা যেন আমাকে আর না ডাকে।
ও	সংযোগ	তুমি ও আমি যাব।
	সম্ভাবনা	আজ বৃষ্টি হতে পারে।
	তুলনায়	ওকে বলাও যা, না বলাও তা।
	স্বীকৃতি	হ্যাঁ, তুমিও যাবে।
	হতাশা	এত চেষ্টাতেও হলো না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. পদ বলতে বোঝায়–

ক. বিভক্তিযুক্ত শব্দের পদ
খ. ধাতুর সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত হয়ে গঠিত পদ
গ. বাক্যে ব্যবহৃত যে কোনো শব্দ পদ
ঘ. বাক্যে ব্যবহৃত অবস্থান পরিচায়ক চিহ্নযুক্ত শব্দের নাম পদ

২. পদ কয় প্রকার?

ক. পাঁচ প্রকার
খ. দুই প্রকার
গ. তিন প্রকার
ঘ. চার প্রকার

৩. প্রাতিপদিকের সঙ্গে নাম বিভক্তি যুক্ত হয়ে গঠিত হয়–

ক. ক্রিয়া বিভক্তি
খ. কারক বিভক্তি
গ. নামপদ
ঘ. বিশেষণ

৪. কোন কিছুর নামকে বলা হয়–

ক. বস্তুবাচক বিশেষ্য
খ. জাতিবাচক বিশেষ্য
গ. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য
ঘ. বিশেষ্য

৫. বিশেষ্য পদ কত প্রকার?

ক. দুই প্রকার
খ. সাত প্রকার
গ. পাঁচ প্রকার
ঘ. চার প্রকার

৬. বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয়–

ক. বিশেষণ পদ
খ. সর্বনাম পদ
গ. বিশেষণের বিশেষণ
ঘ. অব্যয় পদ

৭. ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যোগে গঠিত হয়–

ক. ক্রিয়া বিভক্তি
খ. বিশেষণ পদ
গ. ক্রিয়া পদ
ঘ. বাংলা ক্রিয়া পদ

৮. যে সকল অব্যয় অব্যক্ত শব্দের অনুকরণ করে তাকে বলা হয়–

ক. অনুকারক অব্যয়
খ. সংযোজক অব্যয়
গ. সঙ্কোচক অব্যয়
ঘ. প্রশ্নসূচক অব্যয়

৯. যে ক্রিয়া কর্ম সম্পাদনের যোগ্যতা রাখে না, তার নাম–

ক. অসমাপিকা ক্রিয়া
খ. অকর্মক ক্রিয়া
গ. দ্বিকর্মক ক্রিয়া
ঘ. সকর্মক ক্রিয়া

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. পদ কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী আলোচনা করুন।
২. বিশেষ্য পদ কী? বিশেষ্যপদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।
৩. বিশেষণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪. সর্বনাম পদ কী? সর্বনাম পদের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করুন।
৫. অব্যয় সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
৬. **সংজ্ঞা লিখুন :** পদ, প্রতিপাদিক পদ, ক্রিয়া পদ। সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, অব্যয় পদ, বিশেষ্য পদ।

উত্তরমালা : ক.

১. ঘ ২. খ ৩. গ ৪. গ ৫. গ ৬. খ ৭. গ ৮. ক ৯. খ

পাঠ-৪.২ : ক্রিয়াপদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ক্রিয়াপদ কী তা বলতে পারবেন।
- ক্রিয়া পদের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- ক্রিয়াপদের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ক্রিয়ার ভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বাক্য তৈরির জন্য ক্রিয়াপদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। যে কোনো বাক্যে ক্রিয়াপদ থাকবেই। তবে কখনও কখনও হয়ত তার চেহারা চোখে পড়ে না, তার সাহচর্য মেলে আড়ালে। যেমন– রহিম ভালো ছেলে। এখানে ক্রিয়াপদটি উহ্য, রহিম হয় ভালো ছেলে– এমন লেখা হলে 'হ' ধাতু থেকে তৈরি ক্রিয়াপদটি লক্ষ্যযোগ্য হত। কিন্তু বাক্য গঠনে 'হয়' ক্রিয়াপদটির প্রয়োজন নেই। ক্রিয়া বর্তমানকালে প্রায়ই উহ্য থাকে। বাক্যে সাধারণত 'হ্' এবং 'আছ্' ধাতু দ্বারা গঠিত ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে।

ক্রিয়াপদ

যে পদ দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদনা করা বুঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, বাক্যের অন্তর্গত যে পদ দ্বারা কোনো পুরুষ কর্তৃক নির্দিষ্ট কালে কোনো কার্যের সংঘটন বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন–

- সুজন বই পড়ছে।
- তোমরা আগামী দিনে কলেজে ভর্তি হবে।

উপর্যুক্ত প্রথম উদাহরণে নাম পুরুষ 'সুজন' কর্তৃক বর্তমান কালে 'পড়া' কার্যের সংঘটন প্রকাশ করছে। দ্বিতীয় উদাহরণে মধ্যম পুরুষ 'তোমরা' ভবিষ্যতে ভর্তি হওয়া ক্রিয়া সংঘটনের সম্ভাবনা প্রকাশ করছে।

ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্য

- বাক্য গঠনের জন্য ক্রিয়াপদ অপরিহার্য।
- যে কোনো বাক্যে ক্রিয়াপদ থাকবেই।
- ক্রিয়াপদ কখনো কখনো বাক্যে উহ্য বা অনুক্ত থাকতে পারে। একে অনুক্ত ক্রিয়াপদ বলে। যেমন– আজ প্রচণ্ড শীত = আজ প্রচণ্ড শীত (**অনুভূত হয়**), ইনি আমার বড় বোন = ইনি আমার বড় বোন (**হন**)ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদের গঠন

ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে পুরুষ অনুযায়ী কালসূচক ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদ গঠন করতে হয়। আমরা জানি পড়া, খাওয়া, করা, যাওয়া–এগুলো ক্রিয়াবাচক শব্দ। 'পড়' ক্রিয়া– শব্দটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দাঁড়ায়–

পড়্ + 'আ'; এখানে 'পড়্' হলো মূল অংশ বা 'ধাতু' আর 'আ' হলো বিভক্তি। অর্থাৎ ক্রিয়াপদের দুটি অংশ– ধাতু ও বিভক্তি।

ক্রিয়ার প্রকারভেদ

বিভিন্নভাবে ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। যেমন–

ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়া পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ক. সমাপিকা ক্রিয়া এবং খ. অসমাপিকা ক্রিয়া।

ক্রিয়া

সমাপিকা ক্রিয়া　　　　　　　　　　অসমাপিকা ক্রিয়া

ক. সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের বা বক্তার মনোভাবের পরিসমাপ্তি হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন– আমি ভাত **খাচ্ছি**। মেয়েরা খেলা **করছে**।

খ. অসমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন– আমি ভাত **খেয়ে**---। এখানে 'খেয়ে' ক্রিয়াপদ দ্বারা কথা শেষ হয়নি; কথা সম্পূর্ণ করতে আরো শব্দের প্রয়োজন। বাক্য দুটি সম্পূর্ণ করলে দাঁড়াবে– আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব। এখানে 'খেয়ে' অসমাপিকা ক্রিয়া এবং 'যাব' সমাপিকা ক্রিয়া।

বিবিধ অর্থে ক্রিয়াপদের শ্রেণিভাগ

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পাশাপাশি বিবিধ অর্থে ক্রিয়াকে আরো কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক্রিয়া

অকর্মক　সকর্মক　দ্বিকর্মক　প্রযোজক ক্রিয়া　যৌগিক ক্রিয়া　মিশ্র ক্রিয়া

১. সকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্ম পদ আছে তা-ই সকর্মক ক্রিয়া। ক্রিয়ার সাথে কী বা কাকে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা–ই ক্রিয়ার কর্মপদ। কর্মপদযুক্ত ক্রিয়াই সর্কমক ক্রিয়া। যেমন–বাবা আমাকে একটা বই কিনে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : কী দিয়েছেন? উত্তর : বই (কর্মপদ)।

প্রশ্ন : কাকে দিয়েছেন? উত্তর : আমাকে (কর্মপদ)।

কাজেই 'দিয়েছেন' ক্রিয়াপদটির কর্ম পদ থাকায় এটি সকর্মক ক্রিয়া।

২. অকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্ম নেই, তা অকর্মক ক্রিয়া। যেমন– ছেলেটি হাসে। কী 'হাসে' বা 'কাকে হাসে' প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর হয় না। কাজেই 'হাসে' ক্রিয়াটি অকর্মক ক্রিয়া।

৩. দ্বিকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দুটো কর্মপদ থাকে, তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্ম পদটিকে মুখ্য বা প্রধান কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্ম পদটিকে গৌণ কর্ম বলে। যেমন– বাবা আমাকে একটি কলম দিয়েছেন। এই বাক্যে 'কলম' (বস্তু) মুখ্যকর্ম এবং 'আমাকে' (ব্যক্তি) গৌণ কর্ম।

সমধাতুজ কর্ম : বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে সমধাতুজ কর্ম বা ধাত্বর্থক কর্মপদ বলে। যেমন– আর কত **খেলা** খেলবে।

√ খেল্ + আ = খেলা (কর্মপদ)　　　　√ খেল্ + বে = খেলা (ক্রিয়াপদ)

মূল 'খেল' ধাতু থেকে ক্রিয়াপদ 'খেলবে' এবং কর্মপদ 'খেলা' উভয় গঠিত হয়েছে। তাই 'খেলা' পদটি সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক কর্ম। অনেক ক্ষেত্রে সমধাতুজ কর্মপদ অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক করে। যেমন–

- বেশ এক **ঘুম** ঘুমিয়েছি।
- আর **মায়াকান্না** কেঁদো না গো বাপু।
- এমন সুখের **মরণ** কে মরতে পারে?

সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মকরূপ : প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যে সকর্মক ক্রিয়াও অকর্মক হতে পারে। যেমন–

অকর্মক : আমি রাতে খাব না। **সকর্মক :** আমি রাতে ভাত খাব না।

অকর্মক : আমি চোখে দেখি না। **সকর্মক :** আকাশে চাঁদ দেখি না।

৩. প্রযোজক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া এক জনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। প্রযোজক ক্রিয়াকে সংস্কৃত ব্যাকরণে ণিজন্ত ক্রিয়া বলা হয়।

প্রযোজক কর্তা : যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে, তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।

প্রযোজ্য কর্তা : যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন–

প্রযোজক কর্তা	**প্রযোজ্য কর্তা**	**প্রযোজক ক্রিয়া**
শিলা	আবিরকে	পড়াচ্ছে
মা	শিশুকে	চাঁদ দেখাচ্ছেন
সাপুড়ে	সাপ	খেলায়
(তুমি)	খোকাকে	কাঁদিও না

জ্ঞাতব্য : প্রযোজক ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত হলে অকর্মক প্রযোজক ক্রিয়া সকর্মক হয়।

প্রযোজক ক্রিয়ার গঠন : প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু = মূল ক্রিয়ার ধাতু + আ। যেমন– মূল ধাতু √ হাস্ + আ = হাসা (প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু)। হাসা + চ্ছেন বিভক্তি = হাসাচ্ছেন (প্রযোজক ক্রিয়া)।

৪. নাম ধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া : ক্রিয়ার মূলকে বলা হয় ধাতু। বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পর 'আ' প্রত্যয়যোগে যে সব ধাতু গঠিত হয়, সেগুলোকে নাম ধাতু বলা হয়।

- বেত (বিশেষ্য) + আ (প্রত্যয়) = বেতা। যথা– শিক্ষক ছাত্রটিকে বেতাচ্ছেন (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।
- বাঁকা (বিশেষণ) + আ (প্রত্যয়) = বাঁকা (নামধাতু), যথা– কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধর।
- ধ্বনাত্মক অব্যয় : কন কন –দাঁতটি ব্যথায় কনকনাচ্ছে। ফোঁস– অজগরটি ফোঁসাচ্ছে।

আ–প্রত্যয় যুক্ত হয়েও কয়েকটি নামধাতু বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুর মতো ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ছাপা– আমর বন্ধু বইটা **ছেপেছে**।

ফল– বাগানে বেশ কিছু লিচু **ফলেছে**।

টক– তরকারি বাসি হলে **টকে**।

৫. যৌগিক ক্রিয়া : একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন–

তাগিত দেওয়া অর্থে : ঘটনাটা **শুনে রাখ**।

নিরন্তরতা অর্থে : তিনি **বলতে লাগলেন**।

কার্যসমাপ্তি অর্থে : ছেলে মেয়েরা **শুয়ে পড়ল**।

আকস্মিকতা অর্থে : সাইরেন **বেজে উঠল**।

অভ্যস্ততা অর্থে : শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত **হয়ে থাকে**।

অনুমোদন অর্থে : এখন **যেতে পার**।

৬. মিশ্র ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, হ্, দে, পা, যা, কাট্, গা, ছাড়, ধর্, মার্ প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন–

বিশেষ্যের পরে : আমরা তাজমহল **দর্শন করলাম**। ছেলেটি **গোল্লায় গেছে**।

বিশেষণের পরে : তোমাকে দেখে বিশেষ **প্রীত হলাম**।

ধ্বনাত্মক অব্যয়ের পরে : মাথা ঝিম ঝিম্ করছে। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

ক্রিয়ারভাব (Mood)

ক্রিয়ার যে অবস্থা দ্বারা কার্য ঘটার ধরন, প্রকার বা রীতি প্রকাশ পায়, তাকে ক্রিয়ার ভাব বলে। অর্থাৎ ক্রিয়ার কাজ যেভাবে প্রকাশিত হয় তাকে 'ক্রিয়ার ভাব' বলে। যেমন–

মহিউদ্দীন এখানে **আসে**।

যদি মহিউদ্দীন **আসে**, তবে আমার সাথে দেখা করবে।

রিসাদ, এখানে **এসো**।
আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন।

ক্রিয়ার ভাবের প্রকারভেদ

ক্রিয়ার ভাব বা ধরন চার প্রকার। যথা–

ক. নির্দেশক বা অবধারক ভাব
খ. অনির্দেশক বা সংযোজক বা ঘটান্তরাপেক্ষিত ভাব
গ. অনুজ্ঞা বা আজ্ঞাদ্যোতক ভাব এবং
ঘ. আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব।

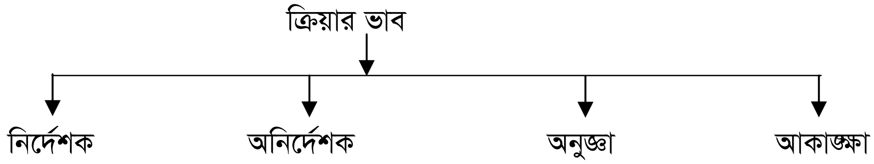

ক. নির্দেশক ভাব: ক্রিয়ার যে অবস্থা কোনো কার্য ঘটার সাধারণ নির্দেশ বা ধারণা দেয়, তাকে ক্রিয়ার নির্দেশক ভাব বলে। যেমন–

- সাধারণ ঘটনা নির্দেশ : সে আসে। তারা খায় না।
- প্রশ্ন জিজ্ঞাসা : তুমি কি ভালো আছো?

খ. অনির্দেশক ভাব : একই বাক্য এক ক্রিয়ার কাজ আর এক ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল রয়েছে এমন ভাব প্রকাশ করলে ক্রিয়ার অনির্দেশক ভাব হয়। যেমন– যদি সে আসে তবে আমি যাব। আজ বাবা বেঁচে থাকলে আমার কষ্ট হতো না।

গ. অনুজ্ঞা ভাব : আদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, প্রার্থনা, অনুনয় প্রভৃতি অর্থে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে মধ্যম পুরুষে ক্রিয়াপদের যে রূপ হয় তাকে অনুজ্ঞা পদ বলে।

- উত্তম পুরুষের অনুজ্ঞা পদ হতে পারে না। কারণ, কেউ নিজেকে আদেশ করতে পারে না।
- অপ্রত্যক্ষ বলে নাম পুরুষের অনুজ্ঞা হয় না। তবে এই মত সকলে সমর্থন করেন না।

বর্তমান কাল অনুজ্ঞা

আদেশ : কাজটি করে ফেল। তোমরা এখন যাও।
উপদেশ : সত্য কথা গোপন করো না। কড়া রোদে ঘোরাফেরা করিস না।
অনুরোধ : আমার কাজটা এখন কর। অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না।
প্রার্থনা : আমার দরখাস্তটা পড়ুন।
অভিশাপ : মর, পাপিষ্ঠ।

ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা

আদেশ : সদা সত্য কথা বলবে।
সম্ভাবনায় : চেষ্টা কর, সবই বুঝতে পারবে।
বিধান অর্থে : রোগ হলে ওষুধ খাবে।
অনুরোধে : কাল একবার এসো।

ঘ. আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব : যে ক্রিয়াপদের বক্তা সোজাসুজি কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, তাকে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাবের ক্রিয়া বলা হয়। যেমন– সে যাক। যা হয় হোক। সে একটু হাসুক। বৃষ্টি আসে আসুক। তার মঙ্গল হোক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি লিখুন:

১. যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ হয় তার নাম—

ক. অসমাপিকা ক্রিয়া খ. সমাপিকা ক্রিয়া
গ. যৌগিক ক্রিয়া ঘ. সকর্মক ক্রিয়া

২. যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্য শেষ হয় না তার নাম

ক. সমাপিকা ক্রিয়া খ. অসমাপিকা ক্রিয়া
গ. সকর্মক ক্রিয়া ঘ. অকর্মক ক্রিয়া

৩. বেল পাকলে কাকের কী?

ক. অসমাপিকা ক্রিয়া খ. অকর্মক ক্রিয়া
গ. সমাপিকা ক্রিয়া ঘ. সকর্মক ক্রিয়া

৪. দুটি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে একটি ভাব প্রকাশ করলে তাকে বলে—

ক. সকর্মক ক্রিয়া খ. যৌগিক ক্রিয়া
গ. সমাপিকা ক্রিয়া ঘ. অসমাপিকা ক্রিয়া

৫. যে দুটি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যৌগিক ক্রিয়া সম্পাদন করে তার একটির নাম—

ক. সহায়ক ক্রিয়া খ. সমাপিকা ক্রিয়া
গ. গৌণ ক্রিয়া ঘ. সকর্মক ক্রিয়া

৬. মুখ্য ক্রিয়ার অর্থ সম্প্রসারণ করে—

ক. সকর্মক ক্রিয়া খ. যৌগিক ক্রিয়া
গ. সহায়ক ক্রিয়া ঘ. গৌণ ক্রিয়া

খ. রচনামূলক প্রশ্ন:

১. ক্রিয়াপদ কী? উদাহরণসহ লিখুন।
২. যৌগিক ক্রিয়া কী? যৌগিক ক্রিয়া গঠনের উপায় লিখুন।
৩. ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৪. টীকা লিখুন:
সকর্মক ক্রিয়া, অকর্মক ক্রিয়া, সমাপিকা ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া, প্রযোজক ক্রিয়া, ক্রিয়ার ভাব।

উত্তরমালা : ক.

১. খ ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. ক ৬. গ

পাঠ-৪.৩ : কাল, পুরুষ ও কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- কাল বা ক্রিয়ার কাল কী তা বলতে পারবেন।
- কালের প্রকারভেদ লিখতে পারবেন।
- কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ক্রিয়ার কাল বোঝাতে সংস্কৃত 'ল' পরিভাষাটি চলত। বাংলায় স্বতন্ত্র কোনো পরিভাষা নেই। ইংরেজি Tense শব্দটি 'কাল'-বাচক (লাতিন Temps > tense = time)। কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তাকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ– এই তিন দিক থেকে বিবেচনা করা চলে। কাজ সম্পন্ন হওয়ার সময় 'এখন হচ্ছে' 'আগে হয়েছে' অথবা 'পরে হবে'– এসব দিক বিবেচনায় 'ক্রিয়ার কাল' প্রসঙ্গ আসে।

কাল

ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে কাল বলে। অন্যভাবে বলা যায়– ক্রিয়া বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হওয়ার নির্দেশই ক্রিয়ার কাল।

১. আমি ভাত খাই। এখানে 'খাওয়া' ক্রিয়াটি বর্তমান কালে সংঘটিত হচ্ছে।

২. কাল তুমি স্কুলে গিয়েছিলে। 'যাওয়া' ক্রিয়াটি পূর্বে অর্থাৎ অতীতে সম্পন্ন হয়েছে।

৩. আগামীকাল লঞ্চ বন্ধ থাকবে। 'বন্ধ থাকা' কাজটি পরে বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে।

উপর্যুক্ত তিনটি উদাহরণেই ক্রিয়া, বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হয়েছে এবং তিনটি কালকে নির্দেশ করছে।

ক্রিয়াপদ : ক্রিয়ামূল অর্থাৎ ধাতুর সঙ্গে কাল, সময় ও পুরুষ জ্ঞাপক (ক্রিয়া) বিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

ক. পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন–

আমি **যাই**। তুমি **যাও**। আপনি **যান**। সে **যায়**। তিনি **যান**।

(সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ অভিন্ন)।

খ. বচনভেদে ক্রিয়ার রূপের কোনো পার্থক্য হয় না, যথা–

আমি (বা আমরা) যাই। তুমি (বা তোমরা) যাও। আপনি (বা আপনারা) যান। সে (বা তারা) যায়।

গ. সাধারণ, সম্ভ্রমাত্মক, তুচ্ছার্থকভেদে মধ্যম ও নাম পুরুষের ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য হয়ে থাকে (উত্তম পুরুষে হয় না)। যেমন–

	সাধারণ	**সম্ভ্রমাত্মক**	**তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক**
উত্তম পুরুষ	আমি যাই	–	–
মধ্যম পুরুষ	তুমি যাও তোমরা যাও	আপনি যান আপনারা যান	তুই যা তোরা যা
নাম পুরুষ	সে যায় তারা যায়	তিনি যান তাঁরা যান	এটা যায় এগুলো যায়।

কালের প্রকারভেদ

ক্রিয়া সংঘটনের প্রধান কাল বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

ক্রিয়া সংঘটনের কাল	বর্ণনা
বর্তমান কাল	ক. সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান খ. ঘটমান বর্তমান গ. পুরাঘটিত বর্তমান
অতীত কাল	ক. সাধারণ অতীত খ. নিত্যবৃত্ত অতীত গ. ঘটমান অতীত ঘ. পুরাঘটিত অতীত
ভবিষ্যৎ কাল	ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

বর্তমান কাল

সাধারণ বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন– তনিমা ভাত খায়। আমি বাড়ি যাই।

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল : স্বাভাবিক বা অভ্যস্ততা বোঝালে সাধারণত সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। যথা– সূর্য পূর্বদিকে ওঠে (স্বাভাবিকতা)।

আমি প্রতিদিন সকাল ছয় টায় ঘুম থেকে উঠি (অভ্যস্ততা)।

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের প্রয়োগ	উদাহরণ
স্থায়ী সত্য প্রকাশ	চার আর তিনে সাত হয়।
ঐতিহাসিক বর্তমান (অতীতের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনায় যদি নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের প্রয়োগ হয়, তাহলে তাকে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলে)	বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন আরোহণ করেন।
কাব্যের ভণিতায়	মহাভারতের কথা অমৃত সমান কাশীরাম দাস **ভনে শুনে** পুণ্যবান।
অনিশ্চয়তা প্রকাশে	কে যানে দেশে আবার সুদিন আসবে কি না।
যদি, যখন, যেন প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপনের জন্য সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। যেমন–	বৃষ্টি যদি আসে, আমি বাড়ি চলে যাব। সকলেই যেন ক্লাসে উপস্থিত থাকে। বিপদ যখন আসে, তখন এমনি করেই আসে।

সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

১. **অনুমতি প্রার্থনায় (ভবিষ্যৎ কালের অর্থে) :** এখন **তবে** আসি।

২. **প্রাচীন লেখকের উদ্ধৃতি দিতে (অতীত কালের অর্থে) :** চণ্ডীদাস **বলেন**, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

৩. **বর্ণিত বিষয়ে প্রত্যক্ষীভূত করতে (অতীতের স্থলে) :** আমি **দেখেছি**, বাচ্চাটি রোজ রাতে কাঁদে।

৪. **'নেই', 'নাই' বা 'নি' শব্দযোগে অতীত কালের ক্রিয়ায় :** তিনি গতকাল গুলশান **যাননি**।

ঘটমান বর্তমান কাল : যে কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাজ বোঝানোর জন্য ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়, যথা– আরিফ বই **পড়ছে**। তাহিয়া গান **গাইছে**।

পুরাঘটিত বর্তমান কাল : ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলে এবং তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে, পুরাঘটিত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন–
এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ **হয়েছি**।
এতক্ষণ আমি অঙ্ক **করেছি**।

অতীত কাল

সাধারণ অতীত : বর্তমান কালের পূর্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সংঘটনই সাধারণ অতীত কাল। যেমন–
প্রদীপ নিভে গেল। শিকারি পাখিটিকে গুলি **করল**।

সাধারণ অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার

১. **পুরাঘটিত বর্তমান স্থলে :** 'এক্ষণে **জানিলাম**, কুসুমে কীট আছে।'
২. **বিশেষ ইচ্ছা অর্থে বর্তমান কালের পরিবর্তে :** তোমরা যা খুশি কর, আমি বিদায় **হলাম**।

নিত্যবৃত্ত অতীত : অতীত কালে যে ক্রিয়া সাধারণ অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে। যেমন–
আমরা তখন রোজ সকালে নদী তীরে ভ্রমন **করতাম**।

নিত্যবৃত্ত অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার

১. কামনা প্রকাশে : আজ যদি সুমন **আসত**, কেমন মজা **হতো**।
২. অসম্ভব কল্পনায় : 'সাতাশ **হতো** যদি একশ সাতাশ'।
৩. সম্ভাবনা প্রকাশে : তুমি যদি যেতে, তবে ভালোই **হতো**।

ঘটমান অতীত কাল : অতীত কালে যে কাজ চলছিল এবং যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তখনও কাজটি সমাপ্ত হয়নি– ক্রিয়া সংঘটনের এরূপ ভাব বোঝালে ক্রিয়ার ঘটমান অতীত কাল হয়। যেমন–
কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি **পড়ছিল**। আমরা তখন বই **পড়ছিলাম**। বাবা আমাদের পড়াশুনা **দেখছিলেন**।

পুরাঘটিত অতীত কাল : যে ক্রিয়া অতীতের বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তার কালকে পুরাঘটিত অতীত কাল বলা হয়। যেমন– সেবার তাকে সুস্থই **দেখেছিলাম**। কাজটি কি তুমি **করেছিলে?**

অতীতে সংঘটিত ঘটনার নিশ্চিত বর্ণনায় : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে এক লক্ষ সৈন্য মারা **গিয়েছিল**। আমি সমিতিতে সেদিন পাঁচ টাকা নগদ **দিয়েছিলাম**।
অতীতে সংঘটিত ক্রিয়ার পরম্পরা বোঝাতে শেষ ক্রিয়াপদে পুরাঘটিত কালের প্রয়োগ হয়। যেমন– বৃষ্টি আসার পূর্বেই আমরা বাড়ি পৌঁছেছিলাম।

ভবিষ্যৎ কাল

সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া পরে বা অনাগত কালে সংঘটিত হবে, তার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যথা–
আমরা মাঠে খেলতে **যাব**।
শীঘ্রই বৃষ্টি **আসবে**।

সাধারণ ভবিষ্যৎকালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

১. অক্ষেপ প্রকাশে অতীতের স্থলে ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার হয়। যেমন– কে জানত আমার ভাগ্য এমন **হবে?** সে দিন কে জানত যে ইউরোপে আবার মহাযুদ্ধের ভেরি **বাজবে?**
২. অতীত কালের ঘটনা সম্পর্কিত যে ক্রিয়াপদে সন্দেহের ভাব বর্তমনা থাকে, তার বর্ণনায় সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার হয়। যেমন– ভাবলাম, তিনি এখন বাড়ি গিয়ে **থাকবেন**। তোমরা হয়তো 'বিশ্বনবি' পড়ে **থাকবে**।

ঘটমান ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার রূপ

নাম পুরুষ সাধারণ : –ইতে থাকিবে/– তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ : –ইতে থাকিবেন/– তে থাকবেন। (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন)। সম্ভ্রমাত্মক।

মধ্যম পুরুষ সাধারণ : –ইতে থাকিবে/ – তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক : –ইতে থাকিবে/ – তে থাকিবে। (করিতে থাকিবি/করতে থাকবি)।

উত্তম পুরুষ : –ইতে থাকিব/– তে থাকব। (করিতে থাকিব/করতে থাকব।)

যে কাজ ভবিষ্যৎ কালে চলতে থাকবে তার কালকে **ঘটমান ভবিষ্যৎ** বলে। লক্ষণীয়, এখানে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া –ইতে/– তে বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে থাক্ ধাতুর, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়।

জ্ঞাতব্য : মূল ধাতুর সঙ্গে –ইতে/তে– বিভক্তি যোগে যে অসমাপিকা ক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা অপরিবর্তনীয় এবং কোনো কালবাচক নয়। মূল ধাতুর সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালের কোনোরূপ ক্রিয়া বিভক্তিই যুক্ত হয় না। অর্থের দিক থেকে ঘটমান ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদ সৃষ্টি হয়েছে মনে করা যেতে পারে। রূপের দিক থেকে এগুলো সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়ার রূপ মাত্র। তাই অনেকে ঘটমান ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদের রূপ আছে বলে স্বীকার করেন না।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার রূপ : যে ক্রিয়া সম্ভবত ঘটে গিয়েছে, সাধরণ ভবিষ্যৎ কালবোধক শব্দ ব্যবহার করে তা বোঝাতে **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ** কাল হয়। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশের জন্য মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়াবিভক্তি –ইয়া/এ যোগ করে এবং যাক্ ও গম্ ধাতুর সঙ্গে সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত করে **যৌগিক ক্রিয়াপদ** তৈরি হয়। যথা– গিয়ে থাকব/যাইয়া থাকব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. কোন বাক্যে পুরাঘটিত অতীত কালের ক্রিয়া আছে?

ক. তারা গিয়েছে
খ. সে গিয়েছিল
গ. তুমি যেতে থাক
ঘ. তুমি যাও

২. কোন্ বাক্যটির ঘটমান বর্তমানের ক্রিয়া দ্বারা গঠিত?

ক. এ কথা জানতে তুমি
খ. 'দেখে এলাম তারে'
গ. লোকটি এদিকে আসছে
ঘ. 'আবার আসিব ফিরে'

৩. কোন বাক্যটি ঐতিহাসিক বর্তমানের ক্রিয়াপদ দ্বারা গঠিত?

ক. আদিব স্কুলে যায়
খ. রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান
গ. কেন যে তুমি আস না
ঘ. রোজ দেরি হয় কেন?

৪. জলিল হয়তো 'এসে থাকবে'– এখানে কোন্ কালের পরিবর্তে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. পুরাঘটিত বর্তমান
খ. ঘটমান অতীত
গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
ঘ. সাধারণ অতীত

৫. কাজ শেষ করার জন্য সেলিম আদাজল 'খেয়ে লেগেছে'– এখানে ক্রিয়া পদটির কাল হচ্ছে–

ক. সাধারণ বর্তমান
খ. ঘটমান বর্তমান
গ. পুরাঘটিত বর্তমান
ঘ. ঐতিহাসিক বর্তমান

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. কাল বলতে কী বোঝায়? ক্রিয়ার কাল কত প্রকার উদাহরণসহ লিখুন।

২. 'পুরুষভেদে ক্রিয়ার প্রয়োগে ভিন্নতা দেখা যায়, কিন্তু বচনভেদে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না।'- ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা : ক.

১। খ ২। গ ৩। খ ৪। গ ৫। গ

পাঠ-৪.৪ : সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সমাপকিা ক্রিয়ার গঠন ও ব্যবহার বলতে পারবেন।
- অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন ও ব্যবহার লিখতে পারবেন।
- যৌগিক ক্রিয়ার গঠন ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের বা বক্তার মনোভাবের পরিসমাপ্তি হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন– আমি বই **পড়ছি**। মেয়েরা গান **গাইছে**। অন্যদিকে, যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন– আমি ভাত **খেয়ে**---। এছাড়া এটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন– ছেলে মেয়েরা **শুয়ে পড়ল** (কার্যসমাপ্তি অর্থে), সাইরেন **বেজে উঠল** (আকস্মিকতা অর্থে) ইত্যাদি।

সমাপিকা ক্রিয়ার গঠন

সমাপিকা ক্রিয়া সকর্মক, অকর্মক ও দ্বিকর্মক হতে পারে। ধাতুর সঙ্গে বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যথা–

দেলোয়ার বই পড়ে। (ক্রিয়া–সকর্মক, কাল–বর্তমান)।
তামিম সারাদিন খেলেছিল। (ক্রিয়া–অকর্মক–কাল অতীত)।
আমি তোমাকে একটি কলম উপহার দেব। (ক্রিয়া–দ্বিকর্মক, কাল–ভবিষ্যৎ)।

অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন

ধাতুর সঙ্গে কাল নিরপেক্ষ –ইয়া (য়ে), –ইত (তে) অথবা –ইলে (লে) বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন–**যত্ন করলে** রত্ন মেলে। তাকে খুঁজে নিয়ে আসতে চেষ্টা করবে।

অসমাপিকা ক্রিয়ায় গঠন

অসমাপিকা ক্রিয়া ঘটিত বাক্যে একাধিক কর্তা (কর্তৃকারক) দেখা যায়–

১. এক কর্তা : বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসামাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক বা অভিন্ন হতে পরে। যথা–তুমি চাকরি পেলে আর কি দেশে আসবে? 'পেলে' (অসমাপিকা ক্রিয়া) এবং 'আসবে' (অসমাপিকা ক্রিয়া উভয় ক্রিয়ার কর্তা এখানে 'তুমি'।

২. অসমান কর্তা : বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক না হলে সেখানে কর্তাগুলোকে অসমান কর্তা বলা হয়। অসমান কর্তা আবার দুই ধরনের। যেমন–

ক. শর্তাধীন কর্তা : এ জাতীয় কর্তাদের ব্যবহার শর্তাধীন হতে পারে। যেমন– তোমরা বাড়ি **এলে** আমি **রওনা** হব। এখানে 'এলে' অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা 'তোমরা' এবং 'রওনা হব' সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা 'আমি'। তোমাদের বাড়ি আসার ওপর আমার রওনা হওয়া নির্ভরশীল বলে এ জাতীয় বাক্যে কর্তৃপক্ষের ব্যবহার শর্তাধীন।

খ. নিরপেক্ষ কর্তা : শর্তাধীন না হয়েও সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপদ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম কর্তৃপদটিকে বলা হয় **নিরপেক্ষ কর্তা**। যেমন– সূর্য অস্তমিত **হলে** যাত্রীদল পথ চলা শুরু **করল**। এখানে 'যাত্রীদের' পথ চলার সঙ্গে 'সূর্য' অস্তমিত হওয়ার কোনো শর্ত বা সম্পর্ক নেই বলে 'সূর্য' নিরপেক্ষ কর্তা।

অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

১. 'ইলে' > 'লে' বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

ক. কার্যপরম্পরা বোঝাতে : চারটে **বাজলে** স্কুল ছুটি হবে।
খ. প্রশ্ন বা বিস্ময় জ্ঞাপনে : একবার **মরলে** কি কেউ ফেরে?
গ. সম্ভাব্যতা অর্থে : এখন বৃষ্টি **হলে** ফসলের ক্ষতি হবে।
ঘ. সাপেক্ষতা বোঝাতে : তিনি **গেলে** কাজ হবে।
ঙ. দার্শনিক সত্য প্রকাশে : '**জন্মিলে** মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?'
চ. বিধিনির্দেশে : এখানে প্রচারপত্র **লাগালে** ফৌজদারিতে সোপর্দ হবে।
ছ. সম্ভাবনার বিকল্পে : আজ **গেলেও** যা, কাল **গেলেও** তা।
জ. পরিণতি বোঝাতে : বৃষ্টিতে **ভিজলে** সর্দি হবে।

২. 'ইয়া' > 'এ' বিভক্তি অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

ক. অনন্তরতা বা পর্যায় বোঝাতে : হাত–মুখ ধুয়ে **পড়তে** বস।
খ. হেতু অর্থে : ছেলেটি কুসঙ্গে **মিশে** নষ্ট হয়ে গেল।
গ. ক্রিয়া বিশেষণ অর্থে :চেঁচিয়ে কথা বলো না।
ঘ. ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বোঝাতে : 'হৃদয়ের কথা **কহিয়া কহিয়া গাহিয়া** গান।'
ঙ. ভাববাচক বিশেষ্য গঠন : সেখানে আর **গিয়ে** কাজ নেই।
চ. অব্যয় পদের অনুরূপ : ঢাকা **গিয়ে** বাড়ি যাব।

৩. 'ইতে'>'তে' বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

ক. ইচ্ছা প্রকাশ : এখন আমি **যেতে** চাই।
খ. উদ্দেশ্য বা নিমিত্ত অর্থে : মেলা **দেখতে** ঢাকা যাব।
গ. সামর্থ্য বোঝাতে : খোকা এখন **হাঁটতে** পারে।
ঘ. বিধি বোঝাতে : বাল্যকালে বিদ্যাভাস **করতে** হয়।
ঙ. দেখা বা জানা অর্থে : রমলা **গাইতে** জানে।
চ. আবশ্যকতা বোঝাতে : এখন ট্রেন **ধরতে** হবে।
ছ. সূচনা বোঝাতে : সেতু এখন ইংরেজি **পড়তে** শিখেছে।
জ. বিশেষণবাচকতায় : লোকটাকে **দৌড়াতে** দেখলাম।
ঝ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে : তোমাকে তো এ গ্রামে **থাকতে** দেখিনি।
ঞ. অনুসর্গরূপে : 'কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের **চাইতে শ্যামল**।'
ট. বিশেষ্যর সঙ্গে অন্বয় সাধনে : '**দেখিতে** বাসনা মাগো তোমার চরণ'।
ঠ. বিশেষণের সঙ্গে অন্বয় সাধনে : পদ্মফুল **দেখতে** সুন্দর।

৪. 'ইতে' 'তে' বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়ার দ্বিত্ব প্রয়োগ

ক. নিরন্তরতা প্রকাশে : 'কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।'
খ. সমকাল বোঝাতে : 'সেঁউতিতে পদ দাবী **রাখিতে রাখিতে**। সেঁউতিতে হইল সোনা '**দেখিতে দেখিতে**'।

জ্ঞাতব্য : রীতিসিদ্ধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাপিকা ক্রিয়া অনুপস্থিত থেকে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারে বাক্য গঠিত হতে পরে। যেমন– গরু **মেরে** জুতা দান। আঙ্গুল **ফুলে** কলাগাছ।

যৌগিক ক্রিয়া

যৌগিক ক্রিয়ার গঠনবিধি : অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে যা, পড়, দেখ্, লাগ্, ফেল্, আস্, উঠ্, দে, লহ্, থাক্, প্রভৃতি ধাতু থেকে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়ে উভয়ে মিলিতভাবে যৌগিক ক্রিয়া তৈরি করে, এসব যৌগিক ক্রিয়া বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন–

১. য-ধাতু

ক. সমাপ্তি অর্থে : বৃষ্টি **থেকে গেল**।

খ. অবিরাম অর্থে : গায়ক **গেয়ে যাচ্ছেন**।

গ. ক্রমশ অর্থে : চা **জুড়িয়ে যাচ্ছে**।

ঘ. সম্ভাবনা অর্থে : এখন যাওয়া **যেতে পারে**।

২. পড়-ধাতু

ক. সমাপ্তি অর্থে : এখন **শুয়ে পড়**।

খ. ব্যাপ্তি অর্থে : কথাটা **ছড়িয়ে পড়েছে**।

গ. আকস্মিক অর্থে : এখনই তুফান **এসে পড়বে**।

ঘ. ক্রমশ অর্থে : কেমন যেন মনমরা **হয়ে পড়েছি**।

৩. দেখ্-ধাতু

ক. মনোযোগ আকর্ষণে : এদিকে **চেয়ে দেখ**।

খ. পরীক্ষা অর্থে : লবণটা **চেখে দেখ**।

গ. ফল সম্ভাবনায় : সাহেবকে **বলে দেখ**।

৪. আস্-ধাতু

ক. সম্ভাবনা অর্থে : আজ বিকেলে বৃষ্টি **আসতে পারে**।

খ. অভ্যস্ততায় : আমরা এ কাজই **করে আসছি**।

গ. আসন্ন সমাপ্তি অর্থে : ছুটি **ফুরিয়ে আসছে**।

৫. দি-ধাতু

ক. অনুমতি অর্থে : আমাকে **যেতে দাও**।

খ. পূর্ণতা অর্থে : কাজটা শেষে **করে দিলাম**।

গ. সাহায্য প্রার্থনায় : আমাকে অঙ্কটা **বুঝিয়ে দাও**।

৬. নি-ধাতু

ক. নির্দেশ জ্ঞাপক : এবার কাপড়-চোপড় **গুছিয়ে নাও**।

খ. পরীক্ষা অর্থে : কষ্টি পাথরে সোনাটা **কষে নাও**।

৭. ফেল্-ধাতু

ক. সম্পূর্ণতা অর্থে : মিষ্টিগুলো **খেয়ে ফেল**।

খ. আকস্মিকতা অর্থে : ছেলেরা **হেসে ফেলল**।

৮. উঠ্-ধাতু

ক. ক্রমান্বয়তা বোঝাতে : ঋণের বোঝা ভারী **হয়ে উঠেছে**।

খ. অভ্যাস অর্থে : শুধু শুধু তিনি **রেগে ওঠেন**।

গ. আকস্মিকতা অর্থে : সে হঠাৎ **চেঁচিয়ে উঠল**।

ঘ. সম্ভাবনা অর্থে : আমার আর থাকা **হয়ে উঠল** না।

ঙ. সামর্থ্য অর্থে : এসব কথা আমার সহ্য **হয়ে ওঠে** না।

৯. লাগ্-ধাতু

ক. অবিরাম অর্থে : খোকা কাঁদতে লাগল।

খ. সূচনা নির্দেশে : এখন কাজে **লাগ** তো দেখি।

১০. থাক্–ধাতু

ক. নিরন্তরতা অর্থে : এবার **ভাবতে থাক**।

খ. সম্ভাবনায় : তিনি হয়তো **বলে থাকবেন**।

গ. সন্দেহ প্রকাশে : সে–ই কাজটা **করে থাকবে**।

ঘ. নির্দেশ : আর দরকার নেই, এবার বসে **থাক**।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. কোন বাক্যের ক্রিয়াটি সম্ভাবনা প্রকাশ করছে?

ক. বৃষ্টি থেমে গেল | খ. এক্ষুণি বৃষ্টি এসে পড়বে
গ. তাড়াতাড়ি চল, বৃষ্টি আসতে পারে | ঘ. সে গান করতে পারে।

২. কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়াটি অনুসর্গ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. জন্মভুমি স্বর্গের চাইতে শ্রেষ্ঠ | খ. সে আমার দিকে চাইতে থাকে
গ. এমন চাওয়া চাইতে নেই | ঘ. কী চাইতে ইচ্ছা করে?

৩. কোন বাক্যে অসমান কর্তা আছে?

ক. সে যেতে যেতে থেমে গেল | খ. বালিকাটি গান করে চলে গেল
গ. সে কেঁদে কেঁদে বলল | ঘ. সে এলে আমি যাব।

৪. কোন বাক্যের কর্তা নিরপেক্ষ?

ক. আকাশে চাঁদ উঠলে আড্ডা ভাঙে | খ. বৃষ্টি হয়েছে তাই আমরা যাব না
গ. বৃষ্টিতে ভিজলে কেন, সর্দি হবে | ঘ. তুমি যদি যাও, সে যাবে।

৫. কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. তুমি কি এখন যাবে? | খ. মরলে কি কেউ ফেরে?
গ. 'জন্মিলে মরিতে হবে।' | ঘ. আজ গেলেও যা, কাল গেলেও তা।

৬. কোন বাক্যে আবশ্যকতা বোঝাতে ইতে> তে বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. তোমাকে দেখতে চাই | গ. খোকা এখন পড়তে পারে
খ. আমি এখানে থাকতে আসিনি | ঘ. এখন ট্রেন ধরতে হবে।

৭. কোন বাক্যে পরীক্ষা অর্থে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. কষ্টি পাথরে সোনা কষে নাও | খ. আমাকে করতে দাও
গ. এখন ভাবতে থাক | ঘ. আমরা পরীক্ষা দিয়ে আসছি।

৮. কোন বাক্যে নির্দেশ অর্থে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. তিনি হয়তো বসে থাকবেন | খ. কাজ করে সে বসে থাকবে
গ. অনেক কাজ করেছ, এখন বসে থাক | ঘ. তুমি কি এখন বসে থাকবে?

৯. কোন বাক্যে ইয়া (>এ) বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বোঝাচ্ছে?

ক. কথা কয়ে দেখ | খ. গান গেয়ে গেয়ে পথ চলছে
গ. রাজশাহী গিয়ে ফিরে আসব | ঘ. এখন গিয়ে কী করবে?

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য কী?

২. যৌগিক ক্রিয়া কী? কয়টি যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখান।

উত্তরমালা : ক.

নিজে করুন।

পাঠ-৪.৫ : বাংলা অনুজ্ঞা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- অনুজ্ঞাপদ কী তা বলতে পারবেন।
- অনুজ্ঞা পদের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন কালে মধ্যম ও নাম পুরুষে অনুজ্ঞার রূপ লিখতে পারবেন।

বর্তমান ও অতীত কালে মধ্যম পুরুষে ক্রিয়াপদের যে রূপ হয় তাকে অনুজ্ঞা পদ এবং যে–ভাব আবেদন, অনুমতি, অনুরোধ, আদেশ, আমন্ত্রণ, আশীর্বাদ, প্রার্থনা ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে অনুজ্ঞা ভাব বলে (Imperative mood)।

বাংলা অনুজ্ঞা

আদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, প্রার্থনা, অনুনয় প্রভৃতি অর্থে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে মধ্যম পুরুষে ক্রিয়াপদের যেরূপ হয় তাকে **অনুজ্ঞা পদ** বলে। যেমন– কাল একবার **এসো**। তুই বাড়ি **যা**। '**ক্ষমা কর** মোরা অপরাধ।' আলোচ্য প্রথম বাক্যে অনুরোধ, দ্বিতীয় বাক্যে আদেশ এবং তৃতীয় বাক্যে প্রার্থনা বোঝাচ্ছে।

অনুজ্ঞা পদের গঠন

১. মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থ বা ঘনিষ্ঠার্থক সর্বনামের অনুজ্ঞায় ক্রিয়াপদে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। মূল ধ্বনিটিই ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন– মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক তুই (বই) পড়্। তোরা (বই) পড়্। কিন্তু অনুরোধ, আদেশ বা অনুরূপ সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের সর্বনাম 'আপনি' বা 'আপনারা' এবং সাধারণ মধ্যম পুরুষের সর্বনাম 'তুমি' বা 'তোমরা' পদের সঙ্গে যে অনুজ্ঞা পদের ব্যবহার হয়, তাতে বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন–

সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষ– আপনি (আপনারা) আসুন (আস্+উন)।

সাধারণ মধ্যম পুরুষ– তুমি (তোমরা) আস (আস্+অ)।

২. প্রাচীন বাংলা রীতিতে মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার সঙ্গে 'হ' যোগ করার নিয়ম ছিল। এই 'হ' বর্তমানে অ এবং ও তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন–

'করহ [=কর] আপন কাজ, তাতে কিবা ভয় লাজ।'

'অধম' সন্তানের মাগো দেহ [দাও] পদচ্ছায়া।'

৩. ক. উত্তম পুরুষের অনুজ্ঞা পদ হতে পারে না। কারণ, কেউ নিজেকে আদেশ করতে পারে না।

খ. অপ্রত্যক্ষ বলে নাম পুরুষের অনুজ্ঞা হয় না। তবে এই মত সকলে সমর্থন করেন না।

৪. ক. মধ্যম ও নাম পুরুষের বর্তমান অনুজ্ঞার রূপ :

ধরন	**সর্বনাম**	**বিভক্তি**	**উদাহরণ/ক্রিয়াপদ**
সম্ভ্রমাত্মক	আপনি, আপনারা, তিনি, তাঁরা	উন, ন	যাউন, যান
সাধারণ	তুমি, তোমরা	অ, ও	কর, করো, যাও
তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	০ (শূন্য)	কর্, যা
সাধারণ	সে, তারা	উক	করুক

জ্ঞাতব্য: নির্দেশক ভাবের সাধারণ বর্তমান কালের সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের বিভক্তি = এন। যেমন– আপনি দেখেন। সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞা পদের বিভক্তি–'উন'। যেমন– আপনারা দেখুন।

খ. চলিত ভাষায় ধাতুর মূল স্বর এ–কারান্ত বা ও–কারান্ত হলে উক্ত পার্থক্য লোপ পায়। যেমন– নেন, লন, নিন < লউন, লোন।

গ. মধ্যম ও নাম পুরুষে ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা রূপ :

অনুজ্ঞার রূপ

	সর্বনাম	বিভক্তি		ক্রিয়াপদ	
		সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সম্ভ্রমাত্মক	আপনি, আপনারা	–ইবেন	– বেন	করিবেন	করবেন
	তিনি, তাঁরা				
সাধারণ	তুমি, তোমরা	–ইও	–ও	করিও	করো
তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	–ইস	–স	করিস, খাইস	খাস
সাধারণ	সে, তারা	–ইবে	– বে	করিবে	করবে

দ্রষ্টব্য : ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা এবং ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা।

প্রকারভেদ : অনুজ্ঞাপদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা,
২. ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা।

১. ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা : মূল ক্রিয়াপদের সঙ্গে –ইতে/–তে বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন করা যায়। এই অসমাপিকা ক্রিয়াপদ এবং থাক্ ধাতুর সঙ্গে (সাধারণ) বর্তমান অনুজ্ঞার বিভক্তি করে যে ক্রিয়াপদ হয়, উভয় মিলে যৌগিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এই যৌগিক ক্রিয়া ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে। যেমন–

(সে)–ইতে/– তে + –উক (করিতে/করতে থাকুক)।
(তিনি/আপনি)–ইতে/- তে + উন (করিতে/করতে থাকুন)
(তুমি)–ইতে/– তে + অ –ও (করিতে/করতে থাক/ থাকো)।
(তুই)–ইতে/ তে + – ও (করিতে/করতে থাক্)

মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি–ইতে/– তে যুক্ত হয়; এরূপ বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া সর্বদা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। এই অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সাধারণ বর্তমানের অনুজ্ঞার ক্রিয়া বিভক্তিযুক্ত থাক্ ধাতু (ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা) মিলে যৌগিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এই যৌগিক ক্রিয়া ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে।

থাক্ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়া বিভক্তিগুলোই অনুজ্ঞা অর্থ প্রকাশ করে। মূল ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন অসমাপিকা ক্রিয়াটি ঘটমানতা প্রকাশে সাহায্য করে।

২. ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : উপর্যুক্ত কারণেই ঘটমান অবিষ্যৎ অনুজ্ঞার জন্য পৃথক ক্রিয়া বিভক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা অনাবশ্যক। যেমন–

–ইতে/– তে + –ইবেন/– বেন (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন)।
–ইতে/– তে+ইও–এ/–ও (করিতে থাকিও/করতে থেকো)।
–ইতে/– তে + –ইস (করিতে থাকিস/করতে থাকিস)।
–ইতে/– তে + –ইবে/– বে (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

জ্ঞাতব্য

ক) ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় উত্তম পুরুষ ব্যবহৃত হয় না।
খ) সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়ার রূপটি সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়।

ক. বর্তমান কাল

১. আদেশ : কাজটি করে **ফেল**। তোমরা এখন **যাও**।
২. উপদেশ : সত্য গোপন **করো না**।

কড়া রোদে ঘোরাফেরা **করিস না**।

'পাতিস নে শিলাতলে পদ্মপাতা।'

৩. অনুরোধ : আমার কাজটা এখন **কর**।

অঙ্কটা বুঝিয়ে **দাও না**।

৪. প্রার্থনা : আমার দরখাস্তটা **পড়ুন**।

৫. অভিশাপ : **মর**, পাপিষ্ঠ।

খ. ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা

১. আদেশ : সদা সত্য **বলবে**।

২. সম্ভাবনায় : চেষ্টা কর, সবই বুঝতে **পারবে**।

৩. বিধান অর্থে : রোগ হলে ওষুধ **খাবে**।

৪. অনুরোধে : কাল একবার **এসো** (বা আসিও বা আসিবে)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. আদেশ, উপদেশ, অনুমতি, অনুরোধ, প্রার্থনা প্রভৃতি বোঝাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার যেরূপ হয়, তাকে কী বলে?

ক) অনুজ্ঞা
খ) বাচ্য
গ) বাক্য
ঘ) উক্তি

২. কোন পুরুষে অনুজ্ঞা পদ হয় না?

ক) মধ্যম পুরুষে
খ) উত্তম পুরুষে
গ) নামপুরুষে
ঘ) কোনটিই নয়

৩. অনুজ্ঞা পদ কোন পদের রূপ?

ক) বিশেষ্য
খ) বিশেষণ
গ) সর্বনাম
ঘ) ক্রিয়া

৪. সদা সত্য কথা বলবে– এটি কোন অনুজ্ঞার উদাহরণ?

ক) বর্তমান কালের অনুজ্ঞার
খ) অতীত কালের অনুজ্ঞার
গ) ভবিষ্যৎকালের অনুজ্ঞার
ঘ) অতীত-বর্তমান কালের অনুজ্ঞার

৫. উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞা পদ হয় না, কারণ–

ক) প্রত্যক্ষ বলে
খ) পরোক্ষ বলে
গ) কেউ নিজেকে আদেশ করতে পারে না
ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তরমালা : ক.

১. ক ২. খ ৩. ঘ ৪. গ ৫. গ

পাঠ-৪.৬ : ক্রিয়াবিভক্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ক্রিয়া বিভক্তি কী তা বলতে পারবেন।
- ক্রিয়া বিভক্তির রূপভেদ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- ধাতুর রূপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাধু ও চলতি রীতিভেদে ক্রিয়া বিভক্তির পরিবর্তন করতে পারবেন।
- বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে ধাতু ও বিভক্তির বিভিন্ন রূপ লিখতে পারবেন।

ক্রিয়াপদ গঠনের ক্ষেত্রে যা ধাতুর পরে যুক্ত হয় তাই ক্রিয়া–বিভক্তি। ক্রিয়া–বিভক্তির রূপভেদ ভাষার বিভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

ক্রিয়া বিভক্তি

ধাতুর সঙ্গে যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে সামাপিকা ক্রিয়া গঠন করে ঐ সমস্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে ক্রিয়া–বিভক্তি বলা হয়। অর্থাৎ যা ধাতুর পরে যুক্ত হয়ে 'ক্রিয়াপদ' হয়, তাকে বলে ক্রিয়া বিভক্তি। ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায় : ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং ক্রিয়া–বিভক্তি। যেমন– 'করে' একটি ক্রিয়াপদ। এর দুটো অংশ রয়েছে– কর্ + এ = করে। এখানে 'কর্' ধাতুর সঙ্গে '-এ' বিভক্তি যুক্ত হয়ে 'করে' ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে। এরূপ, আমি যাই (যা + ই) – 'যা' ধাতুর সঙ্গে 'ই' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। আপনারা যাবেন (যা + বেন) – 'যা' ধাতুর সঙ্গে 'বেন' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

ক্রিয়া–বিভক্তির রূপভেদ

১. বিভক্তিসমূহ ক্রিয়ার কাল, পুরুষ ও বাচ্যভেদে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন–
   আমি যাই– সাধারণ বর্তমান কালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ।
   আপনারা যাবেন– সাধারণ ভবিষ্যত কালে (সম্ভ্রমাত্মক) মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ।

২. সাধু ও চলিত রীতিভেদেও ক্রিয়া বিভক্তির পরিবর্তন হয়। যেমন–

সাধুরীতি	চলিতরীতি
তাহারা ঢাকা যাইতেছে।	তারা ঢাকা যাচ্ছে।
আপনি ভাত খাইয়াছেন।	আপনি ভাত খেয়েছেন

৩. প্রযোজক ক্রিয়াতেও ক্রিয়াবিভক্তির অনুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন–

সাধু রীতি (প্রযোজক)	চলিত রীতি (প্রযোজক)
ফেরদৌসী নীলাকে গান শিখাইতেছিল।	ফেরদৌসী নীলাকে গান শেখাচ্ছিল
আমি তাহাকে দিয়া কাজটি করাইয়াছি।	আমি তাকে দিয়ে কাজটি করিয়েছি।

ধাতুর 'গণ' : 'গণ' শব্দের অর্থ শ্রেণি। কিন্তু ধাতুর 'গণ' বলতে ধাতুগুলোর বানানের ধরন বোঝায়। 'ধাতুর গণ' ঠিক করতে দুটি বিষয় লক্ষ রাখতে হয়। যেমন–

ক. ধাতুটি কয়টি অক্ষরে গঠিত।

খ. ধাতুর প্রথমে সংযুক্ত স্বরবর্ণটি কী?

'হওয়া' ক্রিয়ার ধাতু হ (হ্ + অ) 'হ্' একাক্ষর ধাতু এবং প্রথম বর্ণ 'হ'–এর সাথে স্বরবর্ণ 'অ' যুক্ত আছে। সুতরাং হ–আদি গণের মধ্যে ল–ধাতু (ক্রিয়াপদ–লওয়া) পড়বে। বাংলা ভাষার সমস্ত ধাতুকে বিশটি গণে ভাগ করা হয়েছে, যথা–

১. হ্– আদিগণ : হ (হওয়া), ল (লওয়া) ইত্যাদি।
২. খা– আদিগণ : খা (খাওয়া), ধা (ধাওয়া), পা (পাওয়া), যা (যাওয়া) ইত্যাদি।
৩. দি– আদিগণ : দি (দেওয়া), নি (নেওয়া), ছু (ছোঁয়া) ইত্যাদি।
৪. শু– আদিগণ : চু (চোঁয়ানো), নু (নোয়ানো), ছু (ছোঁয়া) ইত্যাদি।
৫. কর্– আদিগণ : কর্ (করা), কম্ (কমা), গড় (গড়া), চল্ (চলা) ইত্যাদি।
৬. কহ্– আদিগণ : কহ্ (কহা), সহ্ (সহা), বহ্ (বহা) ইত্যাদি।
৭. কাট্– আদিগণ : গাঁথ্, চাল্, আক্, বাঁধ্, কাঁদ্ ইত্যাদি।
৮. গাহ্– আদিগণ : চাহ্, বাহ্, নাহ্ (নাহান < স্নান) ইত্যাদি।
৯. লিখ্– আদিগণ : কিন্, ঘির্, জিত্, ফির্, ভিড়্, চিন্ ইত্যাদি।
১০. উঠ্– আদিগণ : উড়্, শুন্, ফুট্, খুঁজ্, খুল্, ডুব্, তুল্ ইত্যাদি।
১১. লাফা– আদিগণ : কাটা, ডাকা, বাজা, আগা (অগ্রসর হওয়া) ইত্যাদি।
১২. নাহা– আদিগণ : গাহা ইত্যাদি।
১৩. ফিরা– আদিগণ : উঁচা, লুকা, কুড়া (কুড়াচ্ছে) ইত্যাদি।
১৪. ঘুরা– আদিগণ : ছিটা, শিখা, ঝিমা, চিরা ইত্যাদি।
১৫. ধোয়া– আদিগণ : শোয়া, খোঁচা, খোয়া, গোছা, যোগা ইত্যাদি।
১৬. দৌড়্– আদিগণ : পোঁছে, দৌড়া ইত্যাদি।
১৭. চট্কা– আদিগণ : সম্ঝা, ধম্কা, কচ্লা ইত্যাদি।
১৮. বিগ্ড়া– আদিগণ : হিঁচ্ড়া, ছিট্কা, সিট্কা ইত্যাদি।
১৯. উল্টা– আদিগণ : দুম্ড়া, মচ্ড়া, উপ্চা ইত্যাদি।
২০. ছোবলা– আদিগণ : কোঁচকা, কোঁকড়া, কোদলা ইত্যাদি।

ধাতু–বিভক্তির রূপ

বর্তমান কাল

কাল	নাম পুরুষ (সাধারণ)		নাম ও মধ্যম (সম্ভ্রমাত্মক)		মধ্যম পুরুষ (সাধারণ)		মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)		উত্তম পুরুষ	
	সে				তুমি				আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সাধারণ	–এ	–এ	–এন	–এন	–অ	–অ	–ইস্	–ইস্	–ই	–ই
ঘটমান	–ইতেছে	–ছে –চ্ছে	–ইতেছেন	– ছেন –চ্ছে	–ইতেছ –ছ	–ছ –চ্ছ	–ইতেছিস্	–ছিস্ –চ্ছিস্	–ইতেছি	–ছি –চ্ছি
পুরাঘটিত	–ইয়াছে	–এছে	–ইয়াছেন	–এছেন	–ইয়াছ	–এছ	–ইয়াছিস্	এছিস্	–ইয়াছি	–এছি
অনুজ্ঞা	–উক	–উক	–উন	–উন	–অ –ও	–অ	–মূলধাতু	–মূলধাতু		

মন্তব্য : –ইতেছে, –ছ, –এছ, বিভক্তিগুলোর চিহ্ন অ–কারান্ত।

অতীত কাল

কাল	নাম পুরুষ (সাধারণ)		নাম ও মধ্যম (সম্ভ্রমাত্মক)		মধ্যম পুরুষ (সাধারণ)		মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)		উত্তম পুরুষ	
	সে				তুমি				আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সাধারণ	–ইল	–ল	–ইলেন	– লেন	–ইলে	– লে	–ইলি	–লি	–ইলাম	–লাম –লুম
নিত্তবৃত্ত	–ই	– তে	–ইতেন	– তেন	–ইতে	– তে	–ইতিস্	–তিস	–ইতাম	–তাম

		– তো								–তুম
ঘটমান	–ইতেছিল	–ছিল	–ইতেছিলেন	–ছিলেন	–ইতেছিলে	–ছিলে –ছিল	–ইতেছিলি	–ছিলি –চ্ছিলি	–ইতেছিলাম	–ছিলাম
পুরাঘটিত	–ইয়াছিল	–এছিল	–ইয়াছিলেন	–এছিলেন	–ইয়াছিল	–এছিল	–ইয়াছিলি	–এছিলি	–ইয়াছিলাম –ইয়াছি	–এছিলুম –এছিলাম

দ্রষ্টব্য: পরে, ‘চ্ছ’ থাকলে কর্ ধাতুর ‘র’ লোপ পায় (কচ্ছিলে, কচ্ছিলি)।

ভবিষ্যৎকাল

কাল	**নাম পুরুষ (সাধারণ)**		**নাম ও মধ্যম (সম্ভ্রমাত্মক)**		**মধ্যম পুরুষ (সাধারণ)**		**মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)**		**উত্তম পুরুষ**	
	সে				তুমি				আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সাধারণ	–ইবে	– বে	–ইবেন	– বেন	-ইবে	– বে	–ইবি	–বি	–ইব	-ব – বো
অনুজ্ঞা	–ইবে	– বে	–ইবেন	– বেন	–ইও	–ও	–ইস	–ইস		

দ্রষ্টব্য: –ইল, –ল, –ইত, –ইতেছিল, –ছিল, –এছিল বিভক্তিগুলো উচ্চারণে অ–কারান্ত।

কর্ ধাতুর রূপ (সর্, গড়্, চল্ প্রভৃতি কর–আদিগণ)

কাল	**সে**		**তিনি আপনি**		**তুমি**		**তুই**		**আমি**	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সাধারণ বর্তমান	করে	করে	করেন	করেন	কর	কর	করিস	করিস	করি	করি
ঘটমান বর্তমান	করিতেছে	করছে	করিতেছেন	করছেন	করিতেছ	করছ	করছিস	করিতেছিস	করছিস	করছি
পুরাঘটিত বর্তমান	করিয়াছে	করেছে	করিয়াছেন	করেছেন	করিয়াছ	করেছ	করিয়াছিস	করেছিস	করিয়াছি	করেছি
বর্তমান অনুজ্ঞা/আকাঙ্ক্ষা	করুক	করুক	করুন	করুন	কর	কর	কর্	কর্	০	০
সাধারণ অতীত	করিল	করল	করিলেন	করলেন	করিলে	করলে	করিলি	করলি	করিলাম	করলাম
নিত্যবৃত্ত অতীত	করিত	করত	করিতেন	করতেন	করিতে	করতে	করিতিস	করতিস	করিতাম	করতাম
ঘটমান অতীত	করিতেছিল	করছিল	করিতেছিলেন	করছিলেন	করিতেছিলে	করছিলে	করিতেছিলি	করছিলি	করিতেছিলাম	করছিলাম
পুরাঘটিত অতীত	করিয়াছিল	করছিল	করিয়াছিলেন	করেছিলেন	করিয়াছিল	করেছিল	করিয়াছিলি	করেছিলি	করিয়াছিলাম	করেছিলাম
সাধারণ ভবিষ্যত	করিবে	করবে	করিবেন	করবেন	করিবে	করবে	করিবি	করবি	করব	করব
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	করিবে	করবে	করিবেন	করবেন	করিও	করো	করিস	করিস	০	০

বিশেষ দ্রষ্টব্য: তিনটি কালের দশটি ক্রমিক রূপের জন্য আমরা ধাতুরূপ সাধনে এরপর কালের পরিবর্তে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১০ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করব। কর, করিতেছ, করছ, করিয়াছ, করেছ–শব্দগুলো শেষে ধ্বনির উচ্চারণ অ–কারান্ত।

যা–ধাতুর রূপ

(আদিবর্ণ আ–কার যুক্ত–খা, যা, পা, ধা প্রভৃতি খা–আদিগণ)

সাধু	**চলিত**
যায়। যান। যাও। যাইস। যাই।	যায়। যান। যাও। যাস। যাস। যাই।

যাইতেছে। যাইতেছেন। যাইতেছে। যাইতেছিস। যাইতেছি।	যাচ্ছে। যাচ্ছেন। যাচ্ছ। যাচ্ছিস। যাচ্ছি।
গিয়াছে। গিয়াছেন। গিয়াছ। গিয়াছিস। গিয়াছি।	গেছে (গিয়েছে)। গিয়াছেন। (গেছেন) গিয়েছ (গেছ)। গিয়েছিস (গেছিস)। গিয়েছি (গেছি)।
যাউক (যাক)। যান। যাও। যা।	যাক। যান। যাও। যা।
গেল (যাইল)। গেলেন (যাইলেন)। গেলে (যাইলে)। গেলি (যাইলি)। গেলাম (যাইলাম)।	গেল। গেলেন। গেলে। গেলি। গেলাম।
যাইত। যাইতেন। যাইতে। যাইতিস্। যাইতাম।	যেত। যেতেন। যেতে। যেতিস। যেতাম।
যাইতেছিল। যাইতেছিলেন। যাইতেছিলে। যাইতেছিলি। যাইতেছিলাম।	যাচ্ছিল। যাচ্ছিলেন। যাচ্ছিলে। যাচ্ছিলি। যাচ্ছিলাম।
গিয়াছিল। গিয়াছিলেন। গিয়াছিলে। গিয়াছিলি। গিয়াছিলাম।	গিয়েছিল। গিয়েছিলেন। গিয়েছিলে। গিয়েছিলি। গিয়েছিলাম।
যাইবে। যাইবেন। যাইবে। যাইবি। যাইব।	যাবে। যাবেন। যাবে। যাবি। যাব।
যাইবে। যাইবেন। যাইও। যাইস।	যাবে। যাবেন। যেও (যেয়ো)। যাস।

দ্রষ্টব্য: গিয়াছ, গেল, গিয়াছিল, যাইব, যাচ্ছ, গিয়েছে, গেছ, যেত, যাচ্ছিল, গিয়েছিল, যাব–শব্দগুলোর উচ্চারণ অ–কারান্ত।

লিখ ধাতুর রূপ

(আদ্যবর্ণ ই–কার যুক্ত–কিন্ন ঘির, জিত্ ফির, ভির, চিন প্রভৃতি লিখ্–আদিগণ)

সাধু	**চলিত**
লিখে। লিখেন। লিখ। লিখিস। লিখি।	লেখ। লেখেন। লেখ। লিখিস। লিখি।
লিখেতেছে। লিখিতেছেস। লিখিতেছ। লিখিতেছিস। লিখিতেছি।	লিখছে। লিখছেন। লিখছ। লিখছিস। লিখছি।
লিখিয়াছে। লিখিয়াছেন। লিখিয়াছ। লিখিয়াছিস। লিখিয়াছি।	লিখেছ। লিখেছেন। লিখেছ। লিখেছিস। লিখেছি।
লিখুক। লিখুন। লিখ। লিখ্।	লিখুক। লিখুন। লেখ। লেখ্।
লিখিল। লিখিলেন। লিখিলে। লিখিলি। লিখিলাম।	লিখল। লিখলেন। লিখলে। লিখলি। লিখলাম।
লিখিত। লিখিতেন। লিখিতে। লিখিতিস। লিখিতাম।	লিখত। লিখতেন। লিখতে। লিখতিস। লিখতাম।
লিখিতেছিল। লিখিতেছিলেন। লিখিতেছিলে। লিখিতেছিলি। লিখিতেছিলাম।	লিখছিল। লিখছিলেন। লিখছিলে। লিখছিলি। লিখছিলাম
লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলে। লিখিয়াছিলি। লিখিয়াছিলাম।	লিখেছিল। লিখেছিলাম। লিখেছিলে। লিখেছিলি। লিখেছিলাম।
লিখিবে। লিখিবেন। লিখিবে। লিখিবি। লিখিব।	লিখবে। লিখবেন। লিখবে। লিখবি। লখব।
লিখিবে। লিখিবেন। লিখিও (লিখিয়ো)। লিখিস।	লিখবে। লিখবেন। লিখো। লিখিস।

দ্রষ্টব্য: লিখ, লেখ, লিখিয়াছ, লিখেছ, লিখছ, লিখিত, লিখল, লিখিতেছিল, লিখছিল, লিখিত, লিখত–শব্দগুলোর উচ্চারণ অ–কারান্ত।

দে (দি) ধাতুর রূপ

(আদ্যবর্ণ ই–কার যুক্ত – 'নি' ইত্যাদি দি–আদিগণ)

সাধু	**চলিত**
দেয়। দেন। দাও। দিস। দেই	দেয়। দেন। দাও। দিস। দি (দিই)।
দিতেছে। দিতেছেন। দিতেছ। দিতেছিস। দিতেছি।	দিচ্ছি। দিচ্ছেন। দিচ্ছ। দিচ্ছিস। দিচ্ছি।
দিয়াছে। দিয়াছেন। দিয়াছ। দিয়াছিস। দিয়াছি।	দিয়েছে। দিয়েছেন। দিয়েছ। দিয়েছিস। দিয়েছি।

দিক। দিন। দাও। দে।	সাধু রীতির মতো।
দিল (দিল)। দিলেন। দিলে। দিলি। দিলাম।	সাধু রীতির মতো।
দিত। দিতেন। দিতে। দিতি। দিতাম।	সাধু রীতির মতো।
দিতেছিল। দিতেছিলেন। দিতেছিলে। দিতেছিলি। দিতেছিলাম।	দিচ্ছিলি। দিচ্ছিলেন। দিচ্ছিলে। দিচ্ছিলি। দিচ্ছিলাম।
দিয়াছিল। দিয়াছিলেন। দিয়াছিলে। দিয়াছিলি। দিয়াছিলাম।	দিয়েছিল। দিয়েছিলেন। দিয়েছিলে। দিয়েছিলি। দিয়েছিলাম।
দিবে। দিবেন। দিবি। দিব।	দেব। দেবেন। দিবি। দে।
দিবে। দিবেন। দিও (দিয়ো)। দিস।	দেব। দেবেন। দিও (দিয়ো)। দিস।

উঠ্ ধাতুর রূপ

(আদ্যবর্ণ উ–কার যুক্ত –উড়, শুন্, পুট্, খুঁজ্, খুল্, ডুব্, তুল্ ইত্যাদি উট্ আদিগণ)

সাধু	চলিত
উঠে। উঠেন। উঠ। উঠিস। উঠি	ওঠে। ওঠেন। ওঠ। উঠিস। উঠি।
উঠিতেছে। উঠিতেছেন। উঠিতেছ। উঠিতেছিস। উঠিতেছি।	উঠছে। উঠছেন। উঠছ। উঠছিস। উঠছি।
উঠিয়াছে। উঠিয়াছেন। উঠিয়াছ। উঠিয়াছিস। উটিয়াছি।	উঠেছে। উঠেছেন। উঠেছ। উঠেছিস। উঠেছি।
উটুক। উঠুন। উঠ। উঠ্।	উঠুক। উঠুন। ওঠ। ওঠ্
উঠিল। উঠিলেন। উঠিলে। উঠিলি। উঠিলাম।	উঠল। উঠলেন। উঠলে। উঠলি। উঠলাম।
উঠিত। উঠিতেন। উঠিতে। উঠিতিস। উঠিতাম।	উঠত। উঠতেন। উঠতে। উঠতিস। উঠতাম।
উঠিতেছিল। উঠিতেছিলেন। উঠিতেছিলে। উঠিতেছিলি। উঠিতেছিলাম।	উঠছিল। উঠলিলেন। উঠছিলে। উঠছিলি। উঠছিলাম।
উঠিয়াছিল। উঠিয়াছিলেন। উঠিয়াছিলে। উঠিয়াছিলি। উঠিয়াছিলাম।	উঠেছিল। উঠেছিলেন। উঠেছিলে। উঠেছিলি। উঠেছিলাম।
উঠিবে। উঠিবেন। উঠিবে। উঠিবি। উঠিব।	উঠবে। উঠবেন। উঠবে। উঠবি। উঠব।
উঠিবে। উঠিবেন। উঠিও (উঠিয়ো)। উঠিস॥	উঠবে। উঠবেন। উঠো। উঠিস।

দ্রষ্টব্য: উঠ, ওঠ, উঠছ, উঠিল, উঠিতেছিল, উঠছিল, উঠিয়াছিল–শব্দগুলো উচ্চারণে অ–কারান্ত।

শু–ধাতু (আদ্যবর্ণ উ–কার যুক্ত–চুঁ, নু, ছুঁ ইত্যাদি শু–আদিগণ)

সাধু	চলিত
শোয়। শোন। শোও। শুস। শুই	শোয়। শোন। শোও। শুস। শুই
শুইতেছে। শুইতেছেন। শুইতেছ। শুইতেছিস। শুইতেছি	শুচ্ছে। শুচ্ছেন। শুচ্ছ। শুচ্ছিস। শুচ্ছি
শুইয়াছেন। শুইয়াছেন। শুইয়াছ। শুইয়াছিস। শুইয়াছি।	শুয়েছে। শুয়েছেন। শুয়েছ। শুয়েছিস। শুয়েছি
শুক। শোন। শোও। শো।	সাধু রীতির মতো
শুইল। শুইলেন। শুইলে। শুইলি। শুইলাম।	শুল। শুলেন। শুলে। শুলি। শুলাম।
শুইত। শুইতেন। শুইতে। শুইতিস। শুইতাম	শুম, শুতেন। শুতে। শুতিস। শুতাম
শুইতেছিল। শুইতেছিলেন। শুইতেছিলে। শুইতেছিলি। শুইতেছিলাম।	শুচ্ছিল। শুচ্ছিলেন। শুচ্ছিলে। শুচ্ছিলি। শুচ্ছিলাম
শুইয়াছিল। শুইয়াছিলেন। শুইয়াছিলে। শুইয়াছিলি। শুইয়াছিলাম।	শুয়েছিল। শুয়েছিলেন। শুয়েছিলে। শুয়েছিলি। শুয়েছিলাম।
শুইবে। শুইবেন। শুইবে। শুইবি। শুইব	শোবে। শোবেন। শোবে। শুবি। শোবা।
শুইবে। শুইবেন। শুইও (শুইয়ো)। শুইবি।	শোবো। শোবেন। শুয়ো। শুস

দ্রষ্টব্য: শুইছ, শুইতেছ, শুইয়াছ, শুয়েছ, শুইল, শুল, শুইত, শুত, শুইতেছিল, শুচ্ছিল, শুইয়াছিল, শুয়েছিল, শুইত –শব্দগুলো উচ্চারণে অ–কারান্ত।

প্রয়োজক ধাতুর রূপ

প্রযোজক ধাতুর চলিত রূপ সাধনে কখনো মূল ধাতুর সঙ্গে শুধু প্রযোজক রূপটি যুক্ত হয়। যেমন– শিক্ষক ছাত্রটিকে পড়াইয়াছেন।–সাধু রূপ।

[√পড়+আ=পড়া (প্রযোজক ধাতু) + ইয়াছেন (বিভক্তি)।

শিক্ষক ছাত্রটিকে পড়িয়েছেন–চলতি রূপ।

[√পড়+০ (অর্থাৎ প্রযোজক–প্রকরণের আ যুক্ত হলো না) + ইয়েছেন = পড়িয়েছেন–চলিত রূপ।] চলিত রূপে আরও কয়েকটি ধাতুর পরিবর্তন লক্ষণীয়–

হা– ধাতু : দাঁড়াও, তোমাকে **হওয়াচ্ছি**।

শিখ্– ধাতু : কে তোমাকে গান **শেখাচ্ছে ?**

শুন্– ধাতু : এ কী কথা **শোনালি** রে!

প্রযোজক ধাতুর বিভক্তি

বর্তমান কাল

কাল	সে		তিনি / আপনি		তুমি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সাধারণ	*য়	*য়	*ন	*ন	*ও	*ও	*ইস	*স	*ই	*ই
ঘটমান	*ইতেছে	*চ্ছে	*ইতেছেন	*চ্ছেন	*ইতেছ	*চ্ছ	*ইতেছিস	*চ্ছিস	*ইতেছি	*চ্ছি
পুরাঘটিত	*ইয়াছে	*ইয়েছে	*ইয়াছেন	*ইয়েছেন	*ইয়াছ	*ইয়েছ	*ইয়াছিস	*ইয়েছিস	*ইয়াছি	*ইয়েছি
অনুজ্ঞা	*উক	*ক	*ন	*ন	*ও	*ও	*ইস	*স		

অতীত কাল

কাল	সে		তিনি / আপনি		তুমি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সাধারণ	*ইল	*ল *লো	*ইলেন	* লেন	*ইলে	* লে	*ইলি	*লি	*ইলাম	*লাম
নিত্যবৃত্ত	*ইত	*ত *তো	*ইতেন	*তেন	*ইতে	*তে	*ইতিস	*তিস	*ইতাম	*তাম
ঘটমান	*ইতেছিল	*চ্ছিল	*ইতেছিলেন	*চ্ছিলেন	*ইতেছিলে	*চ্ছিলে	*ইতিছিলি	*চ্ছিলি	*ইতেছিলাম	*চ্ছিলাম
পুরাঘটিত	*ইয়াছিল	০ ইয়েছিল	*ইয়াছিলেন	০ ইয়েছিলেন	* ইয়াছিলে	০ ইয়েছিলে	*ইয়াছিলি	০ ইয়েছিলি	*ইয়াছিলাম	০ ইয়েছিলাম

ভবিষ্যৎ কাল

কাল	সে		তিনি/ আপনি		তুমি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সাধারণ	*ইবে	* বে	*ইবেন	* বেন	*ইবে	* বে	*ইবি	*বি	*ইব*ব	* বো
অনুজ্ঞা	*উক	*ক	* বেন	* বেন	*ইও	* য়ো	*ইস্	*স		

জ্ঞাতব্য : ধাতুর প্রযোজক রূপ সাধনে তারকা চিহ্নের (*) স্থলে মূল ধাতুর পরে (আ–কার) সংযোজিত হবে, কিন্তু ০ স্থানে হবে না।

'কর' ধাতুর প্রযোজক রূপ

কাল	সে		তিনি/ আপনি		তুমি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সাধারণ বর্তমান	করায়	করায়	করান	করান	করাও	করাও	করাইস	করাস	করাই	করাই
ঘটমান বর্তমান	কারাইতেছে	করাচ্ছে	করাইতেছেন	করাচ্ছেন	করাইতেছ	করাচ্ছ	করাইতেছিস	করাচ্ছিস	করাইতেছি	করাচ্ছি
পুরাঘটিত বর্তমান	করাইয়াছে	করায়েছে করিয়েছে	করাইয়াছেন	করিয়েছেন	করাইয়াছ	করিয়েছ	করাইয়াছিস	করিয়েছিস	করাইয়াছি	করিয়েছি
অনুজ্ঞা/অ াকাঙ্ক্ষা বর্তমান	করাক	করাক	করান	করান	করাও	করাও	করাইস	করাস	করাই	করাই
সাধারণ অতীত	করাইল	করাল	করাইলেন	করালেন	করাইলে	করালে	করাইলি	করালি	করাইলাম	করালাম
নিত্যবৃত্ত অতীত	করাইত	করাত	করাইতেন	করাতেন	করাইতে	করাতে	করাইতিস	করাতিস	করাইতাম	করাতাম
ঘটমান অতীত	করাইতেছিল	করাচ্ছিল	করাইতেছিলেন	করাচ্ছিলেন	করাইতেছিলে	করাচ্ছিলে	করাইতেছিলি	করাচ্ছিলি	করাইতেছিলাম	করাচ্ছিলাম
পুরাঘটিত অতীত	করাইয়াছিল	করিয়েছিল	করাইয়াছিলেন	করিয়েছিলেন	করাইয়াছিলি	করিয়েছিলে	করাইয়াছিলি	করিয়েছিলি	করাইয়াছিলাম	করিয়েছিলাম
সাধারণ ভবিষ্যত	করাইবে	করাবে	করাইবেন	করাবেন	করাইবে	করাবে	করাইবি	করাবি	করাইব	করাব
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	করাক	করাক	করান	করান	করাইও	করায়ো	করাইস	করাস		

পরিশিষ্ট: ধাতুর চলিত রূপ সাধানে কতিপয় পরিবর্তন

১. মূলস্বর অ–কারান্ত

কাহ্ ধাতু : কইতাম, কইলাম, কইতি, কইতিস, কয়েছিস ইত্যাদি।

২. মূলস্বর অ–কারান্ত

ক. খা–ধাতু : খেলাম (খাইলাম), খেলেন (খাইলেন), খেল, খেলে, (খাইল), খেয়েছে ইত্যাদি।

খ. যা–ধাতু : গেল (যাইত), গিয়েছিল, যেত– যেতো (যাইত), যেতেছিল, যাচ্ছিল (যাইতেছিল) ইত্যাদি।

গ. গাহ্ (গৈ)–ধাতু : (চলিত রূপ)–গাইত, গাইলাম, গেয়েছি, গেয়েছিলাম, গেয়েছ, গাইলে, গাইতিস, গাইছিস, গাইবে, গাবে, গাইব, গাব ইত্যাদি।

৩. মূলস্বর ই বা ঈ–কারান্ত : শুন্ ধাতু– শোনো, শোনেন, শোনে, শুনলাম, শুনেছি, শুনতাম, শুনেছিস, শোনাও ইত্যাদি।

৪. মূলস্বর উ–কারান্ত : শুন্ ধাতু– শোনে, শোনেন, শোনে, শুনলাম, শুনেছি, শুনতাম, শুনেছিস, শোনাও ইত্যাদি।

৫. মূলস্বর এ–কারান্ত : দে, (দি) ধাতু–দিই, দেয়, দেন, দিন, দাও, দিলাম, দিয়েছিলাম, দিতাম (দিতুম), দেব (দেবো), দিচ্ছি, দিচ্ছিমুল, দাও, দে, দিন, দিক, দিয়ো (দিবো) ইত্যাদি।

৬. মূলস্বর ও–কারান্ত : ধো–ধাতু–ধোয়া, ধোন, ধোও, ধুচ্ছিস, ধুইবি, ধুয়েছিস, ধাস ইত্যাদি। বাকিসবগুলো উ–কার যুক্ত ধাতুর রূপের ন্যায়।

প্রয়োজক ধাতুর চলিত রূপ সাধনে কয়েকটি পরিবর্তন

(বন্ধনীর মধ্যে সাধু রূপটিও দেখানো হলো)

ক. মূলস্বর অ-কারান্ত : 'হ' – হইয়েছে (হওয়াইয়াছে), হইয়েছিস (হওয়াইয়াছিস), হইয়েছিলুম (হওয়াইয়াছিলুম), হওয়াচ্ছি (হওয়াইতেছি), হয়ায়ো (হওয়াইও)।

খ. মূলস্বর ই-ঈ কারান্ত : হলে প্রয়োজক ধাতুর চলিত রূপ কখনো ই-কারান্ত এবং কখনো এ-কারান্ত হয়। যেমন-(সাধু) শিখ > (চলিত) শেখ (ধাতু)।

রূপ-সাধন: শিখাই-শেখাই-শিখুই। শেখালুম-শিখোলুম। শেখালে-শিখোলে। শেখাতুম-শিখোতুম। শেখাতিস-শিখেতিস। শেখাত-শিখোতো। শেখাবি-শিখাবি। শিখাচ্ছি-শেখেচ্ছি (শিখাচ্ছি)। শেখাচ্ছে-শিখুচ্ছে। শেখাচ্ছিল-শিখেচ্ছিল। শেখাও- শেখোও। শেখ-শিখো।

গ. মূলস্বর উ-কারান্ত : এর দুটো রূপ দেখা যায়। বন্ধনীর মধ্যে দ্বিতীয় রূপটিও দেখানো হলো।

শুন-ধাতুর রূপ সাধন : শুনাই (শোনাই)। শোনাও (শুনোও)। শুনান (শুনোন)। শোনায় (শুনোয়)। শুনানি (শুনোনি)। শুনালুম (শুনোলুম)। শোনাতুম (শুনোতুম)। শোনাতিস (শুনেতিস-শুনোতিস-শুনতিস)। শোনাব (শুনোব)। শোনাচ্ছ (শুনাচ্ছ)। শোনাও (শোনোও)। শোনাস (শুনোস) ইত্যাদি।

বাক্য গঠন : আহ! কী হওয়াটাই না তুমি **হওয়ালে**। দাঁড়াও তোমাকে শেখাচ্ছি। তুই আর আমাকে কী **শিখুবি?** রোজ তোমাকে কত রূপকথা **শোনাই**। 'কী কথা শুনালি মোরে'। ওকে তুমি কী শুনাচ্ছ?

কয়েকটি অসম্পূর্ণ ধাতু

বাংলা ভাষায় কয়েকটি ধাতুর সকল কালের রূপ পাওয়া যায় না। সাধারণ সহকরী ক্রিয়া গঠনে এদের কয়েকটি রূপ পাওয়া যায় মাত্র। যেমন-

১. √আ-আইল > এল। আইলেন>এলেন। আইলে>এলে। আইলি>এলি। আইলাম>এলাম। আয় (অনুজ্ঞা)।
২. √আছ্-(বর্তমান কালে) : আছে, আছেন, আছ, আছিস, আছি। (অতীত কালে) ছিল, ছিলেন, ছিলে, ছিলি, ছিলাম।
৩. নাহ্-ধাতু-(বর্তমান কালে) : নন, নহে, নহেন>নন, নহ, নও, নহস, নহিস, নস, নহি, নই।
৪. বাট্ ধাতু -(বর্তমান কালে) : বটে, বটেন, বট, বটিস, বটি।
৫. থাক্ (রহ্) ধাতু (বর্তমান কালে) : থাকে, থাকেন, রহেন, থাক, (রও), থাকিস, (রস, রোস, রহিস), থাকি (রই), থাকে (রয়) ইত্যাদি।

অতীত কাল : রহিত (রইত), রহিতেন (রইতেন), রহিতাম (রইতাম-রইতুম) ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কাল : রহিবে, (রইবে, রবে), রহিবেন (রইবেন), রহিবি (রইবি), রহিব (রইবো), রহিস (রোস, রোসো)।

বাক্য গঠন : 'কোথাকার জাদুকর **এলি** এখানে।' **আইল** রাক্ষসকুল প্রভঞ্জ বেগে।' কেমন **আছিস?** কোথায় **ছিলি?** সে ব্যক্তিটি তুমি **নও**। 'একা দেখি কুলবধূ, কে **বট** আপনি? 'আজ ঘরে একলাটি পারবো **না রইতে**।' **রোসো**, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।'

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন-

১. বাংলা ভাষার ধাতুর রূপ কয়টি?

ক. ১৮টি
খ. ১৯টি
গ. ২০টি
ঘ. ২১টি

২. কোন গুচ্ছের সবগুলো ধাতু উট-আদি গণের অন্তর্ভুক্ত?

ক. শুন্ খুঁজ্, ডুব, তুস্
খ. সহ্, কহ্, বস্, শুন্,

গ. লিখ্, কিন্, বাহ্, ডুব্ ঘ. কিহ্, ডুব্, লিখ্, শুন্

৩. কর্-ধাতুর উত্তম পুরুষ পুরাঘটিত অতীতে চলিত রূপ কোনটি?

ক. করতাম খ. করিতাম

গ. করিয়াছিলাম ঘ. করেছিলাম

৪. যা–ধাতুর মধ্যম পুরুষ নিত্যবৃত্ত অতীতের চলিত ভাষার রূপ কোনটি?

ক. গিয়েছিলে খ. যাচ্ছিলি

গ. যেতে ঘ. যাইত

৫. দে–ধাতুর প্রথম পুরুষ ঘটমান বর্তমানের চলিত রীতির রূপ কোনটি?

ক. দিতেছে খ. দিচ্ছে

গ. দিত ঘ. দিয়েছিল

৬. কোন গুচ্ছের সবগুলো ধাতু সম্পূর্ণ ধাতু?

ক. আ, বট, শিখ্, যা খ. আছ, তা, শিখ, যা

গ. আ, থাক্, আছ, বট্, ঘ. থাক্, বট, আ, শিখ্

৭. প্রযোজক যা–ধাতুর পুরাঘটিত অতীত কালের প্রথম পুরুষের চলিত রূপ কোনটি?

ক. গেল খ. গিয়েছিল

গ. যেত ঘ. গিয়েছিল

৮. নহ্-ধাতুর সাধারণ বর্তমান উত্তম পুরুষের চলিত রূপ কোনটি?

ক. নহি খ. নহে

গ. নই ঘ. নয়

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. ক্রিয়া বিভক্তি কী? ক্রিয়া বিভক্তি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : ক.

নিজে করুন।

পাঠ-৪.৭ : অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ কী তা বলতে পারবেন।
- অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- অনুসর্গের প্রকারভেদ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- অনুসর্গের প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলোর নিজস্ব অর্থ ও স্বতন্ত্র প্রয়োগ রয়েছে, যা কখনো স্বাধীন পদরূপে, আবার কখনো শব্দ–বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ বলে।

অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ

যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদ রূপে, আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্যে করে, সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে। অনুসর্গগুলো কখনো প্রতিপদিকের পরে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো বা 'কে' এবং 'র' বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে বসে–

বিনা : দুঃখ **বিনা** সুখ লাভ হয় কি মহীতে? (প্রতিপদিকের পরে)
সনে : ময়ূরীর **সনে** নাচিছে ময়ূর। (ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)
দিয়ে : তোমাকে **দিয়ে** আমার চলবে না। (দ্বিতীয়ার 'কে' বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)
এরূপ : হতে, দিয়ে, থেকে, মাঝে, পরে ইত্যাদি।

অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দের বৈশিষ্ট্য

১. অনুসর্গের নিজস্ব অর্থ থাকে।
২. অনুসর্গের স্বতন্ত্র প্রয়োগ আছে।
৩. অনুসর্গ সম্পর্কিত শব্দটির ডানদিকে একটু তফাতে বসে।
৪. অনুসর্গ সাধারণত শব্দের পরে বসলেও কখনো কখনো পূর্বেও বসে।

অনুসর্গের প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় বহু অনুসর্গ আছে। যেমন– প্রতি, বিনা, বিহনে, সহ, ওপর, অবধি, হেতু, মধ্যে, মাঝে, পরে, ভিন্ন, বই, ব্যতীত, জন্যে, জন্য, পর্যন্ত, অপেক্ষা, সহকারে, তরে, পানে, নামে, মত, নিকট, অধিক, পক্ষে, দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক, সাথে, সঙ্গে, হইতে, হতে, থেকে, চেয়ে, পাছে, ভিতর, ভেতরে ইত্যাদি।

এদের মধ্যে দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক, হইতে (হতে), চেয়ে, অপেক্ষা, মধ্যে প্রভৃতি কয়েকটি অনুসর্গ বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়। কারক প্রকরণে এদের উদাহরণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

অনুসর্গের প্রয়োগ

অনুসর্গের প্রয়োগ	
বিনা/বিনে	কর্তৃকারকের সঙ্গে– তুমি **বিনা (বিনে)** আমার কে আছে?
বিনি	করণ কারকের সঙ্গে –**বিনি** সুতায় গাঁথা মালা।
বিহনে	উদ্যম **বিহনে** কার পুরে মনোরথ?
সহ	সহগামিতা অর্থে–তিনি **পুত্রসহ** উপস্থিত হলেন।
সহিত	সমসূত্রে অর্থে–শত্রুর **সহিত** সন্ধি চাই না।
সনে	বিরুদ্ধগামিতা অর্থে– 'দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে **ভুজঙ্গ সনে**।'

সঙ্গে	তুলনায়–মায়ের **সঙ্গে** এ মেয়ের তুলনা হয় না।
অবধি	পর্যন্ত অর্থে– সন্ধ্যা **অবধি** অপেক্ষা করব।
পরে	স্বল্প বিরতি অর্থে– এ ঘটনার **পরে** আর এখানে থাকা চলে না।
পর	দীর্ঘ বিরতি অর্থে– শরতের **পরে** আসে বসন্ত।
পানে	প্রতি, দিকে অর্থে– ঐ তো ঘর **পানে** ছুটেছেন।
	‘শুধু তোমার মুখের **পানে** চাহি বাহির হনু।’
মতো	ন্যায় অর্থে– বেকুবের **মতো** কাজ করো না।
তরে	মত অর্থে–এ জন্মের **তরে** বিদায় নিলাম।
পক্ষে	সক্ষমতা অর্থে– রাজার **পক্ষে** সবকিছুই সম্ভব।
	সহায় অর্থে– আসামির **পক্ষে** উকিল কে?
মাঝে	মধ্যে অর্থে- ‘সীমার **মাঝে** অসীম তুমি’।
	একদেশিক অর্থে– এ দেশের **মাঝে** একদিন সব ছিল।
	ক্ষণকাল অর্থে– নিমেষ **মাঝেই** সব শেষ।
কাছে	নিকটে অর্থে– আমার **কাছে** আর কে আসবে।
	কর্মকারকে ‘কে’ বোঝাতে– ‘রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের **কাছে**।’
প্রতি	প্রত্যেক অর্থে – মণপ্রতি পাঁচ টাকা লাভ দেব।
	দিকে বা ওপর অর্থে –নিদারুণ তিনি অতি অতি, নাহি দয়া তব **প্রতি**।’
হেতু	নিমিত্ত অর্থে– ‘কী **হেতু** এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া।’
জন্যে	নিমিত্ত অর্থে – ‘এ ধন-সম্পদ তোমার **জন্যে**।’
সহকারে	সঙ্গে অর্থে– আগ্রহ **সহকারে** কহিলেন।
বশত	কারণে অর্থে–দুর্ভাগ্য**বশত** উপস্থিত হতে পারিনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. অনুসর্গ সাধারণত কোথায় বসে?

ক. শব্দের পূর্বে | খ. শব্দের পরি
গ. শব্দের মধ্যে | ঘ. বাক্যের শেষে

২. অনুসর্গ কী?

ক. শব্দ-বিভক্তি | খ. ক্রিয়া-বিভক্তি
গ. উপসর্গ | ঘ. অব্যয়

৩. ‘শরতের পর আসে বসন্ত’। এখানে ‘পর’ অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. দীর্ঘ বিরতি | খ. বিরতি
গ. অল্প বিরতি | ঘ. নৈটক্য

৪. ‘কী হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া।’ –‘হেতু’ অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করেছে?

ক. ব্যাপার | খ. প্রার্থনা
গ. নিমিত্ত | ঘ. প্রসঙ্গ

৫. এ দেশের মাঝে এক দিন সব ছিল। এখানে ‘মাঝে’ –অনুসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. সর্বত্র | খ. মধ্যে
গ. একদেশিক | ঘ. ব্যপ্তি

৬. তোমার তরে এনেছি মালা গাঁথিয়া। –এখানে 'তরে' শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. মত
খ. নিকট
গ. মধ্যে
ঘ. নিমিত্ত

৭. 'দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুভে ভুজঙ্গ সনে।' –এখানে 'সনে' শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. বিরুদ্ধগামিতা
খ. সঙ্গে
গ. প্রতি
ঘ. হেতু

৮. 'বিনে স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা'। –এখানে 'বিনে' কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. সঙ্গে
খ. প্রযোজন
গ. ব্যতিরেকে
ঘ. আবশ্যিকতা

৯. 'আছ তুমি প্রভু, জগৎ মাঝারে।' –এখানে 'মাঝারে' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. বাইরে
খ. ব্যাপ্তি
গ. মধ্যে
ঘ. সঙ্গে

১০. অনুসর্গ কী করে?

ক. বিভক্তির কাজ করে
খ. শব্দের অর্থের পরিবর্তন করে
গ. শব্দের অর্থের পরিবর্তন করে
ঘ. বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. অনুসর্গ কী? অনুসর্গের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২. বাংলা অনুসর্গগুলির প্রয়োগ দেখান– প্রতি, সহিত, বশত, মতো, হেতু।

উত্তরমালা : ক.

ইউনিট ৫
বাক্যতত্ত্ব

ভাষাবিজ্ঞানের চারটি শাখার মধ্যে বাক্যতত্ত্ব অন্যতম। ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় বাক্যের গঠন-বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয়, এক কথায় তাকে বলা যেতে পারে বাক্যতত্ত্ব। বাক্যতত্ত্বকে আবার প্রথাগত, সাংগঠনিক ও রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল– এ তিন পদ্ধতি অনুসারে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। প্রথাগত বাক্যতত্ত্বের আদিভূমি হিসেবে প্রাচীন গ্রিস, রোম ও ভারতবর্ষের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথাগত বাক্যতত্ত্বে অর্থকে প্রাধান্য দেয়া হত বেশি, সাংগঠনিক ব্যাকরণে সংগঠনকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। বাক্যতত্ত্বের আলোচনায় রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল বাক্যতত্ত্ব নতুন যুগের সূচনা করে।

আমেরিকার বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী আব্রাহাম নোয়াম চমস্কি রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল বাক্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ব্যাকরণ রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ নামে পরিচিত। ১৯৫৭ সালে চমস্কি *Syntactic structures* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের ধারণা দেন। এ ব্যাকরণ রচনার মধ্য দিয়েই চমস্কি ভাষাবিজ্ঞানের জগতে অন্যতম প্রতিভূ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। এ ব্যাকরণে তিনি ভাষার মূল উপকরণ হিসেবে বাক্যকে গণ্য করেছেন। বাক্যতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর মূল কথা হলো ব্যাকরণের নিয়ম সসীম কিন্তু বাক্য অসীম। প্রতিদিন মানুষ ভাষার যে বাক্য ব্যবহার করে তা মুখস্ত করে ব্যবহার করে না; মানুষ বাক্য সৃজন করে এবং রূপান্তর করে বাক্য ব্যবহার করে। তাঁর ব্যাকরণের কিছু অভিধা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ অভিধাগুলো হলো– রূপান্তর, সৃষ্টিশীলতা, গভীরতল ও উপরিতল, ভাষাবোধ ও ভাষা প্রয়োগ, ভাষা সার্বজনীনতা, মৌলিক বাক্য ইত্যাদি। এসব অভিধা বিশ্লেষণ করলে চমস্কির ব্যাকরণের স্বাতন্ত্র্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বাক্যের আলোচনায় তিনি মন, ভাষা, চিন্তা, মস্তিষ্ক প্রভৃতি বিষয়ের ভুমিকার কথাও আলোচনা করেছেন। তিনি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন।

পাঠ-৫.১ : বাক্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বাক্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারেন।
- একটি সার্থক বাক্যের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাক্যের যোগ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাক্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

বাক্য অর্থ কথ্য বা কথিত বিষয়। সাধারণভাবে বলা যায়, কয়েকটি শব্দ একত্রিত হয়ে যদি সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করে তবে তাকে বলা হয় বাক্য। অর্থাৎ যথাযথ বিন্যস্ত অর্থবোধক পদসমষ্টি যদি একটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে তবে তাকে বলা হয় বাক্য। অন্যভাবে বলা যায়, যেসব শব্দ বা পদ মিলে সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ পায়, তাদের সমষ্টিকে বাক্য বলে।

ভাষার মূল উপকরণ বাক্য, আর বাক্যের মূল উপাদান হলো শব্দ বা পদ। কতগুলো শব্দ বা পদ মিলে বাক্য গঠিত হলেও যে কোনো পদ বা শব্দ সমষ্টিকে বাক্য বলা যায় না। পদসমষ্টি মিলে যদি মনের ভাব বা অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে বাক্যের মর্যাদা দেয়া হয়। কতগুলো শব্দ মিলে বাক্য গঠিত হবে তার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। বাক্যে শব্দ কমও হতে পারে আবার বেশিও হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে ভাষাব্যবহারকারী তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য যত শব্দের প্রয়োজন মনে করবেন তা নিয়েই তিনি বাক্য তৈরি করবেন। তবে সব বাক্যে ক্রিয়াপদ থাকতে হবে। ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্যের অর্থ পূর্ণ হয় না। কোনো একটি বাক্যে একটি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হতে পারে আবার একাধিক ক্রিয়াপদও ব্যবহৃত হতে পারে।

বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদ দৃশ্যমান হতে পারে আবার ক্রিয়াপদ বাক্যে উহ্যও থাকতে পারে। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে ভাষাবিশেষজ্ঞগণ নিম্নরূপে বাক্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন–

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'যে পদ বা শব্দসমষ্টির দ্বারা কোনও বিষয়ে বক্তার ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।'

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বলেন, 'যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোন বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।'

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'পরস্পর অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট যে পদগুলোর দ্বারা একটি সম্পূর্ণ ধারণা বা বক্তব্য বা ভাব প্রকাশ পায়, সেই পদগুলোরর সমষ্টিকে বাক্য বলে।'

বাক্যের অংশ

প্রতিটি বাক্যের দুটি অংশ থাকে– উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকে বলা হয় উদ্দেশ্য। আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। যেমন– আদিব স্কুলে যায়। এ বাক্যের উদ্দেশ্য হলো আদিব। আর স্কলে যায়– এটি বিধেয়।

সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্য বা গুণ

একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকে–

ক) আকাঙ্ক্ষা
খ) আসত্তি ও
গ) যোগ্যতা

ক. আকাঙ্ক্ষা : বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য একপদের পর অন্যপদ শোনার যে আগ্রহ জাগে, তাকে বলা হয় আকাঙ্ক্ষা। বাক্যে গঠনে যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয় তার সাহয্যে বক্তার ইচ্ছা পূরণ হলেই এ শর্ত মতে তা বাক্য হবে। যেমন– চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। এ বাক্যে শ্রোতার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্ত হয়েছে বলে এটি বাক্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয় সূর্য পৃথিবীর চারদিকে.... তাহলে এ শব্দসমষ্টি শোনার পরে শ্রোতার মনে আরও ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা জন্মাবে। অতএব এখানে 'ঘোরে' শব্দটি শ্রোতার শোনার যে আগ্রহ তাই হলো আকাঙ্ক্ষা।

খ. আসত্তি : বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলোর মাঝে অর্থের সঙ্গতি বা মিল রাখার জন্য সুশৃঙ্খলভাবে পদবিন্যাসকেই বলা হয় আসত্তি। মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যের পদগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে অর্থ প্রকাশে বাধার সৃষ্টি না করে। যেমন– কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত– লেখা হওয়াতে পদ সন্নিবেশ ঠিকভাবে না হওয়ায় শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয়নি। তাই এটি বাক্য হয়নি। মনোভাব প্রকাশের জন্য এ পদগুলোকে এভাবে সাজাতে হবে– কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

গ. যোগ্যতা : বাক্যস্থিত পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলো অর্থগত ও ভাবগত দিক থেকে মিলে গেলে সে বাক্য যোগ্যতা সম্পন্ন হবে। যেমন– বর্ষাকালে বেশি বৃষ্টি হয়। পাখিরা আকাশে উড়ে। এ বাক্য দুটি যোগ্যতা সম্পন্ন বলে অর্থ প্রকাশে কোনো সমস্যা হয়নি। কারণ বাক্য দুটিতে ভাবগত ও অর্থগত সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয়, বর্ষার রোদ্রে প্লাবনের সৃষ্টি হয়। মাছেরা আকাশে উড়ে। তাহলে বাক্য দুটি যোগ্যতা হারাবে। কারণ বাস্তবতার সঙ্গে বাক্য দুটির কোনো মিল নেই। বাক্যের অর্থ ও বাস্তবতার সাথে মিল থাকতে হবে। অর্থাৎ বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত ও ভাবগত মিলন বন্ধন থাকতে হবে।

বাক্যের যোগ্যতা

একটি বাক্যের যোগ্যতার সঙ্গে যেসব বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে তা নিচে আলোচনা করা হয়েছে।

১. রীতি সিদ্ধ অর্থবাচকতা **: প্রকৃতি ও প্রত্যয়জাত অর্থে শব্দ ব্যবহৃত হয়। যোগ্যতার দিক থেকে রীতিসিদ্ধ অর্থের** দিকে লক্ষ রেখে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন–

শব্দ	রীতিসিদ্ধ অর্থ	প্রকৃতি+ প্রত্যয়	প্রকৃতি + প্রত্যয়জাত অর্থ
বাধিত	কৃতজ্ঞ বা অনুগৃহীত	বাধ + ইত	বাধাপ্রাপ্ত
তৈল	তিল জাতীয়	তিল +ষ্ণ	তিলজাত স্নেহ পদার্থ/ যে কোন শস্যের রস

২. **দুর্বোধ্যতা :** অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন– তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছ। (এখানে শব্দটি চাতুরী বা মায়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু বাংলায় প্রপঞ্চ শব্দটি অপ্রচলিত)।

৩. **গুরুচণ্ডালী দোষ :** তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ ঘটলে যে দোষের সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় গুরুচণ্ডালী দোষ। তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনও কখনও গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুষ্ট শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন– গরুর গাড়ি, শবদাহ, মড়াপোড়া প্রভৃতি হলো তৎসম শব্দ। গঠন ও অর্থের দিক থেকে এসব শব্দের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি বলা হয় যথাক্রমে গরুর শকট, শবপোড়া, মড়াদাহ; তাহলে দেশীয় শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দের মিলন ঘটে এবং তাতে শব্দ গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট হয়।

৪. **বাগধারার পরিবর্তন :** বাগধারা ভাষার সম্পদ। বিশেষ অর্থে এসব শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাগধারার গঠনের একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকে। এ গঠনের যথেচ্ছ পরিবর্তন ঘটলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমনঃ অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন) না ব্যবহার করে যদি বলা হয় বনে ক্রন্দন তবে বাগধারাটি যোগ্যতা হারাবে।

৫. **উপমার ভুল প্রয়োগ :** উপমা ভাষাবিশেষের সম্পদ। বিশেষ অর্থে প্রসঙ্গ অনুযায়ী এসব উপমা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সঠিকভাবে এসব উপমা ব্যবহার না করলে বাক্য তার যোগ্যতা হারায়। যেমন– আমার হৃদয় মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হল। এখানে উপমার ভুল প্রয়োগ ঘটেছে, কারণ বীজ মন্দিরে বপন করা হয় না, বপন করা হয় ক্ষেতে। বাক্যটি হবে– আমার হৃদয় ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হল।

৬. **বাহুল্য দোষ :** প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং শব্দ তার যোগ্যতা গুণ হারিয়ে ফেলে। যেমন– দেশের সব শিক্ষকগণ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। বাংলা ভাষায় একই বাক্যে দুইবার বহুবচন ব্যবহৃত হয় না। দুইবার বহুবচন বাচক চিহ্ন বা শব্দ ব্যবহার করলে শব্দ বাহুল্য দোষে দুষ্ট হয়। বাক্যটি হবে– দেশের সব শিক্ষক এখানে উপস্থিত হয়েছেন অথবা দেশের শিক্ষকগণ এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. দুই বা ততোধিক শব্দ একত্রে মিলিত হয়ে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে, তাকে কী বলে?
ক) শব্দ খ) বাক্য
গ) ধ্বনি ঘ) অর্থ

২. বাক্য ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
ক) ধ্বনিতত্ত্ব খ) রূপতত্ত্ব
গ) বাক্যতত্ত্ব ঘ) অর্থতত্ত্ব

৩. বাক্য শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী?
ক) আলোচনা খ) কথা
গ) কথ্য বা কথিত বিষয় ঘ) উক্তি

৪. প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহৃত করলে বাক্যে কোন দোষ ঘটে?
ক) গুরুচণ্ডালী খ) দুর্বোধ্যতা
গ) অর্থ প্রকাশে অক্ষমতা ঘ) বাহুল্যদোষ

৫. একটি বাক্যের প্রধানত অংশ থাকে কয়টি?
ক) দুটি খ) তিনটি
গ) চারটি ঘ) পাঁচটি

উত্তরমালা : ক.

১. খ ২. গ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ক

পাঠ-৫.২ : বাক্যের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বাংলা বাক্যের প্রকারভেদ করতে পারবেন।
- প্রকারভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন বাক্যের উদাহরণ দিতে পারবেন।

বাক্যের প্রকারভেদ

বাক্যকে প্রধানত দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা হয়েছে–

ক) অর্থ অনুসারে এবং
খ) গঠন অনুসারে।

ক) অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

অর্থানুসারে বাক্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. **বর্ণনা বা বিবরণমূলক বাক্য :** যে বাক্যের সাহায্যে কোনো কিছু বর্ণনা বা বিবৃত করা হয়, সে বাক্যকে বলা হয় বর্ণনামূলক বাক্য। যেমন– পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। লোকটি প্রতিদিন পুকুরে সাতার কাটে। সে কবিতা লিখছে ইত্যাদি। এ বাক্যকে আবার অস্তিবাচক বা হ্যাঁসূচক বাক্য ও নেতিবাচক বা না-সূচক বাক্য– এ দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

   ক. অস্তিবাচক বাক্য : যে বাক্য দ্বারা কোনো কিছুর বর্ণনায় ইতিবাচক দিক তুলে ধরা হয়, সে বাক্যকে বলা হয় অস্তিবাচক বাক্য। যেমন– আমি প্রত্যদিন সকালে হাটি। ছাত্ররা নিয়মিত লেখাপড়া করে। ভালো লোক ভালো কাজের পরামর্শ দেন।

   খ. নেতিবাচক বাক্য : যে বাক্যের সাহায্যে কোন কিছুর নেতিবাচক বর্ণনা দেয়া হয়, তাকে বলা হয় নেতিবাচক বাক্য। যেমন– সে এখন আর গান গায় না। ছেলেটির অসুখ এখনও ভালো হয়নি। তিনি এবার গ্রামে যাবেন না ইত্যাদি।

২. **প্রশ্নবোধক বাক্য :** যে বাক্যের সাহায্যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হয়, তাকে বলা হয় প্রশ্নবোধক বাক্য। যেমন: তুমি কি লোকটিকে চিন? সে কি আজ বাড়ি যাবে? তুমি কি প্রতিদিন স্কুলে যাও ইত্যাদি।

৩. **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য :** যে বাক্যের সাহায্যে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ, প্রস্তাব ইত্যাদি প্রকাশিত হয় তাকে বলা হয় অনুজ্ঞাসূচক বাক্য। যেমন–
   আদেশ : এখান থেকে বিদায় হও।
   অনুরোধ : দয়া করে আমার কাজটি করে দাও।
   উপদেশ : অযথা সময় নষ্ট করো না।
   নিষেধ : অনুমতি ছাড়া কখনও তার ঘরে প্রবেশ করো না।
   প্রস্তাব : চল, খেলার মাঠে ফুটবল খেলি আসি।

৪. **ইচ্ছাসূচক বাক্য :** এ ধরনের বাক্যে শুভজনক প্রার্থনা, আশিস, আকাঙ্ক্ষা করা হয়। যথা– তোমার মঙ্গল হোক। পরীক্ষায় সফল হও।

৫. **বিস্ময়সূচক বাক্য :** যে বাক্যে আশ্চর্যজনক কিছু বুঝায় তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। যথা– হুররে, আমরা জিতেছি!

খ) গঠন অনুসারে বাক্য : গঠনগত দিক থেকে বিচার করলে বাক্য তিন প্রকার। যথা–

১. সরল বাক্য

২. মিশ্র বা জটিল বাক্য

৩. যৌগিক বাক্য।

১. সরল বাক্য : যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় থাকে তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন– রহিমা প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায়। বাক্যটিতে 'রহিমা' উদ্দেশ্য এবং 'প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায়' বিধেয়।

২. মিশ্র বা জটিল বাক্য : কোন কোন বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অর্থাৎ কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া ছাড়া এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ড বাক্য থাকতে পারে। এ অপ্রধান খণ্ডাংশ মূল বাক্যেরই অংশ। এ ধরনের বাক্যকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যেমন– যে সত্যবাদি, তাকে সবাই ভালোবাসে। বাক্যটিতে 'যে সত্যবাদি' অপ্রধান খণ্ডবাক্য আর 'তাকে সবাই ভালোবাসে' অংশটি প্রধান খণ্ড বাক্য।

খণ্ডবাক্য : একাধিক বাক্য মিলে একটি জটিল বাক্য তৈরি হলে বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি বাক্য যদি স্বাধীন বাক্য না হয়ে অন্য কোনো বাক্যের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে খণ্ড বাক্য বলে। যেমন– যদি তুমি আস তাহলে আমি যাব। এখানে 'তুমি আস এবং আমি যাব' বাক্যাংশ দুটি খণ্ড বাক্য।

৩. যৌগিক বাক্য : দুই বা তার বেশি সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি দীর্ঘ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো এবং, ও, কিন্তু, অথবা, কিংবা, বরং, তথাপি ইত্যাদি অব্যয়যোগে সংযুক্ত থাকে। যেমন– দোষ করেছ অতএব শাস্তি পাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন–

১. কয়টি দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা বাক্য বিভাজন করা হয়েছে ?

ক) একটি　　খ) দুটি
গ) তিনটি　　ঘ) চারটি

২. গঠন অনুসারে বাংলা বাক্য কত প্রকার?

ক) দুই　　খ) তিন
গ) তিন　　ঘ) চার

৩. জ্ঞানী লোক সবার শ্রদ্ধা পান– এটি কোন ধরনের বাক্য?

ক) জটিল　　খ) সরল
গ) যৌগিক　　ঘ) বিশুদ্ধ

৪. তার ধন আছে, কিন্তু বিদ্যা নেই– এটি কোন ধরনের বাক্য?

ক) সরল　　খ) জটিল
গ) যৌগিক　　ঘ) প্রশ্নসূচক

৫. কোনটি জটিল বাক্যের উদাহরণ?

ক) আমি কাজটি করতে পারব।　　খ) যদি সে আসে তবে আমি যাব।
গ) মেঘ গর্জন করে এবং ময়ূর নৃত্য করে।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাক্য কাকে বলে? একটি স্বার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।
২. অর্থ অনুসারে বাক্যকে কয়ভাগে আলোচনা করা যায় উদাহরণসহ লিখুন।
৩. গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : ক.

১. খ　২. খ　৩. খ　৪. গ　৫. খ

পাঠ-৫.৩.১ : কারক ও বিভক্তি, সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বিভক্তির সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বিভক্তির প্রকারভেদ করতে পারবেন।
- পদে বিভক্তি যোগের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।

একটি বাক্যে ক্রিয়ার ভূমিকা অপরিহার্য। কেননা ক্রিয়া ছাড়া কোনো বাক্য হয় না। সে হিসেবে ক্রিয়া হচ্ছে বাক্যের কেন্দ্রীয় উপাদান। এই ক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই বাক্যের অন্যান্য উপাদান ব্যবহৃত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বাক্যে কর্তা, কর্ম ইত্যাদি বিশেষ্য অনুযায়ী ক্রিয়াপদের ভিন্নতা ঘটে থাকে। মূলত বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করার জন্য বাক্যে ক্রিয়া ছাড়াও বিভিন্ন বিশেষ্য পদ ব্যবহার করতে হয়। আর এসব বিশেষ্য পদের সাথে ক্রিয়ার সম্পর্ক নির্ধারণই কারক। এছাড়া ক্রিয়া ও বিশেষ্যপদের সম্পর্কটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাক্যস্থিত বিশেষ্য পদে বিভক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে। তাই বাংলা ব্যাকরণে কারক অংশে বিভক্তিও আলোচিত হয়ে থাকে। মূলত কারক আলাচনার মাধ্যম বাংলা বাক্যের বিভিন্ন উপাদানসমূহের ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

কারকের সঙ্গে বিভক্তির সম্পর্ক রয়েছে। তাই কারকের প্রকারভেদ আলোচনার পূর্বে বিভক্তির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ আলোচনা আবশ্যক। শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়েই শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

বিভক্তির সংজ্ঞা

যে সব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি বা চিহ্ন দ্বারা বাক্যের এক পদের সঙ্গে অন্য পদের সম্বন্ধ নির্ধারিত হয়, তাকে বলা বিভক্তি। শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হলেই তাকে বলা হয় বিভক্তি।

বিভক্তির প্রকারভেদ

বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তি দুই প্রকার–

ক) ক্রিয়া বিভক্তি এবং

খ) শব্দ বিভক্তি বা কারক বিভক্তি

ক) ক্রিয়া বিভক্তি : কাল ও পুরুষ অনুসারে ধাতুর পরে যেসব চিহ্ন যুক্ত হয়, তাকে বলা হয় ক্রিয়া বিভক্তি। যেমন– (কর) ছে, (ধর) ছে ইত্যাদি।

খ) শব্দ বিভক্তি বা কারক বিভক্তি : নাম পদের সঙ্গে বা বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সঙ্গে যেসব বিভক্তি যোগ করা হয় তাকে বলা হয় শব্দ বিভক্তি বা কারক বিভক্তি। যেমন–

এ, য়, তে ,ক, য়ে, অ ইত্যাদি।

বাংলায় সাত রকম শব্দ বা কারক বিভক্তি ব্যবহৃত হয়– প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী এবং সপ্তমী।

বিভক্তির আকৃতিগত পার্থক্য

একবচন ও বহুবচন ভেদে বিভক্তিগুলোর নিম্নলিখিত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়–

বিভক্তির নাম	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	০, অ, এ, য়, তে, এতে	রা, এরা, গুলি, গণ
দ্বিতীয়া		কে, রে দিগকে, দিগেরে
তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক	দিগকে, দিগেরে, দিগের, দ্বারা, দের দ্বারা

চতুর্থী	কে, রে	দিগকে, দিগেরে
পঞ্চমী		হইতে, থেকে, চেয়ে, দিগের, হইতে, দের, হইতে
ষষ্ঠী	র, এর	দিগের, দের
সপ্তমী	এ, য়, তে	দিগে, দিগেতে।

কারক ও বিভক্তি

বাংলায় কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি যুক্ত হয়, তার সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। বাংলায় সব কারকেই সব বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। সংস্কৃতে কারকের জন্য বিভক্তি নির্দিষ্ট। সংস্কৃত নিয়মে কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি যোগ হয় তার তালিকা নিম্নরূপ–

কারকের নাম	বিভক্তির নাম	বিভক্তি চিহ্ন
কর্তৃকারক	প্রথমা	শূন্য
কর্মকারক	দ্বিতীয়া	কে, রে
করণ কারক	তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক
সম্প্রদান কারক	চতুর্থী	কে, রে
অপাদান কারক	পঞ্চমী	হইতে, থেকে, চেয়ে
অধিকরণ কারক	সপ্তমী বিভক্তি	এ, য়ে, তে

বিভক্তি যোগের নিয়ম

বিভক্তি ব্যবহারের নিয়মগুলো নিম্নরূপ–

১. অপ্রাণি বা ইতর প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে রা যুক্ত হয় না; গুলো, গুলি, গুলো যুক্ত হয়। যেমন– পাথরগুলো, গরুগুলো ইত্যাদি।
২. অপ্রাণিবাচক শব্দের পরে কে, রে, বিভক্তি যুক্ত হয় না, শুন্য বিভক্তি যোগ হয়। যেমন– বই দাও।
৩. স্বরান্ত শব্দের পরে এ বিভক্তির রূপ হয়। যেমন- য় বা য়ে। এ স্থানে তে বিভক্তিও যুক্ত হতে পারে। যেমন– মা+ এ = মায়ে, ঘোড়া + য় = ঘোড়ায়, পানি + তে = পানিতে ইত্যাদি।
৪. অ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের পরে প্রায়ই প্রথমায় রা স্থানে এরা হয় এবং ষষ্ঠী বিভক্তির র স্থানে এর যুক্ত হয়। যেমন- লোক + এরা = লোকেরা, বিদ্বান + এরা = বিদ্বানেরা, লোক + এর = লোকের ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. বাংলা ভাষায় বিভক্তি দুই প্রকার। যথা– শব্দ বিভক্তি এবং ....বিভক্তি।
ক) ক্রিয়া খ) পদ গ) বাক্য ঘ) বিশেষ্য

২. বাংলা ভাষায় বিভক্তি ...... ধরনের।
ক) চার খ) পাঁচ গ) ছয় ঘ) সাত

৩. কর্তৃকারকে কোন বিভক্তি ব্যবহৃত হয়?
ক) প্রথমা খ) দ্বিতীয়া গ) তৃতীয়া ঘ) চতুর্থী

৪. অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ...... ব্যবহৃত হয় না।
ক) এরা খ) গুলো গ) গুলি ঘ) রা

৫. স্বরান্ত শব্দের পরে .... বিভক্তির রূপ হয়।
ক) য় খ) এ গ) তে ঘ) রে

উত্তরমালা :

১. ক ২. ঘ ৩. ক ৪. ঘ ৫. খ

পাঠ-৫.৩.২ : কারক

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- কারকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- কারকের প্রকারভেদ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন কারকের ব্যবহার করতে পারবেন।

কারকের সংজ্ঞা

‘কারক’ শব্দটি ভাঙ্গলে পাওয়া যায় কৃ + ণক (অক), এখানে ‘কৃ’ ধাতুর অর্থ হলো করা এবং ‘ণক’ বা ‘অক’-এর অর্থ হলো সম্পাদন। অতএব কারকের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো– যা ক্রিয়া সম্পদান করে। বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের সাথে নামপদের সম্পর্ককে বলা হয় কারক। যেমন–

আকিব বই **পড়ে**। এ বাক্যে ক্রিয়াপদ হলো ‘পড়ে’।

এই ক্রিয়াপদের সঙ্গে আকিবের একটি সম্পর্ক রয়েছে। কারণ আকিব একটি নামপদ।

কারকের প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কারক ছয় প্রকার। যথা–

ক. কর্তৃকারক, খ. কর্মকারক, গ. করণ কারক, ঘ. সম্প্দ্রান কারক, ঙ, অপাদান কারক ও চ. অধিকরণ কারক।

ক) কর্তৃকারক

সংজ্ঞা : বাক্যের যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সাহায্যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাকে বলা হয় কর্তৃকারক। যেমন–

শামীম কলেজে যাচ্ছে। এ বাক্যের কর্তা হলো বিশেষ্য পদ শামীম। অতএব শামীম হলো কর্তৃকারক।

কর্তৃকারক চার প্রকার- **১**। মুখ্য কর্তা **২**। প্রযোজক কর্তা **৩**। প্রযোজ্য কর্তা এবং ৪। ব্যতিহার কর্তা।

১. **মুখ্য কর্তা :** যে কর্তা নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে বলা হয় মুখ্য কর্তা। যেমন– মেয়েরা গান গাইছে। খেলোয়াড়গণ অনুশীলন করছে। এ দুই বাক্যের মুখ্য কর্তা হলো যথাক্রমে মেয়েরা এবং খেলোয়াড়গণ।

২. **প্রযোজক কর্তা :** কর্তা যখন অন্য কাউকে কাজে নিয়োজিত করে তখন তাকে বলা হয় প্রযোজক কর্তা । যেমন– বাবা ছেলেকে পড়াচ্ছেন। মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। এ দুই বাক্যের প্রযোজক কর্তা হলো বাবা এবং মা।

৩. **প্রযোজ্য কর্তা :** কর্তা যাকে দিয়ে কাজ সম্পাদন করে তাকে বলা হয় প্রযোজ্য কর্তা। যেমন– শিক্ষক ছাত্রদেরকে ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন। মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। এ দুই বাক্যের প্রযোজ্য কর্তা যথাক্রমে ছাত্রদেরকে এবং শিশুকে।

৪. **ব্যতিহার কর্তা :** কোনো বাক্যে যদি দুটি কর্তা একই জাতীয় কাজ সম্পন্ন করে তখন তাকে বলা হয় ব্যতিহার কর্তা। যেমন– বাঘে-মহিষে এক ঘাটে পানি খায়। রাজায় রাজায় লড়াই উলুখাগড়ার প্রাণান্ত। বাক্য দুটিতে ব্যতিহার কর্তা যথাক্রমে বাঘে-মহিষে এবং রাজায় রাজায়।

বাক্যের বাচ্য বা প্রকাশভঙ্গি অনুসারে কর্তা তিন রকম হতে পারে। যেমন–

১. কর্মবাচ্যের কর্তা (কর্মপদের প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : পুলিশ দ্বারা চোর ধৃত হয়েছে।

২. ভাববাচ্যের কর্তা (ক্রিয়ার প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : আমার যাওয়া হবে না।

৩. কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা (বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয়) : বাঁশি বাজে। কলমটা লেখে ভালো।

কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা শূন্য বা অ বিভক্তি : **খোকন** বই পড়ে।

খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : **মাসুমকে** যেতে হবে।

গ) তৃতীয় বা দ্বারা বিভক্তি : **ফেরদৌসি** কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে।

ঘ) ষষ্ঠী বা র বিভক্তি : **আমার** যাওয়া হয়নি।

ঙ) সপ্তমী বা এ বিভক্তি : **গাঁয়ে** মানে না, আপনি মোড়ল। বাপে না জিজ্ঞাসে, **মায়ে** না সম্ভাষে। পাগলে কী না বলে, **ছাগলে** কী না খায়। বাঘে–**মহিষে** খানা একঘাটে খাবেন।

য়–বিভক্তি : **ঘোড়ায়** গাড়ি টানে।

তে–বিভক্তি : গরুতে দুধ দেয়।

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবে কীসে?

কর্মকারক

সংজ্ঞা : কর্তা যাকে আশ্রয় করে বা অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে বল হয় কর্মকারক। যেমন–
সেলিম বই পড়ে– এ বাক্যের কর্ম হলো বই। কারণ বইকে আশ্রয় করে কর্তা এখানে কাজ সম্পাদন করেছে।
কর্ম প্রধানত দুই প্রকার– মুখ্য কর্ম এবং গৌণ কর্ম।

১. **মুখ্য কর্ম** : কোনো কোনো বাক্যে দুটি কর্ম থাকে। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার অপ্রাণিবাচক বা বস্তুবাচক কর্মটিকে বলা হয় মুখ্য কর্ম। যেমন– সুমি রিপনকে একটি কলম দিয়েছে। এ বাক্যে দুটি কর্ম রয়েছে– রিপন এবং কলম। কলম হলো বস্তুবাচক কর্ম; অতএব কলম হলো মুখ্য কর্ম।
২. **গৌণ কর্ম** : দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মকে বলা হয় গৌণ কর্ম। যেমন– জয়নাল, ফারুককে একটি বই দিয়েছিল। এ বাক্যের ব্যক্তিবাচক কর্ম হলো জয়নাল। অতএব ফারুক হলো গৌণ কর্ম।

কর্মকারকের প্রকারভেদ

ক) সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম : রিমা **ফুল** তুলছে।

খ) প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম : **ছেলেটিকে** বিছানায় শোয়াও।

গ) সমধাতুজ কর্ম : **খুব** এক ঘুম ঘুমিয়েছি।

ঘ) উদ্দেশ্য ও বিধেয় : দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটি পরস্পর আপেক্ষিক কর্মপদ থাকলে প্রধান কর্মপদটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য কর্ম এবং অপেক্ষিত কর্মপদটিকে বলা হয় বিধেয় কর্ম। যেমন–

দুধকে (উদ্দেশ্য কর্ম) মোরা **দুগ্ধ** (বিধেয় কর্ম) বলি, **হলুদকে** (উদ্দেশ্য কর্ম) বলি **হরিদ্রা** (বিধেয় কর্ম)।

কর্মকারকের বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা বা শূন্য অ বিভক্তি : **ডাক্তার** ডাক।

আমাকে এক খানা **বই** দাও। (দ্বিকর্মক ক্রিয়ার মূখ্য কর্ম)

রবীন্দ্রনাথ পড়লাম, **নজরুল** পড়লাম, এর সুরাহা খুঁজে পেলাম না।(গ্রন্থ অর্থে বিশিষ্ট প্রয়োগ)।

খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : **তাকে** বল।

রে বিভক্তি : '**আমারে** তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা'।

গ) ষষ্ঠী বা র বিভক্তি : **তোমার** দেখা পেলাম না।

ঘ) সপ্তমীর এ বিভক্তি : 'জিজ্ঞাসিবে জনে জনে।' (বীপ্সায়)।

করণ কারক

সংজ্ঞা : 'করণ' শব্দের অর্থ যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। ক্রিয়া সম্পাদনের উপকরণ বা উপায়কে বলা হয় করণ কারক। অন্যভাবে বলা যায়, কর্তা যে পদের সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে বলা হয় করণ কারক। ক্রিয়াপদকে কিসের দ্বারা, কিসের সাহায্যে বা কী উপায়ে ইত্যাদি প্রশ্ন করলে করণ কারক পাওয়া যায়।

সুজলা কলম দিয়ে লেখে (উপকরণ-কলম)

জগতে কীর্তিমান হও সাধনায় (উপায়-সাধনায়)

করণ কারকের বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : ছাত্ররা **ক্রিকেট** খেলছে। (অকর্মক ক্রিয়া)।

খ) তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি : **লাঙ্গল** দ্বারা জমি চাষ করা হয়।

দিয়া বিভক্তি : **মন দিয়া** কর সবে বিদ্যা উপার্জন।

গ) সপ্তমী বিভক্তি বা এ বিভক্তি : **ফুলে ফুলে** ঘর ভরেছে।
শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।
তে বিভক্তি : 'এত শঠতা, এত যে ব্যথা,
তবু যেন তা **মধুতে** মাখা।' –নজরুল।
লোকটা **জাতিতে** বৈষ্ণব।
য় বিভক্তি : **চেষ্টায়** সব হয়।
এ **সুতায়** কাপড় হয় না।

সম্প্রদান কারক

সংজ্ঞা : যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কোনো কিছু দান বা সাহায্য করা হয়, তাকে বলা হয় সম্প্রদান কারক। দানের সঙ্গে সম্প্রদানের একটি সম্পর্ক রয়েছে। কারণ কোনো কিছু দিয়ে যদি আবার ফেরত নেয়া হয় তবে তা সম্পদান কারক হয় না। যেমন- যদি বলা হয় ধোপাকে কাপড় দাও।

এটিও দেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এখানে ফেরত দেয়ার একটি শর্ত রয়েছে। অতএব এটি কর্মকারক, সম্প্রদান কারক নয়। কাজেই স্বত্ব ত্যাগ না করে কোনো কিছু না দিলে তা সম্প্রদান কারক হয় না।

কিন্তু যদি বলা হয়–

১. ভিক্ষারীকে ভিক্ষা দাও।
২. সংসারে কল্যাণ দান কর।
৩. গুরুজনে কর নতি।
৪. অন্ধজনে দেহ আলো ইত্যাদি

–বাক্যের ভিক্ষারীকে, সংসারে, গুরুজনে, অন্ধজনে ইত্যাদি হলো সম্প্রদান কারকের উদাহরণ।

অপাদান কারক

সংজ্ঞা : যা থেকে কোনো কিছু উৎপত্তি, বিচ্যুত, জাত, গৃহীত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয়, তাকে বলা হয় অপাদান কারক।

বাক্যের ক্রিয়াপদকে কোথা হতে, কি থেকে, কিসের থেকে ইত্যাদি প্রশ্ন করলে উত্তরে যে কারক পাওয়া যায়, তা-ই হলো অপাদান কারক। উদাহরণ–

বিচ্যুত : ছাদ থেকে পানি পড়ে। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় ইত্যাদি।
গৃহীত : দুধ থেকে দই হয়। বিশ্বাস থেকে বস্তু মেলে।
জাত : জমি থেকে আমরা ফসল পাই। খেজুর রসে গুড় হয়।
বিরত : পাপে বিরত হও। মিথ্যা বলা ছাড়।
দূরীভূত : দেশ থেকে পাপাচার দূর করতে হবে।
রক্ষিত : বিপদ থেকে আমায় বাঁচাও।
আরম্ভ : বুধবার থেকে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চলবে।
ভীত : বাঘে ভীত হয়।

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তি ছাড়াও হইতে, হতে, থেকে, দিয়ে, দিয়া ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।
অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ–

(ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : বোঁটা-আলগা ফল গাছে থাকে না।
'মনে পড়ে সেই জ্যৈষ্ঠ দুপুরে **পাঠশালা পলায়ন'**
(খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : **বাবাকে** বড্ড ভয় পাই।
(গ) ষষ্ঠী বা এর বিভক্তি : যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়।
(ঘ) সপ্তমী বা এ বিভক্তি : **বিপদে** মোরে করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা।

লোকমুখে শুনেছি। **তিলে** তৈলে হয়।
য় বিভক্তি : **টাকায়** টাকা হয়।

বিভিন্ন অর্থে অপাদানের ব্যবহার

(ক) স্থানবাচক :	তিনি কিশোরগঞ্জ থেকে এসেছেন।
(খ) দুরত্ববজ্ঞাপক :	ঢাকা থেকে পটুয়াখালী বরিশাল একশো কিলোমিটারেরও বেশি।
(গ) নিক্ষেপ :	বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে।

অধিকরণ কারক

সংজ্ঞা : ক্রিয়ার আধারকে বলা হয় অধিকরণ কারক। আধার বলতে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়ার স্থান, কাল ও ভাবকে বোঝায়। অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদনের কাল এবং আধারকে বলা হয় অধিকরণ কারক।

বাক্যের ক্রিয়াপদকে কোথায়, কখন ও কোনো বিষয় বোঝাতে অধিকরণ কারক হয়। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি অর্থাৎ এ, য়, তে ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন- আধার (স্থান) : আমরা প্রতিদিন কলেজে যাই। কাল (সময়) সকালে সূর্য উঠবে। এ দুই বাক্যের কলেজে এবং সকালে হলো অধিকরণ কারকের উদাহরণ।

অধিকরণ কারক তিন প্রকার–
ক) আধারাধিকরণ খ) কালাধিকরণ ও গ) ভাবাধিকরণ।

ক. আধারাধিকরণ কারক : যে স্থানে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাকে আধারাধিকরণ কারক বলে। যেমন– সাগরে পানি আছে। আপনি এ পথে যান। আধারাধিকরণ কারক আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. **ঐকদেশিক :** বিরাট স্থানের যে অংশে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে বলা হয় ঐকদেশিক আধারাধিকরণ কারক বলে। যেমন– পুকুরে মাছ আছে (পুকুরের যে কোনো স্থানে)। তেমনি বনে বাঘ থাকে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। সামীপ্য অর্থেও ঐকদেশিক অধিকরণ কারক হয়। যেমন– ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। দুয়ারে দাঁড়িয়ে প্রার্থী,ভিক্ষা দেও তারে। রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা।
২. **অভিব্যাপক :** সমগ্র স্থান বা এলাকা জুড়ে যদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তবে তাকে বলা হয় অভিব্যাপক। যেমন– পুকুরে মাছ আছে (পুকুরের সমগ্র এলাকা জুড়ে)। তিলে তেল আছে (তিলের পুরো জায়গায়)।
৩. **বৈষয়িক :** কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা বোঝাতে যে কারক হয় তাকে বলা হয় বৈষয়িক আধারাধিকরণ কারক। যেমন– আজাদ ইংরেজিতে ভালো কিন্তু বাংলায় দুর্বল। আমাদের সোনার ছেলেরা সাহসে দুর্জয়, যুদ্ধে অপরাজেয়।

খ. কালাধিকরণ কারক : যে অধিকরণ কারকের সাহায্যে ক্রিয়া সংঘটনের কালকে নির্দেশ করে তাকে বলা হয় কালাধিকরণ কারক। যেমন– শুক্রবার কলেজ বন্ধ থাকে। শীতে গাছের পাতা ঝরে যায়।

গ. ভাবাধিকরণ কারক : যে ক্রিয়া দ্বারা ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়, তাকে বলা হয় ভাবাধিকরণ কারক। যেমন– কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়। সূর্যোদয়ে চারদিক আলোকিত হয়।

অধিকরণ কারকে অন্যান্য বিভক্তি

(ক) প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি : আমি **বরিশাল** যাবো। বাবা **বাড়ি** নেই।
(খ) তৃতীয়া বিভক্তি : **খিলিপান** (এর ভিতরে) দিয়ে ওষুধ খাবে।
(গ) পঞ্চমী বিভক্তি : বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।
(ঘ) সপ্তমী বা তে বিভক্তি: এ **বাড়িতে** কেউ নেই।

অধিকরণে অনুসর্গের ব্যবহার

ঘরের **মধ্যে** কে রে? তোমার আসন পাতিব হাটের মাঝে।

সম্বধ পদ

ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখে যে নাম পদ বাক্যস্থিত অন্য পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে সম্বন্ধ বলে। যেমন– আসিয়ার ভাই বাড়ি যাবে। এখানে 'আসিয়ার' সঙ্গে 'ভাই'–এর সম্পর্ক আছে, কিন্তু 'যাবে' ক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধ নেই।

জ্ঞাতব্য: ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ পদের সম্বন্ধ নেই বলে সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না।

সম্বন্ধ পদের বিভক্তি

(ক) সম্বন্ধ পদে 'র' বা 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে। যথা: আমি + র = আমার (ভাই), খালিদ + এর = খালিদের (বই)।

(খ) সময়বাচক অর্থে সম্বন্ধ পদে কার> কের বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা–

আজি + কার= আজিকার > আজকের (কাগজ)। পুর্বে + কার= পূর্বেকার (ঘটনা)

কালি + কার= কালিকার > কালকার > কালকের (ছেলে)।

কিন্তু 'কাল' শব্দের উত্তর শুধু 'এর' বিভক্তিই যুক্ত হয়। যেমন : কাল + এর= কালের। বাক্য : সে কত কালের কথা।

সম্বন্ধ পদের প্রকারভেদ

সম্বন্ধ পদ বহু প্রকারের হতে পারে। যেমন–

(ক) অধিকরণ সম্বন্ধ : **রাজার** রাজ্য, **প্রজার** জমি।
(খ) জন্ম-জনক সম্বন্ধ : **গাছের** ফল, **পুকুরের** মাছ।
(গ) কার্যকারণ সম্বন্ধ : **অগ্নির** উত্তাপ, **রোগের** কষ্ট।
(ঘ) উপাদান সম্বন্ধ : **রূপার** থালা, **সোনার** বাটি।
(ঙ) গুণ সম্বন্ধ : মধুর মিষ্টতা, নিমের তিক্ততা।
(চ) হেতু সম্বন্ধ : **ধনের** অহংকার, **রূপের** দেমাগ।
(ছ) ব্যাপ্তি সম্বন্ধ : **রোজার** ছুটি, **শরতের** আকাশ।
(জ) ক্রম সম্বন্ধ : **পাঁচের** পৃষ্ঠা, **সাতের** ঘর।
(ঝ) অংশ সম্বন্ধ : **হাতির** দাঁত, **মাথার** চুত।
(ঞ) ব্যবসায় সম্বন্ধ : **পাটের** গুদাম, **আদার** ব্যাপারি।
(ট) ভগ্নাংশ সম্বন্ধ : **একের** তিন, **সাতের** পাঁচ।
(ঠ) কৃতি সম্বন্ধ : **নজরুলের** 'অগ্নিবীণা', **মাইকেলের** 'মেঘনাদবধ কাব্য'।
(ড) আধার–আধেয় : **বাটির** দুধ, **শিশির** ওষুধ।
(ঢ) অভেদ সম্বন্ধ : **জ্ঞানের** আলো, **দুঃখের** দহন।
(ণ) উপমান-উপমেয় সম্বন্ধ : **ননীর** পুতুল, **লোহার** শরীর।
(ত) বিশেষণ সম্বন্ধ : **সুখের** দিন, **যৌবনের** চাঞ্চল্য।
(থ) নির্ধারণ সম্বন্ধ : **সবার** সেরা, **সবার** ছোট।
(দ) কারক সম্বন্ধ :
  (১) কর্তৃকারক : **রাজার** হুকুম।
  (২) কর্ম কারক : **প্রভুর** সেবা, **সাধুর** দর্শন।
  (৩) করণ কারক : **চোখের** দেখা , **হাতের** লাঠি।
  (৪) অপাদান কারক : **বাঘের** ভয়, **বৃষ্টির** পানি।
  (৫) অধিকরন কারক : **ক্ষেতের** ধান, **দেশের** লোক।

সম্বোধন পদ

'সম্বোধন' শব্দটির অর্থ আহবান। যাকে সম্বোধন বা আহবান করে কিছু বলা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন– **ওহে মাঝি**, আমাকে পার কর। **রায়হান**, এখানে এসো।

জ্ঞাতব্য : সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ। কিন্তু বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সম্বোধন থাকে না বলে সম্বোধন পদ কারক নয়।

১. অনেক সময় সম্বোধন পদের পূর্বে ওগো, ওরে, হে, অয়ি প্রভৃতি অব্যবাচক শব্দ বসে সম্বোধনের সুচনা করে। যেমন– 'ওগো, তোরা জয়ধ্বনি কর।' 'ওরে, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।' 'অয়ি নিরমল ঊষা, কে তোমাকে নিরমিল?'

২. অনেক সময় সম্বোধনসূচক অব্যয়টি কেবল সম্বোধন পদের কাজ করে থাকে।

৩. সম্বোধন পদের পরে অনেক বিস্ময়সূচক চিহ্ন দেওয়া হয়। এই ধরনের বিস্ময়সূচক চিহ্নকে সম্বোধন চিহ্ন বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন চিহ্ন স্থানে কমা (,) চিহ্নের প্রয়োগই বেশি হয়। যেমন– ওরে খোকা, যাবার সময়ে একটা কথা শুনে যাস।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারকের উদাহরণ

কর্তৃকারক

১। **পাখি** সব করে রব	কর্তৃকারকে	শূন্য	বিভক্তি
২। **আমার দ্বারা** এ কাজ হবে না সাধন	,,	তৃতীয়া	,,
৩। **পাছে লোকে** কিছু বলে	,,	৭মী	,,
৪। **পাগলে** কিনা বলে	,,	৭মী	,,
৫। **বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে	,,	৭মী	,,
৬। **ঘোড়ায়** গাড়ি টানে	,,	৭মী	,,
৭। **মানুষ** ভাবে এক হয় আর এক	,,	শূন্য	,,
৮। **সবাইকে** একদিন মরতে হবে	,,	২য়া	,,

কর্মকারক

১। বাবা শিশুকে **চাঁদ** দেখাচ্ছেন	কর্মকারকে	শূন্য	বিভক্তি
২। আমি চিনি গো চিনি **তোমারে**	,,	২য়া	,,
৩। ঈদের **চাঁদ** উঠেছে	,,	শূন্য	,,
৪। কোন কাননে ফুটল **ফুল**	,,	শূন্য	
৫। **গুরুজনে** কর নতি	,,	৭মী	”
৬। বিপদে যেন করিতে পারি **জয়**	,,	শূন্য	,,
৭। **ডাক্তারকে** ডাক	,,	২য়া	”
৮। গৃহহীনে **গৃহ** দিলে আমি থাকি ঘরে	,,	শূন্য	,,

করণ কারক

১। টাকায় কিনা হয়	করণ কারকে	৭মী	বিভক্তি
২। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে	,,	৭মী	,,
৩। আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি	,,	৭মী	,,
৪। আলোয় কাটিল আঁধার	,,	৭মী	,,
৫। কালির দাগ সহজে ওঠে না	,,	৬ষ্ঠী	,,
৬। ব্যবহারে বংশের পরিচয়	,,	৭মী	,,
৭। টাকায় বাঘের দুধ মেলে	,,	৭মী	,,
৮। সে পীড়ায় হয়েছে দুর্বল	,,	৭মী	,,

সম্প্রদান কারক

১। অন্ধজনে দেহ আলো	সম্প্রদান কারকে	৭মী	বিভক্তি
২। ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও	,,	৪র্থী	,,
৩। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও	,,	৪র্থী	,,
৪। মৃতজনকে প্রাণ দাও	,,	৪র্থী	,,
৫। দীনে দয়া কর	,,	৭মী	,,
৬। সৎপাত্রে কন্যা দান কর	,,	৭মী	,,
৭। সর্বভূতে দান কর	,,	৭মী	,,

অপাদান কারক

১। এ বনে বাঘের ভয়	অপাদান কারকে	৭মী	বিভক্তি
২। তিথির চেয়ে বিথী বড়	,,	ষষ্ঠী	,,
৩। পরাজয়ে ডরে না বীর	,,	৭মী	,,
৪। তিলে তৈল হয়	,,	৭মী	,,
৫। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়	,,	৫মী	,,
৬। বিপদে মোর রক্ষা কর	,,	৭মী	,,
৭। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু	,,	৭মী	,,
৮। ছাদ থেকে পানি পড়ে	,,	৫মী	,,

অধিকরণ কারক

১। তিলে তৈল আছে	অধিকরণ কারকে	৭মী	বিভক্তি
২। কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল	,,	৭মী	,,
৩। শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে	,,	শূন্য	,,
৪। পাতায় পাতায় পড়ে শিশির নিশির	,,	৭মী	,,
৫। বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি	,,	শূন্য	,,
৬। বন্যেরা বনে সুন্দর	,,	৭মী	,,
৭। ছাদে পানি আছে	,,	৭মী	,,
৮। কপালের লিখন যায় না খণ্ডন	,,	ষষ্ঠী	,,

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন–

১. কারক শব্দের অর্থ কী?

ক) যা ক্রিয়া সম্পাদন করে
খ) যা থেকে কোনো কিছু উৎপত্তি হয়
গ) যা উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু বলা হয়
ঘ) যার কোনো ব্যয় নেই

২. বাংলা ব্যাকরণে কারক কয় প্রকার?

ক) চার
খ) পাঁচ
গ) ছয়
ঘ) সাত

৩. অধিকরণ কারক কয় প্রকার?

ক) তিন
খ) চার
গ) পাঁচ
ঘ) ছয়

৪. যে কর্তা নিজেই কাজ সম্পাদন করে, তাকে কী কর্তা বলা হয়?

ক) মুখ্য
খ) গৌণ
গ) প্রযোজ্য
ঘ) প্রযোজক

৫. কোনটি অধিকরণ কারকের উদাহরণ?

ক) গাছ হতে ফল পাওয়া যায়
খ) সে ভাত খায়
গ) পানিতে মাছ আছে।
ঘ) গরিবকে দান কর

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. কারক কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী?
২. বিভিন্ন কারকের শূন্য বিভক্তির উদাহরণ দিন।
৩. বিভিন্ন কারকের সপ্তমি বিভক্তির উদাহরণ দিন।
৪. সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ কারক নয় কোনো ব্যাখ্যা করুন।
৫. কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন।
ক. এ কলমে ভাল লেখা হয়।
খ. চেষ্টায় সব হয়।
গ. লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করা হয়।
ঘ. তোমার দেখা পেলাম না।
ঙ. ছাত্ররা ক্রিকেট খেলছে।

উত্তরমালা : ক.

১. ক ২. গ ৩. ক ৪. ক ৫. গ

পাঠ-৫.৪ : বাচ্য ও বাচ্য পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বাচ্যের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বলতে পারবেন।
- বাচ্য পরিবর্তনের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারেন।

বাংলা ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্ব অংশে বাচ্য আলোচিত হয়েছে। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে বাক্যকে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করার জন্য বাচ্যের ভূমিকা অপরিসীম। এক বাচ্য থেকে অন্য বাচ্যে রূপান্তর করে বাক্যকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয়। কাজেই বাচ্য পরিবর্তন ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

সংজ্ঞা : বাচ্য শব্দের অর্থ বক্তব্য। বাক্যকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করাকে বলা হয় বাচ্য। অর্থাৎ বাক্যে কথকের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ ভঙ্গিকে বলা হয় বাচ্য।

প্রকারভেদ

বাংলা ব্যাকরণে বাচ্য তিন প্রকার। যথা–

ক) কর্তৃবাচ্য
খ) কর্মবাচ্য এবং
গ) ভাববাচ্য।

ক. কর্তবাচ্য : যে বাক্যে কর্তার প্রাধান্য থাকে এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয় তাকে কর্তৃবাচ্য বলে। যেমন– সেলিনা স্কুলে যাচ্ছে।

খ. কর্মবাচ্য : যে বাক্যে কর্মেরই প্রাধান্য এবং ক্রিয়াটি কর্মের অনুগামী হয়, তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন– বিদ্বান সকলের দ্বারা আদৃত হন।

গ. ভাববাচ্য : যে বাক্যে কর্ম থাকে না, ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যর্থ হয় তাকে ভাববাচ্য বলে। যেমন– তোমাকে পাশ করতে হবে।

বাচ্য পরিবর্তন

বাক্যের অর্থকে অপরিবর্তিত রেখে বাক্যের গঠন কৌশল পরিবর্তন করে বাক্যকে এক বাচ্য থেকে অন্য বাচ্যে পরিবর্তন করার নাম বাচ্য পরিবর্তন। বাংলা ভাষায় বাচ্য পরিবর্তন চার প্রকার-

ক) কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তন।
খ) কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন।
গ) কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে পরিবর্তন।
ঘ) ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন।

ক) কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তনের নিয়ম

১) কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে কর্তায় ও কর্মে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কর্মের অনুসারী হয়।

২) কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে তার কর্মবাচ্য হয় না। উদাহরণ–

কর্তৃবাচ্য	**কর্মবাচ্য**
১। বাদল বই পড়ে।	১। বাদল কর্তৃক বই পড়া হয়।
২। আমি পাখি দেখেছি।	২। আমার দ্বারা পাখি দেখা হয়েছে।

৩। বিপুল ছবি এঁকেছে।	৩। বিপুল কর্তৃক ছবি অঙ্কিত হয়েছে।
৪। বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছেন।	৪। বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণ রচিত হয়েছে।
৫। পুলিশ চোর ধরেছে।	৫। পুলিশ কর্তৃক চোর ধৃত হয়েছে।
৬। হযরত মুহম্মদ (সা.) ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।	৬। হযরত মুহম্মদ (সা.) কর্তৃক ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে।
৭। চরিত্রবানকে সবাই সম্মান করে।	৭। চরিত্রবান সবার দ্বারা সম্মানিত হয়।
৮। আমি কাজটি করব।	৮। আমাকে এ কাজটি করতে হবে।
৯। সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ করেন।	৯। সুলতান মাহমুদ কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হয়।
১০। আলেকজান্ডার পারস্য জয় করেন।	১০। আলেকজান্ডার কর্তৃক পারস্য বিজিত হয়।

খ) কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরের নিয়ম

১. ক্রিয়া কর্তা অনুযায়ী হয়।
২. কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া বা শূন্য বিভক্তি হয়। উদাহরণ–

কর্মবাচ্য	কর্তৃবাচ্য
১। সেলিমের কাজটি শেষ হয়নি।	১। সেলিম কাজটি শেষ করেনি।
২। তার পত্র লেখা হয়নি।	২। সে পত্র লেখেনি।
৩। খেলোয়াড় কর্তৃক বল খেলা হয়।	৩। খেলোয়াড় বল খেলে।
৪। আমা কর্তৃক ভাত খাওয়া হয়েছে।	৪। আমি ভাত খেয়েছি।
৫। শিকারী কর্তৃক বাঘ নিহত হয়েছে।	৫। শিকারী বাঘ মেরেছে।
৬। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শান্তিনিকেতন স্থাপিত হয়েছে।	৬। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন স্থাপন করেছেন।

গ) কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে রূপান্তরের নিয়ম

১. ক্রিয়া নামপুরুষ অনুযায়ী হয়।
২. কর্তার ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

কর্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
১। শিপু সেখানে যাবে না।	১। শিপুর সেখানে যাওয়া হবে না।
২। মিতু গল্পের বই পড়ছে।	২। মিতুর গল্পের বই পড়া হয়েছে।
৩। সে এখন কাজটি করবে।	৩। তার দ্বারা এখন কাজটি করা হবে।
৪। তুমি কবে আসবে?	৪। কবে তোমার আসা হচ্ছে?
৫। তার এই মনোভাব পরিবর্তন করতে পারল না।	৫। তার এই মনোভাব পরিবর্তন হল না।

ঘ) ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরের নিয়ম

১. ক্রিয়া কর্তার অনুগামী হয়।
২. কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়ে থাকে।

ভাববাচ্য	কর্তৃবাচ্য
১। আমার এখন খাওয়া হবে।	১। আমি এখন খাব।
২। আমার যাওয়া হবে।	২। আমি যাব না।
৩। আমার নীলগিরি দেখা হয়েছে।	৩। আমি নীলগিরি দেখেছি।
৪। তোমার বেড়ানো হলো?	৪। তুমি বেড়ালে?
৫। এবার একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো।	৫। এবার একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করলাম।
৬। সে দিনটা এভাবেই কেটে গেল।	৬। সে দিনটা এভাবেই কাটালাম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন–

১। বাচ্য কাকে বলে?

২। বাচ্য কত প্রকার ও কী কী?

৩। বাচ্য পরিবর্তনের দুটি নিয়ম লিখুন।

৪। বাচ্য ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

৫। ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরের একটি উদাহরণ দিন।

উত্তরমালা

১। কথার বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ ভঙ্গিকে বলা হয় বাচ্য।

২। বাচ্য তিন প্রকার; যথা– ক) কর্তৃবাচ্য খ) কর্মবাচ্য এবং গ) ভাববাচ্য

৩। বাচ্য পরিবর্তনের দুটি নিয়ম হলো– ক) কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে কর্তায় ও কর্মে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কর্মের অনুসারী হয়। খ) কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে তার কর্মবাচ্য হয় না।

৪। বাচ্য ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্ব অংশে আলোচিত হয়েছে।

৫। উদাহরণ– ভাববাচ্য– আমার এখন যাওয়া হবে। কর্তৃবাচ্য : আমি এখন যাব।

পাঠ-৫.৫ : উক্তি ও উক্তি পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- উক্তির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বলতে পারবেন।
- উক্তি পরিবর্তনের নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলো উক্তি। বাংলা ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্ব অংশে উক্তি আলোচনা করা হয়েছে। উক্তিকে বাক্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। বাংলা ব্যাকরণে উক্তি পরিবর্তনের ভূমিকা অপরিসীম। এই পাঠে উক্তির সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার বর্ণনা করা হয়েছে।

সংজ্ঞা

উক্তি শব্দের অর্থ হলো *বলা*। সংক্ষেপে বলা যায়, কোনো কিছু বলার নামই হলো উক্তি। কোনো কথকের কোনো কিছু বলাই হলো উক্তি। বাক্যের মধ্যে বক্তার কিংবা বক্তা সম্বন্ধে অন্য ব্যক্তির কথা বলার ধরনকে উক্তি বলে।

প্রকারভেদ

বাংলায় ব্যাকরণে উক্তি দুই প্রকার । যথা–

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি (direct speech) ও

খ) পরোক্ষ উক্তি (indirect speech)।

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : যে বাক্যের সাহায্যে বক্তার কথা সরাসরি বর্ণনা করা হয় তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ উক্তি। যেমন– ইব্রাহীম বলল, "আমি কাজটি শেষ করতে পারিনি।"

এ বাক্যের বক্তা হলো ইব্রাহীম। ইব্রাহীমের কথাই এখানে সরাসরি বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব এটি হলো প্রত্যক্ষ উক্তির উদাহরণ।

খ) পরোক্ষ উক্তি : যে বাক্যে বক্তার বক্তব্য সরাসরি বর্ণনা করা হয় না, অন্যের দ্বারা বর্ণনা করা হয় সে উক্তিকে বলা হয় পরোক্ষ উক্তি। যেমন–

ইব্রাহীম বলল যে, সে কাজটি শেষ করতে পারেনি। এখানে বক্তা ইব্রাহীমের কথা সরাসরি প্রকাশিত হয়নি; অন্যের সাহায্যে তা প্রকাশ করা হয়েছে।

উক্তি পরিবর্তনের নিয়মাবলি

উক্তি পরিবর্তনের নিয়মগুলি নিচে আলোচনা করা হলো–

১. প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্য উদ্ধরণ চিহ্নের (" ") মধ্যে আবদ্ধ থাকে। পরোক্ষ উক্তিতে এ উদ্ধরণ চিহ্ন লোপ পায়। প্রথম উদ্ধরণ চিহ্নের স্থানে যে সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করতে হয়। বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য উক্তির মধ্যে বক্তার পুরুষের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–
প্রত্যক্ষ উক্তি : জাহাঙ্গীর বলল, "আমি বাড়ি যাব।"
পরোক্ষ উক্তি : জাহাঙ্গীর বলল যে সে বাড়ি যাবে।

২. পরোক্ষ উক্তিতে বাক্যের সর্বনাম পদ এবং কালবাচক শব্দের পরোক্ষ উক্তিতে নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্তন করতে হয়–

প্রত্যক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তি	প্রত্যক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তি
এই	সেই	ইহা	তাহা
এ	সে	এখানে	সেখানে
ওখানে	ঐখানে	আজ	সেদিন
এখন	তখন	গতকাল	পূর্বদিন
আগামীকাল	পরদিন		

৩. বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার জন্য সর্বনাম পদ পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–
প্রত্যক্ষ উক্তি : ইমরান বলল, "আমার বাবা আজই বিদেশ যাচ্ছেন।"
পরোক্ষ উক্তি : ইমরান বলল যে তার বাবা সে দিনই বিদেশ যাচ্ছেন।

৪. প্রত্যক্ষ উক্তির কালবাচক পদকে পরোক্ষ উক্তিতে অর্থানুসারে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–
প্রত্যক্ষ উক্তি : তিনি বললেন, "কাল আমি চট্টগ্রাম যাব।"
পরোক্ষ উক্তি : তিনি বললেন যে পরদিন তিনি চট্টগ্রাম যাবেন।

৫. বাক্যের অর্থ সঙ্গতি রক্ষার জন্য পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন; করতে হয়। যেমন–
প্রত্যক্ষ উক্তি : হিরণ বলল, "আমি এক্ষুণি আসছি।"
পরোক্ষ উক্তি : হিরণ বলল যে, সে তক্ষুণি যাচ্ছে।

৬. আশ্রিত খণ্ডবাক্যের ক্রিয়ার কাল পরোক্ষ উক্তিতে সব সময় মূল বাক্যাংশের ক্রিয়ার কালের উপর নির্ভরশীল হয় না। যেমন–
প্রত্যক্ষ উক্তি : শিলা বলল, "ঢাকায় খুব গরম পড়েছে।"
পরোক্ষ উক্তি : শিলা বলল যে, ঢাকায় খুব গরম পড়েছিল।

৭. প্রত্যক্ষ উক্তিতে কোনো চিরন্তন সত্যের উল্লেখ থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কালের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন-
প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "সত্যের মৃত্যু নেই।
পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে সত্যের মৃত্যু নেই।

৮. প্রশ্নবোধক, আবেগসূচক ও অনুজ্ঞাসূচক প্রত্যক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে হলে প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্রিয়াকে ভাব অনুসারে পরিবর্তন করতে হয়। এক্ষেত্রে পরোক্ষ উক্তিতে মূল বাক্যের কোনো পদ বর্জন এবং কোনো কোনো পদের সংযোজন ঘটে। যেমন–

প্রশ্নবোধক বাক্য

প্রত্যক্ষ উক্তি : মা বললেন, "তোমরা কি বেড়াতে যাবে?"
পরোক্ষ উক্তি : আমরা বেড়াতে যাব কিনা মা তা জিজ্ঞেস করলেন।
প্রত্যক্ষ উক্তি : বাবা বললেন, "তোমাদের পরীক্ষা শেষ হবে কবে?"
পরোক্ষ উক্তি : আমাদের পরীক্ষা কবে শেষ হবে বাবা তা জানতে চাইলেন।

আবেগসূচক বাক্য

প্রত্যক্ষ উক্তি : সেলিম বলল, "বা! কী চমৎকার দৃশ্য!"
পরোক্ষ উক্তি : সেলিম আনন্দের সাথে বলল যে দৃশ্যটি খুবই চমৎকার।
প্রত্যক্ষ উক্তি : ছাত্ররা বলল, "কী মজা !আজ আমাদের ছুটি হবে।"
পরোক্ষ উক্তি : ছাত্ররা আনন্দের সাথে বলল যে সেদিন তাদের ছুটি হবে।

নির্দেশক বাক্য

প্রত্যক্ষ উক্তি : কাজল বলল, "আমি আগামীকাল ঢাকা যাব।"

পরোক্ষ উক্তি : কাজল বলল যে সে সেদিন ঢাকা যাবে।
প্রত্যক্ষ উক্তি : মনি বলেছিল, "আমি গতকাল কলেজে যাইনি।"
পরোক্ষ উক্তি : মনি বলেছিল যে সে আগেরদিন স্কুলে যায়নি।
প্রত্যক্ষ উক্তি : সে আমাকে বলল, "আমি তোমাকে চিনি না।"
পরোক্ষ উক্তি : সে আমাকে বলল যে সে আমাকে চিনে না।
প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।"
পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

প্রশ্নবোধক বাক্য

প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "তোমরা কি শিক্ষাসফরে যেতে চাও?
পরোক্ষ উক্তি : আমরা শিক্ষাসফরে যেতে চাই কিনা তা জিজ্ঞাসা করলেন।
প্রত্যক্ষ উক্তি : হাসান, আবিরকে বলল, "তুমি কি ময়মনসিংহ যাবে?"
পরোক্ষ উক্তি : আবির ময়মনসিংহ যাবে কিনা তাকে হাসান তা জিজ্ঞেস করল।
প্রত্যক্ষ উক্তি : আমি তাকে বললাম, "মূর্খ জানে না যে, 'তেলে জলে মিশে না?"
পরোক্ষ উক্তি : আমি তাকে মূর্খ সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলাম তেলে জলে মিশে না তা কি সে জানে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. উক্তি কাকে বলে?
২. উক্তি কত প্রকার ও কী কী?
৩. প্রত্যক্ষ উক্তিতে এটা থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কী হবে?
৪. প্রত্যক্ষ উক্তিতে আসা থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কী হবে?
৫. প্রত্যক্ষ উক্তির বক্তার বক্তব্য কোন্ চিহ্নের সাহায্যে আবদ্ধ থাকে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. উক্তি কাকে বলে? উক্তি কত প্রকার ও কী কী?

পাঠ-৫.৬ : যতি ও ছেদচিহ্নের ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বিরামচিহ্ন কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- বাংলা ভাষার কী কী বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয় তা লিখতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবেন।

মানুষ যখন কথা বলে বা লেখে তখন মাঝে মধ্যে থেমে তারপর কথা বলে বা লেখে। কথা বলার বা লেখার মাঝখানে এই যে থামা তার সময়কাল আছে। এই থামার সময় নির্দিষ্ট করার জন্য বিভিন্ন রকমের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের চিহ্নকে বলা হয় বিরামচিহ্ন বা বিরতিচিহ্ন বলা হয়।

বিরাম চিহ্ন কথার অর্থ– যে চিহ্নের সাহায্যে কথা বলার সময়, জিহ্বার কাজের বিরাম বা বিরতি নির্দেশিত হয়। মনোভাব প্রকাশের সময় অর্থ ভালোভাবে বোঝার জন্য উচ্চারিত বাক্যের বিভিন্ন স্থানে বিরতি দিতে হয়। লেখার সময়ও বাক্যের মধ্যে বিরতি বুঝিয়ে তা দেখানোর জন্য কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, যেগুলোকেই বিরতি চিহ্ন, যতি চিহ্ন, ছেদ চিহ্ন, বিরাম চিহ্ন বা ভাষা চিহ্ন বলে।
নিচে বিভিন্ন প্রকার যতি, চিহ্নের নাম, আকৃতি এবং তাদের বিরতি কাল নির্দেশ করা হলো :

যতি চিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতি কাল
কমা	,	১ (এক) বলতে যে সময় লাগে
সেমিকোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়
দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)	।	এক সেকেন্ড
জিজ্ঞাসা চিহ্ন	?	এক সেকেন্ড
বিস্ময় চিহ্ন	!	এক সেকেন্ড
কোলন চিহ্ন	:	এক সেকেন্ড
কোলন ড্যাস	:-	এক সেকেন্ড
ড্যাস	-	এক সেকেন্ড
হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই
ইলেক বা লোপ চিহ্ন	’	থামার প্রয়োজন নেই
উদ্ধরণ চিহ্ন	“ ”	‘এক’ উচ্চারণে যে সময় লাগে
ব্র্যাকেট	() { } [ ]	থামার প্রয়োজন নেই থামার প্রয়োজন নেই থামার প্রয়োজন নেই

যতি বা ছেদচিহ্নের ব্যবহার :

১. কমা {পাদচ্ছেদ (,)}সাধারণত একটি দীর্ঘ বাক্যের ভেতরে দম নেয়া ও অর্থের স্পষ্টতা বোঝাতে কমা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বাক্যের মধ্যে স্বল্পতম সময়ের বিরতি নির্দেশ করে কমা। নিচে কমার প্রয়োগ ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো :

ক. বাক্যে সমজাতীয় একাধিক পদ থাক?েল কমা ব্যবহৃত হয়। যথা– সালাম, বরকত, রফিক– নাম না জানা আরো অনেকে শহীদ হয়েছেন ভাষা আন্দোলনে।

খ. পরস্পর সম্বন্ধসূচক একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া বাকি সবগুলোর পরই কমা বসবে। যেমন : সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য একই মালিকার পুষ্প।

গ. সমজাতীয় একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ থাকলে কমা ব্যবহৃত হয়। যথা– বসতে দিলে, শুতে চায়, শুতে দিলে, ঘুমাতে চায়।

ঘ. বাক্যের প্রারম্ভে সম্বোধনের পরে কমা বসাতে হয়। যেমন : শুভ, এদিকে এসো।

ঙ. জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ড বাক্যের পরে কমা বসবে। যেমন : গতকাল যে লোকটি এসেছিল, সে আমার পরিচিত।

চ. উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে কমা বসাতে হয়। যেমন : সাহেব বললেন, "এখানে একবার এসো।"

ছ. মাসের তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর কমা বসবে। যেমন; ১৮ পৌষ, বুধবার, ১৩১০ সাল।

জ. বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসবে। যেমন : ৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১০৮০।

২. সেমিকোলন (;)

ক. কমা অপেক্ষা বেশি কিন্তু দাঁড়ির চেয়ে কম সময়ের বিরতির প্রয়োজন হলে সেমিকোলন বসে। শব্দ বা পদের পরে সেমিকেলন বসে না। সাধারণত বাক্যাংশের পরে বসে। যেমন : সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ আমরা, এ মায়ার বাঁধন কি সত্যিই টুটে।

খ. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একবাক্যে লিখতে মাঝখানে সেমিকোলন হয়। যেমন : চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে।

গ. দুটি বা তিনটি বাক্য সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত না হলে সেমিকোলন হয়। যেমন : আগে পড়া, তারপর খাওয়া, অতঃপর স্কুল।

ঘ. পরস্পর নির্ভরশীল বাক্য সংযোজক অব্যয় দিয়ে যুক্ত হলেও কখনো কখনো প্রথম বাক্যের শেষেও সংযোজক অব্যয়ের আগে সেমিকোলন বসে। যথা– দুঃখ তো মানুষের জন্যই আসে, কিনতু তা জয় করার জন্য চাই মনোবল।

ঙ. যেসব বাক্যে ভাব সাদৃশ্য আছে তাদের মধ্যে সেমিকোলন বসে। যেমন : শরীরটা ভালো নয়; মাঝে মাঝে হাঁচি ও কাশি আসছে।

চ. বাক্যের কোনো বক্তব্যকে পরবর্তী অংশে বিষদভাবে বর্ণনাকরার সময় দুই অংশের মাঝে সেমিকোলন বসে। যেমন– আমরা স্বাধীন জাতি; আমাদের উন্নতি কিসে হবে, কিভাবে হবে তা ভেবে দেখতে হবে।

ছ. শ্রেণিভুক্ত করার সময় জাতীয় বিষয়কে অন্য শ্রেণি থেকে পৃথক করতে সেমিকোলনের ব্যবহার হয়। যেমন : শীতকালে কাজের, ফুলকপি, বাধাকপি, কমলা ও পাওয়া যায়।

৩. দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।)

বাংলাভাষায় দাঁড়ি একটি বহুল ব্যবহৃত যতিচিহ্ন। বাক্যের মধ্যে বক্তব্য সমাপ্ত হলে অথবা অর্থ সম্পূর্ণ হলে দাড়ি বা পূর্নচ্ছেদ বসে। এর প্রয়োগ ক্ষেত্র হচ্ছে–

ক. অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের শেষে দাঁড়ি বসে। যেমন– কাল একবার এসো।

খ. নির্দেশাত্মক বাক্যের শেষে দাঁড়ি বসে। যেমন– সব সময় সত্য কথা বলবে।

গ. পরোক্ষ প্রশ্নের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্নের বদলে দাড়ি ব্যবহার হয়। যেমন– সীমা জানতে চাইল রীমা কবে আসবে।

৪. প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) : প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসা হয়। এর ব্যবহার ক্ষেত্র–

ক. বাক্যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে। যেমন; তুমি একন এসে? সে কি যাবে?

খ. সন্দেহ বোঝাতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়। যেমন; সে কি কাল আসবে?

গ. ব্যাঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশে কখনো কখনো বাক্যের মধ্যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়। যেমন: আপনার মতো উপকারী বন্ধু (?) না থাকাই ভালো।

ঘ. প্রশ্নবাচক পদের পরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন করতে পারে। যেমন– কোথায় যাবেন?

৫. বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন (!)

ক. হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে হলে এবং সম্বোধন পদের পরে (!) চিহ্নটি বসে। যেমন : আহা! কি চমৎকার দৃশ্য। জননী! আজ্ঞা দেহ মোরে যাই রনস্থলে।

খ. আবেদন, ভীতি, হতাশা, আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে (!) চিহ্নটি বসে। যেমন : দয়া করে আমার কথা শুনুন!

গ. সবিস্ময় প্রশ্নের জায়গায় প্রশ্ন চিহ্নের পরিবর্তে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে। যেমন : তোমার হৃদয় কি পাষাণে গড়া! একটি বারও পলাশের কথা ভাবলে না!

ঘ. সংক্ষিপ্ত উত্তরের শেষে কখনো কখনো পূর্ণচ্ছেদ না বসে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে। যেমন : আমাকে একটু আদর করবে!

৬. কোলন (:) এর ব্যবহার

ক. একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে আর একটি বাক্যের অবতারণা করতে গেলে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন : সভায় সাব্যস্ত হলো : এক মাস পরে নতুন সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

খ. কোনো বিবৃতিকে সম্পূর্ণ করতে দৃষ্টান্ত দিতে হলে কোলন ব্যবহার করতে হয়। যেমন : পদ পাঁচ প্রকার: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া।

গ. নাটকের চরিত্রের পরে ও সংলাপের আগে কোলন বসে। যেমন : সিরাজ : আমার দুর্ভাগ্য যে আপনাকে আমার অপমান করতে হয়েছে।

ঘ. আবেদন পত্রে ভুক্তি, উপভুক্তির পরে কোলন বসে। যেমন– নাম : পিতার নাম: ঠিকানা : শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষর : তারিখ:।

ঙ. সময়কে সংখ্যায় নির্দেশ করতে : **১২:৩০, ২:১৫**।

৭. ড্যাশ চিহ্ন (–)

ড্যাস শব্দের বাংলা অর্থ বাক্য সঙ্গতি চিহ্ন। বাক্যের মধ্যে গতির জন্য ড্যাস চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এর ব্যবহার ক্ষেত্র হলো–

ক. যৌগিক বা মিশ্র বাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা তার কোনো বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন : তোমরা দরিদ্রের উপকার কর– এতে তোমাদের সম্মান যাবে না– বাড়বে।

খ. উদাহরণ প্রয়োগ করতে হলে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন : বচন দুই প্রকার– একবচন, বহুবচন।

গ. কোনো কথার দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বোঝাতে ড্যাশ হয়। যেমন : বার্ধক্য তাহাই– যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

ঘ. বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে ড্যাশ চিহ্ন হয়। যেমন : বাবা গর্জিয়া উঠিলেন, "বটে রে"-ইত্যাদি।

৮. হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন (-)

হাইফেন সবসময় দুই ততোধিক শব্দের মধ্যে বসে। বাংলা লেখার সময় এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এর ব্যবহার ক্ষেত্র হলো–

ক. সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন : হাট-বাজার, সাত-পাঁচ।

খ. একই শব্দ পরপর দুবার বসলে তাদের মাঝে হাইফেন বসে। যেমন : চলতে-চলতে কোথায় চলে যায়। যেতে-যেতে হয়রান হয়ে পড়েছি।

গ. দিক বা স্থান বা সময় নির্দেশের ক্ষেত্রে অনেক সময় হাইফেন বসে। যেমন : উত্তর-পশ্চিম কোণে মেঘ জমেছে।

ঘ. কোনো কোনো উপসর্গের পরে হাইফেন বসে। যেমন : অ-তৎসম, কু-অভ্যাস, বে-আক্কেল।

৯. ইলেক (') বা লোপ চিহ্ন বা উর্ধ্বকমা

ক. শব্দে বর্ণের লোপ বোঝাতে ইলেক বা লোপ চিহ্ন হয়। যেমন : মাথার' পরে জ্বলছে রবি (' পরে=ওপরে), পাগড়ি বাঁধা যাচ্ছে কা'রা? (কা'রা = কাহারা) দু'বেলা ভাত জোটে না– রেডিও কিনবো কি দিয়ে?

খ. হাইফেনের বিকল্প চিহ্ন হিসেবে ইলেক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন : তোমার মা'র অসুখ সেরেছে কি?

গ. সালের বর্জিত সংখ্যা বোঝাতে ইলেক চিহ্ন বসে। যেমন : ২৬ মার্চ '৭১ ফেব্রুয়ারি '৫২।

১০. উদ্ধরণ চিহ্ন (“ ”)

বক্তার বক্তব্য অবিকৃত ভাবে তুলে ধরতে হলে উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার হয়। এর ব্যবহার ক্ষেত্র-

ক. বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে এ চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। যেমন : শিক্ষক বললেন, “পৃথিবী গোলাকার”।

খ. কোনো বিশেষ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ এবং গ্রন্থের নামে উদ্ধৃতি চিহ্ন বসে। যেমন : শরৎচন্দ্রের ‘বিলাসী’।

১১. ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন (), { }, [].

বাক্যের মধ্যে কোনো শব্দের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য অথবা অন্য কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করার জন্য এ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বাক্যে সাধারণত প্রথম ও তৃতীয় বন্ধনীর ব্যবহার হয়।

সাধারণত এই তিনটি চিহ্ন (), { }, [].গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথম বন্ধনীটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন : ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

১২. বর্জন চিহ্ন (), { }, [].

রচনার বিশেষ অংশ বর্জন করা হলে সেখানে বর্জন চিহ্নের প্রয়োগ ঘটে। ।

ব্যাকরণিক চিহ্ন

বিশেষভাবে ব্যাকরণে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হয়।

ক. ধাতু বা ক্রিয়ামূল বোঝাতে (√) চিহ্ন : √কৃ+অক = কারক

খ. পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (<) চিহ্ন হয়। যেমন : সাঁ < গ্রাম।

গ. পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (>) চিহ্ন হয়। যেমন : স্বর্ণ > সোনা।

ঘ. সম্মানবাচক বা সমস্তবাচক বোঝাতে (=) সমান চিহ্ন হয়। পিতা ও মাতা = পিতামাতা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। বিরামচিহ্ন কাকে বলে বলুন।

২। যেকোনো পাঁচটি বিরামচিহ্নের নাম ও পাঁচটি বাক্যে এর ব্যবহার দেখান।

পাঠ-৫.৭ : বাগধারা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বাগধারার সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- বাক্যে বাগধারা প্রয়োগ করতে পারবেন।

ভাষা মাত্রই কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বাকভঙ্গি থাকে। এ বৈশিষ্ট্য যেমন থাকে বাক্যরীতিতে তেমনি থাকে বাগভঙ্গিতেও। বাগধারাকে এক ধরনের বাগভঙ্গি বলা হয়। ইংরেজিতে বাগধারাকে বলা হয় Idiom।

বাগধারা হলো বিশিষ্ট ধরনের শব্দ। বলা যায়, যেসব শব্দসমষ্টি বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বলা হয় বাগধারা।

বাগধারা প্রয়োগ

অ

১. অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া) – কম বয়সেই লোকটি অক্কা পেল।
২. অগস্ত্য যাত্রা (চিরদিনের জন্য প্রস্থান) – ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে সে গ্রাম থেকে অগস্ত্য যাত্রা করেছে।
৩. অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন) – ঐ কৃপণ বুড়োর কাছে টাকা চাওয়া আর অরণ্যে রোদন করা একই কথা।
৪. অগাধ জলের মাছ (চতুর ব্যক্তি) – সে তো অগাধ জলের মাছ, তার সঙ্গে তুমি পারবে না।
৫. অর্ধচন্দ্র (গলাধাক্কা) – বেয়াদব লোকটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে সভা থেকে বিদায় করে দাও।
৬. অমাবস্যার চাঁদ (অদর্শনীয়) – সেলিমকে ইদানীং আর কোনো কাজেই পাওয়া যায় না, সে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেছে।
৭. অথৈ জলে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া) – গভীর নদীতে জমিজমা হারিয়ে লোকটি এখন অথৈ জলে পড়েছে।
৮. অকূল পাথার (সীমাহীন বিপদ) – তুমি হে মম অকূল পাথারে প্রভু।
৯. আদায় কাঁচকলায় (পরম শত্রুতা) – দুই জায়ের মধ্যে একেবারে আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক।
১০. আসরে নামা (অবতীর্ণ হওয়া) – আজাহার সাহেব এবার সুযোগ বুঝে রাজনীতির আসরে নেমে পড়েছেন।

আ

১১. আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) – আকাশ কুসুম বাদ দিয়ে পড়ালেখা করো না হলে পরীক্ষায় পাস করতে পারবে না।
১২. আক্কেল সেলামি (বোকামির দণ্ড) – বোকামির জন্য আকিবকে আক্কেল সেলামি দিতে হলো।
১৩. আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়লোক হওয়া) – ব্যবসা করে রহিম সাহেব আঙ্গুল ফুলে কলা হয়েছে।
১৪. আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি) – তার মিথ্যা অভিযোগ শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম।
১৫. আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) – সে একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি– তাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।
১৬. আকাশ ভেঙে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া) – বন্যায় ফসল হারিয়ে তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে।
১৭. আষাঢ়ে গল্প (আজগুবি গল্প) – মিম আষাঢ়ে গল্প বলায় পটু।

১৮. আকাশ থেকে পড়া (না জানার ভান করা) – তার জেল হয়েছে শুনে তুমি আকাশ থেকে পড়লে মনে হচ্ছে।

১৯. আলালের ঘরের দুলাল (আদুরে ছেলে) – ওতো আলালের ঘরের দুলাল, সে এত পরিশ্রমের কাজ পারবে কেন?

২০. আদা জল খেয়ে লাগা (সর্বাত্মক চেষ্টা করা) – পরীক্ষা পাশের জন্য তুমি এবার আদাজল খেয়ে লেগেছ মনে হচ্ছে।

২১. আঠারো মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রতা) – তোমার তো আঠারো মাসে বছর, এই সামান্য কাজ করতেই এতদিন লেগে গেল।

ই

২২. ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ব) – মনি খুব ইঁচড়ে পাকা, সব কথাতেই নাক গলায়।

২৩. ইতর বিশেষ (পার্থক্য) – জ্ঞানের দিক থেকে সেলিম ও সালামের মধ্যে তেমন ইতর বিশেষ নেই।

২৪. ইঁদুর কপালে (মন্দভাগ্য) – ইঁদুর কপালে না হলে কি আমার কপালে এমন ফলাফল জুটে।

২৫. ঈদের চাঁদ (আকাঙ্ক্ষিত বস্তু) – অনেক দিন পর ছেলে বাড়ি আসায় মা যেন হাতে ঈদের চাঁদ পেয়েছেন।

উ

২৬. উত্তম মধ্যম (প্রহার) – চোরটিকে উত্তম মধ্যম দিয়ে বিদায় দাও।

২৭. উলুবনে মুক্তা ছড়ান (অস্থানে মূল্যবান দ্রব্য প্রদান) – তাকে উপদেশ দেওয়া আর উলুবনে মুক্তা ছড়ানো একই কথা।

২৮. উড়ো কথা (গুজব) – উড়ো কথায় কান দিও না।

২৯. উড়নচণ্ডী (অমিতব্যয়ী) – করিম সাহেবের উড়নচণ্ডী ছেলেটি অল্পদিনেই বাপের সম্পত্তি নষ্ট করে পথে দাঁড়িয়েছে।

৩০. উড়োচিঠি (বেনামী চিঠি) – মেম্বার সাহেব উড়োচিঠি পেয়ে একেবারে মুষড়ে পড়েছেন।

এ

৩১. এক চোখা (পক্ষপাতিত্ব) – চেয়ারম্যান সাহেব তো একচোখা, তার কাছে সুবিচার পাবে কী করে?

৩২. এলাহি কাণ্ড (বিরাট আয়োজন) – ছেলের আকিকায় এতবড় আয়োজন, এ যে এক এলাহি কাণ্ড।

৩৩. এক মাঘে শীত যায় না (বিপদ একবারই আসে না)– যেই টাকাটা পেয়েছ, আর দেখা নাই তবে এক মাঘে শীত যায় না, ওকে আবার আসতেই হবে।

৩৪. এক কথার মানুষ (প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকে) – আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব এক কথার মানুষ।

৩৫. একহাত নেওয়া (সুযোগ বুঝে প্রতিশোধ নেয়া) – সুযোগ পেলে সেলিমকে সে একহাত নেবে।

ও

৩৬. ওষুধ ধরা (কাজ হওয়া) – মনে হয় ওষুধ করেছে– ছেলেটা এবার কথামতো কাজ করবে।

৩৭. ওতপাতা (শিকারের অপেক্ষায় থাকা)– বিড়ালটা মাছের জন্য ওতপেতে বসে আছে।

৩৮. ওজন বুঝে চলা (আত্মমর্যাদা)– মামুন সাহেব খুব ওজন বুঝে চলেন।

ক

৩৯. কথার কথা (গুরুত্বহীন কথা) – বাবুল যা বলল তা কথার কথা।

৪০. কান পাতলা (বিশ্বাসপ্রবণ) – হারুন খুব কান পাতলা, তার কথা বিশ্বাস করো না।

৪১. কথায় চিড়া ভিজা (বিনা ব্যয়ে কাজ না হওয়া) – কথায় কী আর চিড়ে ভিজে, কিছু টাকা পয়সা ছাড়, এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে।

৪২. কাঁচা পয়সা (নগদ উপার্জন) – ঠিকাদারি করা কাঁচা পয়সা তো তাই দুহাতে উড়াচ্ছে।

৪৩. কপাল ফেরা (অবস্থা ভালো হওয়া) – ওর কপাল ফিরেছে, এখন ভালো টাকা-পয়সা উপার্জন করে।
৪৪. কান ভারি করা (কুপরামর্শ দেওয়া) – আমার বিরুদ্ধে নানান কথা বলে ও বড় সাহেবের কান ভারি করেছে।
৪৫. কলুর বলদ (পরাধীন) – সংসারে কেবল কলুর বলদের মতো খেটে গেলাম, কারো মন পেলাম না।
৪৬. কই মাছের প্রাণ (যে সহজে মরে না) – লোকটির কই মাছের প্রাণ, সে সহজে মরবে না।

খ

৪৭. খয়ের খাঁ (চাটুকার) – মিঠু খুব খয়ের খা, ওকে দিয়ে এ ভালো কাজ হবে না।
৪৮. খাল কেটে কুমির আনা (বিপদ ডেকে আনা) – ভাইয়ে-ভাইয়ের বিবাদে প্রতিবেশী ডেকে নিয়ে এসে খাল কেটে কুমির এনেছ, এখন ঠ্যালা সামলাও।
৪৯. খাই-খরচ (খাওয়ার খরচ)– চাকুরি করে যা পাই তা দিয়ে খাই-খরচ চলে আর কি।

গ

৫০. গড্ডলিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ) – গড্ডলিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে নিজের বুদ্ধি মতো চলো।
৫১. গলগ্রহ (পরের বোঝা স্বরূপ) – আমি কারো গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই না।
৫২. গোবর গণেশ (মূর্খ) – ছেলেটা একেবারে গোবর গণেশ, বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিছুই নেই।
৫৩. গোড়ায় গলদ (আরম্ভে ভুল) – অঙ্ক মিলবে কী করে, গোড়াতেই যে গলদ করে বসে আছ।
৫৪. গা ঢাকা দেওয়া (লুকিয়ে থাকা) – পুলিশের ভয়ে সে গা ঢাকা দিয়েছে।

ঘ

৫৫. ঘোড়া রোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত করা) – ঘরে সাদাকালো টিভি কেনার টাকা নেই রহিম নাকি রঙিন টিভি কিনবে– এটি ঘোড়ার রোগ ছাড়া আর কি।
৫৬. ঘাটের মড়া (অতি বৃদ্ধ) – গরিব বলে কি ঘাটের মড়ার কাছে মেয়ে সমর্পণ করব?
৫৭. ঘোড়ার ডিম (বৃথা, অর্থহীন) – সারা বছর লেখাপড়া না করলে পরীক্ষার খাতায় ঘোড়ার ডিম তো পাবেই।
৫৮. ঘটিরাম (অপদার্থ) – ইব্রাহীম একটা ঘটিরাম, ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না।

চ

৫৯. চশমখোর (লজ্জাহীন) – তোমার মতো এমন চশমখোর লোক আর জীবনে দেখিনি।
৬০. চোখের চামড়া (লজ্জা) – তোমার চোখের চামড়া থাকলে এ মিথ্যা কথাটা আর বলতে না।
৬১. চাঁদের হাট (সুখের মিলন) – পুত্র কন্যাদের নিয়ে শহীদুল্লাহ সাহেবের সংসারে চাঁদের হাট বসেছে।
৬২. চোখে সরষের ফুল দেখা (হতভম্ব) – পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন পড়েনি– নাসির তাই চোখে সরষের ফুল দেখছে।
৬৩. চোখের মনি (প্রিয়) – শুভ ছিল মায়ের চোখের মনি।
৬৪. চুনোপুটি (সামান্য ব্যক্তি) – রাঘব বোয়ালরা ভয়ে কম্পমান, আর তুমি বাপু চুনোপুটি হয়ে লাফাচ্ছ।
৬৫. চোখের চামড়া (চক্ষুলজ্জা থাকা) – তোমার চোখের চামড়া থাকলে মায়ের কাছে এমন নির্লজ্জ আবদার করতে পারত না।

ছ

৬৬. ছকড়া নকড়া (সস্তা দর) – বাজারে সবজির আমদানি বেশি, তাই ছকড়া নকড়া দরে বিক্রি হচ্ছে।
৬৭. ছেলের হাতে মোয়া (সহজলভ্য) – ভোট ছেলের হাতে মোয়া নয় যে চাইলেই পেয়ে যাবে।
৬৮. ছা পোষা (পোষ্য ভারাক্রান্ত) – তার মতো ছা পোষা মানুষকে দিয়ে এত বড় কাজ হবে না।
৬৯. ছাই চাপা আগুন (প্রচ্ছন্ন প্রতিভা) – ছাই চাপা আগুন কোনো দিন ঢাকা থাকে না, একদিন প্রকাশ পাবেই।

৭০. ছিনিমিনি খেলা (অপব্যয় করা) – স্বপন আমার টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, তা হতে দেব না।

জ

৭১. জিলিপির প্যাচ (কুবুদ্ধি)– তোমার পেটে এত জিলিপির প্যাচ – তা আমি আগে টের পাইনি।

৭২. জগদ্দল পাথর (গুরুভার) – নাবালক ভাইদের সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব জগদ্দল পাথরের মতো আমার ঘাড়ে চেপে আছে।

৭৩. জগাখিচুড়ি (সবকিছু এলোমেলো, বিশৃঙ্খল হয়ে থাকা) – গুছিয়ে বলতে না পারার জন্য ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত জগাখিচুড়ি হয়ে গেল।

ঝ

৭৪. ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মেশা (সুযোগ পাওয়া মাত্র নিজের দলে ফেরা) – তাদের জন্য অনেক করলাম কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত আমাকে তাড়া করে ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মিশে গেল।

৭৫. ঝোপ বুঝে কোপ মারা (সুযোগ বুঝে কার্যসিদ্ধি করা) – ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলে অতি কঠিন কাজেও সফলতা লাভ করা যায়।

ট

৭৬. টনক নড়া (সজাগ হওয়া) – এ কাজের ব্যাপারে তোমার আগেই টনক নড়া উচিৎ ছিল।

৭৭. টাকার গরম (ধনসম্পদের অহংকার) – হঠাৎ বড়লোক হয়েছ তাই তুমি টাকার গরম দেখাচ্ছ।

৭৮. টাকার কুমির (ধনী) – লোকটা টাকার কুমির কিন্তু গরীব দুখীদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

৭৯. টুপ ভুজঙ্গ (নেশায় চুর) – আরে, কাকে কী বলছ, দেখছ না নেশা করে একেবারে টুপ ভজঙ্গ হয়ে এসেছে।

৮০. টক্কর দেওয়া (পাল্লা দেওয়া) – যার তার সাথে টক্কর দিতে যেও না, শেষে বিপদে পড়বে।

ঠ

৮১. ঠোঁট কাটা (বেহায়া) – এমন ঠোঁট কাটা মেয়ে আমি আগে দেখিনি।

৮২. ঠাই ঠাই (পৃথক)– ভাই ভাই ঠাই ঠাই আছে।

৮৩. ঠাণ্ডা লড়াই (গোপনে বিরোধিতা)– রহিম বহুদিন ধরে সালমার সাথে ঠাণ্ডা লড়াই চালাচ্ছে।

ড

৮৪. ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য বস্তু) – নাছিরকে আজকাল দেখাই যায় না, সে যেন ডুমুরের ফুল হয়ে গেছে।

৮৫. ডান হাতের ব্যাপার (আহার) – অনেক বেলা হয়েছে ডান হাতের ব্যাপারটা সেরেই ফেলি।

৮৬. ডামাডোল (বিশৃঙ্খলা) – যুদ্ধের ডামাডোলে চোরাকারবারিরা দুহাতে পয়সা লুটছে।

ঢ

৮৭. ঢং করা (ন্যাকামি)– এত ঢং না করে যা বলার বলে ফেল।

৮৮. ঢাকের কাঠি (মোসাহেব) – কেরানি তো বড় সাহেবের ঢাকের কাঠি, যা বলবে তাই শুনবে।

৮৯. ঢাকের বাঁয়া (অকেজো) – ছেলের বিয়ের যোগাড় করেছে মা, বাবাটি তো ঢাকের বাঁয়া।

ত

৯০. তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী) – তাদের প্রেম তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে গেল।

৯১. তীর্থের কাক (প্রতীক্ষারত) – একটু ত্রাণের আশায় গরিবলোকেরা সারাদিন ধরে তীর্থের কাকের মতো বসে আছে।

৯২. তেলে বেগুনে জ্বলে উঠা (হঠাৎ অতিশয় রাগান্বিত হওয়া) – পাওনা টাকা চাইতেই তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

৯৩. তামার বিষ (অর্থের কুপ্রভাব) – সে যে লম্বা কথা বলে তার মূলে আছে তামার বিষ।

৯৪. তালকানা (হুঁশ নেই যার) – ইলা তালকানা, ওর ওপর গুরু দায়িত্ব দেয়া যায় না।

দ

৯৫. দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠতা) – ইলা ও মিলার মধ্যে খুব দহরম মহরম।

৯৬. দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু) – টাকা থাকলে দুধের মাছির অভাব হয় না।

৯৭. দাঁও মারা (মোটা অঙ্ক লাভ করা) – হঠাৎ চালের দাম বেড়ে যাওয়ায়, চালের দোকানদাররা ভালো দাঁও মেরেছে।

৯৮. দুধে ভাতে (ভালো অবস্থায় থাকা) – বাপ মায়ের আশা তাদের সন্তান যেন দুধে ভাতে থাকে।

ধ

৯৯. ধামাধরা (চাটুকারিতা) – সমাজে ধামাধরাদের অত্যাচারে টিকে থাকা কঠিন।

১০০. ধরাকে সরা জ্ঞান করা (তুচ্ছ জ্ঞান করা) – হঠাৎ কিছু কাঁচা পয়সা হাতে এসেছে বলে ধরাকে সরা জ্ঞান কোরো না।

১০১. ধান ভানতে শিবের গীত (এক কাজ করতে বা বলতে গিয়ে অন্য কাজ করা বা বলা) – তোমার ধান ভানতে শিবের গীতের অভ্যাসটা আর গেল না।

১০২. ধকল সওয়া (সহ্য করা) – তুমি যা-ই বল না কেন, এ বয়সে এত বড় ধকল সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ন

১০৩. নয় ছয় (অপচয়) – এ বয়সেই এত নয়ছয় করছ, সারাজীবন চলবে কীভাবে।

১০৪. নেই আঁকড়া (নাছোড়বান্দা) – পড়েছি নেই আঁকড়াদের হাতে চাঁদা না দিয়ে কি রক্ষে আছে।

১০৫. নাড়ির খবর (সকল খবর) – নাড়ির খবর জেনেই তবে আমি একাজ করব।

১০৬. নজর লাগা (দৃষ্টিতে নষ্ট হওয়া) – নজর লেগে ছেলেটি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

১০৭. নিমরাজি (অল্পরাজি) – সে এ কাজে নিমরাজি ছিল।

প

১০৮. পটল তোলা (মারা যাওয়া) – পুলিশের বেদম মার খেয়ে চোরটা গত রাতে পটল তুলেছে।

১০৯. পুকুর চুরি (ব্যাপক চুরি) – একটু আধটু হলে না হয় বুঝতাম, এ যে পুকুর চুরি– গোটা প্রতিষ্ঠানটাই বেমালুম গায়েব।

১১০. পোয়াবারো (সুসময়) – মিলের ম্যানেজার অফিসে নেই, ছোটকর্তার তো এখন পোয়াবারো।

১১১. পুঁটি মাছের প্রাণ (ক্ষীণ প্রাণ) – ওতো পুঁটি মাছের প্রাণ– ওকে ধমক ধামক দিয়ে কী লাভ।

১১২. পগার পার (পালিয়ে যাওয়া) – লোকজনকে দেখে চোর পগার পার হলো।

ফ

১১৩. ফপর দালালি (মাতাব্বরি)– এ ব্যাপারে আমি হারুনের ফপর দালালি সহ্য করব না।

১১৪. ফুলবাবু (সৌখিন সজা-সজ্জাধারী) – ফুলবাবু সেজে ঘুরে বেড়ালে পেটের ভাত যোগাড় হবে কোত্থেকে।

১১৫. ফাটা কপাল (মন্দভাগ্য)– যা আমার ফাটা কপাল, তাতে কোনো আশাই করি না।

ব

১১৬. বালির বাঁধ (ক্ষণস্থায়ী) – তাদের প্রেম বালির বাঁধের মতো ভেঙ্গে গেল।

১১৭. বাঁ হাতের ব্যাপার (ঘুষ) – আজকাল বা হাতের ব্যাপার ছাড়া চাকুরি পাওয়া কঠিন।

১১৮. বাঘের দুধ (দুষ্প্রাপ্য বস্তু) – টাকা হলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়।

১১৯. বুদ্ধির ঢেঁকি (বোকা) – ও যে বুদ্ধির ঢেঁকি, ওকে দিয়ে এ শক্ত কাজ হবে না।

১২০. ব্যাঙের আধুলি (অতি সামান্য ধন) – ব্যাঙের আধুলি পেয়েই এত লাফাচ্ছ– বেশি টাকা পেলে কী করবে ভেবে পাচ্ছি না।

১২১. ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব) – ডাকাতকে দেখাচ্ছ পুলিশের ভয়? ব্যাঙের কোনো দিন সর্দি হয় নাকি!

১২২. বিসমিল্লায় গলদ (গোড়ায় ভুল) – অঙ্ক মিলবে কী করে, বিসমিল্লায় গলদ করে বসে আছ।

ভ

১২৩. ভরাডুবি (সর্বনাশ) – ব্যবসায় করিম সাহেবের ভরাডুবি হয়েছে।

১২৪. ভিজা বিড়াল (কপট) – ওতো একটা ভিজা বিড়াল, চেহারা শান্ত হলেও পেটে যত শয়তানি বুদ্ধি।

১২৫. ভিটায় ঘুঘু চরান (সর্বনাশ করা) – তুমি আমার পেছনে লেগেছ– তোমার ভিটায় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়ব।

১২৬. ভানুমতির খেল (ভোজবাজি, ভেল্কি) – খুব তো ভানুমতির খেল দেখালে, তুমি যে এমন ফাঁকিবাজ তা আগে জানলে তোমাকে এ কাজের ভার দিতাম না।

ম

১২৭. মাকাল ফল (অন্তঃসারশূন্য) – তার মতো মাকাল ফল দিয়ে এ কাজ হবে না।

১২৮. মাটির মানুষ (সরল ব্যক্তি) – জালাল সাহেব সত্যি মাটির মানুষ, সকলের প্রতি তিনি সমান ব্যবহার করেন।

১২৯. মাথা খাওয়া (প্রশ্রয় দিয়ে নষ্ট করা) – ছেলেটাকে প্রশ্রয় দিয়ে তারা মাথা খেয়েছে।

১৩০. মামাবাড়ির আবদার (অতিরিক্ত দাবি যা যুক্তিসংগত নয়) – ভোট মামার বাড়ির আবদার নয় যে চাইলেই পাবে?

য

১৩১. যক্ষের ধন (কৃপণের ধন)– তুমি তো যক্ষের ধন, তুমি আবার কী দান করবে।

১৩২. যো হুকুম (চাটুকার)– সাবধান ভাই সাবধান, যো হুকুমের দল সর্বনাশ করবে।

১৩৩. যমের অরুচি (যে সহজে মরে না): আশি বছরের বৃদ্ধের প্রতি যমেরও অরুচি।

র

১৩৪. রাঘব বোয়াল (অতি ক্ষমতাধর) – সমাজে রাঘব বোয়ালদের জন্য অনেকসময় শুভ কাজ করা যায় না।

১৩৫. রগচটা (বদরাগি) – রগচটা লোকের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা কঠিন কাজ।

১৩৬. রাবণের চিতা (চির অশান্তি)– তার সংসারে সর্বদা রাবণের চিতার মতো জ্বলছে।

ল

১৩৭. লেফাফা দুরস্ত (বাইরের পরিপাটি ভাব) – লোকটা পোশাকে আশাকে লেফাফাদুরস্ত কিন্তু লেখাপড়া একটুও জানে না।

১৩৮. লম্বা দেওয়া (পালিয়ে আত্মরক্ষা) – পুলিশ দেখা মাত্র চোরটা লম্বা দিল।

শ

১৩৯. শাঁখের করাত (উভয় সংকট) – আমার হয়েছে শাঁখের করাত –এখন হ্যাঁ বললেও বিপদ না বললেও বিপদ।

১৪০. শকুনি মামা (অসৎ বুদ্ধিদাতা আত্মীয়) – অসৎ কাজে প্রেরণা দিতে শকুনি মামারা চিরকালই লেগে আছে।

১৪১. শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (নিন্দনীয় কাজ গোপন করার চেষ্টা) – ছেলের কুকর্ম ঢাকতে গিয়ে মিথ্যা বললেন হাজি সাহেব, শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়।

ষ

১৪২. ষোলকলা (সম্পূর্ণ) – জীবনে যা কাম্য সবই পেয়েছেন তিনি– বলা চলে ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে তাঁর।

১৪৩. ষোল আনা (পুরোপুরি)– চাকুরিটা পেয়ে তার ষোলো আনা পূর্ণ হলো।

স

১৪৪. সোনায় সোহাগা (সুন্দর মিলন) – যেমন বর তেমন কনে, একেই বলে সোনায় সোহাগা।

১৪৫. সাপে নেউলে (শত্রুভাব) – দু ভাইয়ে এখন সাপে-নেউলে ভাব, কেউ কারো মুখদর্শন পর্যন্ত করে না।

হ

১৪৬. হাত টান (চুরির অভ্যাস) – লোকটার হাতটানের অভ্যাস আছে।

১৪৭. হ-য-ব-র-ল (বিশৃঙ্খলা) – বাসার সব জিনিসপত্র এমন হ-য-ব-র-ল হয়ে আছে কেন।

১৪৮. হাতে খড়ি (আরম্ভ) – ব্যবসায়ে ছেলেটার হাতে খড়ি দিলাম, কিছু করে খেতে হবে তো।

১৪৯. হাতের পাঁচ (শেষ অবলম্বন) – এ এক লাখ টাকাই এখন আমার হাতের পাঁচ।

১৫০. হাড় হাভাতে (অভাবী) – মামুন খুবই হাড় হাভাতে লোক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :

১। বাগধারা কাকে বলে?

২। নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্যরচনা করুন: অক্কা পাওয়া, তাসের ঘর, আকাশ পাতাল, নিমরাজি, ইদুর কপালে, পটল তোলা, ওজন বুঝে চলা, বসন্তের কোকিল, ছা পোষা, ভরাডুবি, টাকার গরম, ঢাকের বায়া, কান পাতলা, পটল তোলা, যক্ষের ধন।

পাঠ-৫.৮ : শব্দের বিশিষ্ট অর্থের প্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- একই শব্দের ভিন্নার্থক প্রয়োগ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অনেক শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়। এসব শব্দ পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োগ হয়ে থাকে।

উঠা

আভিধানিক অর্থ : উত্থিত হওয়া

বিশেষ অর্থ :

১. রব উঠা (গুজব উঠা)	এ খারাপ কাজটি তুমিই করেছ বলে রব উঠেছে।
২. জাতে উঠা (সমাজে স্থান পাওয়া)	চাকুরি হওয়ায় মজিদ এখন জাতে উঠেছে।
৩. কানে উঠা (শুনতে পাওয়া)	কথাটা মায়ের কান পর্যন্ত উঠেছে।
৪. মন উঠা (সন্তুষ্ট হওয়া)	এত অল্প টাকায় তার মন উঠবে না।

কথা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বাক, বচন, ভাষা, উক্তি

বিশেষ অর্থ :

১. কথা দেওয়া (প্রতিশ্রুতি দেওয়া)	আমি এ ব্যাপারে তাকে কথা দিয়েছি।
২. কথা (তুলনা)	তোমার সঙ্গে তার কথা চলে না।

কান

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : কর্ণ

বিশেষ অর্থ :

১. কান পাতা (শুনার জন্য মনোযোগ দেওয়া)	জব্বর আলীর কান পাতার অভ্যাস আছে।
২. কান দেওয়া (শোনা)	খারাপ লোকের কথায় কান দিও না।
৩. কানে তোলা (কথা উত্থাপন করা)	এসব তুচ্ছ কথা তাঁর কানে তুলে লাভ নাই।

কাজ

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : কর্ম, কার্য

বিশেষ অর্থ :

১. কাজ দেওয়া (সাহায্য করা)	আমি একটি ভাল কাজ পেয়েছি।
২. কাজে লাগা (প্রয়োজনে আসা)	তার পরামর্শ আমার কাজে লেগেছে।
৩. কাজ হাসিল করা (উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া)	কেবল মধুর কথায় কাজ হাসিল করা যায় না।

কাঁচা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : অপক্ব

বিশেষ অর্থ :

১. কাঁচা মাংস (অসিদ্ধ মাংস)	আদিম যুগে মানুষ কাঁচা মাংস খেত।
২. কাঁচা লোক (অনিপুণ লোক)	রশিদ সাহেব কাঁচা লোক নন।
৩. কাঁচা ঘুম (সদ্য ঘুম)	ছেলেটাকে কাঁচা ঘুমে ডেকো না।
৪. কাঁচা হাত (অনিপুণ হাত)	আদিবের কাঁচা হাতের লেখা, বুঝা মুশকিল।

কড়া

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : তীব্র, অকোমল

বিশেষ অর্থ :

১. কড়া (কঠোর)	ভাড়াটিয়াকে হাকিম সাহেব কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন।
২. কড়া (প্রখর)	কড়া রোদে দৌড়ান ভালো নয়।
৩. কড়া (তীব্র)	ডাক্তার তাকে কড়া ঔষধ দিল।
৪. কড়া (সতর্ক)	বাড়িটি কড়া পাহাড়ায় রাখ।

গরম

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : উষ্ণ, তাপ, উত্তাপ

বিশেষ অর্থ :

১. গরম (উগ্র)	আমাকে গরম মেজাজ দেখাবেন না।
২. গরম (অহংকার)	টাকার গরম দেখানো ভালো নয়।
৩. গরম (উত্তাপ)	জ্বরে ছেলেটির গা গরম হয়েছে।
৪. গরম (গ্রীষ্ম)	গরম কালে অনেক ফল পাওয়া যায়।
৫. গরম (টাটকা)	এটা আজকের গরম খবর।

গা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : শরীর, গতর

বিশেষ অর্থ :

১. গায়ে হাত তোলা (প্রহার করা)	বাচ্চা ছেলেদের গায়ে হাত তোলা উচিৎ নয়।
২. গায়ে কাঁটা দেওয়া (রোমাঞ্চিত হওয়া)	সেই রাত্রির কথা মনে পড়িলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে।
৩. গা করা (মন দেওয়া)	বসে থেকে কি হবে? গা করে কাজ করো।
৪. গা জুড়ানো (স্বস্তি পাওয়া)	তোমার ঐ বিশটি টাকায় আমার গা জুড়াবে না।

চোখ

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : চক্ষু, নয়ন

বিশেষ অর্থ :

১. চোখ দেখা (চোখ পরীক্ষা করা)	ডাক্তার সাহেব রোগীর চোখ দেখলেন।
২. চোখ পাকানো বা রাঙানো (রাগ দেখানো)	কথায় কথায় আজিজ সাহেব চোখ পাকায়।
৩. চোখ উঠা (চক্ষূরোগ বিশেষ)	ছেলেটার চোখ উঠেছে।
৪. চোখঠারা (চোখ দিয়ে ইশারা করা)	কেন তুমি চোখঠারাও প্রমিলার দিকে?
৫. চোখ ফোটা (প্রকৃত জ্ঞান হওয়া)	কবে যে তোমার চোখ ফুটবে কে জানে!
৬. চোখ রাখা (দৃষ্টি রাখা)	ছেলেটির প্রতি একটু চোখ রেখো।

ছোট

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ

বিশেষ অর্থ :

১. ছোট (সংকীর্ণ)	লোকটার মন ছোট।

২. ছোট (নীচ) — ছোট লোক কত ভদ্রতাই বা জানবে।
৩. ছোট (কনিষ্ঠ) — ছোট ছেলেটি মা বাবার আদুরে।

ছাড়া

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বর্জন বা ত্যাগ করা

বিশেষ অর্থ :

১. আশা ছাড়া (ত্যাগ করা) — আমি চাকরির আশা ছেড়েছি।
২. হাল ছাড়া (নিরাশ হওয়া) — এত শিগগির হাল ছাড়লে চলবে কি করে।
৩. গলা ছাড়া (উদাত্ত কণ্ঠ) — গলা ছেড়ে গান গাও।
৪. জ্বর ছাড়া (জ্বর থামা) — ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছেড়েছে।
৫. ছেড়ে দেওয়া (মুক্ত করা) — পাখিটাকে ছেড়ে দাও।

তোলা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : উঠানো, উত্তোলন

বিশেষ অর্থ :

১. গুজব তোলা (রটনা করা) — যারা মিথ্যা গুজব তোলে, তারা দেশের শত্রু।
২. ঘরে তোলা (গৃহজাত করা) — সব ফসল ঘরে তোলা হয়েছে তো?
৩. পটল তোলা (মারা যাওয়া) — লোকটা অল্প বয়সে পটল তুলেছে।
৪. চাঁদা তোলা (চাঁদা সংগ্রহ করা) — সমিতির জন্য পাড়ার ছেলেরা চাদা তুলছে।

ধরা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : স্পর্শ, পাকড়ানো, পৃথিবী

বিশেষ অর্থ :

১. দোষ ধরা (দেখান) — অযথাই অন্যের দোষ ধরো কেন?
২. তাল ধরা (উৎসাহ দেওয়া) — প্রতি কাজেই তাল ধরলে হয় না।
৩. রোগ ধরা (রোগাক্রান্ত হওয়া) — লোকটাকে শক্ত রোগে ধরেছে।
৪. মনে ধরা (পছন্দ হওয়া) — কথাটা আমার মনে ধরেনি।
৫. ট্রেন ধরা (ঠিক সময় ট্রেন পাওয়া) — বড্ড দেরি হয়ে গেছে; ট্রেন ধরতে পারব কি?

পা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : পদ, চরণ

বিশেষ অর্থ :

১. পা বাড়ানো (অগ্রসর হওয়া) — পা বাড়িয়ে চলো; সাফল্য তোমার আসবেই।
২. পা চালান (দ্রুতবেগে চলন) — পা চালাও তা না হলে ট্রেন ধরতে পারবে না।
৩. পায়ে পড়া (ক্ষমা চাওয়া) — কৃত অপরাধের জন্য ছাত্রটি শিক্ষকের পায়ে পড়ল।
৪. পায়ে ঠেলা (তুচ্ছ করা) — হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না।

পাকা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : পক্ব, পরিণত

বিশেষ অর্থ :

১. পাকা ইট (পোড়ানো) — পাকা ইটের বাড়ি খুব শক্ত মজবুত।
২. পাকা (অভিজ্ঞ) — রহমান সাহেব পাকা ডাক্তার।
৩. পাকা সোনা (খাঁটি) — পাকা সোনার অলংকার টিকে বেশি।
৪. পাকারং (স্থায়ী) — পাকারঙের শাড়ি দামে সস্তা নয়।
৫. পাকা চুল (সাদা) — সে পাকা চুলে রঙ দিয়েছে।

৬. পাকা খাতা(শেষ) — পাকা খাতায় হিসেব তোলা হয়েছে; আর কাটাকাটি সম্ভব নয়।
৭. পাকা (নিপুণ) — রাসেলের কাজে খুবই পাকা, কোনো দোষ ধরা যায় না।
৮. পাকা (সম্পূর্ণ) — এ কাজটি করতে তালুকদারের পাকা এক সপ্তাহ লেগেছে।
৯. পাকাকথা (অপরিবর্তনীয়) — তারা বিয়েতে পাকাকথা দিয়েছে।

বড়

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বৃহৎ, দীর্ঘ, মহৎ, খুব

বিশেষ অর্থ :

১. বড় (ধনী)	সে বেশ বড় লোক।
২. বড় (উচ্চপদস্থ)	বড় বাবুকে সবাই ভয় পায়।
৩. বড় (অত্যন্ত)	রাশেদ বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছে।
৪. বড় (উদার)	সম্রাট আকবর বড় মনের অধিকারী ছিলেন।
৫. বড় (জ্যেষ্ঠ)	নয়না বাবা মায়ের বড় মেয়ে।
৬. বড় (উচ্চবংশ)	মুন বড় বংশের মেয়ে।
৭. বড় (কঠোর)	সে আমার মুখের উপর এত বড় কথা বলতে পারল!
৮. বড় (বিশেষ)	বড়দিনের ছুটিতে লিপি বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেল।
৯. বড় (নিকট)	লোকটি আমার বড় কুটুম।

বুক

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বক্ষস্থল, অন্তর, ছাতি

বিশেষ অর্থ :

১. বুক বাঁধা (মন দৃঢ় করা)	এতিম ছেলেটি বুক বেঁধে জীবন সংগ্রামে নেমেছে।
২. বুক ফাটা (হৃদয় বিদীর্ণ হওয়া)	কোন কোন মায়ের বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না।
৩. বুকের পাটা (সাহস)	রশিদের বুকের পাটা আছে বলেই এমন কথা বলতে পারে।
৪. বুক পাতা (সাহায্য করা)	সৎ লোক অন্যের জন্য বুক পাততে পারে।
৫. বুক ফুলা (গর্ব করা)	ছেলের পরীক্ষা পাশে বুড়োর বুক ফুলে গেছে।
৬. বুকে লাগা (আঘাত পাওয়া)	তোমার কথায় ছেলেটির বুকে লেগেছে।

মন

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : চিত্ত, হৃদয়

বিশেষ অর্থ :

১. মন উঠা (সন্তুষ্ট হওয়া)	কিছুতেই তার মন উঠছে না।
২. মন পড়া (পছন্দ হওয়া)	মেয়েটাতে তার মন পড়েছে।
৩. মন লাগা (মনোযোগী হওয়া)	কিছুতেই কাজে মন লাগছে না।
৪. মনে পড়ে (স্মরণে আসা)	কবিতার লাইনটা মনে পড়ছে না।
৫. মনে লাগা (পছন্দ হওয়া)	বাড়িটি আমার বেশ মনে লেগেছে।
৬. মন পাওয়া (ভালোবাসা পাওয়া)	এত করেও তোমার মন পেলাম না।
৭. মনের মিল (সদ্ভাব)	আদিব ও আকিবের মধ্যে মনের মিল আছে।
৮. মন কষাকষি (মনোমালিন্য)	সম্পত্তির কারণে দুই ভাইয়ের মধ্যে মন কষাকষি চলছে।

মাথা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : মস্তক, শির, আগা, আরম্ভ /শরীরের একটি অঙ্গ

বিশেষ অর্থ :

১. মাথা দেওয়া (সাহায্য করা)	বিপদে যে মাথা দেয় সেই প্রকৃত বন্ধু।

২. মাথা ধরা (মাথায় যন্ত্রণা হওয়া) — ওষুধ খেয়ে রুগির মাথা ধরা কমেছে।
৩. মাথা পাতা (সম্মত হওয়া) — এ কাজে আমি মাথা পাততে পারি না।
৪. মাথা আসা (বোধগম্য হওয়া) — অঙ্কটি কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না।
৫. মাথা খাওয়া (নষ্ট করা) — অতি আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়ো না।
৬. মাথা ঠেকান (প্রণাম করা) — ও আমার দেশের মাটি, তোমার তরে ঠেকাই মাথা।
৭. মাথায় উঠা (প্রশ্রয় পাওয়া) — আদর পেয়ে ছেলেটা মাথায় উঠে যাচ্ছে।
৮. মাথা গরম করা (চটিয়া যাওয়া) — এত অল্পে ছেলেটা মাথায় উঠে যাচ্ছে।
৯. চোখের মাথা খাওয়া (অন্ধ হওয়া) — চোখের মাথা না খেলে কেউ এমন কাজ করতে পারে?
১০. মাথার দিব্যি (শপথ) — মাথার দিব্যি, দয়া করে এ কাজ করো না।

মুখ

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : মুখমণ্ডল, সম্মুখ
বিশেষ অর্থ :

১. মুখ রাখা (মান রাখা) — মেয়েটা তার বাবার মুখ রেখেছে।
২. মুখ উজ্জ্বল করা (গৌরব বাড়ানো) — আমজাদ বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে।
৩. মুখ চাওয়া (নিভুর্র করা) — আমি তার মুখ চেয়ে বসে আছি।
৪. মুখ তোলা (প্রসন্ন হওয়া) — আল্লাহ অবশেষে আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।
৫. মুখে খই ফোটা (বেশি কথা বলা) — মনে হয়, বক্তার মুখে যেন খই ফুটছে।
৬. মুখ খোলা (নীরবতার পর কথা বলা) — অবশেষে আসামী মুখ খুলল।
৭. মুখ সামলানো (সংযত হওয়া) — খবরদার মুখ সামলিয়ে কথা বলো।
৮. মুখ করা (তিরস্কার করা) — জলিল সাহেব তাকে খুব মুখ করল?
৯. মুখ ভার করা (অভিমান করা) — ইব্রাহীম মুখ ভার করে বসে আছে।

মোটা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বেশি, স্থূল
বিশেষ অর্থ :

১. মোটা (স্থূল) — আলম সাহেব মোটা বুদ্ধির লোক।
২. মোটা (অমসৃণ) — গরিব মানুষ সাধারণত মোটা কাপড় পড়ে ।
৩. মোটা (মিহি নয় এমন) — মোটা ভাত ও মোটা কাপড়েই সে তুষ্ট।
৪. মোটা (বেশি) — মোটা আয়ের লোক ভালোভাবে সংসার চালাতে পারে।
৫. মোটা (বহু) — আমার মোটা কাজ আছে।
৬. মোটা (প্রচুর) — মোটা ধার নিলে শেষে শোধ করতে পারে না।

রাখা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ :
বিশেষ অর্থ :

১. পায়ে রাখা (আশ্রয় দেওয়া) — এ অধমকে পায়ে রেখ, হে খোদা!
২. মান রাখা (সম্মান রাখা) — এ সন্তান বংশের মান রাখতে পারে।
৩. মন রাখা (সন্তুষ্ট করা) — সকলের মনরেখে চলা কঠিন।
৪. কথা রাখা (অনুরোধ রক্ষা করা) — আমার বিশ্বাস, সে আমার কথা রাখবে।
৫. চোখ রাখা (নজর রাখা) — শিশুটির প্রতি চোখ রেখো।
৬. মনে রাখা (স্মরণ রাখা) — সে বংশের মান রেখেছে।

৭. নাম রাখা (সম্মান রাখা) ছেলেটা বাপের নাম রেখেছে।
৮. কথা রাখা (প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা) শেষ পর্যন্ত কথা রাখলেন বড় সাহেব।

শক্ত

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : কঠিন, নরম না

বিশেষ অর্থ :

১. শক্ত কথা (কড়া) কাউকে শক্ত কথা উচিত নয়।
২. শক্ত (কঠিন) অঙ্কটি খুবই শক্ত।
৩. শক্ত (দুরারোগ্য) বড় শক্ত পীড়ায় সে ভুগছে।
৪. শক্ত লোক (নির্দয়) শক্ত লোককে অনেকেরই পছন্দ করে না।
৫. শক্ত (মজবুত) করিম সাহেবের হাতের কাজ খুবই শক্ত।

হাত

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : হস্ত /শরীরের একটি অঙ্গ

বিশেষ অর্থ :

১. হাত আসা (অভ্যাস হওয়া/রপ্ত হওয়া) কাজটিতে তার হাত এসেছে।
২. হাত করা (বশীভূত করা) চাকরটাকে হাত করে চোর ঘরে ঢুকেছে।
৩. হাত থাকা (প্রস্তাব) এ ব্যাপারে আমার হাত নেই।
৪. হাত পাতা (অনুগ্রহ চাওয়া/ভিক্ষা করা) আমি তার কাছে হাত পাততে পারবো না।
৫. হাত দেওয়া (কাজ করতে চাওয়া) এক সপ্তাহ ধরে কাজটিতে হাত দিতে পারি না।
৬. হাতটান (চুরির অভ্যাস) কাদেরের হাতটানের অভ্যাস আছে।
৭. হাত তোলা (প্রহার করা) বাচ্চা ছেলেদের গায়ে হাত তোলা ঠিক নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। নিচের শব্দগুলোর ভিন্নার্থক প্রয়োগ দেখান– হাত, মাথা, গা, কাঁচা, ছোট, তোলা, পা, মন।

পাঠ-৫.৯ : প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ কী তা বলতে পারবেন।
- প্রায় সমোচ্চারত শব্দের ব্যবহার দেখাতে পারবেন।

এমন অনেক শব্দগুচ্ছ বাংলা ভাষায় রয়েছে যাদের উচ্চারণ প্রায় একই হলেও এদের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদেরকে প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ বলে অভিহিত করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে-সব শব্দগুচ্ছের উচ্চারণ এক, কিন্তু অর্থ আলাদা সে-সব শব্দকে বলা হয় প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ।

১
অন্ন (ভাত) আমি তাকে অন্ন দিব বলে বলছি।
অন্য (অপর) নিজের পাশাপাশি অন্যের কথাও ভাবতে হবে।
২
অনু (পশ্চাৎ) যা বলার সামনে বলো অনুতে না বলাই ভালো।
অণু (ক্ষুদ্রতম অংশ) কেবল বড় জিনিস নয়, অণুতেও সফল পেতে পার।
৩
অংশ (ভাগ) তার জমিতে আমার অংশ আছে।
অংস (কাঁধ) বিপদে দূরে সরে না থেকে অংস মেলাও।
৪
অশ্ব (ঘোড়া) এরকম অশ্বের মতো শব্দ করছ কেন?
অশ্ম (পাথর) অশ্মে মাথা ঠুকে লাভ নাই, চল বাড়ি যাই।
৫
অশক্ত (দুর্বল) বিপদে অশক্ত হতে নাই।
অসক্ত (আসক্তিহীন) বইয়ে অসক্ত হলে ছাত্রজীবন বৃথা হবে।
৬
অনিল (বাতাস) পৃথিবীর সর্বত্রই অনিলের সমারোহ।
অনীল (যা নীল নয়) আকাশ কী কখনো অনীল হয়।
৭
অন্ত (শেষ) সংসারে কাজের অন্ত নাই।
অন্ত্য (যা অন্তে আছে) নিলয়ের আজ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছে।
৮
অন্যান্য (অপরাপর) অন্যান্যের সঙ্গেই তার ভালো সম্পর্ক আছে।
অন্যোন্য (পরস্পর) অন্যোন্যের প্রতি ভালোবাসায় মানুষের সুখ।
৯
অবদান (সৎকর্ম) দেশের স্বাধীনতায় মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান অনেক বেশি।
অবধান (মনোযোগ) পড়ালেখায় অবধান না দিলে ভালো করতে পারবে না।

১০

অবিরাম (অনবরত)		অবিরাম চেষ্টা মানুষকে সফলতা এনে দেয়।
অভিরাম (সুন্দর)		পোশাকে নয়নাভিরাম সেজো না, মনের দিকে অভিরাম হও।

১১

অপচয় (ক্ষতি)		সময়ের অপচয় করো না।
অবচয় (চয়ন)		সবকিছুতেই সৌন্দর্য অবচয়ন করতে হবে।

১২

অবিনীত (উদ্ধত)		অবিনীত সন্তান সমাজের জন্য ক্ষতিকর।
অভিনীত (অভিনয় করা হয়েছে) এটি নায়ক রাজ রাজ্জাকের প্রথম অভিনীত ছবি।

১৩

অপগত (দূরীভূত)		অন্যের দুঃখ দূর অবগত কর।
অবগত (জানা)		এ বিষয়ে আমি অবগত আছি।

১৪

আদি (মূল)		জুলফিকার এ জমির আদি মালিক।
আধি (মনঃকষ্ট)		সে আধি কাউকে বলে না।

১৫

আশা (ভরসা)		এ ছাত্ররাই আগামী দিনের আশা।
আসা (আগমন)		আমি আজ আসতে পারব না।

১৬

আবাস (বাসস্থান)		পাখিদেরও আবাস আছে।
আভাস (ইঙ্গিত)		পুলিশের আভাসেই চোরটা পালিয়ে গেল।

১৭

আবরণ (আচ্ছাদন)		এই আবরণের নিচেই মূল্যবান জিনিস আছে।
আভরণ (অলংকার)		ইদানীং বিয়েতে অনেক আভরণের প্রয়োজন হয় ।

১৮

আপন (নিজ)		শামীম আমার আপন লোক।
আপন (দোকান)		ময়মনসিংহে আমার একটি আপন আছে।

১৯

উপাদান (উপকরণ)		জমিতে অনেক উপাদান লাগে।
উপাধান (বালিশ)		আমার এ উপাধানটি ভালো নয়।

২০

ওষধি (যে গাছ একবার ফল দিয়ে মারা যায়) ধান ওষধি গাছ।
ওষধি (ভেষজ উদ্ভিদ)		ওষধি আমাদের জন্য খুব প্রয়োজন।

২১

কূল (তট)		আমরা সন্ধ্যায় সমুদ্রের কূলে গেলাম।
কুল (বংশ)		ভালো কাজ করে নিজের কুল রক্ষা করো।

২২

কালি (লেখার রং)		কালো কালিতে ভালো লেখা হয়।
কালী (সনাতন ধর্মের দেবী) কালী শক্তির প্রতীক।

২৩

খাট (পালঙ্ক)		খাটটি বেশ সুন্দর।
খাটো (বেঁটে)		মেয়েটি খাটো হলেও দেখতে সুন্দর।

২৪

গা (শরীর) আমাদের দেশের মানুষের গা একেক জনের একেক রকম।

গাঁ (গ্রাম) রাসেল তার গাঁকে খুব ভালোবাসে।

২৫

গাদা (রাশি, স্তূপ) কৃষক ধান কেটে গাদা দিয়ে রাখে।

গাধা (গর্ধভ) শিলা সংসারে সারাজীবন গাধার মতো খেটে গেল।

২৬

ঘোড়া (অশ্ব) ঘোড়ার গায়ে শক্তি বেশি।

ঘোরা (বিচরণ) লোকটি সারাদিন এ গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘোরে।

২৭

চাল (ঘরের চালা) গ্রামে এখনও খড়ের চালের প্রচলন আছে।

চাল (চাউল) চাল থেকে ভাত হয়।

২৮

চির (দীর্ঘকাল) চিরদিন কেউ বেঁচে থাকে না।

চীর (ছেঁড়া কাপড়) চীর হলেও পরিষ্কার করে পরতে হয়।

২৯

জাম (ফল বিশেষ) পাকা জাম খেতে অনেক মজা ।

যাম (অংশ) দিবসের দ্বিতীয় যামে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

৩০

টিকা (রোগের প্রতিষেধক) মনি হামের টিকা দেয়নি।

টীকা (ব্যাখ্যা) এ লেখায় টীকার প্রয়োজন হয় না।

৩১

ঠক (ধ্বনি বিশেষ) বুড়ো লোকটি ঠতক ঠক করে হাটে।

ঠক (প্রতারক) ঠক মানুষকে কেউ শ্রদ্ধা করে না।

৩২

ডাল (শাখা) ঝড়ের সময় গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ে।

ডাল (খাদ্যবিশেষ) গরিবের ডালভাত খেয়ে দিন কাটে।

৩৩

দিন (দিবস) আমি দিনে অনেক কাজ করি।

দীন (দরিদ্র) দীনে দয়া করা মানুষের ধর্ম।

৩৪

ধনী (বিত্তশালী) ফিরোজ সাহেব আমাদের গ্রামের সবচেয়ে ধনী লোক।

ধ্বনি (আওয়াজ) ছেলেটি মুখ দিয়ে নানারকম ধ্বনি করতে পারে।

৩৫

নীর (পানি) পানির অপর নাম নীর।

নীড় (পাখির বাসা) বাবুই পাখি নীড় বানাতে পারে।

৩৬

নিতি (রোজ) আমি নিতি নামাজ আদায় করি।

নীতি (নিয়ম) আমাদের স্যার খুব নীতিবান।

৩৭

নিত্য (প্রতিদিন) নিত্য তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়।

নৃত্য (নাচ) মেয়েটির নৃত্য দেখে আমি অবাক হলাম।

৩৮

প্রদান (দেওয়া) ছেলেটি গরিব মানুষকে টাকা প্রদান করল।

প্রধান (বড়, শ্রেষ্ঠ) ভাত বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য।

৩৯

পরা (পরিধান) বাবা সব সময় শার্ট পরেন।

পড়া (পাঠ করা) বই পড়া মজার কাজ।

৪০

পান (পাতা বিশেষ) পাহাড়ে পানের চাষ ভালো হয়।

পান (পান করা) ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ।

৪১

ফি (প্রত্যেক) ফিবছর আমরা নববর্ষ উদযাপন করি।

ফি (বেতন) স্কুলে এবার ফি বাড়ানো হয়েছে।

৪২

বর্ষা (ঋতুবিশেষ) বর্ষাকালে মাঠঘাট পানিতে ভরে যায়।

বর্শা (অস্ত্রবিশেষ) বর্শার আঘাতে মানুষের মৃত্যু হয়।

৪৩

বান (বন্যা) বানভাসী মানুষ খুব কষ্টে আছে।

বাণ (শর) বাণবিদ্ধ হয়ে বাঘটি মারা গেল।

৪৪

বল (শক্তি) একতাই বল।

বল (খেলার বল) রাজু ক্রিকেট বল কিনতে গেল।

৪৫

বিনা (ব্যতীত) বিনা কারণে ঝগড়া করো না।

বীণা (বাদ্যযন্ত্র) বীণার সুরে মানুষ আনন্দ পায়।

৪৬

বিষ (গরল) আর্সেনিক এক প্রকার বিষ।

বিশ (কুড়ি) দেলোয়ারকে বিশ টাকা দিয়ে দাও।

৪৭

ভাষণ (উক্তি, কথন, বক্তব্য) ৭ই মার্চের ভাষণ খুব বিখ্যাত।

ভাসন (দীপ্তি) সূর্যের ভাসনে অন্ধকার দূর হয়।

৪৮

ভারা (স্তূপাকার) ধান কাটা শেষে চাষিরা ভারা করে রাখে।

ভাড়া (মাশুল) আগের তুলনায় বাসের ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪৯

মন (অন্তর, হৃদয়) কাজে তোমার মন নেই।

মণ (চল্লিশ সের) চল্লিশ সেরে এক মণ হয়।

৫০

মাস (ত্রিশ দিন) বারো মাসে এক বছর হয়।

মাষ (কলাই) আমি মাষকলাই ডাল পছন্দ করি।

৫১

মুখ (বদন) তোমরাই আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে।

মুক (বোবা) মুক মানুষ কথা বলতে পারে না।

৫২
মরা (মৃত) মরা মানুষ পানিতে ভেসে ওঠে।
মড়া (শবদেহ) মড়াকে তাড়াতাড়ি সৎকার করাই ভালো।
৫৩
মূর্খ (জ্ঞানহীন) মূর্খ মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।
মুখ্য (প্রধান) মানুষের সেবা করাই আমার মুখ্য কাজ।
৫৪
লক্ষ (সংখ্যা বিশেষ) লক্ষ লক্ষ মানুষ মাঠে নেমেছে।
লক্ষ্য (দৃষ্টি, উদ্দেশ্য, গন্তব্যস্থল) আমার লক্ষ্য হচ্ছে তাকে সাহায্য করা।
৫৫
শক্ত (কঠিন) ইলার হৃদয় খুব শক্ত।
সক্ত (আসক্ত) মাদকাসক্ত লোক সমাজের জন্য ক্ষতি।
৫৬
শীত (শীতল) উত্তরবঙ্গে শীত বেশি পড়ে।
সিত (সাদা) সিত কাগজে ইচ্ছামত লেখা হয় না।
৫৭
শব (মৃতদেহ) সব ধর্মেই শব সৎকারের কথা আছে।
সব (সকল) সব মানুষ এখানে আসতে পারে।
৫৮
সাড়া (সংকেত) কুকাজে সাড়া দিও না।
সারা (সমাপ্ত) মনি বিয়ের কাজ সেরে ফেলেছে।
৫৯
সাক্ষর (শিক্ষিত, অবদান) মামুন একজন সাক্ষর মানুষ।
স্বাক্ষর (নামসই) মিম স্বাক্ষর করতে জানে।
৬০
হাড় (অস্থি) হাড়ই সম্বল, তার শরীরে মাংস নাই বললেই চলে।
হার (পরাজয়) জোহরা জীবনে হার মানেনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। সমোচ্চারিত শব্দের সংজ্ঞা লিখুন।
২। নিচের শব্দগুলো দিয়ে অর্থসহ বাক্য গঠন করুন-

সাক্ষর	শব	নীর	আভরণ	সারা	দিন	কুল	কালি	বিশ	বর্ষা
স্বাক্ষর	সব	নীড়	আবরণ	সাড়া	দীন	কূল	কালী	বিষ	বর্শা

পাঠ-৫.১০ : এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- এক কথায় প্রকাশের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- এক কথায় প্রকাশের ব্যবহার লিখতে পারবেন।

মানুষ বাক্যের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করে। মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মানুষ অনেক সময় পুরো বাক্য না বলে বাক্যের অংশ বলে বা বাক্যকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে থাকে। এমনকি কখনও কখনও একটি শব্দ বা পদের সাহায্যেও পুরো বাক্যের অর্থ প্রকাশ করা যায়। এভাবে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করাকে বলা হয় এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংক্ষেপণ বা বাক্য সংকোচন।

মনের ভাব প্রকাশের জন্য একাধিক পদ বা শব্দকে সংক্ষেপে প্রকাশ করাকে বলা হয় এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংক্ষেপণ

নিচে এক কথায় প্রকাশের সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দেয়া হলো–

অ

অগ্রে বর্তমান থাকে যে – অগ্রবর্তী
অক্ষির সম্মুখে – প্রত্যক্ষ
অহংকার করে যে – অহংকারী
অভিজ্ঞতার অভাব – অনভিজ্ঞ
অনেকের মধ্যে একজন – অন্যতম
অগ্রে জন্মিয়াছে যে – অগ্রজ
অনুতে (পশ্চাতে) জন্মেছে যে – অনুজ
অতি দীর্ঘ নয় যা – নাতিদীর্ঘ
অক্ষির অগোচর – পরোক্ষ
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা – অনুসন্ধিৎসা
অন্যদিকে মন যার – অন্যমনস্ক/অন্যমনা
অন্য দেশ – দেশান্তর
অনুসরণ করে যে– অনুসারী
অতীত কাহিনী– ইতিহাস
অতি শীতও নয় অতি উষ্ণও নয় – নাতিশীতোষ্ণ
অবশ্যই যা হবে – অবশ্যম্ভাবী
অশ্বের ডাক – হ্রেষা
অল্প কথা বলে যে –অল্পভাষী
অধ্যাপনা করেন যিনি – অধ্যাপক
অর্ধেক সম্মত – নিমরাজি
অন্য উপায় নেই – অগত্যা
অন্ত নেই যার – অনন্ত
অভিনয় করে যে– অভিনেতা
অপ্রিয় কথা বলে যে– অপ্রিয়বাদী
অপসারণ করা হয়েছে এমন– অপসারিত
অন্য গতি নেই যার– অগত্যা
অহনের পূর্বাংশ – পূর্বাহ্ণ
অহনের অপর অংশ – অপরাহ্ণ
অহনের মধ্য অংশ – মধ্যাহ্ন

আ

আদি নেই যার– অনাদি
আরাধনার যোগ্য যিনি– আরাধ্য
আট মাসে জন্মেছে যে– আটাশে
আপনাকে ভুলে থাকে যে– আত্মভোলা
আরোহণ করে যে– আরোহী
আকাশে উড়ে বেড়ায় যে – খেচর
আকাশ মাধ্যম আগত বাণী– আকাশবাণী
আল্লাহকে বিশ্বাস করে যে – আস্তিক
আল্লাহর প্রতি যার বিশ্বাস নেই– নাস্তিক
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত – আদ্যন্ত
আকাশের রং– আকাশী
আসবে যে– আগামী

আক্কেল নেই যার– বে-আক্কেল
আশ্রয় নেই যার– নিরাশ্রয়
আসমানের মতো রঙ– আসমানী
আঠাযুক্ত যা – আঠালো
আদি নেই যার– অনাদি

ই

ইসলামে অবিশ্বাসী– কাফের
ইতঃস্তত ভ্রমণ– বিচরণ
ইতোপূর্বে দণ্ডিত ব্যক্তি– দাগী
ইষ্টকে অতিক্রম না করে– যথেষ্ট
ইতিহাস লেখেন যিনি – ঐতিহাসিক
ইহলোক বিষয়ক – ঐহিক
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি – ইতিহাসবেত্তা
ইন্দ্রের বাগান– নন্দন
ইতোমধ্যকার ঘটনা– ইদানীং
ইহলোকে যা সামান্য নয়– আলোকসামান্য

ঈ

ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন যিনি – আস্তিক
ঈশ্বরকে যিনি বিশ্বাস করেন না– নাস্তিক
ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার – আঁষটে
ঈশ্বর বিষয়ক – ঐশ্বরিক
ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ – ধূসর
ঈষৎ নীলবর্ণ – নীলাভ
ঈষৎ হাস্য – স্মিত
ঈষৎ মধুর– আমধুর
ঈষৎ রুগ্ন– রোগাটে

উ

উচিৎ নয় যা– অনুচিৎ
উপমা নেই যে নারীর–নিরুপমা
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে – কৃতজ্ঞ
উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে – অকৃতজ্ঞ
উপকারীর অপকার করে যে – কৃতঘ্ন
উপকার করার ইচ্ছা – উপচিকীর্ষা
উল্লেখ করা হয় না যা – উহ্য
উপন্যাস রচয়িতা – ঔপন্যাসিক
উপায় নেই যার– নিরুপায়
উড়ন্ত পাখির ঝাঁক– বলাকা
উন্নত নয় যা– অনুন্নত

ঊ

ঊর্ধ্বদিকে গমন করে যে –ঊর্ধ্বগামী
ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসা – অবতরণ
ঊর্ধ্বদিকে গতি যার – ঊর্ধ্বগতি

ঋ

ঋষির উক্তি– আর্য
ঋণ নেই যার– অঋণী
ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি – ঋত্বিক।
ঋষির ন্যায় – ঋষিকল্প।
ঋণশোধে অসমর্থ – দেউলিয়া

এ

এক মতের ভাব– ঐকমত্য
একই গুরুর শিষ্য – সতীর্থ
একই মাতার উদরে জাত যারা – সহোদর
এ পর্যন্ত যার শত্রু জন্মায়নি – অজাতশত্রু
এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায় যে – যাযাবর
একই সময়ে – যুগপৎ
একই সময়ে বর্তমান – সমসাময়িক
একসঙ্গে যারা যাত্রা করে –সহযাত্রী
এক তার যুক্ত বাদ্যযন্ত্র– একতারা
একদিকে দৃষ্টি যার– একচোখা
একস্থানে স্থিত– একত্র

ঐ

ঐক্যের অভাব আছে যাতে –অনৈক্য
ঐতিহাসিক কালের পূর্ববর্তী– প্রাগৌতিহাসিক
ঐশ্বর্যের অধিকারী যিনি –ঐশ্বর্যবান

ও

ওষ্ঠ ও অধর – ওষ্ঠাধর
ওষ্ঠের দ্বারা উচ্চারিত – ঔষ্ঠ্য
ওজন করা হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে – তুলাদণ্ড
ওষধি থেকে উৎপন্ন– ওষুধ

ঔ

ঔষধের সাহায্যে সংরক্ষিত মৃতদেহ– মমি
ঔষধের বিপণি – ঔষধালয়

ক

কখনও মৃত্যূ হয় না যার– অমর
করার যোগ্য– করণীয়
কূলের যোগ্য– অনুকূল
কবিতা লেখেন যিনি – কবি
কেউ জানে না যা– অজ্ঞাত
কোথাও নত কোথাও উন্নত – বন্ধুর
কোকিলের ডাক – কুহু
কণ্ঠ পর্যন্ত – আকণ্ঠ
কী করতে হবে যে স্থির করতে পারে না – কীংকর্তব্যবিমূঢ়
কুৎসিত আকার যার – কদাকার
কৃষি থেকে উৎপন্ন –কৃষিজ
কূলের বিপরীত –প্রতিকূল
কিছু বলতে যার ঠোঁটে বাধে না – ঠোঁটকাটা
কম কথা বলে যে– স্বলভাষী

খ

খাওয়ার যোগ্য– খাদ্য
খাইবার ইচ্ছা – ক্ষুধা
খুব দীর্ঘ নয় –নাতিদীর্ঘ/অনতিদীর্ঘ
খরচের হিসাব যার নেই – বেহিসেবি
খাতাপত্র রাখার ঘর – দপ্তরখানা
খুব দীর্ঘ নয় যা– নাতিদীর্ঘ
খেলায় পটু যে– খেলোয়াড়

গ

গণনার যোগ্য নয় যা – নগণ্য
গোলাপের মতো রঙ যা– গোলাপী
গাছে উঠতে পটু যে – গেছো
গৃহে থাকে যে –গৃহস্থ
গভীর রাত্রি – নিশীথ
গাড়ি চালায় যে – গাড়োয়ান
গ্রন্থ রাখার গৃহ – গ্রন্থাগার।

ঘ

ঘোড়া থাকার স্থান – ঘোড়াশাল/আস্তাবল
ঘটনার বিবরণ – প্রতিবেদন
গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেন যিনি– গোয়েন্দা
ঘোড়ার গাড়ির চালক– কোচওয়ান
ঘোলার ভাব– ঘোলাটে
ঘোড়ার বল্গাম– লাগাম
ঘটকের কাজ – ঘটকালি

চ

চিরস্থায়ী নয় যা – অনিত্য/নশ্বর
চট করে মেজাজ খারাপ করেন যিনি– বদমেজাজী
চৈত্র মাসের ফসল – চৈতালি
চিবিয়ে খেতে হয় যা – চর্ব্য
চার রাস্তার মিলনস্থল – চৌরাস্তা
চক্ষুলজ্জাহীন ব্যক্তি – চশমখোর
চোখে দেখা যায় যা – প্রত্যক্ষ
চোখের দ্বারা দৃষ্ট – চাক্ষুষ
চিরকাল মনে রাখার যোগ্য – চিরস্মরণীয়
চলছে এমন ছবি– চলচ্চিত্র

ছ

ছন্দে নিপুণ যিনি – ছান্দসিক
ছয় মাস অন্তর – ষান্মাসিক
ছুটছে যা – ছুটন্ত
ছায়া প্রধান তরু– ছায়াতরু
ছল করে কান্না – মায়াকান্না

জ

জানু পর্যন্ত– আজানু
জায়া ও পতি– দম্পতি
জীবন ধারণের উপায়– জীবিকা
পানি বেষ্টিত ভূভাগ– দ্বীপ
জলে স্থলে যে জন্তু বিচরণ করে – উভচর
জীবিত থেকেও যে মৃত – জীবন্মৃত
জয়সূচক যে উৎসব – জয়ন্তী
জলে চরে যে – জলচর
জলে জন্মে যা – জলজ

ঝন ঝন শব্দ – ঝঙ্কার/ঝনৎকার
জনগণের প্রিয়– জনপ্রিয়

ঝ

ঝিনুকের গর্ভজাত রত্ন– মুক্তা
ঝনঝন শব্দ– ঝঙ্কার
ঝট করে টান– ঝটকা
ঝগড়া করা যার স্বভাব– ঝগড়াটে

ট

টকটকে লাল–কস্তা
টোল পড়েনি এমন– নিটোল।
টাকা ধার দেয়ার কাজ – মহাজনী
টসটস করেছে এমন– টসটসে

ঠ

ঠাণ্ডায় পীড়িত– শীতার্ত
ঠাকুরের ভাব – ঠাকুরালি
ঠিকরে পড়ে যা– ঠিকরানো
ঠিক মতো নামধাম আছে যাতে– ঠিকানা

ড

ডাকের জন্য নির্ধারিত মাশুল– ডাকমাশুল
ডাক বহন করে যে – ডাকহরকরা
ডুবে আছে যা– ডুবন্ত
ডুব দিতে জানে যে – ডুবুরি
ডাকঘরের চিঠি বিলি করে যে পিয়ন– ডাকপিয়ন

ঢ

ঢাকায় প্রস্তুত– ঢাকাই
ঢিপির মতো – ঢ্যাপসা
ঢাক বাজায় যে – ঢাকি

ত

তিন ফলের সমাহার– ত্রিফলা
তিন তারের সমাহার– সেতার
তিন নয়ন যার– ত্রিনয়ন
তিনটি ভুজ আছে যার– ত্রিভুজ
তাল জ্ঞান নেই যার – তালকানা
তালের অভাব– বেতাল
তার মতো – তাদৃশ
তবলায় নিপুণ – তবলর্চি

থ

থাবার আঘাত– থাপ্পড়
থই পাওয়া যায় না যেখানে– অথৈই
থুড় থুড় করে এমন– থুড়থুড়ে
থেমে থেমে চলন– থমক

দ

দিবসের শেষ ভাগ – অপরাহ্ণ
দমন করা যায় না এমন– অদম্য
দমের অভাব– বেদম
দানের বিপরীত– প্রতিদান
দ্বীপের সদৃশ – উপদ্বীপ
দু'দিকে অপ যার – দ্বীপ
দু'বার জন্ম হয় যার – দ্বিজ
দু'বার বলা – দ্বিরুক্তি
দু'হাতে সমান কাজ করতে পারে যে – সব্যসাচী
দেখা যায় না যা – অদৃশ্য
দয়া আছে যার– সদয়
দর্শন শাস্ত্র জানেন যিনি– দার্শনিক

ধ

ধারণ করে রাখা যা–ধর্ম
ধূলায় পরিণত – ধূলিসাৎ
ধীরে যে গমন করে – ধীরগামী/মন্দগামী
ধনের দেবতা – কুবের
ধার আছে যাতে– ধারালো
ধানের মতো রঙ যার– ধানী

ন

নৌকা চালনা করে যে – নাবিক
নিবারণ করা যায় না যা–অনিবার্য
নিজেকে হত্যা করে যে– আত্মঘাতী
নয় বাধ্য– অবাধ্য
নূপুরের ধ্বনি – নিক্কণ
নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার – নশ্বর
নিকৃষ্ট ব্যক্তি – দুর্জন
নেই লজ্জা যার–নির্লজ্জ
নেই পক্ষ যার– নিরপেক্ষ

ন্যায় বিচার– ইনসাফ

প

পথ দিয়ে হেঁটে চলে যে– পথিক
পান করার ইচ্ছা – পিপাসা
পরে জন্মেছে যে– অনুজ
পরে জন্মেছে যে – অনুজ
পূর্বে ছিল এখন নেই – ভূতপূর্ব
পিতার ভ্রাতা – পিতৃব্য
পাখির কলরব – কুজন
পশ্চাতে গমন করে যে – অনুগামী
পরস্পরে আলিঙ্গন – কোলাকুলি
পশুহত্যা করে যে – কসাই
পঙ্কে জন্মে যা – পঙ্কজ
পড়া হয়েছে যা – পঠিত
পরিমিত ব্যয় করে যে – মিতব্যয়ী
পা থেকে মাথা পর্যন্ত – আপাদমস্তক

ফ

ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায় – ওষধি
ফুল তোলা মসলিন শাড়ি– জামদানি
ফেলে দেয়ার যোগ্য– ফেলনা
ফুল হতে জাত – ফুলেল
ফুটছে এমন – ফুটন্ত

ব

বনের আগুন– দাবানল
বসে আছে যে– আসীন
বহুর মধ্যে এক– অন্যতম
বিদেশে থাকে যে – প্রবাসী
বিশ্বজনের হিতকর – বিশ্বজনীন
বহুর মধ্যে একটি – অন্যতম
বর্ণনা করা যায় না যা – অবর্ণনীয়
বেশি কথা বলে যে – বাচাল
বিধিকে অতিক্রম না করে – যথাবিধি
বীরের ভাব– বীরত্ব
বাণিজ্যের স্থান– বন্দর

ভ

ভবিষ্যতে হবে এমন–ভাবী
ভয় নেই যার– নির্ভীক
ভাতের অভাব আছে যার– হাভাতে
ভিক্ষার অভাব– দুর্ভিক্ষ
ভূত নামায় যে– ওঝা
ভাগ করা যায় না এমন– অবিভাজ্য
ভমন করে বেড়ায় এমন– ভ্রাম্যমাণ

ম

ময়ূরের ডাক– কেকা
মধু পান করে যে– মধুকর
মরণ পর্যন্ত – আমরণ
মৃতের মতো অবস্থা যার – মুমূর্ষু
ময়ূরের ডাক – কেকা
মরে না যে – অমর
মন হরণ করে যা – মনোহর
মনুর বংশধর– মানব
মরবেই যা– মরণশীল

য

যা অর্জন করা হয়েছে– অর্জিত
যা ভাবা হয়নি– অভাবিত
যা করা উচিৎ– কর্তব্য
যা বিশ্বাস করা যায় না – অবিশ্বাস্য
যা সহজে লাভ করা যায় – সুলভ
যা যুক্তিসঙ্গত নয় – অযৌক্তিক
যা দেখা যায় না – অদৃশ্য
যা জলে ও স্থলে চরে – উভচর
যা সহজে ভেঙে যায় – ভঙুর
যা জলে জন্মে – জলজ
যা দমন করা যায় না – অদম্য
যে জামাই শ্বশুর বাড়িতে থাকে – ঘরজামাই
যে গাছ কোনো কাজে লাগে না – আগাছা
যে পুরুষ বিয়ে করেনি – অকৃতদার
যা বেঁচে আছে– জীবন্ত
যা গমন করে না– নগ
যার মা বাবা নেই – অনাথ
যা একটুও ভাঙেনি– অটুট

যাকে ধরা যায় না– অধরা

র

রসের কথা– রসিকতা
রস বোধ আছে যার– রসিক
রূপের যোগ্য–অনুরূপ
রেশমের দ্বারা তৈরি – রেশমি
রূপে যাকে ধরা যায় না– অরূপ
রোদে শুকানো আম– আমসী
রাতের মধ্যভাগ-মহানিশা

ল

লোক গণনা– আদমশুমারি
লাঠি খেয়াল পটু– লাঠিয়াল
লুট করে যারা– লুটেরা
লজ্জা নেই যার – নির্লজ্জ, বেহায়া
লোক গণনা – আদমশুমারি
লাভের অংশ– লভ্যাংশ
লিখতে হবে যা– লিখিতব্য

শ

শাসন করা যায় যাকে– শিষ্য
শ্রদ্ধার যোগ্য – শ্রদ্ধেয়
শৈশবকাল থেকে – আশৈশব
শত অব্দের সমাহার – শতাব্দী
শত ভাগে বিভক্ত– শতধা
শরণ চায় যে– শরণার্থী

ষ

ষাঁড়ের চেহারা– ষণ্ডামার্কা
ষোল বছর বয়স্কা – ষোড়শী
ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে আনন্দ উৎসব–হীরক জয়ন্তী

স

সকলের মধ্যে ভালো বা উত্তম– সর্বোত্তম
স্বামীর সাথে মৃত্যুবরণ– সহমরণ
সবচেয়ে ছোট – কনিষ্ঠ
সকলের জন্য প্রযোজ্য – সার্বজনীন
সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ – সর্বশ্রেষ্ঠ
সেবা করেন যিনি – সেবক/সেবিকা
সর্বজনের হিতকর – সর্বজনীন
স্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান – সস্ত্রীক
স্মরণ রাখার যোগ্য– স্মর্তব্য

হ

হর্ষের সাথে বর্তমান– সহর্ষ
হাতির ডাক– বৃংহতি
হরিণের চামড়া – অজিন
হিসাব করে চলে না যে – বেহিসাবি
হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্যন্ত – আসমুদ্রহিমাচল
হনন করার ইচ্ছা – জিঘাংসা
হেমন্তে জাত – হৈমন্তিক
হস্তী রাখার স্থান– পিলখানা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :

১। এক কথায় প্রকাশ কাকে বলে?

২। এক কথায় প্রকাশ করুন :

অক্ষির সম্মুখে, অহংকার করে যে, গণনার অযোগ্য, শাসন করা যায় যাকে, লোকগণনা সম্পর্কিত, সবার মধ্যে উত্তম, যা খাওয়ার যোগ্য, যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না, পা হতে মাথা পর্যন্ত, আঠাযুক্ত যা।

পাঠ-৫.১১ : ক্রিয়ার কাল

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- কালের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- কালের প্রকারভেদ করতে পারবেন।
- কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ বলতে পারবেন।

কালের সংজ্ঞা

ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়ার সময়কে ক্রিয়ার কাল বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতে ক্রিয়া যে অবস্থায় থাকে, তাকে ক্রিয়ার কাল বলা হয়। যেমন–

আমি দেখি, আমি দেখলাম, আমি দেখব। এখানে *দেখা* ক্রিয়াটির বর্তমান কালের রূপ হলো দেখি, অতীত কালের রূপ হলো দেখলাম এবং ভবিষ্যৎ কালের রূপ হলো দেখব। এভাবে সময় অনুযায়ী ক্রিয়ার তিনটি রূপ লক্ষ করা যায়।

পুরুষভেদে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের আবার রূপের পরিবর্তন হতে পারে। সেক্ষেত্রে ক্রিয়া সংঘটনের সময় পরিবর্তন হয় না। কেবল তার রূপের পরিবর্তন হয় মাত্র।

১. কালের প্রকারভেদ

ক্রিয়ার কালকে প্রথমেই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

ক) বর্তমান কাল
খ) অতীত কাল ও
গ) ভবিষ্যৎ কাল।

ক) বতমান কাল : বর্তমানে কোনো ক্রিয়া সংঘটিত হলে, তার কালকে বলা হয় বর্তমান কাল। যেমন–
মেসি ভালো ফুটবল খেলে। তিনি এখন বই পড়ছেন ইত্যাদি।
খ) অতীত কাল : অতীতে কোনো ক্রিয়া সংঘটিত হলে তার কালকে বলা হয় অতীত কাল। যেমন–
মেসি কাল ভালো ফুটবল খেলেছিল। তিনি গতকাল বই পড়ছিলেন ইত্যাদি।
গ) ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে তাকে বলা হয় ভবিষ্যৎ কাল। যেমন–
মেসি আগামী কাল ফুটবল খেলবে। তিনি আগামীকাল বইটি পড়বেন।
এই তিন প্রকার কালকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়–

ক) বর্তমান কাল : বর্তমান কালকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. সাধারণ বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে সংঘটিত হয়, তাকে বলা হয় সাধারণ বর্তমান কাল। যেমন– সেলিম মাঠে কাজ করে। কৃষকেরা চাষ করেন।

২. ঘটমান বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া বর্তমানে ঘটছে বা চলছে তাকে বলা হয় ঘটমান বর্তমান কাল। যেমন– ছাত্ররা স্কুলে যাচ্ছে। আদিব ফুটবল খেলছে।

২. পুরঘটিত বর্তমান কাল : ক্রিয়ার কোনো কাজ পূর্বে শেষ হলেও বর্তমানে তার ফল বিদ্যমান আছে, এরূপ বোঝালে সে কালকে বলা হয় পুরাঘটিত বর্তমান কাল। যেমন– আকিব গান গেয়েছে। মনি পুরস্কার পেয়েছে।

৩. বর্তমান অনুজ্ঞা : যে ক্রিয়ার কালের সাহায্যে বর্তমানের আদেশ, উপদেশ, নিষেধ ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বলা হয় বর্তমান অনুজ্ঞা। যেমন– তুমি বেশি দেরি করো না। নিয়মিত ঔষধ সেবন কর।

৪. ঐতিহাসিক বর্তমান : যে কালের স াহায্যে অতীত কালের রূপ বর্তমানে প্রকাশিত হয়, তাকে বলা হয় । ঐতিহাসিক বর্তমান কাল। যেমন– রুশ বিপ্লব ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সা.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন।

খ) অতীত কাল : অতীত কালকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. সাধারণ অতীত কাল : যে ক্রিয়া অতীতে সাধারণ ভাবে সংঘটিত হয়েছে, তাকে বলা হয় সাধারণ অতীত কাল। যেমন– তিনি কাল বাড়ি এসেছেন। লোকটি বেড়াতে গেলো।

২. ঘটমান অতীত কাল : যে ক্রিয়ার কাল অতীতে শুরু হয়েছিল বা চলছিল বোঝায় তাকে বলা হয় ঘটমান অতীত কাল। যেমন– ইলা গান গাইছিলো, তিনি তখন বাড়ি আসছিলেন।

৩. পুরাঘটিত অতীত কাল : যে ক্রিয়া অতীতে বহুপূর্বে সংঘটিত হয়েছে এবং পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে তাকে বলা হয় পুরাঘটিত অতীত কাল। যেমন– আমি বাড়ি যাওয়ার পূর্বেই মিম চলে গিয়েছিল । ডাক্তার আসার পর রোগী মারা গেল। বৃষ্টি শুরু হওয়ার পূর্বেই আমরা বাড়ি পৌছেছিলাম ইত্যাদি।

৪. নিত্যবৃত্ত অতীত কাল : যে ক্রিয়ার সাহায্যে অতীত কালের কোনো কাজের অভ্যস্ততা বোঝায়, তাকে বলা হয় নিত্যবৃত্ত অতীত কাল। যেমন– লোকটি নিয়মিত নদীর ধারে হাটতেন। মিম প্রায়ই রাধুনী রেস্তোরায় খেতে যেত।

নিত্যবৃত্ত অতীত কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ : নিম্নলিখিত অর্থ প্রকাশে নিত্যবৃত্ত অতীত কালের ক্রিয়ার বিশেষ ব্যবহার লক্ষ করা যায়–

১. কামনা প্রকাশে : তিনি দ্রুত আরোগ্য লাভ করবেন।
২. সম্ভাবনা প্রকাশে : আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে আবীরের দেখা পেতে।
৩. কল্পনা প্রকাশে : হতাম যদি বিশ্ব রাজা!

গ) ভবিষ্যৎ কাল : ভবিষ্যৎ কাল কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া পরে সংঘটিত হবে তাকে বলা হয় সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল। যেমন– শিলা এবার পরীক্ষা দেবে। তার বোন আজ বাড়ি আসবে ইত্যাদি।

২. ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল : ক্রিয়ার যে কাজ ভবিষ্যৎ কালে শুরু হয়ে চলতে থাকবে বুঝায় তাকে বলা হয় ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল। যেমন– মনি পার্কে বেড়াতে থাকবে। ছেলেরা ফুটবল খেলতে থাকবে।

৩. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল : ভবিষ্যতে কোনো কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকবে বোঝালে তাকে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন– ইলা দোকানে কাজটি করে থাকবে।

এ কাল দ্বারা আবার দুটো কাজ একত্রে সংঘটিত হবার প্রক্রিয়া বুঝায়। সেক্ষেত্রে একটি সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বোঝায় এবং অপরটি পুরাঘটিত বর্তমান কাল বোঝায়। যেমন-

তুমি আসার পূর্বে আমি স্কুলে পৌছে যাব। লোকটি উপস্থিত হওয়ার পূর্বে সেলিম মাঠে উপস্থিত হবে।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের সাহায্যে ভবিষ্যতের ক্রিয়া সম্পাদনে অতীতের সন্দেহাত্মক ভাব বোঝায়। যেমন– বাবুল হয়ত কাজটা করে থাকবে। তিনি হয়ত খবরটা দিয়ে থাকবেন।

৪. ভবিষ্যত অনুজ্ঞা : আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ. প্রার্থনা ইত্যাদি বোঝাতে যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে তাকে বলা হয় ভবিষ্যত অনুজ্ঞা। যেমন– সদা সত্য কথা বলবে। তার কাজটি করে দিও। আল্লাহ তোমার সহায় হবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন–

১। কাল কাকে বলে?

২। কাল প্রথমত কত প্রকার ও কী কী?

৩। নিত্যবিত্ত অতীত কালের একটি উদাহরণ দিন।

৪। সদা সত্য কথা বলবে– এটি কোন কালের উদাহরণ?

৫। হতাম যদি বিশ্ব রাজা– এ বাক্য দ্বারা কী প্রকাশ করছে?

উত্তরমালা :

১। ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময়কে কাল বলা হয়।
২। কাল প্রথমত তিন প্রকার। যথা– ক) বর্তমান কাল খ) অতীত কাল ও গ) ভবিষ্যৎ কাল
৩। রাজা প্রতিদিন নদীর ধারে হাঁটতেন।
৪। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার উদাহরণ।
৫। কল্পনা

ইউনিট ৬
ভাবসম্প্রসারণ

উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়া শেষে আপনি–

- কোনো বাক্য বা বাক্যগুচ্ছের অন্তর্নিহিত ভাবকে সম্প্রসারিত করতে পারবেন।
- দৃষ্টান্ত ও যুক্তির মাধ্যমে কোনো গূঢ় ভাবকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- কোনো চিন্তাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।
- সহজ-সরল ভাষায় চিন্তা প্রকাশের কৌশল লিখতে পারবেন।
- চিন্তাকে কীভাবে একটি কাঠামোর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে হয়, তা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

কবি সাহিত্যিকরা যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে লেখেন, তখন কখনো কখনো কোনো কোনো জায়গায় অল্প শব্দে কোনো একটি গুরুতর ভাব জমাট বেঁধে যায়। সাহিত্যিকের বলার কথাটি কোথাও কোথাও সংহত হয়ে প্রকাশিত হয়। সচেতন পাঠক পড়তে গেলে সাধারণত এই ধরনের বাক্য বা বাক্যগুচ্ছে এসে থমকে দাঁড়ান; চমৎকৃত হন। হাতে কলম থাকলে এই জমাট বাধা, সংহত, অল্প জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রকাশিত হওয়া বাক্য বা বাক্যগুচ্ছে দাগ দিয়ে রাখেন। এসব চরণ বা চরণগুচ্ছ মানুষ বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজনে উদ্ধৃতি হিসেবেও ব্যবহার করে থাকেন। বড় বড় সাহিত্যিকের এধরনের অনেক চরণ বা চরণগুচ্ছ অনেক সময় বহুল ব্যবহৃত হতে হতে প্রবাদ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। সাধারণত এই ধরনের চরণ বা চরণগুচ্ছই ভাবসম্প্রসারণের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, ‘বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে’ অথবা ‘নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়’।

ভাবসম্প্রসারণের জটিলতা কোথায়?

একটি গভীর জটিল গুরুত্বপূর্ণ কথা যখন কবি-সাহিত্যিকরা বলে ফেলেন, তখন তাদের এই বলাকে সংক্ষিপ্ত-সংহত করতে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের অলংকার ক্রিয়াশীল থাকে। এই অলংকারের মধ্যে বেশি ব্যবহৃত হয় উপমা এবং রূপক অলংকার। অর্থাৎ একটি বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে অন্য একটি বিষয়ের বা বস্তুর তুলনা করে কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের বক্তব্যকে স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন। যেমন, ‘কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে/দুঃখ বিনে সুখ লাভ হয় কি মহীতে।’ এখানে কবি সুখকে কমল আর দুঃখকে কাঁটার সঙ্গে তুলনা করে তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। কিন্তু অনেকের জন্যে এই উপমাটিই জটিলতার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া প্রদত্ত বাক্য বা বাক্যগুচ্ছে অনেক সময় আপাতজটিল শব্দের সমাবেশ থাকতে পারে। এটিও অনেক সময় শিক্ষার্থীকে প্রদত্ত বাক্য বা বাক্যগুচ্ছের অর্থ বুঝতে ব্যর্থ করে দেয়। এ-দুটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকলে ভাবসম্প্রসারণ করা সহজ হয়ে যায়।

ভাবসম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুসরণ করতে হয়–

ক. প্রথমে প্রদত্ত বাক্য বা বাক্যগুচ্ছ ভালো করে একাধিকবার পড়তে হবে। মূল ভাবটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে।
খ. প্রদত্ত গদ্যাংশ বা পদ্যাংশের জটিল শব্দগুলোর অর্থ আলাদাভাবে বুঝতে হবে।
গ. প্রদত্ত চরণ বা চরণগুচ্ছে কোনো তুলনা থাকলে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে, কাকে কেন, কার সঙ্গে তুলনা করেছে।
ঘ. ভাবসম্প্রসারণের তিনটি অংশ থাকবে। প্রথমে মূলভাব, পরে সম্প্রসারিত ভাব এবং সবশেষে মন্তব্য বা উপসংহার।
ঙ. মূলভাব অংশে দুই থেকে চার বাক্যে সংক্ষেপে লিখতে হবে; প্রদত্ত বাক্য বা বাক্যগুচ্ছ দিয়ে কবি বা সাহিত্যিক জীবন-জগৎ বা কোনো বিষয় সম্পর্কে কী বোঝাতে চেয়েছেন, সেই কথাটি। এরপর সম্প্রসারিতভাব অংশে প্রথমে প্রদত্ত বাক্য বা

বাক্যগুচ্ছের জটিল শব্দগুলোর অর্থ স্পষ্ট করা যেতে পারে। এরপর কোনো উপমা-তুলনা বা অলংকার থাকলে সেটি স্পষ্ট করা যেতে পারে। কাকে, কার সঙ্গে, কেন তুলনা করা হয়েছে তা স্পষ্ট করতে হবে। এরপর নিজে থেকে আরো বাস্তব জীবনের উদাহরণ, উপমা-তুলনা দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে হবে। অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে যা ঘনীভুত হয়ে আছে তাকে স্পষ্ট করতে হবে। প্রয়োজনে মহৎ, ঐতিহাসিক মানুষদের ঘটনা সহযোগে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। সবশেষে, সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য দিয়ে ভাব-সম্প্রসারণের উপসংহার টানা যেতে পারে।

চ. তবে খেয়াল রাখতে হবে, ভাব-সম্প্রসারণের ভাষা যেন তুলনামূলকভাবে সহজ সরল হয়। একই কথার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে। উদ্ধৃতি ব্যবহার করা যাবে, তবে তা যেন বেশি বড় না হয়। ছোট, সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি ব্যবহারই শ্রেয়।

ছ. ভাব-সম্প্রসারণের আকার-আকৃতি কতটুকু হবে তা নির্ভর করবে এর জন্যে বরাদ্দকৃত নম্বরের ওপর। আর অনুচ্ছেদ (para) সংখ্যা অন্তত তিনটি হবে। প্রয়োজনে বেশি অনুচ্ছেদ হতে পারে। তবে তিনটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালো।

শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করে শির,
লিখে রেখো একফোঁটা দিলেম শিশির।

ক্ষুদ্রদানের আস্ফালন ক্ষুদ্রতারই পরিচায়ক। অন্যের জন্য কিছু করে তার উল্লেখ করা বা তা নিয়ে বড়াই করা মহৎ হৃদয়ের লক্ষণ নয়। এটি ক্ষুদ্রতা, দীনতারই পরিচায়ক। মহৎ হৃদয় নীরবে শুধু দিয়েই যায়।

শৈবালের জন্ম দিঘির বুকে। শৈবাল বেঁচেও থাকে দিঘির জলে। দিঘির জল ছাড়া শৈবালের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কিন্তু শৈবাল থেকে কখনো কখনো রাতে সামান্য শিশির গড়িয়ে পড়ে দিঘির বুকে। এই সামান্য জল দিঘির জলের স্ফিতিতে কোন রকম প্রভাব ফেলে না। শৈবাল থেকে গড়িয়ে পড়া জল দিঘির অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধিতে কোন ভূমিকা রাখতে পারে না বললেই চলে। কিন্তু শৈবাল ঐ এক ফোঁটা জলকণা দিঘিকে প্রদান করে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ ঐ দিঘির জলের আশ্রয়ে বেঁচে থাকে সামান্য শৈবাল। কিন্তু দিঘি কখনো তার বুকে আশ্রয় নেওয়া শৈবালকে স্মরণ করিয়ে দেয় না কিভাবে সে বেঁচে আছে। শৈবালের এই মনোভাব যেমন হাস্যকর তেমনি মানসিক নীচতা ও দীনতার পরিচায়ক।

এ-জগতের মানুষের দিকে দৃষ্টি দিলেও দেখা যাবে, সবার সামর্থ্য বা যোগ্যতা সমান নয়। কেউ বিরাট রাজ্যের অধিপতি, আবার কেউ সেই অধিপতির অধীনে সামান্য প্রজামাত্র। অধীনের সামর্থ্য অনেক সময় এত ক্ষীণ থাকে যে, তা দিয়ে বড় কোন কাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি তারা ছোট কোন কাজ সম্পন্ন করে তাদের প্রভুকে বলে যে, আমি এই কাজটুকু আপনার জন্য করেছি স্মরণ রাখবেন, তবে তা হবে ঐ দিঘিকে শৈবালের শিশিরের জল প্রদানের মতোই হাস্যকর ও নীচতার পরিচায়ক। কেননা, যারা মহান তারা কখনোই অন্যকে উপকারের কথা বলেন না। তারা প্রতিনিয়ত নীরবে আত্মদান করে মানুষের উপকার করে যান; নিঃস্ব মানুষের ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। তারাই পৃথিবীর স্মরণীয়-বরণীয় মানুষ, মানবতার শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হন। কিন্তু সামান্য, তুচ্ছ, যার দান করার কোন ক্ষমতাও নেই, সে সামান্য উপকার করে যদি তা স্মরণ রাখতে বলে তখন নিঃসন্দেহে তাকে ছোট মনের মানুষ বলাই যায়। পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে যত মহামানব আছেন, তাঁরা বিশ্বমানবতার জন্য অক্লান্ত কাজই করেছেন। কখনো তা নিয়ে নিজে অহংকার করেননি।

আত্ম-অহংকার, দাম্ভিকতা করা উচিত নয়। কাউকে সামান্য দান করে তা বারবার বলার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই। তা সভ্য সমাজে শুধু কৌতুক বলেই মনে হবে। কেননা যারা তিল তিল করে সাধারণ মানুষের জন্যই এই বিশ্ব সভ্যতা সৃস্টি করেছেন, তারা কখনই তা বলেন না। তাই তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে শৈবালের মতো ক্ষুদ্রমনা চিন্তা পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু

ষড় রিপুর মধ্যে লোভ ভয়াবহতম রিপু। এটি মানুষকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। অনেক সময় অযাচিত চাহিদার বশবর্তী হয়ে, মানুষ তার কামনা-বাসনাকে পূরণ করার জন্য, নানা লোভের মোহে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। আর তখনই সে অনবির্যভাবে পাপের পথে এগিয়ে যায়। লোভ আর পাপের যৌথ প্রযোজনায় তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে।

মানুষ আশা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাঁচে। কিন্তু সেই আশা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামর্থ্য ও বাস্তবের মিল থাকতে হয়; সঙ্গে থাকতে হয় সাধনা-সংগ্রাম করার মানসিকতা। কিন্তু যখনই কারো আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামর্থ্য ও বাস্তবের মিল থাকে না, সংগ্রাম আর সাধনার যোগ থাকে না, তখন তা আর স্বপ্ন থাকে না। তখন তাকে বলা হয় লোভ। লোভ মানুষকে কষ্ট করে কোন কিছু অর্জন করা থেকে বিরত রাখে। সামর্থ্য, বাস্তবতা আর সাধনার বাইরে গিয়ে অতি আশা বা লোভ মানুষকে অমানুষ করে তোলে। সে এ-কূল ও-কূল দুকূল হারায়। কেননা, আমরা সেই গল্পটি জানি, সোনার ডিম পাড়া হাঁসটিকে কিভাবে দরিদ্র ব্যক্তিটি এক সাথে সব ডিম পাওয়ার জন্য হত্যা করে। কিন্তু পরে দেখা গেল কোন ডিম তাতে নেই। এ-লোভ তার সমস্ত স্বপ্নকে যেমন হত্যা করেছে, তেমনি তাকে পাপের দিকেও ঠেলে দিয়েছে। একই সঙ্গে ঐ লোভী ব্যক্তির মনুষ্যত্বের হয়েছে অপমৃত্যু। তার দৈহিক মৃত্যু না হলেও আত্মিক মৃত্যু হয়েছে। আবার গল্পের সেই চরিত্রের কথা কে না জানে, যে-ব্যক্তি লোভের বশবর্তী হয়ে সূর্যাস্তের আগে বিশাল ভূ-খণ্ড বৃত্তাকারে ঘুরে আসতে গিয়ে বৃত্তটাই পূরণ করতে পারল না। বৃত্ত পূরণ করার আগেই মরে গেল। অতি লোভই তার মৃত্যুর কারণ হল। লোভের বশবর্তী মানুষকে জীবন-সংসারে খেতে হয় অসংখ্য হোঁচট। তার জীবন হয়ে পড়ে বিপন্ন। লোভের চোরাবালিতে একবার পা দিলে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। লোভ ডেকে আনে ধ্বংস, আর ধ্বংসই এক প্রকার মৃত্যু। এজন্য বলা হয়– 'সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা ধনি যে লোভে বন্দি নয়।' ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মীর জাফর অতি লোভ করে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ইংরেজদের হাতে পরাজয় বরণে ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সেই মসনদের সুখ-সমৃদ্ধি সসম্মানে ভোগ করতে পারেননি। তার অসম্মানজনক পরিণতি হয়েছে। এভাবে অনেকে লোভের মোহে বুদ হয়ে নানা রকম পাপাচার করে ধ্বংস হয়েছে।

লোভের বশবর্তী হয়ে পাপাচার করে মানুষের সব সময় দৈহিক মৃত্যু না হলেও, আত্মার মৃত্যু ঘটে যায়। আত্মিক মৃত্যু দৈহিক মৃত্যুর চেয়ে কম ভয়াবহ নয়। কেননা মানুষ বাঁচে তার আত্মার সতেজতার মাধ্যমে।

দুর্নীতি জাতীয় জীবনের সকল উন্নতির অন্তরায়

একটি জাতির উন্নতি নির্ভর করে ঐ জাতির নৈতিক আদর্শের ওপর। যে-জাতি চেতনায় সুনীতিকে যত বেশি লালন করে এবং কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ঘটায়, সে-জাতির উন্নতি তত দ্রুতগামী হয়। আর যে-জাতি তার ওপর অর্পিত দায়িত্বকে ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য অনৈতিকভাবে ব্যবহার করে অর্থাৎ দুর্নীতির আশ্রয় নেয় সে-জাতির সামগ্রিক উন্নতি সুদূর পরাহত হয়ে পড়ে।

কোন আদর্শের নৈতিক, আধ্যাত্মিক বা ব্যবহারিক অসাধুতা বা বিচ্যুতিই দুর্নীতি। অবৈধভাবে সম্পত্তির আত্মসাৎ অথবা সরকারি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করাও দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। যারা এ-ধরনের নৈতিকতা বা আদর্শ-বর্জিত মানুষ তারাই দুর্নীতিগ্রস্ত। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি দেশ ও জাতির জন্য চরমভাবে ক্ষতিকর। তাদের কারণে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি চরমভাবে ব্যাহত হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির দেশ ও জাতি নেই। তারা কেবল নিজের স্বার্থকেই বড় করে দেখে। এভাবে একটি দেশের অধিকাংশ মানুষ যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ ব্যক্তিগত লাভালাভের দিক বিবেচনা করে কাজ করে তবে, সেই দেশের সার্বিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়। সার্বিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত হলে জাতি হয়ে পড়ে দুর্বল। জাতীয় জীবন থমকে যায়। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, Opportunity makes a man thief. একজন ব্যক্তি নিজ মেধা গুণে উচ্চ আসনে আসীন হতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি সুযোগকে অসৎভাবে ব্যবহার করে নানা রকম দুর্নীতি করে থাকেন, তবে তিনি ঐ জাতির জন্য অভিশাপ। তিনি চোর বলে সাব্যস্ত হবেন। আর কোন ব্যক্তি সুযোগ পেয়েও যদি ন্যায়-নিষ্ঠভাবে নিজের কাজটি যথাযথভাবে পালন করেন তবে তার দ্বারা সমাজ, দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। তিনি রাষ্ট্রের উন্নয়নের একজন ত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত হতে পারেন। দুর্নীতি জাতীয় জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবনে এক চরম অভিশাপ। দুর্নীতি সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সুখ ও সমৃদ্ধি কেড়ে নিয়ে

যায়। মানুষ হয়ে পড়ে অসহায়। কেউ সম্পদের পাহাড় গড়ে, কেউ গরিব থেকে আরো গরিব হতে থাকে। সৃষ্টি হয় বৈষম্যের সংস্কৃতি। আর সামগ্রিক সুখ-সমৃদ্ধি উন্নয়ন যা-ই বলি না কেন তা হয় সুদূর পরাহত।

দুর্নীতি আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে একটি পরিচিত ঘটনা। কিন্তু বাংলাদেশে এর প্রকোপ একটু বেশি বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণ-শাসন-দুর্নীতির হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেশ স্বাধীন করেছিলেন বাংলার আপামর জনগণ। কিন্তু সেই দুর্নীতির ভূত আমাদের ঘাড় থেকে নামেনি। এই জন্য আমাদের পরিশুদ্ধতার প্রয়োজন। নৈতিকভাবে সুদৃঢ় হলে দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব হবে।

গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন
নহে বিদ্যা, নহে ধন, হলে প্রয়োজন

মানুষের জীবনকে মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সোপান হল জ্ঞান। আর বেঁচে থাকার জন্য, পার্থিব সুখ শান্তির জন্য প্রয়োজন ধন সম্পত্তি। কিন্তু তা কেবল অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে কাজে আসবে না। তাকে প্রচলিত প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনের সময় প্রায়োগিক করতে হবে। তা না হলে ঐ জ্ঞান এবং ধন-সম্পত্তি অর্জন দুটোই বৃথা হবে।

সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য জ্ঞান অর্জন যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি ধন-সম্পত্তি অর্জনও প্রয়োজনীয়। জ্ঞান অর্জনের জন্য মানুষকে সর্বোচ্চ মুল্য দিতে হয়, সাধনার চরম পর্যায়ে পৌঁছাতে হয়। তারপর আসে সেই কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান নামক সোনার হরিণ। কিন্তু কেউ যদি শুধু পাঠ্য বইয়ের মধ্যে থেকে হরবোলা পাখির মতো পড়াগুলো শুধু মুখস্থই করে, তবে তা কোন কাজে আসবে না। গ্রন্থের বিদ্যা বা জ্ঞান নির্জীব। তাকে আত্মস্থ করে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে সজীব ও অর্থবহ করে তুলতে হয়। গ্রন্থের বিদ্যাকে ব্যবহার করে ভেতরের নানা সুকুমার বৃত্তিগুলোকে জাগিয়ে তুলতে হয়; মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে হয়। গ্রন্থ থেকে অর্জিত বিদ্যাকে মানব কল্যাণে ব্যবহার করতে হয়। বিদ্যার সোনার কাঠির স্পর্শে যে-মানুষের অন্তর্জগৎ জেগে উঠল না, যে-মানুষের ভেতরটা আলোকিত হল না, তার বিদ্যা অর্থহীন। ঠিক ধন-সম্পত্তির বিষয়টিও একই রকম। ধন-সম্পদের বড় গুণের একটি হচ্ছে তা প্রচুরতম লোকের প্রভূততম কল্যাণ সাধন করতে পারে। কিন্তু সেই ধন-সম্পদ যদি কেউ এক জায়গায় কুক্ষিগত করে রাখে, নিজের ও দশের কল্যাণে ব্যবহার না কওে, তবে তার কোন মূল্যই থাকে না।

বিদ্যা এবং ধন দুটিই নির্জীব জড়। তাকে মানুষই সজীব, চলিষ্ণু, অর্থবহ, কল্যাণময় করে তোলে এর বহুমাত্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে। নিজের এবং সভ্যতার বিকাশের প্রয়োজনে ব্যবহার করলেই শুধু বোঝা যায় যে, বিদ্যা আর ধন উভয়ই ফুলের মত সুরভিময়। ব্যক্তি ও তার চারপাশে ছড়িয়ে পড়াতেই তার বিকাশ। জ্ঞান যেমন বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার বিষয় নয়, তেমনি ধনও শুধু সঞ্চিত করে রাখার বিষয় নয়। তা প্রয়োজনে ব্যবহারের মধ্যেই সার্থকতা।

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

বিচার কোনো অমানবিক বিষয় নয়। মানুষ মাত্রই অপরাধপ্রবণ– এটা যেমন সত্য, তেমনি মানুষই মানবিক হতে পারে– এটাও একইভাবে সত্য। বিচারক যখন অপরাধীর বিচার করতে যান, তখন তাঁকে হতে হবে নিরপেক্ষ, আইনানুগ এবং একই সঙ্গে মানবিক। বিচারের সাথে যদি বিচারকের ক্ষোভ, ক্রোধ, ঘৃণা জড়িয়ে থাকে তবে তা বিচারের যথাযথ মহিমাকে ক্ষুণ্ন করে। নিরপেক্ষ বিচারের সাথে যদি মানবিক বিষয়টির রসায়ন ঘটে তবেই সে বিচার হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ।

এই সভ্য সমাজে মানুষের মধ্যে যেমন সভ্যতার ছোঁয়া লেগেছে, তেমনি এই মানুষই জড়িয়ে পড়ছে নানামুখী অপরাধের সাথে। এসব অপরাধীদের জন্য রয়েছে বিচার ব্যবস্থা। বিচারের মাধ্যমেই অপরাধী পায় যথাযথ শাস্তি, নিরপরাধ পায় মুক্তি এবং সমাজে ফিরে আসে শান্তি। আর এই বিচারের কাজটি করে থাকে বিচারক। অপরাধীর বিচার করতে গিয়ে বিচারককে হতে হয় ন্যায়বান, নিষ্ঠাবান, নিরপেক্ষ। কিন্তু একই সঙ্গে বিচারককে হতে হবে মানবিক। মানবিক হতে হবে মানে এই নয় যে, দয়া পরবশ হয়ে অপরাধীর শাস্তিযোগ্য অপরাধকে ক্ষমা করে দেবেন। অপরাধের শাস্তি অবশ্যই তিনি অপরাধীকে

দেবেন। কিন্তু অপরাধীর প্রাপ্ত শাস্তি অপরাধীকে যতটা ব্যথিত করে, সেই ব্যাথা বিচারককেও অনুধাবন করতে হবে। বিচারক নিজেকে দণ্ডিতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার করলে তবেই তা শ্রেষ্ঠ বিচার হবে। কিন্তু যদি কোন বিচারক একান্ত পেশাদারিত্বের খাতিরে শুধু বিচারকার্য সম্পন্ন করেন এবং অপরাধীকে শাস্তি দেন, তবে সে বিচার হয়ে যাবে অমানবিক। এটি একজন বিচারকের কাছ থেকে কাম্য নয়। কেননা যে-ব্যক্তি অপরাধ করেছে, সেও সমাজেরই আলো-বাতাস, স্নেহ-মমতায় বেড়ে ওঠা একজন মানুষ। যদি বিচারক ঐ দণ্ডিতের মানবিক দিক লক্ষ রেখে শাস্তির বিধান করেন তবে দণ্ডিতের মধ্যেও পরবর্তীতে ভাল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে। এখানেই একজন বিচারকের কৃতিত্ব। । তবে অবশ্যই তা হতে হবে নিরপেক্ষ এবং আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে।

তাই ব্যক্তি-জীবন থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনে, এই আদর্শকে ব্রত করে আমরা যদি চলতে পারি, তবে সমাজ হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক সমাজ।

বিশ্রাম কাজের অঙ্গ একসঙ্গে বাঁধা
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা

কোনো মানুষের পক্ষে বিশ্রামহীনভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। বিশ্রামহীন কাজ মানুষকে কাজের প্রতি বিতৃষ্ণ করে তোলে। কাজের ফাঁকে বিশ্রাম মানুষকে আবার কাজ বা পরিশ্রম করার জন্য তৈরি করে তোলে। কাজ এবং বিশ্রাম পরস্পরের পরিপূরক।

প্রাণের অস্তিত্ব, পরিশ্রম আর বিশ্রাম পরস্পর একসূত্রে গাঁথা। প্রাণের পূর্ণতা সাধিত হয় পরিশ্রম এবং বিশ্রামের এক অসামান্য সামঞ্জস্যে। বিশ্রাম কাজেরই একটি অঙ্গ। বলা যায় প্রধানতম অঙ্গ। চোখ যেমন অনবরত দেখার কাজ করে, তেমনি চোখের পলক তার দেখার শক্তি জোগায়। দিন যেমন মানুষকে কর্মব্যস্ত রাখে রাত তেমনি ঘুমের মাধ্যমে মানুষকে আবার পরবর্তী দিনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। চোখ ও চোখের পলকের যে-সম্পর্ক, রাত ও দিনের যে-সম্পর্ক, আলো ও অন্ধকারের যে-সম্পর্ক, বিশ্রাম ও কাজেরও সেই সম্পর্ক। একটি ছাড়া অন্যটি অর্থপূর্ণ তো নয়-ই, বরং একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। নিরবচ্ছিন্ন কাজ জীবনে নিয়ে আসে একঘেয়েমি, জড়তা, নীরস প্রাণের অস্তিত্ব। কিন্তু এই কর্মের মধ্যে সামান্য বিরতি সমস্ত ক্লান্তিকে দূরীভূত করে যেন আবার নতুন করে কাজে উদ্যম নিয়ে আসে। যেখানে শুধু কাজ আর কাজ, বিশ্রাম গৌণ, সেখানে সোনা ফললেও সে-সোনার ঔজ্জ্বল্য থাকে না। সেই জন্য কর্মের সাথে চাই কর্মের বিরতি। কেননা মানুষ যন্ত্র নয়, সে জন্য বলা হয়– Man is not machine. মানুষ যেহেতু যন্ত্রের মতো কাজ করতে পারে না, তাই তার এই ধূসর কর্মময় জীবনে বিশ্রাম নিয়ে আসে নতুন করে কর্মের নতুন স্পৃহা। প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রেই এটি ধ্রুব সত্য। নির্দিষ্ট কর্ম ঘণ্টার পর মানুষ তার বিশ্রামের জন্য সময় চেয়েছে। মহান 'মে দিবস' এ-কথারই যেন সুর তোলে। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে তার বিশ্রামের জন্য সুযোগ থাকতে হবে। যাতে নতুন প্রাণের উন্মাদনায় আবার কাজ শুরু করতে পারে।

বিশ্রামহীন পৃথিবী কল্পনাই করা যায় না। কাজ এবং বিশ্রামের সুষম বন্টনই যেন সোনা ফলানোর ছন্দ। সেই ছন্দের গতিতে পৃথিবী খুঁজে পায় নতুন প্রাণ।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

অন্যায় করা আর অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে চুপ করে থাকা দুটিই ঘৃণার। অন্যায় করা যেমন খারাপ, তেমনি অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে আরো অন্যায়ের জন্মকে ত্বরান্বিত করাও খারাপ।

সমাজ মানেই ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের সমষ্টি। মন্দ ও অন্যায় আছে বলেই সুন্দর-স্বাভাবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ গড়ে তোলে আইন-কানুন। চিহ্নিত করে দেয় কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায়। একটি সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকে যারা কোন অনুশাসন মানে না, অন্যায়, অবিচার, উৎপড়ীন নানামুখী খারাপ কাজ করে থাকে। ফলে সমাজে তৈরি হয় অশান্তি ও দুরাচার। এসব কাজ নিন্দনীয়। কিন্তু সমাজে দেখা যায় অনেক মানুষ তা দেখেও না দেখার ভান করে। নীরবে

এসব অন্যায় সহ্য করে। নিজেদের বিবেককে বিকিয়ে দিয়ে প্রতিবাদী হয় না। এটি এক প্রকার অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ারই নামান্তর। অন্যায়কে আরো বাড়তে দেওয়ার, বাধামুক্ত করে দেওয়ারই নামান্তর। এতে সমাজে অন্যায়ের প্রতাপ বাড়ে, অন্যায়ের রাজত্ব কায়েম হয়। ন্যায়ের নির্বাসন ঘটে। ফলে এক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে আমাদের উচিত যেখানে অন্যায় সেখানেই প্রতিবাদ করা। অন্যায়ের টুটি চেপে ধরে এর বৃদ্ধি বন্ধ করে দেওয়া। যদি কেউ তা না করে তবে সেও অন্যায়কারীর মতই ঘৃণার্হ্য। সমাজে এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা আত্ম-সুখকাতর, আত্মকেন্দ্রিক এবং বিলাসী। তাদের সামনের ওপর দিয়ে কেউ অন্যায় করলে তারা কিছু বলে না। এর ফলে অন্যায়কারীরা আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এতে কিন্তু ঐ ব্যক্তিই প্রকারান্তরে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হন। যেমন– সমাজে ঘুষ নেওয়ার প্রচলন আছে। কিন্তু যারা দিচ্ছেন এবং নীরবে সহ্য করছেন তারা যদি প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন তবে হয়ত বা ঘুষ নেওয়া অনেকাংশে কমে যাবে। আর যদি ঘুষ দিয়ে যান বা নীরবে সহ্য করে যান তবে দুর্নীতি আরো বৃদ্ধি পাবে। দুজনই সমান অপরাধী হয়ে উঠবেন। অন্যায়কারীকে যদি কোন প্রকার বাঁধা না দেয়া হয়, তবে সমাজে অন্যায় ব্যাধির মতো মহামারি আকার ধারণ করবে। এজন্য প্রয়োজন মেরুদণ্ড শক্ত করে অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়ানো। কেননা সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠায় অন্যায়কে প্রতিবাদ করার কোন বিকল্প নেই।

বর্তমান সমাজে অন্যায় সহ্য করায় সামাজিক অস্থিরতা বেড়েই চলেছে এবং অপরাধীদের প্রতিবাদ না করায় তারা একের পর এক অপরাধ করেই যাচ্ছে। এ-অবস্থায় প্রতিবাদ না করে আমরা মূলত নিজেরাই অপরাধী হয়ে উঠছি।

এমতাবস্থায় আমাদের সকলের উচিত অন্যায়কে ঘৃণা করা এবং তার প্রতিবাদ করা। তবেই সুখী সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা আমাদের জন্য কঠিন কিছু হবে না।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি

জীবনে উন্নতির জন্য, কাঙ্ক্ষিত যে-কোনো কিছু অর্জনের জন্য পরিশ্রম প্রয়োজন। নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব।

'পরিশ্রম' অর্থ কষ্ট স্বীকার করে কাজ করা। আর 'প্রসূতি' অর্থ জন্মদাত্রী। একটি কারণ এবং অন্যটি ফলাফল। যে-ব্যক্তি পরিশ্রম করে, সে-ই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। কারণ, পরিশ্রম তথা নিরলস সাধনার মধ্যেই সৌভাগ্যের বসবাস। সৌভাগ্য বাইরে থেকে আসে না। কাজের মাধ্যমে মানুষ নিজেই তার সৌভাগ্যকে নির্মাণ করতে পারে। কাজ না করে, যে-মানুষ কারো মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কারো মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, সে তার স্বপ্নকে সফল করতে পারে না। পরিশ্রম ছাড়া কৃষকের ঘরে ফসল আসবে ভাবা যায়?

পরিশ্রমের বিপরীত ভাগ্যে বিশ্বাস করা; নিজেকে নিয়তির হাতে সমর্পণ করা। এর মানে অলস জীবন যাপন করা। শুধু ভাগ্যে বিশ্বাস করে, নিয়তির হাতে নিজেকে সমর্পণ করে, অলস জীবন যাপন করে কোনো কিছু লাভ করা যায়– এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। নিজে কোনো কিছু লাভ করতে হলে, মানুষের জন্য কিছু করতে হলে, মৃত্যুর পর পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে থাকতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই। কথায় বলে, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। অলস মানুষ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি মানব জাতির বোঝা; অগ্রগতির অন্তরায়। পৃথিবীতে যাঁরা অনুসরণীয় আদর্শ স্থাপন করে মহৎ হয়েছেন, মহামানব হয়েছেন, তাঁদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁদের সমগ্র জীবন কর্মমুখর, ঘর্মাক্ত। এজন্য সব ধর্ম এবং মহামানব পরিশ্রম তথা কাজ করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পরিশ্রমীর হাত সবচেয়ে পবিত্র হাত এবং সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে প্রিয় হাত। আধুনিক উন্নত পাশ্চাত্য দুনিয়ায় কাজকে, পরিশ্রম করাকে ধর্মচর্চার অংশ মনে করা হয়।

জীবনে উন্নতির জন্য পরিশ্রমের বিকল্প নেই। পরিশ্রমহীন ভাগ্য-নির্ভরতা দেশ, জাতি, মানুষ, পৃথিবীকে পিছিয়ে দেয়। ভালো কিছু লাভ করার জন্য দরকার উপযুক্ত পরিশ্রম।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। যে-কোন জাতির পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে, সেই জাতির শিক্ষিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

অশিক্ষিত মানুষ একটি জাতির অগ্রগতির পথে শুধু বাধা নয়, বোঝাও বটে। যে-জাতির জনগোষ্ঠী যত শিক্ষিত সে- জাতি ততো দ্রচত উন্নতি করে। এজন্য বলা হয়, যে-জাতি জ্ঞানে বড় নয়, সে-জাতি ধনে বড় নয়। কোন জাতি কতটা সভ্য তার প্রধান নির্ণায়কও এই শিক্ষা। শিক্ষা না থাকলে একটি জাতির অর্থনীতি, সংস্কৃতিও অনুন্নত হতে বাধ্য। শিক্ষা হচ্ছে এক ধরনের আলো। এই আলো যে-জাতির মধ্যে ঢুকেছে, সে-জাতির সর্বত্র আলোকিত হয়, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ– বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের– দেশগুলো এক সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উপনিবেশ ছিল। ওই দেশগুলো ততোদিন পর্যন্ত শাসন ও শোষণের শিকার ছিল, যতদিন পর্যন্ত ওই জাতিগুলো যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়নি। অশিক্ষার ফল স্বরূপ তারা পরাধীন ছিল। অর্থাৎ মেরুদণ্ডহীন ছিল। কিন্তু ওই জাতিগুলো যখন শিক্ষিত হয়েছে, তখন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। শিক্ষার কারণে পরাধীন জাতিগুলো স্বাধীন হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষা একটি জাতিকে তার ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। এ-কারণেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নে নানা মুনি নানা মত রাখলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সব সময় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতেন। তিনি মনে করতেন, বাঙালি তথা ভারতবর্ষের মানুষ ভেতরগতভাবে শিক্ষিত হলে, তাদের বাইরের পরাধীনতা ঘুচতে বাধ্য। শিক্ষা একটি জাতিকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান ও স্বপ্নবান করে তোলে। ফলে সে-জাতি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

শিক্ষা যে একটি জাতির মেরুদণ্ড তার প্রমাণ **১৯৭১** সালের **১৪** ডিসেম্বরে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক বুদ্ধিজীবী নিধনের ঘটনা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের নিশ্চিত পরাজয় জেনে এদেশের শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকে হত্যা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালি জাতির মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দেয়া। যাতে করে বাঙালি জাতি অদূর ভবিষ্যতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এ-জন্য বলা হয়– যদি কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে চাও তাহলে সেই জাতির শিক্ষিত ও জ্ঞানী লোকের মাথা কাট। এ-থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, শিক্ষাই একটি জাতির মেরুদণ্ড।

শিক্ষা একটি জাতির মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করে। মানুষকে সম্পদে পরিণত করা ছাড়া প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকা অসম্ভব। এজন্য শিক্ষা যে-কোনো জাতির উন্নতির জন্য অত্যন্ত জরুরি।

কীর্তিমানের মৃত্যু নেই

শারীরিকভাবে মানুষ পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকে না। কিন্তু মানুষের কীর্তি বা মহৎ কর্ম টিকে থাকে। মহৎ কর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষ পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করতে পারে।

মানুষের জীবন পৃথিবীতে খুবই সংক্ষিপ্ত। এটি জানার পরেও সব মানুষই পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু তা অসম্ভব। পৃথিবী থেকে মানুষকে বিদায় নিতেই হয়। অধিকাংশ মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার অল্প কিছুকালের মধ্যেই পৃথিবী এবং মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যায়। কিন্তু যেসব মানুষ পৃথিবীতে মহৎ কর্মের মাধ্যমে দেশ ও দশের কল্যাণের জন্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখে মারা যায়, পৃথিবীতে তাদের স্মৃতি টিকে থাকে। মানুষ তার রেখে যাওয়া সৃষ্টিকর্ম, মহৎ-কর্ম তথা কীর্তির মধ্য দিয়ে তাকে স্মরণ করে। অর্থাৎ কীর্তিমান মানুষ মরেও অমরতা লাভ করেন। ভাবা যাক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন আজ থেকে প্রায় পৌনে এক শতাব্দী আগে। কিন্তু বাঙালি জাতির সংকটে-সমস্যায়, উৎসবে-আনন্দে, একান্ত অনুভবে তিনি তো প্রতিনিয়তই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছেন। শারীরিক অস্তিত্ব না থাকলেও কবিতা, গান, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রতিনিয়ত যেন আমাদের সঙ্গ দিয়ে চলেছেন। সৃষ্টিশীল মানুষ, কীর্তিমান মানুষ না থেকেও এভাবেই থাকেন তাঁর কর্মের মাধ্যমে।

প্রাণিজগতের অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষের পার্থক্য এখানেই যে, অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষ শরীর সর্বস্ব নয়। অন্যান্য প্রাণী মারা গেলে; তার শারীরিক অস্তিত্ব লোপ পেলেই, সে শেষ হয়ে যায়। কারণ তার কোনো কীর্তির স্বাক্ষর সে পৃথিবীতে রেখে যেতে পারে না। কিন্তু মানুষ পারে। মানুষের সেই সক্ষমতা, ইচ্ছা, আকুলতা থাকে বলেই সে মানুষ। পৃথিবীতে যে-মানুষ মহৎ-কর্ম বা কীর্তির স্বাক্ষর রাখতে পারে না, সে ব্যর্থ মানুষ। মানুষ ব্যর্থ হতে চায় না। পৃথিবীতে কীর্তিও মাধ্যমে চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়। এভাবেই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হয়ে ওঠে।

সারা জীবনব্যাপী ভোগ এবং তারপর একদিন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যাওয়া, যথার্থ মানুষের পরিচায়ক নয়। আমাদের উচিত যার যার সাধ্য মতো পৃথিবীতে এমন কিছু করে যাওয়া, যার মাধ্যমে মৃত্যুর পরেও মানুষ আমাদের স্মরণ করে।

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন

স্বাধীনতা অমূল্য ধন। যে-জাতি পরাধীন, সেই জাতিই বোঝে স্বাধীনতা অর্জন করা কত কঠিন। কিন্তু সেই অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করা, তার মর্যাদা সমুন্নত রাখা, আরো কঠিন।

স্বাধীনতাহীনতায় বসবাস করা কোনো জাতির জন্যই কাঙ্ক্ষিত নয়। স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম বলেই কবি রঙ্গলাল সেন বলেছেন– 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে/ কে বাঁচিতে চায়! দাসত্ব শৃঙ্খল কে পরিতে চায় হে/ কে পরিতে চায়!' 'দাসত্ব শৃঙ্খল' কেউ-ই পরে থাকতে চায় না। এতে একটি জাতির বিকাশ, আত্মসম্মানবোধ, নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়। এ-কারণে দেখা যায়, পরাধীন যে-কোনো জাতি স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এক সময় হয়ত অনেক জাতি দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনই একটি জাতির পরম লক্ষ্য হলে চলে না। স্বাধীনতা অর্জনের পর ওই জাতির কাঁধে চেপে বসে সেই অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করার চরম দায়িত্ব। স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামের নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে। কিন্তু সেই অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করার সংগ্রাম চিরকালীন। যতদিন একটি জাতি অর্জিত স্বাধীনতাকে সমুন্নত, অর্থবহ করার সংগ্রামে লিপ্ত থাকে ততোদিন স্বাধীনতা থাকে। নতুবা স্বাধীনতা হারাতে হয় অথবা স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে যে আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয়, স্বধীনতা রক্ষার জন্য বা তাকে অর্থবহ করার জন্য আরো বেশি আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয়। নতুবা অর্জিত স্বাধীনতা পরাধীনতার নামান্তর হয়ে যায়। এজন্য খ্যাতনামা মার্কিন ইতিহাসবিদ Hannah Arendt বলেন Freedom means responsibility.

স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে শত্রু থাকে একপক্ষ; যারা পরাধীন করে রাখে শুধু তারা। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর শত্রু হয় বহু বিচিত্র। এক্ষেত্রে শুধু অন্য দেশ বা জাতি অর্জিত স্বাধীনতার শত্রু হয় তা নয়। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, পরনির্ভরশীলতা, অনিরাপত্তা, অপসংস্কৃতি ইত্যাদি স্বাধীনতার শত্রুতে পরিণত হয়। এগুলোকে রোধ করতে না পারলে স্বাধীনতা পরাধীনতার নামান্তরই হয়ে যায়। এ-অর্থেও স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে তা রক্ষা করা আরো কঠিন।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বাইরেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকালেও আমরা দেখি যে, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে তা রক্ষা করা আরো কঠিন। যেমন পরিবার থেকে আমাদের যে-কোনো কিছু করার স্বাধীনতা দিলেই আমরা সব কিছু করতে পারি না, আমরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠি না। স্বাধীনতাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ না করতে পারলে পরিবার থেকে দেয়া স্বাধীনতা আমাদের হারানোর সম্ভাবনাই বেশি থাকে।

সুতরাং স্বাধীনতা অর্জন করে ভাববিগলিত হয়ে গেলে, স্বেচ্ছাচারী হয়ে গেলে চলবে না। বরং এর যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে তা ধরে রাখা যে-কোনো জাতির জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

নাম মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে বড় করে তোলে

সুন্দর নাম মানুষের বড়ত্ব বা গুরুত্বের পরিচায়ক নয়, বরং মানুষের মহৎ কর্মই তার বড়ত্বের পরিচায়ক। মানুষ নাম দিয়ে পরিচিত হয় না, মানুষের কাজই তার নামকে পরিচিত করায়।

সুন্দর নাম বা বংশ পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এর সঙ্গে যাকে আমরা মহত্ব বলি, বড়ত্ব বলি তার কোনো সম্পর্ক নেই। বড় কেউ কাউকে করতে পারে না। মানুষের নিজের মহৎ কাজ দিয়েই তাকে বড় হতে হয়। অসুন্দর নামের অধিকারী হয়েও বা নিচু বংশে জন্মগ্রহণ করেও একজন মানুষ তার সাধনা দিয়ে, কর্ম দিয়ে জগতে বড় মানুষের কাতারে শামিল হতে পারে। এ-কারণে কবি বলেছেন– 'নহে আশরাফ যার আছে শুধু বংশের পরিচয়,/সেই আশরাফ জগত যাহার পুণ্য কর্মময়।'অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট (আশরাফ) যার 'পুণ্যকর্ম' রয়েছে।পৃথিবীর বহুশ্রুত, মহৎ নামগুলোর মানুষের জীবন পর্যালোচনা করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, তাঁদের নামের মধ্যে শুরুতে কোনো বিশেষত্ব ছিল না। নামগুলো এতটা সুন্দর বা মহৎও ছিল না। যেমন– আব্রাহাম লিংকন, এ.পি.জে আবদুল কালাম, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ। তাঁরা তাঁদের কর্মের দ্বারা, সাধনার দ্বারা তাঁদের নামকে পৃথিবীর কাছে চিরস্মরণীয় ও অনুকরণীয় করে তুলেছেন। একসময় তাঁদের নাম ছিল অশ্রুত। এখন তাঁদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়।

মানুষের সম্ভাবনা অসীম। মানুষই পারে তার সীমাবদ্ধতাকে নিরলস সাধনা, পরিশ্রম আর নিষ্ঠার দ্বারা নিজেকে তুলে ধরতে। এই কাজ যাঁরা করতে পারেন, তাদেরই আমরা বলি সফল মানুষ, কীর্তিমান মানুষ। কীর্তিমান ও সফল হওয়ার ক্ষেত্রে নাম বা বংশ পরিচয় মুখ্য নয়, মহৎ কাজই মুখ্য।

ভোগে নয় ত্যাগেই প্রকৃত সুখ

ভোগ করার মধ্যে সর্বসুখ নিহিত বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে করা হয়। কিন্তু সুখের গভীরতা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ভোগের সুখ সাময়িক এবং বাহ্যিক। ত্যাগের মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। এই শ্রেষ্ঠত্ব জন্মসূত্রেই মানুষ পায় না। তাকে অর্জন করতে হয় এই শ্রেষ্ঠত্বের জয়মালা। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে এমন কিছু দেখা দেয়, যা তাকে জীবজগতের অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে দেয়। তেমনি একটি বিষয় ত্যাগ। ত্যাগ ধর্ম মানুষকে মহৎ করেছে। মানুষই একমাত্র জীব, যে ত্যাগে আনন্দ লাভ করে। মানুষের এই বৈশিষ্ট্যটি যার মধ্যে নেই তার মধ্যে মানুষের অনেকখানিই অনুপস্থিত। ত্যাগে আনন্দ লাভ করার প্রবৃত্তি না থাকলে মানুষ জীবজগতের অন্য প্রাণীদের কাতারে শামিল হয়ে যায়। জীবজগতের অন্য প্রাণীরা ভোগেই সর্বোচ্চ সুখ লাভ করে থাকে। কিন্তু মানুষ অন্যের জন্যে স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ করেই প্রকৃত সুখ লাভ করে। যে-মানুষ শুধু ভোগের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে, সে-মানুষের জীবন পশুর জীবন। ত্যাগ হচ্ছে হৃদয়ের খোরাক। এর সুবাস, সুগন্ধ, ঐশ্বর্যই মানুষকে মহৎ করে, প্রকৃত সুখ দান করে। ত্যাগের সুখ প্রকৃত সুখ। প্রস্ফুটিত হওয়া ফুলের প্রাথমিক সার্থকতা। অনেকের জন্যে সুবাস ছড়ানোতে তার চূড়ান্ত সার্থকতা। একইভাবে ভোগের দ্বারা মানুষ যে সুখ লাভ করে তা সুখের স্থূল রূপ। আর অন্যের জন্যে ত্যাগ করার মাধ্যমে যে সুখ লাভ করে তা-ই প্রকৃত সুখ। এটিই মানুষের চূড়ান্ত সার্থকতা। এজন্যে কবি বলেছেন– 'তার মতো সুখ আছে কি কোথাও আপনার কথা ভুলিয়া যাও।' মানুষের প্রধান পরিচয় মনুষ্যত্ববোধে, মানবিকতাবোধে। এই মনুষ্যত্ববোধ, মানবিকতাবোধ অর্জনের অন্যতম উপায় ত্যাগের মানসিকতা অর্জন। মনুষ্যত্ববোধ সম্পর্কে কবি ঠিকই বলেছেন– 'ত্যাগে ধরা দেয়, বিলাসে পালায় এমনি স্বভাব তার।'

মানুষ শুধু তার নিজের পাকস্থলী নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য জন্মগ্রহণ করে না। অন্যের ভাবনাও তাকে ভাবতে হবে। অন্যের জন্য স্বার্থত্যাগের সুখই পৃথিবীকে এতো সুন্দর করেছে বাসযোগ্য করে তুলেছে।

প্রাণ থাকলে প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না

সদগুণ, মানবিক অনুভূতি, বিবেক-বিবেচনাই মানুষকে মানুষ কোরে তোলে। এসব গুণই মানুষকে প্রাণিজগত থেকে আলাদা করেছে, দান করেছে শ্রেষ্ঠত্ব।

যার প্রাণ আছে সে-ই প্রাণী। এই হিসেবে মানুষও প্রাণী। কিন্তু প্রাণিজগতের অন্যদের মন নেই বলে তারা প্রাণী হিসেবেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মন বা বিচারবুদ্ধির সক্ষমতার কারণে মানুষ প্রাণিজগত থেকে নিজেকে মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। মানুষ হয়ে উঠেছে সৃষ্টির সেরা জীব। এজন্য বলা হয় Man is animal with rationality.মন বা বিবেক-বুদ্ধি বা 'Rationality'ছাড়া মানুষ প্রাণী বৈ অন্য কিছু নয়। মানুষকে এই সদগুণটি অর্জন করতে হয়। যে- মানুষের মন যত বড়, উদার, উন্নত সে-মানুষ হিসেবে ততো মহৎ। মনের উপস্থিতির কারণে মানুষ ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, শ্রেয়-অশ্রেয়ের পার্থক্য করে। মনের উপস্থিতিই মানুষকে মহানুভব করে তোলে। পৃথিবীর সভ্যতার অগ্রগতি মানুষের মধ্যে মনের উপস্থিতিরই ফল।

মন আছে বলেই মানুষ প্রাণিজগতের অন্য প্রাণীদের মতো শুধু ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্তির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্তির পরও তার যেন হয় না। তার প্রয়োজন হয় সৌন্দর্যচর্চার, অন্যের কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগ করার, পৃথিবীকে ফুল-ফসলে ভরিয়ে তোলার। মানুষের এই অতিরিক্ত বাসনাই তার মনের পরিচায়ক। এই মনই মানুষকে প্রাণিজগতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে।

মন মানে হৃদয়বৃত্তি। মন মানে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভের বোধ। মন মানে স্বার্থ-ত্যাগের তাগিদ অনুভব করার সক্ষমতা। এসব আছে বলেই মানুষ প্রাণিজগত থেকে আলাদা। মনহীন মানুষ পশুর সমান।

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

যার যেটা আপন ভুবন, সেখানেই তাকে মানায়; সেখানেই তার সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ। আপন পরিবেশ থেকে চ্যুত হলে সব জিনিসই তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারায়।

বিশ্ব-প্রকৃতিতে সব কিছুরই উদ্ভব, বিকাশ ও প্রকাশের জন্য নিজস্ব নির্ধারিত একটি স্থান আছে। নিজস্ব, নির্দিষ্ট স্থান থেকে কোনো কিছুকে সরিয়ে নিলে, ওই জিনিসের সৌন্দর্য যেমন নষ্ট হয়, তেমনি যে পরিবেশ থেকে তাকে সরিয়ে নেয়া হয় সেই পরিবেশের সৌন্দর্যেরও হানি ঘটে। যেমন, প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে গাছের ডালেই ফুলকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। ডাল থেকে ফুলকে ঘরে এনে ফুলদানিতে রাখলে ফুলকে যেমন আগের মতো সুন্দর দেখায় না, তেমনি ফুলহীন গাছের সৌন্দর্যেরও হানি ঘটে। অরণ্য প্রকৃতির খোলা পরিবেশে বিচরণরত হরিণ যতটা সুন্দর, খাঁচায় নিশ্চয় ততোটা নয়। শুধু হরিণ নয়, বনজ পরিবেশে যে-কোনো বন্য প্রাণীকে যতটা সুন্দর দেখায়, অন্য কোথাও তার সেই শোভা সৌন্দর্য ফুটে ওঠে না। আবার বন্য প্রাণীহীন বনের শোভা-সৌন্দর্যও পূর্ণতা পায় না। মায়ের কোলেই শিশুকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়।

যার যে-স্থান, তাকে সে-স্থানে না রাখলে কেবল তার শোভা-সৌন্দর্যই নষ্ট হয় তা নয়, তার স্বাভাবিক বিকাশের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন, মুক্ত আরণ্যক পরিবেশেই বটগাছের বিরাট প্রকাশ ঘটে। কিন্তু তাকে টবে ঘরের কোনায় রাখলে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' গল্পের ফটিক চরিত্র থেকেও বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। ফটিক গ্রামের মুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠা কিশোর। সেখানেই সে সুন্দর। গ্রামীণ পরিবেশেই তাঁর স্বাভাবিক বিকাশ হচ্ছিল। কিন্তু যখনই ফটিককে গ্রামীণ পরিবেশের বৃন্ত থেকে চ্যুত করে শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তখন সে আর বাঁচেনি। ফটিক অকালে মৃত্যুবরণ করেছে।

সুতরাং স্বাভাবিক শোভা-সৌন্দর্য ও স্বাভাবিক বিকাশের জন্য যথাস্থান নীতিই সর্বোত্তম নীতি। যার যার স্থানে তাকে থাকতে দেয়াই শ্রেয়।

দুঃখের মতো এতো বড় পরশ পাথর আর নেই

যে-মানুষের জীবন শুধু সুখময়, সে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। সুখের সঙ্গে দুঃখের স্পর্শই একজন মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। দুঃখের স্পর্শ মানুষকে মহৎ ও খাঁটি করে।

পরশ পাথরের স্পর্শে লোহা সোনা হয়। দুঃখ মানুষের জীবনে পরশ পাথরের মতো। এর স্পর্শে ক্ষুদ্র মানুষ, সাধারণ মানুষ মহৎ ও অসাধারণ হয়ে ওঠে। যে-মানুষের জীবন সুখময় তার দ্বারা দুঃখী মানুষের বেদনা বোঝা সম্ভব নয়। আর দুঃখী মানুষের দুঃখ বোঝা ছাড়া পৃথিবীতে কোনো মানুষই মহৎ মানুষ হয়নি। এজন্য দেখা যায়, পৃথিবীর সব মহামানবের জীবনই কমবেশি দুঃখের ভেতর দিয়ে কেটেছে। জীবনে দুঃখের স্পর্শেই তাঁরা হৃদয়বান হয়েছেন, মহৎ হয়েছেন, স্মরণীয়-বরণীয় হয়েছেন। দুঃখের স্পর্শ ছাড়া মানুষের পূর্ণ বিকাশ হয় না। শুধু তাই নয়, দুঃখ হচ্ছে সুখ লাভের একটি ধাপ। এই ধাপ অতিক্রম করেই সুখ লাভ করতে হয়। আর দুঃখ দহনের মধ্যে দিয়ে যে সুখ মানুষ লাভ করে, তার অনুভূতি অনেক গভীর হয়।

দুঃখের স্পর্শ অনুভূতি ছাড়া মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে না। যে-মানুষের জীবনে ক্ষুধার কষ্ট নেই, সে ক্ষুধার্ত মানুষের যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারবে না। যে-মানুষ পীড়িত হয়নি, সে পীড়িত মানুষের আর্তনাদ অনুভব করতে পারবে না। আর এসব মানবিক অনুভব-অনুভূতি ছাড়া একটা মানুষ মহৎ মানুষের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। আগুনে পুড়ে সোনা যেমন খাঁটি হয়, দুঃখের সপর্শে মানুষ তেমনি পবিত্র ও খাঁটি হয়। উন্নত মানুষে পরিণত হওয়ার পরশ পাথর হিসেবে কাজ করে দুঃখ। এ-কারণে কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন– 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান / তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান।'

দুঃখ মানুষকে শক্ত করে, সংগ্রামী করে, যোগ্যতর করে তোলে। যে-কোনো বাধা-বিপত্তি ডিঙানোর সাহস জোগায়। স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার প্রেরণা জোগায় দুঃখ। সত্যি দুঃখের মতো এতো বড় পরশ পাথর আর নেই।

স্বদেশের উপকারে নেই যার মন
কে বলে মানুষ তারে? পশু সেইজন

মা, মাটি আর স্বদেশ– এই তিনটি বিষয়কে অভিন্ন মনে করা হয়। মাতৃসম স্বদেশের মঙ্গলে যে-ব্যক্তি এগিয়ে আসে না, স্বদেশের বিপন্নতায় যার মন কাঁদে না, সে মানুষ হয়েও পশুর সমান।

মা দুধ, অন্ন, স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে তার সন্তানকে লালন-পালন করে। সন্তানের বড় হওয়া থেকে শুরু করে তার প্রতিষ্ঠিত হওয়া, পুরো প্রক্রিয়ায় মায়ের অবদান তুলনাহীন। স্বদেশও মানুষের কাছে মায়ের মতো। প্রতি মানুষ তার স্বদেশের আলো-বাতাস-প্রকৃতি-সম্পদ ভোগ-উপভোগ করেই বড় হয়। মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রধান ক্ষেত্র তো স্বদেশই। স্বদেশের কাছে মানুষের ঋণের শেষ নেই। মায়ের ঋণ যেমন শোধ করা যায় না, স্বদেশের কাছেও মানুষের ঋণ প্রকৃতপক্ষে অপরিশোধ্য। স্বদেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক মায়ের সঙ্গে সন্তানের নাড়ীর সম্পর্কের মতোই। এ-কারণে স্বদেশের বিপন্নতায় মানুষ বিপন্ন বোধ করে। মাতৃভূমি আক্রান্ত হলে মানুষ আক্রান্ত বোধ করে। মায়ের হতশ্রী অবস্থা সন্তানকে উদ্বেলিত করবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু স্বদেশের বিপন্নতায়, বিপদে-আপদে যে-মানুষের প্রাণ কাঁদে না, সে পশুর সমান। পশুদের শুধু খাদ্য হলেই চলে। কারো প্রতি তার দায়বদ্ধতা নেই, কৃতজ্ঞতা নেই, ঋণ নেই। কিন্তু মানুষের থাকে। এসব থাকে বহেই তো সে মানুষ। এ-কারণে মানুষ যত বড় হয়, মাতৃসম স্বদেশের কল্যাণ নিয়ে, মঙ্গল নিয়ে সে ভাবে। কিভাবে স্বদেশের উন্নতি হবে, সে ভাবনায় মানুষ আত্মনিয়োগ করে। এমন কি স্বদেশের মঙ্গলের জন্য মানুষ অকাতরে আত্মোৎসর্গও করে। এর প্রমাণ **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধ। মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খলকে নিজের পায়ে পরা শেকল মনে করে, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করতে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছে। এজন্য তারা মহান; জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। আর স্বদেশের পরাধীনতায় যে কুণ্ঠিত হয় না, লজ্জিত হয় না, তার মুক্তির জন্য প্রাণ নিয়ে এগিয়ে আসে না; সে পশু ছাড়া কী!

তাবৎ পৃথিবীর মহৎ মানুষ স্বদেশের সেবা করে মহৎ হয়েছেন। স্বদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ছাড়া কোনো মানুষ মহৎ উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয় না। স্বদেশের উপকারে যার হৃদয় মন উদ্বেলিত হয় না, সে শারীরিকভাবে মানুষ হলেও চেতনাগতভাবে সে পশু স্তরেই রয়ে যায়।

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?

মাতৃভাষা মানুষের আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। অন্যভাষা যত সুন্দর, শক্তিশালী ও ভাবপ্রকাশের উপযোগীই হোক না কেন, মাতৃভাষা ছাড়া নিজেকে প্রকাশ করার পূর্ণাঙ্গ আনন্দ লাভ করা যায় না।

পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষা আছে। এসব ভাষার কোনোটি অর্থনৈতিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ, আবার কোনোটি তার নিজস্ব ভাবসম্পদ ও সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। এসব ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কাজের কারণে বা জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধির জন্য এসব ভাষা শিক্ষা করা যেতে পারে। অনেকে করেও তাই। কিন্তু তাই বলে অন্য ভাষা মানুষের মনের গভীর, গোপন, একান্ত অনুভূতি প্রকাশের জন্য উপযুক্ত নয়। অন্যভাষায় ভাবপ্রকাশ হয়ত সম্ভব। কিন্তু একথা নিশ্চিত করে বলা যাবে, নিজের ভাষায় অর্থাৎ মাতৃভাষায় নিজের মনের ভাবটি যে-পরিমাণ প্রকাশ করা যায়, অন্য ভাষায় তা কিছুতেই সম্ভব নয়। স্বদেশী ভাষা মাধ্যম হলে, প্রকাশ করার সময় নিজেকে নিংড়ে দেয়া যায়। আর লাভ করা যায় সীমাহীন আনন্দ। অন্যভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতে পারার সাধ, আনন্দ কোনোটিই পূর্ণতা পাওয়া অসম্ভব। এদিক লক্ষ রেখেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষাভাষীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনী, তারপর ইংরেজি শেখার পত্তন।' মাইকেল মধুসূদন দত্তও **১৩/১৪**টি ভাষা জানতেন। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনার মাধ্যমে নিজের মনের গহীন-গোপন অনুভূতি প্রকাশ করতে। কিন্তু তাতে তার তৃপ্তি এবং যশ কোনোটিই আসেনি। অন্য ভাষায় সাহিত্যচর্চা করাটাকে শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের কাছে মনে হয়েছে 'ভিক্ষাবৃত্তি' করার মতো। তাতে মানসিক তৃপ্তি নেই। অবশেষে তিনি বাংলায় সাহিত্যচর্চা করে তৃপ্তি ও খ্যাতি দুই-ই লাভ করলেন। এবং ঠিকই বলে উঠলেন 'মাতৃভাষা-রূপখনি পূর্ণমনিজালে।'

যোগাযোগ-প্রযুক্তি ও বাণিজ্যিক কারণে পুরো পৃথিবী এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। নানা কাজের কারণে মানুষকে এখন অন্যভাষাও আয়ত্ত করতে হয়। কিন্তু মনের একান্ত অনুভূতিটি প্রকাশ করে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করার জন্য মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলাই আমাদের আত্মপ্রকাশের সর্বোত্তম বাহন।

আলো বলে, 'অন্ধকার, তুই বড় কালো'
অন্ধকার বলে, 'ভাই, তাই তুমি আলো।'

পৃথিবীটা ভালো-মন্দের মিশেলে গড়া। মন্দ না থাকলে ভালোকে ভালোভাবে চেনা এবং উপলব্ধি করা যেত না।

অন্ধকারকে আমরা নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতেই অভ্যস্ত। আমরা সব সময় আলোর মধ্যেই থাকতে চাই। চারপাশ আলোকিত রাখতে ও দেখতে চাই। কিন্তু আলো কী, এর মাহাত্ম্যই বা কী– তা উপলব্ধির জন্য অন্ধকার খুবই জরুরি। অন্ধকার না থাকলে আলোর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা হয়ত অবগতই থাকতাম না; রাত আর দিনের পার্থক্যই বুঝতে পারতাম না। একইভাবে মন্দ, কালো, ইতর, কুজন, পাহাড়, মরুভূমি ইত্যাদি না থাকলে আমরা ভালো, সাদা, ভদ্র, সুজন, সমতল, সমুদ্রের স্বাতন্ত্র্য বুঝতে পারতাম না। পাপ ও পাপী আছে বলেই পুণ্য আর পুণ্যবানের কদর আমরা করতে পারি। পৃথিবীতে শুধু যদি পুণ্য থাকত, পাপ না থাকত, তাহলে পুণ্যবান হওয়ার জন্য মানুষের যে নিরন্তর সাধনা ও সংগ্রাম, তার আর প্রয়োজন হোতো না। ফলে মানুষের কীর্তির অনেকখানি ঢাকা পড়ে যেত। অমানবিকতার উপস্থিতি এবং বোধ না থাকলে মানুষের মানবিকতার মুল্য থাকত না। মানবিকতার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বোঝা যায় তখনই, যখন তাকে অমাবিকতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। মিথ্যা ছাড়া সত্যের মাহাত্ম্য কী! এজন্য কবি বলেছেন– দ্বাররুদ্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি ? সত্য বলে, আমি তবে কোথায় দিয়ে ঢুকি।'

পৃথিবীটা প্রকৃতপক্ষে ইতি আর নেতির মিশেলে গড়া। বৈপরীত্যের মধ্যেই পৃথিবীর শোভা সৌন্দর্য ও অগ্রগতি। এজন্য অন্ধকার বা মন্দের নিন্দা করা কোনো কাজের কথা নয়। বরং অন্ধকার বা মন্দকে পাশে রেখে আলোর সাধনাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

সংসার সাগরে দুঃখ-তরঙ্গের খেলা
আশা তার একমাত্র ভেলা।

পৃথিবীতে মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্টের অন্ত নেই। দুঃখ-কষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই মানুষকে টিকে থাকতে হয়। আর মানুষের এই নিরন্তর সংগ্রামের প্রেরণা হচ্ছে আশা। আশা আছে বলেই মানুষ বেঁচে থাকে, টিকে থাকে।

মানুষের জীবন ফুলশয্যা নয়। দুঃখরূপী কাঁটার আঘাতে প্রতিনিয়ত জর্জরিত হয় মানুষ। বাস্তব জীবন সত্যিই যেন এক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ, তরঙ্গ-সংকুল সাগর। মানুষকে এই মত্তসাগর পাড়ি দিতে হয় আমৃত্যু। কিন্তু মানুষের পক্ষে এই দুঃখের সাগর, সংগ্রামের সাগর পাড়ি দেয়া অসম্ভব হোতো, যদি তার সামনে আশা না থাকত। আশার ভরসা বা আশার হাতছানিই মানুষকে দুঃখ-কষ্ট-জর্জরিত সংসারে সংগ্রাম করতে ও টিকে থাকতে প্রেরণা জোগায়। নতুবা মানুষ দুঃখের কাছে পরাজয় স্বীকার করে থমকে যেত। পৃথিবী, মানুষ ও সভ্যতার অগ্রগতি যেত থেমে।

আশাকে অনেকে 'কুহকিনী' বললেও, প্রকৃতপক্ষে আশাই পৃথিবীর কর্মের চাকাকে সচল রেখেছে। আশা হচ্ছে অজানা সুন্দর, কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ। এই কাঙ্ক্ষিত সুন্দরের বাসনা বর্তমানকে সচল রাখে। মানুষ আশায় বুক বাঁধে বলেই তার বিরূপ বর্তমানকে সে জয় করতে পারে। কবি যথার্থই বলেছেন– 'মেঘ দেখে কেউ করিস না ভয় / আড়ালে তার সুর্য হাসে।'

আশা হচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে আলোর ঝলকানি। আশা সংসারের দুঃখ জয়ের দ্বিজমন্ত্র; তাবৎ পৃথিবীর কর্মচঞ্চলতার, সচলতার প্রেরণা। আশা নেই তো পৃথিবীটা অন্ধকার, স্তব্ধ ও হতাশাগ্রস্ত।

কতিপয় নমুনাঃ

সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা

নমুনা : নিজের সুবিধার জন্য মিথ্যা, অন্যায়, অন্যায্যতার আশ্রয় না নিয়ে সত্য, ন্যায় আর ন্যয্যতার পক্ষে থাকার নামই সততা। সততা মানুষকে চেতনাগতভাবে ঐশ্বর্যবান করে তোলে; পবিত্র করে তোলে। সৎ মানুষের জীবন অনাড়ম্বর হতে পারে। কিন্তু তা সুখের জীবন। বিপরীতভাবে অসততার আশ্রয় নিয়ে তাৎক্ষণিক সুবিধা পাওয়া গেলেও, এটি সকল দুঃখের আকর। অসৎ মানুষ পৃথিবীতে অমর হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত নেই। যে মানুষ সততার পথে থাকে সে-ই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

যতনে রতন মিলে

নমুনা : পৃথিবীর সভ্যতার গোড়ার কথা যত্ন বা সাধনা। পৃথিবীতে যেকোনো কাঙ্ক্ষিত জিনিসকে পেতে হলে যত্ন ও সাধনার প্রয়োজন হয়। কথায় বলে, কষ্ট করলে কেস্ট মেলে। যত্ন বা সাধনা হচ্ছে কাঙ্ক্ষিতকে পাবার একমাত্র সিঁড়ি। যা অযত্নে মেলে তার গুরুত্ব মানুষের কাছে কম। সাধনা ছাড়া যাকিছু পাওয়া যায়, তা রত্নতুল্য নয়। যেকোনো আরাধ্যকে পাওয়ার পূর্ব শর্ত যত্ন, সাধনা, কষ্ট, ত্যাগ।

জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান

জ্ঞানই মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। এই জ্ঞানই মানুষকে পশুজগৎ থেকে আলাদা করেছে। জ্ঞান দিয়েই মানুষ ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, পাপ-পুণ্যের পার্থক্য করতে পারে। এই পার্থক্য করার মধ্য দিয়ে মানুষ ভালো, উচিত আর পুণ্যের পক্ষে অবস্থান নেয়। এতে পৃথিবী সুন্দর হয়ে ওঠে। কিন্তু পশুর জ্ঞান নেই। সে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। সুন্দর অসুন্দরের বোধ তার নেই। একারণে জ্ঞানহীন মানুষ আর পশু ভিন্ন কিছু নয়। একই চেতনার ভিন্ন ভিন্ন রূপ আর নাম মাত্র।

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

নমুনা : পৃথিবীতে কাঙ্ক্ষিত যেকোনো কিছুকে পেতে হলে বাধা-বিঘ্ন আসতেই পারে। কেউ সেই বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে কাঙ্ক্ষিতকে লাভ করতে পারে, কেউ আগেই পরাজিত হয়। এই জয়ী আর পরাজিতের পার্থক্য তৈরি হয় মূলত ইচ্ছা শক্তির তারতম্যের কারণে। যার ইচ্ছাশক্তি প্রবল সে যা চায় তা হাতের মুঠোয় আনবেই। প্রবল ইচ্ছাশক্তিই তাকে কাঙ্ক্ষিতকে পাওয়ার উপায় বাতলে দেবে। আর ইচ্ছাশক্তি যার কম কাঙ্ক্ষিতকে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে কোনো উপায়ই খুঁজে পাবে না। ব্যর্থতার গ্লানিই হবে তার সার।

অর্থই অনর্থের মূল

নমুনা : অর্থ মানব জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে, সমাজে মূল্য পেতে হলে অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই অর্থই অনেক সময় অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থ যখন মানুষকে লোভী আর মূল্যবোধহীন অবিবেচক করে তোলে তখন সেই অর্থ সমাজে, রাষ্ট্রে, পৃথিবীতে নানা অন্যায়, অনাচার আর হানাহানির জন্ম দেয়। বর্তমান পৃথিবীর যত বড় বড় সমস্যা তার মূলে আছে অতিরিক্ত অর্থের লোভ আর অর্থের অপব্যবহার।

দশে মিলে করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ

নমুনা : পৃথিবীর সভ্যতার উন্নতির মূলে আছে মানুষের সমবায়ী প্রয়াস। মানুষ একসাথে কাজ করে পৃথিবীকে ফুলে-ফসলে ভরিয়ে তুলেছে। এই পৃথিবী তো এক সময় বসবাসের অযোগ্য ছিল। কেউ একা একক প্রচেষ্টায় পৃথিবীকে নিশ্চয় বাসযোগ্য করে তোলেনি। অনেক মানুষের চেষ্টায় মানুষ জিতেছে বন্য-শ্বাপদের বিপরীতে। ঠিক একইভাবে, পৃথিবীর প্রতিটি কাজই যদি অনেকে মিলে একসাথে করা হয় তবে সফলতা আসার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। সফল না হলেও তাতে এককভাবে কারো ক্ষতি বা লজ্জা কোনোটিই নেই। কারণ সবাই মিলে চেষ্টা করা হয়েছে। আর একই কাজ যদি কোনো ব্যক্তি একা করে, এবং তাতে ব্যর্থ হয়, তবে সেই ব্যর্থতার গ্লানি তাকে এককভাবে বহন করতে হয়। তাই সবাই মিলে কাজ করাই উত্তম।

যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই
পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

নমুনা : আমাদের এই পৃথিবী বৈচিত্র্যে ভরা। বড়, ছোট, সাদা, কালো, সুন্দর, অসুন্দর ইত্যাদি নানা রং, রূপ আর গুণের সমন্বয়ে এই পৃথিবী গড়া। সব মিলিয়ে পৃথিবীর শোভা-সৌন্দর্য। যে আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ তারও পৃথিবীর সৌন্দর্যে-শোভায় পূর্ণতায় অবদান আছে। তাই কোনো কিছুই তুচ্ছ নয়। আপাত তুচ্ছের মধ্যেও থাকে বৃহতের ছায়া, বৃহতের ব্যঞ্জনা। তাই কোনো কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা সমীচীন নয়।

রোম নগরী একদিনে গড়িয়া উঠে নাই

নমুনা : রোম নগরী সমৃদ্ধি, শোভা-সৌন্দর্যের এক চিরায়ত নগরী। কিন্তু এই সমৃদ্ধ রোম, সুন্দর রোম একদিনে তৈরি হয়নি। বহু মানুষের, বহু যুগের, বহু সাধ্য-সাধনার ফলে রোম নগরী গড়ে উঠেছে। ঠিক একইভাবে, আমাদের জীবনে মহৎ কোনো কিছুকে পেতে হলে তা রাতারাতি পাওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নিরলস পরিশ্রম, সাধনা, ধৈর্য।

যে সহে সে রহে

নমুনা : মানুষের জীবন নিরন্তর সংগ্রামের জীবন। নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে মানুষকে এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়। যে এই প্রতিকূলতা সহনশীলতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে না, সে পরাজিত হয়, বিস্মৃত হয়। শুধু মানুষ কেন, পৃথিবীর সমস্ত জীবের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। যে প্রাণী টিকে থাকার নিরন্তর সংগ্রামে টিকে থাকতে পারেনি, তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। তাই বলা হয়, যে সহ্য করতে পারে, সে-ই পৃথিবীতে টিকে থাকে।

পথ পথিককে সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে

নমুনা : পথ আর পথিক বিষয় দুটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, পথ আগে তৈরি থাকে, পথিক সেই পথ দিয়ে হাঁটে। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, পথিকই হেঁটে হেঁটে পথ তৈরি করে। পথিক তার প্রয়োজন অনুযায়ী পথের সৃষ্টি করে। এই পথ সৃষ্টি করাতেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষ তার প্রয়োজন অনুযায়ী সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞা দিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কার করেছে। আবার সৃষ্ট পথ বা নতুন আবিষ্কার যখন পুরনো হয়েছে আবার মানুষ সৃষ্টি করেছে নতুন পথ, আবিষ্কার করেছে নতুন কিছু। এটিই মানুষকে মহৎ করেছে।

ইউনিট ৭
সারমর্ম ও সারাংশ লিখন

উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়া শেষে আপনি–

- সারাংশ ও সারমর্ম কী তা বলতে পারবেন।
- যে কোনো রচনার মূলভাব লিখতে পারবেন।
- ছোট আকারে বড় ভাব প্রকাশ করতে পারবেন।
- আবেগবহুল ভাষা বাদ দিয়ে সরাসরি মূল বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন।

মূলপাঠ

একটি রচনা নানা কারণে দীর্ঘ হতে পারে। বিষয়ের কারণে সেখানে যুক্ত হতে পারে উদাহরণ, উপমা ও দৃষ্টান্তের বাহুল্য। ঘটনার ঘনঘটাও বিচিত্র নয়।। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতায় এসব কিছুই হয়ত মানিয়ে যায়। কিন্তু সারাংশ রচনার ক্ষেত্রে এসব বাহুল্য একেবারে পরিতাজ্য। সেখানে অতিরিক্ত অলঙ্কার বাদ দিয়ে সহজ সরল ভাষায় বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। মোট কথা, কোনো লেখা ছোট আকারে আকর্ষণীয় ভাষায় প্রকাশ করার নামই সারাংশ বা সারমর্ম। কবিতার ক্ষেত্রে এই সংক্ষিপ্তকরণকে বলা হয় সারমর্ম এবং গদ্যের ক্ষেত্রে একে সারাংশ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

লেখক বা কবির যে কোনো রচনায় থাকতে পারে বিভিন্ন রকম উদাহরণ, উপমা, দৃষ্টান্ত, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বিস্তারিভাবে লিখিত বিষয়টির অন্তর্নিহিত ভাব কোনো রকম বাহুল্য ছাড়া সহজ-সরল ও সাবলীলভাবে সংক্ষেপে আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করাকে সারাংশ বা সারমর্ম বলে।

কোনো গদ্য বা কবিতা রচনায় যেসব যুক্তি, দৃষ্টান্ত, উপমা ও অলঙ্কার থাকে তা বাদ দিয়ে সহজ ও সরল ভাষায় বিষয়টি সংক্ষেপে প্রকাশ করার নামই সারাংশ বা সারমর্ম।

সারাংশ বা সারমর্ম লেখার নিয়ম

১. নির্ধারিত অংশটি বার বার পড়ে মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে হবে।
২. মূল অংশে যেসব অপ্রয়োজনীয় উপমা, অলঙ্কার, দৃষ্টান্ত আছে সারাংশে তা বাদ দিয়ে আসল কথাটা লিখতে হবে।
৩. একই কথার পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। তেমনি প্রয়োজনীয় অংশও বাদ দেয়া যাবে না।
৪. সারাংশ খুব ছোট কিংবা বড় হবে না। মূল অংশের চেয়ে তা অবশ্যই আকারে ছোট হবে।
৫. বক্তব্যের বর্ণনায় বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, অলঙ্কার, উপমা, রূপক ইত্যাদি অবান্তর। বাহুল্য বাদ দিয়ে মূল বিষয়টি সরাসরি লিখতে হবে।
৬. মূল বিষয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো বিষয় সারাংশে অবতারণা করা যাবে না। অনুমান নির্ভর কোনো ব্যাখ্যাও বাঞ্ছনীয় নয়।
৭. সারমর্ম কিংবা সারাংশ রচনার ভাষা মূলের অনুগামী হওয়া প্রয়োজন। সহজ-সরল মৌলিক ভাষায় বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে সবার কাছে বিষয়টি সহজবোধ্য হয়।
৮. উদ্ধৃত রচনায় একাধিক বিষয় থাকলে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে এবং মূল বিষয়টি থেকে যাতে রচিত অংশটি সরে না আসে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে।
৯. শব্দ ও বাক্য প্রয়োগে সংযমতা অবলম্বন করতে হবে। একাধিক বিশেষণ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়।

১০. কোনো সাংকেতিক বিষয় থাকলে তার তত্ত্ব বের করতে হবে। ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থাকলে দুই পক্ষের বক্তব্য আলাদাভাবে প্রকাশ করতে হবে।
১১. একটি অনুচ্ছেদে লিখতে হবে।
১২. মূল ভাবের বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগত মতামত বা মন্তব্য প্রকাশ করা যাবে না।
১৩. প্রথম বাক্যটি সহজ-সরল ও মূলভাবের প্রতি নির্দেশক হবে।
১৪. সারাংশ বা সারমর্মটি লেখা হলে কয়েকবার পড়ে নিশ্চিত হতে হবে যেন প্রয়োজনীয় কোন ভাব বাদ না পড়ে।

ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলন প্রয়োজন। সারাংশ বা সারমর্ম রচনার ভাষা পড়ে বুঝতে পারা বা সম্পৃক্ত করে লেখা এ দুটি বিষয়ে দক্ষতা প্রয়োজন। এ দক্ষতা অর্জন করতে হলে সারাংশ বা সারমর্ম রচনার অনুশীলন করতে হবে।

কতিপয় সারমর্ম

১.

দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ,
হাতুড়ি শাবল গাইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমার সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে সেবিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।

সারমর্ম :
যে শ্রমিকদের কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতি আজ সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছেছে, তারাই সমাজজীবনে বঞ্চিত ও অবজ্ঞার শিকার। কিন্তু পালাবদলের দিন এসেছে। একদিন শ্রমজীবী মানুষেরাই বিশ্বে নবজাগরণের সূচনা করবে।

২.

একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে
দহিল হৃদয় মম সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
সেথা দেখি এক জন পদ নাহি তার,
অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার।
পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন
আপনার মনে দুঃখ থাকে কতক্ষণ।

সারমর্ম :
পদহীন দুঃখিজনের কথা চিন্তা করলে কারো পায়ে জুতা না থাকার কষ্ট মনে স্থান পায় না। আসলে পরের দুঃখ-কষ্টকে উপলব্ধি করার মাঝেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত।

৩.

এসেছে, নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান,
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে।
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাবো– তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ

প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

সারমর্ম :

পৃথিবীতে নতুনের জন্যে পুরাতনকে স্থান ছেড়ে দিতে হয়– এটাই প্রকৃতির নিয়ম। জীর্ণপৃথিবীর ব্যর্থ, মৃত, ধ্বংসস্তুপ আর গ্লানি দূর করে তাকে নবীনদের বাসযোগ্য আবাসভুমি হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের একমাত্র কাম্য।

৪.

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদুর?
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতেই সুরাসুর।
রিপুর তাড়নে যখনই মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লাণির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদের কুঁড়ে ঘরে।

সারমর্ম :

এই পৃথিবীতে মানুষের মাঝেই স্বর্গ ও নরক বিদ্যমান। বিবেকবর্জিত মানুষ পৃথিবীতেই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে, আর যারা ভালোবাসা ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলে তাদের কাছে পৃথিবীটাই স্বর্গ।

৫.

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই– ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূণ্য নদীর তীরে,
রহিনু পড়ি–
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

সারমর্ম :

মহাকালের প্রতীক সোনার তরীতে কেবল সোনার ফসলরূপ মহৎ–সৃষ্টিকর্মেরই ঠাঁই হয়। কিন্তু ব্যক্তিসত্তাকেঅনিবার্যভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর করাল গ্রাসের শিকার।

৬.

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
ব্যথা নাহি পায় কোন, তার দণ্ড দান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ড বেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে, সে কারেও দিও না।
যে তোমার পুত্র নহে, তারও পিতা আছে,
মহাঅপরাধী হবে তুমি তার কাছে।

সারমর্ম :

বিচারের সময় অপরাধীর প্রতি সহানুভুতিশীল হলে সে বিচার হয় আদর্শ বিচার। কারণ অপরাধ নিন্দনীয়, অপরাধীনয়। তাই একমাত্র সহানুভূতিশীল বিচারই পারে অপরাধীর মনের পরিবর্তন করাতে ও চরিত্রের সংশোধন ঘটাতে।

৭.

দৈন্য যদি আসে, আসুক, লজ্জা কিবা তাহে?
মাথা উঁচু রাখিস।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি না চাহে,
ধৈর্য ধরে থাকিস।
রুদ্র রূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস,
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে
ঊর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস।

সারমর্ম :

জীবনে দারিদ্র্যের মধ্যে কোনো লজ্জা নেই, বরং কারও মুখাপেক্ষী হওয়ার মধ্যেই লজ্জা। বিপদে ধৈর্য ধারণ করেদুঃখ-দারিদ্র্যকে সাহস ও মনোবল দিয়ে প্রতিহত করতে পারলে জীবনে সফল হওয়া যায়।

৮.

ণমি আমি প্রতিজনে, আদ্বিজ-চণ্ডাল,
প্রভু, ক্রীতদাস।
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু।
সমগ্রে প্রকাশ।
ণমি কৃষি–তন্তুজীবী, স্থপতি, তক্ষক,
কর্ম, চর্মকার!
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড–দৃষ্টি অগোচরে,
বহ অদ্রি–ভার!
কত রাজা, কত রাজ্য গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয়!
একত্বে বরেণ্য তুমি, শ্মরণ্য এককে–
আত্মার আত্মীয়।

সারমর্ম :

ছোট–বড় সকল শ্রেণির মানুষের অবদানেই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর এই সভ্যতা। সুতরাং সকলেই এখানে সম্মানপাওয়ার যোগ্য। তাই মানুষের মাঝে কোনো শ্রেণিভেদ না করে সকলের অবদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হবে।

৯.

নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো,
যুগ জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে,
নিন্দুক সে ছায়ার মত থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে, পবিত্রতা আনে,
সাধক জনে নিস্তারিতে তার মত কে জানে?
বিনামূল্যে ময়লা ধুয়ে করে পরিষ্কার,
বিশ্ব মাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর?
নিন্দুক সে বেঁচে থাকুক বিশ্ব-হিতের তরে
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে।

সারমর্ম :

নিন্দুকের সমালোচনার মাধ্যমে আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত হই। ব্যক্তি ও সমাজের পরোক্ষ কল্যাণ সাধনে নিন্দুকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১০.

বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করে পাই শস্য কণা।
দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস–
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কি তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে বসুমতী,
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে একেবারে ছাড়ে।

সারমর্ম :

শ্রমবিমুখ মানুষ এই পৃথিবীর সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়। শ্রম ও কর্মসাধনায় কোনো জিনিস লাভ করলে তাতেগৌরব ও আত্মতৃপ্তি দুই-ই পাওয়া যায়। পরিশ্রম ও সৃষ্টিশীলতা মানুষের মর্যাদা ও গৌরব বাড়ায়।

১১.

বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া,
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

সারমর্ম :

মানুষ বহু অর্থ ও সময় ব্যয় করে দূর-দূরান্তে সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যে যায়। কিন্তু ঘরের কাছের অপারসৌন্দর্যটুকু দেখা হয় না বলে সে দেখা পূর্ণতা পায় না।

১২.

বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিত্তে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে–
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

সারমর্ম :

বিপদে অটল থেকে তাকে জয় করার ক্ষমতা অর্জন করার জন্যই বিধাতার কাছে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত।নিজের ভার অন্যে লাঘব করলে নিজের কোনো কৃতিত্ব থাকে না। বিধাতার কাছে তাই আত্মশক্তিই আমাদের প্রার্থনা।

১৩.

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্তি–ধ্বজা ধরে,

আমরাও হব বরণীয়।
সময় সাগর তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে,
আমরাও হব যে অমর
সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে, অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
করো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার সমরাঙ্গন মাঝে,
সংকল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,
ব্রতী হয়ে নিজ নিজ কাজে।

সারমর্ম :

জ্ঞানী-গুণিজন আমাদের কাছে অনুসরণীয়। তাঁরা যে পথ অনুসরণ করে জীবনে বড় হয়েছেন আমাদেরও সেই পথঅনুসরণ করা উচিত। এ-সংক্ষিপ্ত জীবনে বৃথা সময় নষ্ট না করে তাদের মতো অবিরাম কাজে লেগে থাকলেই পৃথিবীতেঅমরকীর্তি রেখে যাওয়া সম্ভব।

১৪.

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,
এই সূর্যকরে, এই পুষ্পিত কাননে,
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়,
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

সারমর্ম :

এই পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য ছেড়ে কেউ যেতে চায় না। সুখ–দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও মিলন-বিরহ স্পন্দিত এইজগৎসংসারে নিত্য প্রবাহিত মানুষের জীবনলীলা। সেই লীলাবৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। তাই প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিরলীলা বৈচিত্র্যকে ভালোবেসে চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়।

১৫.

স্বাধীনতা স্পর্শমণি সবাই ভালবাসে,
সুখের আলো জ্বালে বুকে, দুঃখের ছায়া নাশে।
স্পর্শে তাহার নেচে উঠে শূন্য দেহে প্রাণ।
মনুষ্যত্বের বান ডেকে যায়, পশুর হৃদয়তলে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় ভীরু স্বাধীনতার বলে।
দর্পকরে পদানত উচ্চ করে শির,
শক্তিহীনেও স্বাধীনতা আখ্যাদানে বীর।

সারমর্ম :

মানুষের জীবনে স্বাধীনতা পরশ পাথরের মতো। তার ছোঁয়ায় দুঃখময় জীবনে আসে সুখ, মুমূর্ষু জাতির জীবনেজাগে প্রাণস্পন্দন। স্বাধীনতা মানুষের ভীরুতা দূর করে তাকে সাহসী করে তোলে।

১৬.

হউক সে মহাজ্ঞানী মহা ধনবান,
অসীম ক্ষমতা তার অতুল সম্মান,
হউক বিভব তার সম সিন্ধু জল,
হউক প্রতিভা তার অক্ষুণ্ন উজ্জ্বল,
হউক তাহার বাস রম্য হর্ম্য মাঝে,
থাকুক সে মণিময় মহামূল্য সাজে,
হউক তাহার রূপ চন্দ্রের উপম,
হউক বীরেন্দ্র সেই যেন সে রোস্তম,
শত দাস দাসী তার সেবুক চরণ,
করুক স্থাবকদল স্তব সংকীর্তন।
কিন্তু যে সাধেনি কভু জন্মভূমি হিত,
স্বজাতির সেবা যেবা করেনি কিঞ্চিৎ,
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্তর
অতীব ঘৃণিত সেই পাষণ্ড বর্বর।

সারমর্ম :

নিজের দেশের প্রতি যার ভালোবাসা নেই সে পশুর মত অধম। জ্ঞান, সম্মান, সম্পদের অধিকারী হয়ে,বিলাসবহুল জীবন যাপন করে, খ্যাতির শিখরে উঠলেও দেশপ্রেমহীন মানুষ পাষণ্ড ও বর্বর হিসেবেই ঘৃণিত হয়ে থাকে।

১৭.

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
"হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা।
তোমার আদেশে যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য জ্বলি উঠে খর-খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে, যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

সারমর্ম :

অন্যায় করা এবং অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া অর্থাৎ অন্যায়কারী ও অন্যায়সহ্যকারী দুজনই সমান অপরাধী এবং ঘৃণারপাত্র। সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজনবোধে উভয়ক্ষেত্রেই কঠোর হতে হবে।

১৮.

ছোট ছোট বালুকণা, বিন্দু, বিন্দু জল,
গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগল অতল।
মুহূর্তে নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ
গড়ে যুগ যুগান্তর-অনন্ত মহান।
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি, ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ পথে, ঘটায় প্রমাদ,

প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী,
এ ধরায় স্বর্গ সুখ নিত্য দেয় আনি।

সারমর্ম :

পৃথিবীর কোনো ক্ষুদ্র জিনিসকেই অবহেলা করা ঠিক নয়। কারণ ক্ষুদ্র থেকেই বৃহত্তের সৃষ্টি। বিন্দু বিন্দু জল মিলেযেমন সাগর হয়ে যায়, তদ্রুপ ছোট ছোট পাপ জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে।

সারাংশ রচনার নমুনা

১.

অতীতকে ভুলে যাও। অতীতের দুশ্চিন্তার ভার অতীতকেই নিতে হবে। অতীতের কথা ভেবে ভেবে অনেক বোকাই মরেছে। আগামী কালের বোঝা অতীতের বোঝার সঙ্গে মিলে আজকের বোঝা সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎকেও অতীতের মত দৃঢ়ভাবে দূরে সরিয়ে দাও। আজই তো ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎকাল বলে কিছু নেই; মানুষের মুক্তির দিন তো আজই। আজই ভবিষ্যতের কথা যে ভাবতে বসে সে ভোগে শক্তিহীনতায়, মানসিক দুশ্চিন্তায় ও স্নায়ুবিক দুর্বলতায়। অতএব, অতীতের ভবিষ্যতের দরজায় আগল লাগাও– আর শুরু কর দৈনিক জীবন নিয়ে বাঁচতে।

সারাংশ :

অতীতের ব্যর্থতার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কিংবা ভবিষ্যতের সাফল্যের আশায় বর্তমানকে নষ্ট করা উচিত নয়।বর্তমানকে গুরুত্ব দিতে হবে, কেননা আজকের সাধনাই সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দ্বার উন্মোচিত করবে।

২.

অভ্যাস ভয়ানক জিনিস– একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন। মানুষ হবার সাধনাতেও তোমাকে সহিষ্ণু হতে হবে। সত্যবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক কর সপ্তাহে অন্তত একদিন মিথ্যা বলবে না। ছ'মাস ধরে এমনি করে নিজে সত্য কথা বলতে অভ্যাস কর। তারপর এক শুভদিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা কর, সপ্তাহে তুমি দু'দিন মিথ্যা বলবে না। এক বছর পরে দেখবে সত্য কথা বলা তোমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে যখন ইচ্ছা করলেও মিথ্যা বলতে পারবে না। নিজেকে মানুষ করার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে তুমি হঠাৎ জয়ী হতে কখনও ইচ্ছা করো না তাহলে সব পণ্ড হবে।

সারাংশ :

মানুষ অভ্যাসের দাস। স্বভাব থেকে কোনো বদভ্যাস একদিনে দূর হয় না, বরং তার জন্য প্রয়োজন কঠোরসাধনা। ধীরে ধীরে সত্য বলার সাধনা করলেই মিথ্যা বলার অভ্যাসকে পরিহার করা সম্ভব।

৩.

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের উপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড বেগে শুধুই আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে, মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়তো একদিন লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই; এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়।

সারাংশ :

বর্তমান বিশ্বে মানুষের মনুষ্যত্বের চেয়ে অর্থের হিংসা বড় হয়ে উঠেছে। ফলে মানবসমাজ এক চরম অধোগতিরমুখে এসে ঠেকেছে। তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ এখনই খুঁজতে হবে।

৪.

কথায় কথায় মিথ্যাচার, বাক্যের মূল্যকে অশ্রদ্ধা করা– এসব সত্যনিষ্ঠ স্বাধীন জাতির লক্ষণ নয়। স্বাধীন হবার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক তাদের আবেদন- নিবেদন আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছাবে না, তাদের স্বাধীনতার দ্বার থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়া হবে। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যাচারী, সেখানে দু'একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হবে। কিন্তু মানবকল্যাণের জন্য, সত্যের জন্য যে বিড়ম্বনা ও নিগ্রহ তা সহ্য করতেই হবে।

সারাংশ :

সাধনালব্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্যে জাতিকে সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। সত্যনিষ্ঠ না হলে কেউ স্রষ্টারঅনুগ্রহ লাভ করতে পারে না। জাতির অধিকাংশ লোক মিথ্যাচারী হলে দু'একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মানবকল্যাণ ও সত্যেরজন্যে বহু বিড়ম্বনা ও নিগ্রহ সহ্য করতে হয়।

৫.

কোন সভ্য জাতিকে অসভ্য করার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে তাহলে তাদের সব বই ধ্বংস কর এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতেরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে, তারা বাঁচে না। দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে চেষ্টা করবে, সাহিত্যের সাহায্যেই তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এটাই প্রধান ও সম্পূর্ণ। জাতির ভেতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর, আর কিছুর আবশ্যকতা নেই।

সারাংশ :

কোনো সভ্য জাতির উন্নয়নের প্রধান মাপ হল, তাদের সাহিত্য অনুশীলন ও বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন। কারণবুদ্ধিজীবীগণই জাতির প্রাণ। জাতির কল্যাণের জন্য উন্নত সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি করতে হবে।

৬.

ছাত্রজীবন আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ বপনের সময়। এ সময় সে যেমন বীজ বপন করবে, ভবিষ্যৎ জীবনে সে সেরূপ ফল ভোগ করবে। এ সময় যদি আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানের অনুশীলন করে যাই তবে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় হবে। আর যদি হেলায় সময় কাটিয়ে দেই, তাহলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে শিক্ষা জীবন ও জীবিকার পথে কল্যাণকর, যে শিক্ষা মানুষকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে, তা-ই সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। ছাত্রদের জীবন গঠনে শিক্ষক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের সুষ্ঠু পরিচালনার মধ্য দিয়েই ছাত্রদের জীবন গঠিত হয় এবং উন্মুক্ত হয় মহত্তর সম্ভাবনার পথ।

সারাংশ :

জীবনের ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্যে ছাত্রজীবন সর্বোৎকৃষ্ট সময়। এ সময় বৃথায় নষ্ট করলে ভবিষ্যৎ ব্যর্থতায়পর্যবসিত হবে। জীবনধর্মী শিক্ষার মধ্যেই শিক্ষার সার্থকতা নিহিত। ছাত্রজীবনকে সম্ভাবনাময় করে তুলতে শিক্ষকেরসাহচর্য অপরিহার্য।

৭.

জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্যসম্ভার, দালান-কোঠার সংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা সামরিক শক্তির অপরাজেয়তায় বড় হয় না, বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় আর জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনো শক্ত আর দুর্মূল্য হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লেই তবে জাতি অর্জন করে মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা। সব রকম মূল্যবোধের বৃহত্তম বাহন ভাষা তথা মাতৃভাষা, আর তা ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব লেখক আর সাহিত্যিকদের।

সারাংশ :

জাতি বড় হয় মনের ঐশ্বর্যে, বাইরের শক্তিতে নয়। মনের এই ঐশ্বর্য গড়ে ওঠে জীবনাশ্রয়ী মূল্যবোধে–যার মূলেরয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীনতা ও নৈতিক চেতনা। জাতিসত্তার ভিত্তিকে দৃঢ় করতে হলে এই মূল্যবোধের প্রসারদরকার। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বত্র তা সঞ্চারিত করার দায়িত্ব লেখকদের।

৮.

জীবন বৃক্ষের শাখায় যে ফুল ফোটে, তা-ই মনুষ্যত্ব। বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালতে হবে এই ফুলের দিকে লক্ষ্য রেখে। শুধু শুধু মাটির রস টেনে গাছটা মোটাসোটা হয়ে উঠবে এই ভেবে কোন মালী গাছের গোড়ায় জল ঢালে না। সমাজ-ব্যবস্থাকেও ঠিক করতে হবে মানুষকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করে তুলবার জন্য নয়, মানুষের অন্তরে মূল্যবোধ তথা সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ সম্বন্ধে চেতনা জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে। যখন এই চেতনা মানুষের চিত্তে জাগে তখন এক আধ্যাত্মিক

সুষমায় তার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তারই প্রতিফলনে সমস্ত জগৎ আলোকময় হয়ে দেখা দেয়। ফলে মানুষ ইতর জীবনের গুরুভার থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত হালকা মনে করে।

সারাংশ :

মনুষ্যত্ব জীবন-বৃক্ষের ফুলের মতোই। মনুষ্যত্বের ভিত্তি হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধ, যার প্রকাশ ঘটে মানুষেরসৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দবোধে। মানুষের জীবনে মনুষ্যত্বের আলো জ্বলে উঠলে সে আলোয় বিশ্ব হয় আলোকিত আরমানবজীবন হয় সার্থক ও ভারমুক্ত।

৯.

নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষেরও সে ধর্ম। পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির উপর তাদের নিজেদের কোন হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির উপরে তার নিজের হাত রয়েছে। আর, এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না। সুখ-দুঃখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপক্কতা, তাই তো আত্মা।

সারাংশ :

বৃক্ষের সঙ্গে মানবজীবনের যে সাদৃশ্য, তা হল- বৃক্ষ ও মানুষ একইভাবে ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। আবার তরুলতা ওজীবজন্তুর সঙ্গেও মানুষের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধি শুধু দৈহিক, কিন্তু মানুষের বৃদ্ধি শুধু দৈহিকনয়, আত্মিকও। জীবনে সার্থকতা অর্জন করতে হলে নিজের সাধনায় আত্মাকে বিকশিত করতে হয়।

১০.

প্রকৃত জ্ঞানের স্পৃহা না থাকলে শিক্ষা ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়। তখন পরীক্ষা পাসটাই বড় হয়। এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। এ কারণেই পরীক্ষায় পাস করা লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে, কিন্তু অভাব আছে জ্ঞানীর। যেখানেই পরীক্ষা পাসের মোহ তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের উৎকণ্ঠিত রাখে, সেখানেই জ্ঞান নির্বাসিত জীবনযাপন করে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জগতের বুকে অক্ষয় আসন লাভ করতে হলে জ্ঞানের প্রতি তরুণ সমাজকে উন্মুখ করতে হবে। সহজ লাভ আপাতত সুখের হলেও পরিণামে কল্যাণ বহন করে না। পরীক্ষা পাসের মোহ থেকে মুক্ত না হলে তরুণসমাজের সামনে কখনই জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত হবে না।

সারাংশ :

শুধু পরীক্ষা পাসের জন্য নয়, বরং জ্ঞানার্জনের জন্য লেখাপড়া। সহজে পরীক্ষা পাসের মোহ থেকে ছাত্রছাত্রীকেমুক্ত করতে না পারলে প্রকৃত জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। স্বাধীন জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হলে তরুণ সমাজকে জ্ঞানার্জনেরপ্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। এ পথেই দেশ ও জাতির প্রকৃত কল্যাণ আসতে পারে।

১১.

বার্ধক্য তাহাই-যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়ে পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই-যাহারা মায়াচ্ছন্ন, নব-মানবের অভিনব জয়যাত্রা শুধু বোঝা নয়; বিঘ্ন নয়; শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না, যাহারা জীব হইয়াও জড়; যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণস্তুপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই-যাহারা নব-অরূণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোর-পিয়াসী প্রাণ চঞ্চল শিশুদের কল-কোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতিজ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার-বৃদ্ধ তাহারাই।

সারাংশ :

শুধু বয়সের মাপকাঠিতে যৌবন ও বার্ধক্যকে নির্ণয় করা যায় না। বস্তুত যাদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণাপশ্চাৎমুখী, যারা অন্ধ কুসংস্কারে বিশ্বাসী এবং নতুনত্বে বিশ্বাসী নয় তারাই বৃদ্ধ। তাদের বদ্ধমূল মানসিকতা জাতীয়অগ্রগতির অন্তরায়। তাদেরকে দিয়ে দেশের মঙ্গল চিন্তা করা যায় না।

১২.

বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন, মাটির রস টেনে দিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা, সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই।

সারাংশ :

গাছের কাছ থেকে জীবনের সার্থকতার শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। গাছ ক্রমাগত বেড়ে ফুল ও ফল দান করে সার্থকহয়ে ওঠে। মানুষও তেমনি নিজের সাধনা নিয়ে আত্মাকে বিকশিত কর তুলবে। তাতেই জীবনের সার্থকতা।

১৩.

বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক, তাহাই, কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোন মতে কাজ চলে মাত্র; কিন্তু মনের বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়ার দরকার। তেমনি একটি শিক্ষা পুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি অপাঠ্য পুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। ইহাতে আনন্দের সহিত পড়িতে পারিবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গ্রহণশক্তি, ধারণশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে ফল লাভ করে।

সারাংশ :

আনন্দহীন শিক্ষায় কাজ চলে মাত্র কিন্তু এই শিক্ষায় মানসিক বিকাশ ঘটে না। খাদ্য হজম করার জন্যে যেমন বায়ুসেবন প্রয়োজন, তেমনি পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানকে সহজে আয়ত্ত করার জন্যে আনন্দের প্রয়োজন। পাঠ্য-বহির্ভুত পুস্তক পাঠেযে আনন্দের সমাগম ঘটে এবং তাতে গ্রহণ, ধারণ ও চিন্তাশক্তি স্বাভাবিক নিয়মে বৃদ্ধি পায়।

১৪.

বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু চরিত্র তদপেক্ষাও মূল্যবান। অতএব, কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোন লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রহীন লোক যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। প্রবাদ আছে যে, কোনো কোনো বিষধর সর্পের মস্তিষ্কে মণি থাকে। মণি মহামূল্যবান পদার্থ বটে; কিন্তু তাই বলিয়া যেমন মণি লাভের নিমিত্তে বিষধর সর্পের সাহচর্য করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে, সেইরূপ বিদ্যা আদরণীয় হইলেও, বিদ্যালাভের নিমিত্তে বিদ্বান দুর্জনের নিকট গমন বিধেয় নহে। কেননা, দুর্জনের সাহচর্যে আপনার নিষ্কলুষ চরিত্রও কলুষিত হইতে পারে এবং এইরূপে মানব-জীবনের অমূল্য সম্পদ নষ্ট হইতে পারে।

সারাংশ :

বিদ্যা নিঃসন্দেহে মূল্যবান সম্পদ, কিন্তু চরিত্র তার চেয়েও বেশি মূল্যবান। তাই বিদ্বান লোক চরিত্রহীন হলে তারসাহচর্য পরিত্যাজ্য। কারণ, চরিত্রহীন লোকের সাহচর্যে ভালো মানুষের স্বভাবও নষ্ট হয়ে যায়।

১৫.

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব উপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা, শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীবসত্তার ঘরেও সে কাজ করে, ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলাই তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায় শিক্ষার যেমন প্রয়োজনীয় দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় দিকও আছে, আর অপ্রয়োজনীয় দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কি করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কি করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

সারাংশ :

অন্যান্য প্রাণি থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র্য এই যে, সে মনুষ্যত্ববোধে উদ্ভাসিত। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জেগে ওঠেতার অর্জিত শিক্ষার মধ্য দিয়ে। শিক্ষার কাজ হচ্ছে মানুষকে অন্তরের আলোকে আলোকিত করা এবং সৌন্দর্যের সন্ধানদেয়া, অর্থাৎ মনুষ্যত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করা।

১৬.

মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্রে, মনুষ্যত্বে, জ্ঞানে ও কর্মে। বস্তুত চরিত্র বলেই মানুষের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্যই হয়, মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করে সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত করার দরকার নেই। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরবের মূলে এই চরিত্র শক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, এই কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি শুধু লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর। তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয়। চরিত্রবান মানে এই।

সারাংশ :

চরিত্র মানবজীবনের মুকুট স্বরূপ। উন্নত ও ভাল চরিত্র ব্যতীত কোনো মানুষই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হতে পারেনা। জগতের সকল মহাপুরুষের গৌরবের মূলে রয়েছে, চরিত্রের মহিমাময় শক্তি। চরিত্রবান বলতে সত্যবাদী, বিনয়ী,ন্যায়নিষ্ঠ, জ্ঞানবান, পরদুঃখকাতর ও স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তিকেই বোঝায়।

১৭.

মানুষের জীবনে ভাষার স্থান যে কত বড়ো তা আমরা খুব কমই ভেবে থাকি। আমরা যেমন খাইদাই ওঠা বসা করি ও হেঁটে বেড়াই, তেমনি সমাজজীবন চালু রাখবার জন্যে কথা বলি, জানা-অজানা বিষয়ে নানা ভাবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিকতা বজায় রাখতে হলে তার প্রধান উপায় কথা বলা, মুখ খোলা, আওয়াজ করা। একে অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ যেমনই হোক না কেন– শত্রুতার কী ভালোবাসার, চেনা কী অচেনার, বন্ধুত্বের কিংবা মৌখিক আলাপ-পরিচয়ের, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করতে গেলেই মানুষ মাত্রকেই মুখ খুলতে হয়, কতগুলো আওয়াজ করতে হয়। সে আওয়াজ বা ধ্বনিগুলোর একমাত্র শর্ত হচ্ছে যে, সেগুলো অর্থবোধক হওয়া চাই। অর্থহীন ধ্বনিও অবশ্য মানুষ করতে পারে কিন্তু তাতে সমাজজীবন চলে না।

সারাংশ :

মানবজীবনে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিকতা বজায় রাখার মাধ্যম হল মানুষের মুখনিঃসৃত ধ্বনিসমষ্টি। তবেযেসব ধ্বনি দিয়ে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে সেগুলো অর্থবোধক হতে হবে। অর্থহীন ধ্বনি ভাষা নয়।

১৮.

যে–সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর, রং, ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকারে-প্রকারে, ভাবে-ভাষায়, সুরে-ছন্দে মিলিয়া তবেই বাঁচিতে পারে; তাহা মানুষের একান্ত আপনার; তাহা আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে; তাহা সৃষ্টি। সুতরাং তাহা একবার প্রকাশিত হইয়া উঠিলে তাহা রূপান্তর অবস্থান্তর করা চলে না, তাহার প্রত্যেক অংশের উপরে তাহার সমগ্রতা একান্তভাবে নির্ভর করে। যেখানে তাহার ব্যতায় দেখা যায়, সেখানে সাহিত্য-অংশে তাহা হেয়।

সারাংশ :

সাহিত্যের মূল উপাদান হচ্ছে জীবন ও জগৎ। সাহিত্যিকেরা সেই উপাদানকে আপন কল্পনার রঙে রাঙিয়ে যেনতুন ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেন তাই হচ্ছে সাহিত্য। লেখকের অপূর্ব শিল্পকৌশল ভাব ও রূপের সামগ্রিক মেলবন্ধন ঘটলেসাহিত্যকর্ম সার্থক হয়ে ওঠে। তা না হলে তা মহৎ সৃষ্টির মর্যাদা পায় না।

১৯.

রূপার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায় আর ক'টি লোক? শতকরা নিরানব্বইটি মানুষকেই চেষ্টা করতে হয়, জয় করে নিতে হয় তার ভাগ্যকে। বাঁচে সেই যে লড়াই করে প্রতিকুলতার সঙ্গে। পলাতকের স্থান জগতে নেই। সমস্ত কিছুর জন্যই চেষ্টা দরকার। চেষ্টা ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। সুখ চেষ্টারই ফল-দেবতার দান নয়। তা জয় করে নিতে হয়। আপনা আপনি এটা পাওয়া যায় না। সুখের জন্য দু'রকম চেষ্টা দরকার, বাইরের আর ভিতরের। ভিতরের চেষ্টার মধ্যে বৈরাগ্য একটি। বৈরাগ্যও চেষ্টার ফল, তা এমনিতেই পাওয়া যায় না। কিন্তু বাইরের চেষ্টার মধ্যে বৈরাগ্যের স্থান নাই।

সারাংশ :

পৃথিবীতে খুব স্বল্পসংখ্যক লোকই সৌভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। বাকি সকল ব্যক্তিকেই চরম প্রতিকুলতার সঙ্গেসংগ্রাম করে সৌভাগ্যকে অর্জন করতে হয়। জীবনে সাফল্যের জন্যে চেষ্টার কোনো বিকল্প নেই।

২০.

শ্রমকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ কর। কালি ধুলার মাঝে, রৌদ্রবৃষ্টিতে কাজের ডাকে নেমে যাও। বাবু হয়ে ছায়ায় পাখার তলে থাকবার কোন দরকার নেই। এ হচ্ছে মৃত্যুর আয়োজন। কাজের ভিতর কুবুদ্ধি, কুমতলব মানবচিত্তে বাসা বাঁধতে পারে না। কাজে শরীরে সামর্থ্য জন্মে, স্বাস্থ্য, শক্তি আনন্দ, স্ফূর্তি সকলই লাভ হয়। পরিশ্রমের পর যে অবকাশ লাভ হয় তা পরম আনন্দের অবকাশ। তখন কৃত্রিম আয়োজন করে আনন্দ করবার কোন প্রয়োজন হয় না। শুধু চিন্তার দ্বারা জগতের হিত সাধন হয় না। শুধু চিন্তা করে মানুষ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয় না। মানব সমাজে মানুষের সঙ্গে কাজে, রাস্তায়, কারখানায়, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষ নিজেকে পূর্ণ করে। চিন্তা ও পুস্তক মানব মনের পাঁপড়ি খুলে দেয় মাত্র, বাকি কাজ সাধিত হয় সংসারের কর্মক্ষেত্রে।

সারাংশ :

কর্মহীন মানুষ মৃতপ্রায়। কর্মসূত্রেই মানুষ সৌজন্য শেখে, লাভ করে কাজের ও অবকাশের আনন্দ, অবদান রাখেজগতের কল্যাণে। বস্তুত কাজের মাধ্যমেই মানুষ স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে ওঠে।

২১.

সকল প্রকার কায়িক শ্রম আমাদের দেশে অমর্যাদা বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে। শ্রম যে আত্মসম্মানে অণুমাত্রও হানিকর নহে এবং মানুষের শক্তি, সম্মান উন্নতির ইহাই প্রকৃষ্ট ভিত্তি, এই বোধ আমাদের মনে এখনও জাগে নাই। জগতের অন্যত্র মানব সমাজ সামর্থের উপর নির্ভর করিয়া সৌভাগ্যের সোপান উঠিতেছে। আর আমরা কায়িক শ্রমকে ঘৃণা করিয়া দিন দিন দুর্গতি ও হীনতায় ডুবিয়া যাইতেছি। যাহারা শ্রমবিমুখ বা পরিশ্রমে অসমর্থ, জীবন সংগ্রামে তাহাদের পরাজয় অনিবার্য। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে অযোগ্যের পবিত্রাণ নাই। যাহারা যোগ্যতম তাহারাই পায় বাঁচিবার অধিকার এবং অযোগ্যের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং পরিশ্রমে অমর্যাদা আত্মহত্যারই শামিল।

সারাংশ :

কায়িক শ্রম কখনোই অমর্যাদার নয়। বিশ্বে প্রত্যেকটি উন্নত দেশে শ্রমের মর্যাদা বিশেষভাবে স্বীকৃত কিন্তু আমরাশ্রমের যথাযোগ্য মর্যাদা না দেয়ায় ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে শ্রমের অমর্যাদাআত্মহত্যার শামিল।

২২.

সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুধিবা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ, স্থুল বুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়। অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃত বুদ্ধি অধিকারী। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার–এসবের নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানব প্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় আন্তরিকতাশূন্য, উপলব্ধিহীন বাণী।

সারাংশ :

সমাজের কাজ কেবল অস্তিত্ব রক্ষা করা নয়, বিকশিত ও অনুকুল পরিবেশও সৃষ্টি করা। কিন্তু স্বার্থপর অহংকারীরদল এক্ষেত্রে অন্তরায়। তারা কখনো কখনো মুখে মানব প্রেমের বাণী শুনালেও তা বিশুষ্ক, কৃত্রিম। সুন্দর ও সার্থক জীবনরচনায় তা কোনো কাজে আসে না।

২৩.

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচুত্য হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝম-ঝমানি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক-এইসব জিনিসে

সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না।

সারাংশ :

মনে আনন্দ দেয়া আর মনকে রাঙানো এক কথা নয়। এদের সম্পর্ক সাপে-নেউলে। সাহিত্যিকের কাজ পাঠককে আনন্দ দেয়া, তার মনকে রাঙানো নয়। যিনি উল্টোটা করতে চান তিনি হয়ত সস্তা শিল্পী হতে পারেন, কিন্তু মহৎ শিল্পী হতে পারেন না।

২৪.

স্বাধীন হবার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়-পরায়ণতার। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক, তাদের আবেদন-নিবেদনে ফল হয় না। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যাচারী, সেখানে দু'চারজন সত্যনিষ্ঠকে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়, দুর্ভোগ পোহাতে হবে। কিন্তু মানুষ ও জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে সে কষ্ট সহ্য না করে উপায় নেই।

সারাংশ :

অর্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে হবে। যে জাতিরঅধিকাংশ মানুষ মিথ্যাচারী সেখানে স্বল্পসংখ্যক ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্মঠ মানুষকে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতেহয়।

২৫.

সময় ও স্রোত কারও অপেক্ষায় বসে থাকে না। চিরকাল চলতে থাকে। সময়ের নিকট অনুনয় কর, একে ভয় দেখাও, ভ্রুক্ষেপও করবে না, সময় চলে যাবে আর ফিরবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সময় একবার গত হয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। গত সময়ের জন্য অনুশোচনা করা নিষ্ফল। যতই কাঁদ না কেন, গত সময় কখনও ফিরে আসবে না।

সারাংশ :

গত সময়ের জন্য অনুশোচনা নিষ্ফল। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু পৃথিবীর কোনো কিছুরবিনিময়ে গত সময় ফিরে পাওয়া যায় না।

২৬.

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণি। জগতের অন্যান্য প্রাণির সহিত মানুষের পার্থক্য- মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী। এই বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান নাই বলিয়া আর সকল প্রাণি মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ জগতের বুকে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করিয়াছে, জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে, পশুবল ও অর্থবল মানুষকে বড় বা মহৎ করিতে পারে না। মানুষ বড় হয় জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশে। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশে জাতির জীবন উন্নত হয়। প্রকৃত মানুষই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন আনয়নে সক্ষম।

সারাংশ :

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণি হিসেবে জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের গুণে মানুষ জগতে যে অমরকীর্তি গড়ে তুলেছে। পশুবল ও অর্থবল দিয়ে তাকখনও অর্জন করা সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. সারাংশ/সারমর্মে মূলের অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত উপমা–

ক. থাকবে　　　খ. থাকবে না

২. একই কথার পুনরাবৃত্তি–

ক. হবে　　　খ. হবে না

৩. সারাংশ মূলের চেয়ে–
ক. বড় হবে খ. ছোট হবে
৪. সারাংশের ভাষা মূল রচনার–
ক. অনুগামী হবে খ. হবে না
৫. বক্তব্যে একাধিক বিশেষণ–
ক. বাঞ্ছনীয় খ. বাঞ্ছনীয় নয়
৬. সাংকেতিক বা রূপক ভাষা থাকলে তার তত্ত্ব–
ক. উন্মোচিত করতে হবে খ. উন্মোচিত করতে হবে না
৭. শব্দ ও বাক্য প্রয়োগে সংযমী–
ক. হতে হবে খ. হবে না

উত্তরমালা : ক.

১. খ ২. খ ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. ক ৭. ক

খ. সারাংশ ও সারমর্ম লিখুন

১.

জীবনের কল্যাণের জন্য, মানুষের সুখের জন্য এ জগতে যিনি যত কথা বলিয়া থাকেন– তাহাই সাহিত্য। বাতাসের উপর চিন্তা ও কথা স্থায়ী হইতে পারে না, মানব জাতি তাই অক্ষর আবিষ্কার করিয়াছে। মানুষের মূল্যবান কথা, উৎকৃষ্ট চিন্তাগুলি কোনো যুগে পাথরে, কোনো যুগে গাছের পাতায় এবং বর্তমান কাগজে লিখিয়া রাখা হইয়া থাকে। যে নিতান্তই হতভাগা, সেই সাহিত্যকে অনাদর করিয়া থাকে। সাহিত্যে মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষার মীমাংসা হয়। তোমার আত্মা হইতে যেমন তুমি বিচ্ছিন্ন হইতে পার না, সাহিত্যকেও তুমি তেমনি অস্বীকার করিতে পার না– উহাতে তোমার মৃত্যু– তোমার দুঃখ ও অসম্মান হয়।

২.

কোন সভ্য জাতিকে অসভ্য করার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে তাহলে তাদের সব বই ধ্বংস কর এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে তারা বাঁচে না। দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে ইচ্ছা করলে সাহিত্যের সাহায্যে তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এটাই প্রধাণত সম্পূর্ণ। জাতির ভেতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর, আর কিছুরই আবশ্যকতা নেই।

৩.

প্রকৃত জ্ঞানের স্পৃহা না থাকলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। এ অবস্থায় পরীক্ষায় পাস করাটাই বড় হয় এবং পাঠ্যপুস্তক পর্যন্তই জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। আমাদের দেশে পরীক্ষায় পাস করা লোকের অভাব নেই, কিন্তু জ্ঞানী লোকের অভাব আছে। যেখানে পরীক্ষা পাসের মোহ তরুণ শিক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠিত রাখে, সেখানেই জ্ঞান নির্বাসিত। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জগতের বুকে অক্ষয় ও অমরত্ব লাভ করতে হলে জ্ঞানের প্রতি তরুণসমাজকে উন্মুখ করতে হবে। সহজ লাভ আপাতত সুখের হলেও পরিণামে কল্যাণ বয়ে আনে না। পরীক্ষা পাসের মোহ থেকে মুক্ত না হলে তরুণসমাজের সামনে কখনোই দিগন্ত উন্মোচিত হবে না।

৪.

ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষক কাজগুলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মূলেও রহিয়াছে ক্রোধ। ক্রোধ যে মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে, তাহা একবার ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানা সর্বদা হাসিমাখা, উদার ভাবে পরিপূর্ণ, দেখিলেই তোমার মনে আনন্দ

ধরে না, একবার ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকে তাকাও; দেখিবে, সে স্বপ্নের সুষমা আর নাই– নরকাগ্নিতে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত মুখ কি এক কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তখন তাহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটে যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করিতে অন্য কোন রিপু ক্রোধের ন্যায় কৃতকার্য হয় না।

৫.
জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্যসম্ভার, দালানকোঠার সংখ্যাবৃদ্ধি কিংবা সামরিক শক্তির অপরাজেয়তায় বড় হয় না, বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায়, আর জীবনে পণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সক্ষমতায়। জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনও শক্ত আর দুর্মূল্য হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লেই তবে জাতি অর্জন কর মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা। সব রকম মূল্যবোধের বৃহত্তম বাহন ভাষা, তথা মাতৃভাষা, আর তা ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব শুধু লেখক আর সাহিত্যিকদেরই নয় বরং সর্বস্তরের জনগণের।

৬.
মানুষের জীবনকে একটি দোতালা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব ওপরের তলা। জীবসত্তা ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীবসত্তার ঘরেও সে কাজ করে, ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলাই তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। অন্য কথায় শিক্ষায় যেমন প্রয়োজনীয় দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় দিক আছে, আর অপ্রয়োজনীয় দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

৭.
সময় ও স্রোত কারও অপেক্ষায় বসে থাকে না। চিরকাল চলতে থাকে। সময়ের নিকট অনুনয় করো, তাকে ভয় দেখাও, ভ্রুক্ষেপও করবে না, সময় চলে যাবে আর ফিরবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ঘন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু সময় একবার গত হয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। গত সময়ের জন্যে অনুশোচনা করা নিষ্ফল। যতই কাঁদ না কেন, গত সময় কখনও ফিরে আসবে না।

৮.
মাতৃস্নেহের তুলনা নাই, কিন্তু অতি স্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনায়ন করে। সে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃ হৃদয়ের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না, নিয়ত মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সম্মান সে পায় না। দুর্বল অসহায় পক্ষী শাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়।

৯.
জীবন বৃক্ষের শাখায় যে ফুল ফোটে তা-ই মনুষ্যত্ব। বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালতে হবে এর ফলের দিকে লক্ষ্য রেখে। শুধু শুধু মাটির রস টেনে গাছটা মোটাসোটা হয়ে উঠবে এই ভেবে কখনো কোনো মালি গাছের গোড়ায় জল ঢালে না। সমাজব্যবস্থাকেও ঠিক করতে হবে মানুষকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করে তুলবার জন্য নয়। মানুষের অন্তরের মূল্যবোধ, তথা সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ সম্পর্কে চেতনা জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে। যখন এই চেতনা মানুষের মনে জাগে তখন এক আধ্যাত্মিক সুষমায় তার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তারই প্রতিফলনে সমস্ত জগৎ আলোকময় হয়ে দেখা দেয়। ফলে মানুষ ইতর জীবনের মনোভাব থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে লঘু পক্ষ প্রজাপতির মতো হালকা মনে করে।

১০.
ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষক কাজগুলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মুলেও রহিয়াছে ক্রোধ। ক্রোধ যে মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে তাহা একবার ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানা সর্বদা হাসিমাখা, উদারতায় পরিপূর্ণ, দেখিলেই তোমার মনে আনন্দ ধরে না, একবার ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকে তাকাইও, দেখিবে, সে স্বর্গের সুষমা আর নাই– নরকাগ্নিতে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত মুখ কী এক কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তখন তাহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটে যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করিতে অন্য কোনো রিপু ক্রোধের ন্যায় কৃতকার্য হয় না।

১১.
বসুমতি কেন তুমি এতই কৃপণা?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করে পাই শস্য কণা।
দিতে যদি হয় দে মা প্রসন্ন সহাস;
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শষ্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি, কন বসুমতি–
আমার গৌরব তাতে সামান্যই বাড়ে
তোমার গৌরব তাতে একেবারে ছাড়ে।

১২.
ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে বুদ্ধ, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে, যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য বলি উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে, যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান,
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে
১৩.
জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন্ রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি' কত বোন দিল সেবা,

১৪.
গাহি তাহাদের গান–
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম–কিণাঙ্ক–কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি–তলে
ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।
বন্য–শ্বাপদ–সঙ্কুল জরা–মৃত্যু–ভীষণা ধরা
যাদের শাসনে হল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।
যারা বর্বর হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে
বনের ব্যঘ্র ময়ুর সিংহ বিবরের ফণী লয়ে।

১৫.
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোন কালে একা হয়নি ক’ জয়ী পুরুষের তরবারী,
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়া-লক্ষ্মী নারী।

১৬.
সবারে বাসির ভাল, করিব না আত্মপর ভেদ
সংসারে গড়িব এক নতুন সমাজ।
মানুষের সাথে কভু মানুষের রবে না বিচ্ছেদ–
সর্বত্র মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ।
দেশে দেশে যুগে যুগে কত যুদ্ধ কত না সংঘাত
মানুষে মানুষে হল কত হানাহানি।
এবার মোদের পুণ্যে সমুদিবে প্রেমের প্রভাত
সৌল্লাসে গাহিবে সবে সৌহার্দ্যের বাণী।

১৭.
বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র
নানাভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায় পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়
শিখছি সেসব কৌতূহলে সন্দেহ নাই মাত্র।

১৮.
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবণী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

১৯.
বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দু’পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।

২০.
বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিত্তে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।

ইউনিট ৮
পত্রলিখন

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- পত্রের প্রকাভেদ বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার পত্র লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

যোগাযোগের জন্য পত্রলিখনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশেষ করে, দূরবর্তী কারো সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এই পত্রলিখন দরকার। দৈনন্দিন জীবনে কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য পত্রলিখন তাই অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, পত্রলিখন– বিশেষত ব্যক্তিগত পত্র– ব্যক্তির ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিকে ধারণ করে বলে অনেক সময় এর একটি সাহিত্যমূল্যও তৈরি হয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলি।

পত্রের প্রকারভেদ
সাধারণভাবে চিঠিপত্র চার ধরনের–

১. ব্যক্তিগত পত্র
২. সামাজিক পত্র
৩. ব্যবহারিক বা বৈষয়িক পত্র
৪. বাণিজ্যিক বা ব্যবহারিক পত্র

একেক ধরনের চিঠির কাঠামো একেক প্রকার।

চিঠি লেখার কিছু সাধারণ নিয়ম–

১. চিঠির ভাষা হবে আকর্ষণীয়, প্রাঞ্জল ও সহজে বোধগম্য।
২. শুদ্ধ বানানে, সঠিক বাক্যে ও সুন্দর হস্তাক্ষরে চিঠি লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৩. চিঠি মূল বক্তব্যকে ঘিরে লিখিত হবে; বাহুল্য বা অতিরঞ্জন পরিত্যাজ্য।
৪. কাঠামো মেনে চিঠি রচনা করতে হবে এবং খামে প্রেরক ও প্রাপকের পূর্ণ ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৫. পত্রিকায় প্রকাশের চিঠির দুটো অংশ– একটি মূল চিঠি, অপরটি সম্পাদকের প্রতি ছাপানোর অনুরোধ।
৬. স্মারকলিপিতে সব সময় ‘আপনি’ সম্বোধন ব্যবহার করতে হয়।

১. ব্যক্তিগত পত্র :

সাধারণত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অথবা ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের তাগিদে মানুষ আপন পরিবার-পরিজন, বন্ধু-স্বজন বা পরিচিতজনের কাছে চিঠি লিখে থাকেন। এই ধরনের ব্যক্তিগত ভাবনা তাড়িত চিঠিই ব্যক্তিগত চিঠি হিসেবে চিহ্নিত।

প্রচলিত কাঠামোতে ব্যক্তিগত চিঠির পাঁচটি অংশ। সেগুলো হচ্ছে––

(১) ঠিকানা ও তারিখ
(২) সম্ভাষণ
(৩) মূলপত্র
(৪) বিদায় সম্ভাষণ
(৫) স্বাক্ষর

(১) ঠিকানা ও তারিখ : পত্রের বামদিকের ওপরের অংশে প্রথমে পত্রলেখকের পূর্ণ ঠিকানা ও তার নিচে তারিখ লিখতে হয়। যেমন :

৫০/১, নর্থ রোড
ঢাকা-১২০৫
১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ **অথবা,**
গ্রাম- ভুরবুড়িয়া
ডাক- পুটিয়া বাজার
জেলা- নরসিংদী
২৬ আগষ্ট, ২০১৬খ্রি.

(২) সম্ভাষণ : যাকে উদ্দেশ্য করে চিঠিটি লেখা হচ্ছে তার সম্মান, মর্যাদা ও পত্রলেখকের সঙ্গে তার সম্পর্কের নিরিখে সম্ভাষণসূচক শব্দ ব্যবহার করতে হয়। আর সম্ভাষণ লিখতে হয় পত্রের বামদিকে ঠিকানার পরের ধাপে। যেমন :

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু/শ্রদ্ধেয় আব্বা/প্রিয় সুলতান/স্নেহাস্পদ রাসেল/সুজনেষু ইত্যাদি।

(৩) মূলপত্র : এটিই চিঠির মূল অংশ। এ অংশে পত্রলেখক তার বক্তব্যকে সুন্দর করে গুছিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করবে। একই পত্রে একাধিক বক্তব্য থাকলে তা আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদে লিখতে হবে।

(৪) বিদায় সম্ভাষণ : মূলপত্রের পরের ধাপে পত্রের বামদিকে বিদায় সম্ভাষণ লিখতে হয়। পত্রপ্রাপকের সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখে বিদায় সম্ভাষণসূচক শব্দ ব্যবহার করতে হবে। যেমন :

ইতি, আপনার স্নেহাস্পদ/ স্নেহধন্য
ইতি, প্রীতিমুগ্ধ/ প্রিয় বান্ধব
ইতি, তোমার মঙ্গলপ্রার্থী
ইতি, বিনীত ইত্যাদি।

(৫) স্বাক্ষর : এটি চিঠির শেষ অংশ। এখানে পত্রলেখকের পুরো নাম বা প্রচলিত মুদ্রাকৃতি ব্যবহার করা যায়।

চিঠি প্রাপকের কাছে পৌঁছলেই এর সার্থকতা। প্রাপকের কাছে পৌঁছানোর জন্য খাম ব্যবহার করতে হয় এবং খামের ডানদিকে প্রাপকের ও বামদিকে প্রেরকের পূর্ণ ঠিকানা লিখতে হয়। নিম্নে একটি চিঠির পূর্ণ কাঠামো উপস্থাপিত হলো –

(১) তারিখ ও ঠিকানা
(২) সম্ভাষণ
(৩) মূলপত্র
(৪) বিদায় সম্ভাষণ
(৫) স্বাক্ষর

স্ট্যাম্প

প্রেরক,	প্রাপক,
নাম	নাম
ঠিকানা	ঠিকানা

ব্যক্তিগত পত্র

১. পিতার নিকট পুত্রের পত্র

০৩ জুলাই ২০১৭
ঢাকা
শ্রদ্ধেয় আব্বা,
আমার সালাম নিবেন। আম্মাকেও আমার সালাম জানাবেন।
কয়েকদিন যাবত আপনাদের কথা খুব মনে পড়ছিল। গতকাল আপনার চিঠি পেয়ে মনটা ভাল হয়ে গেল। চিঠিতে জানতে পারলাম আপনি আমার ষান্মাষিক পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে বেশ চিন্তিত আছেন। আপনি শুনে খুশি হবেন যে, আমি ষান্মাষিক পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে A+নম্বর পেয়ে পাশ করেছি। হোস্টেলে আমার বন্ধুরাও খুব ভাল ফল করেছে। আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি নিয়মিত পড়াশুনা করছি। আশা করি বার্ষিক পরীক্ষাতেও অনেক ভাল করব। আপনি ও আম্মা আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি ভাল আছি। আপনার শরীরের প্রতি যত্ন নিবেন।
টুম্পা মণিকে আমার আদর দিবেন।

ইতি
আপনার স্নেহের
সজীব

প্রেরক সজীব আইডিয়েল হাই স্কুল, ঢাকা।	প্রাপক, নাম : ফজলুল হক গ্রাম : হোসেনপুর পোস্ট : হোসেনপুর জেলা : কিশোরগঞ্জ	ডাক টিকেট

২. আপনার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানিয়ে আপনার বাবার নিকট নিকট একটি পত্র লিখুন।

২২ জুন ২০১৭
ঢাকা
শ্রদ্ধেয় বাবা,
আমার সালাম নেবেন। মাকেও আমার সালাম জানাবেন। ছোট ভাই দীপুর জন্য আমার আদর রইল।
গতকাল আপনার চিঠি পেয়েছি। চিঠিতে আপনি আমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানতে চেয়েছেন। আপনি তো জানেন আমি এস.এস.সি পরীক্ষায় গোল্ডেন A+পেয়ে পাস করার চেষ্টা করছি। তাই মেডিক্যাল কলেজে পড়ার আমার খুব ইচ্ছা। ভবিষ্যতে আমি একজন ভাল ডাক্তার হতে চাই। আমাদের দেশে কত গরিব লোক সু-চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে। তাই আমি ডাক্তার হয়ে গরীব দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই। আমি গ্রামের মানুষের সেবা করতে চাই। ডাক্তারী পেশার মাধ্যমে আমি আমার গ্রামের অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাব- এটাই আমার স্বপ্ন। আপনি ও মা আমার জন্য প্রাণভরে দোয়া করবেন। আশা করি আমি আমার স্বপ্ন সার্থক করতে পারব। আমার জন্য চিন্তা করবেন না। হোস্টেলে আমি নিয়মিত পড়াশুনা করছি।
দীপন আপুকে আমার সালাম দিবেন। আপনাদের কুশল সংবাদ জানিয়ে আমাকে চিঠি দিবেন। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন- এই কামনা করি।
ইতি
আপনার স্নেহের
শ্যামা

প্রেরক শ্যামা হোসেন ঢাকা।	প্রাপক, নাম : বেলাল হোসেন গ্রাম : চরগ্রাম পোস্ট : নগরবাড়ী জেলা : জামালপুর	ডাক টিকেট

৩. **আপনার দেখা একটি বিজ্ঞান মেলার বর্ণনা দিয়ে বন্ধু/বান্ধবীকে একটি পত্র লিখুন।**

২০ নভেম্বর ২০১৬
শ্যামপাড়া, কুষ্টিয়া

প্রিয় লিলি,
আমার শুভেচ্ছা নিও। অনেকদিন পর তোমার চিঠি পেয়ে মনটা আনন্দে ভরে ওঠল। কয়েকদিন যাবত অনেক ব্যস্ততার মাঝে দিন কাটাচ্ছি। আজ তিনদিন ধরে আমাদের স্কুলে বিজ্ঞান মেলা চলছে। মেলার সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বটা আমার উপরই ছিল। তাই বুঝতেই পারছ, এ নিয়ে আমাদের কত কর্মব্যস্ততা, কত আনন্দ-উল্লাস।
এ মেলাকে সুন্দর ও সার্থক করার জন্য আমাদের উপ-কমিটির সব সদস্য ও বিজ্ঞান শিক্ষকদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। আমাদের স্কুলের ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা এমন সব প্রজেক্ট দিয়ে স্টল সাজিয়েছিল যা দেখে তুমি সত্যি অবাক হয়ে যেতে। এসব ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের তৈরি 'চার্জ লাইট', 'সৌর বিদ্যুৎ', 'গ্রীনহাউজ ইফেক্ট', 'এয়ারকুলার' ইত্যাদি প্রজেক্ট দিয়ে তৈরি স্টলগুলো ছিল সবার আকর্ষণীয়। সারাদিন স্কুলের ছেলে-মেয়ে আর অভিভাবকদের সমাগমে বিজ্ঞান মেলায় ছিল এক উৎসব মুখর পরিবেশ। সমাপনী দিনে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ ম্যানেজিং কমিটির সকল সদস্য বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন। তাছাড়া বিভিন্ন ক্ষুদে বিজ্ঞানীদেরকে পুরস্কৃত করেন। সত্যিই বিজ্ঞান মেলা যে এত মনোরম হতে পারে তা ছিল আমার কল্পনাতীত। আমার জীবনের স্মৃতিতে এ তিনটি দিন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আজ আর নয়। তুমি ভাল থেকো। তোমার আব্বা-আম্মাকে আমার সালাম দিও এবং ছোট ভাই পিন্টুকে শুভেচ্ছা।

ইতি

তোমার বন্ধু

আকাশ নীলা

প্রেরক, লিলি শ্যামপাড়া,কুষ্টিয়া।	ডাক টিকেট প্রাপক, নাম : নীলা গ্রাম : রৌমারি ডাকঘর : রৌমারি জেলা : রংপুর

৪. একটি দুর্ঘটনা বা স্মরণীয় ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে পত্র লিখুন।

১০ আগস্ট ২০১৬
উত্তরা, ঢাকা।

প্রিয় মহসিন,
আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। আজ আমার মনটা ভাল নেই। চোখে ভাসছে শুধু যন্ত্রণাময় এক দুঃসহ স্মৃতি। আজ তোমকে আমার চোখে দেখা এক দুর্ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছি।
ঈদের ছুটিতে ট্রেনে আমি আব্বু-আম্মুসহ গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিলাম। তখন বেলা এগারটা, ট্রেন দ্রচতগতিতে ছুটে চলছিল। হঠাৎ এক যুবক মোবাইলে কথা বলতে বলতে রেললাইন পার হতে যাচ্ছিল। মুহূর্তেই সব শেষ। গাড়ীর নীচে যুবকটির মাথা কাটা গেল। একটু দূরে গিয়ে ট্রেনটি থামল। আমি নেমে এসে সব দেখলাম। যুবকটির মাথা ছিটকে পড়ে আছে। রক্তে চারপাশ লাল হয়ে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন এসে ভীড় জমাল। এমন বীভৎস দৃশ্য এর আগে আমি কখনও দেখিনি। ছেলেটির জন্য আমার অসম্ভব মায়া হতে লাগল। একটু সতর্ক হলে হয়তো তাকে জীবন দিতে হতো না। এই দুঃসহ স্মৃতি কিছুতেই আমার মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না। সামান্য ভুলে এরকম মর্মান্তিক মৃত্যু আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ দুর্ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও পেয়েছি মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে কখনও রাস্তা পারাপার হওয়া উচিত নয়। তুমিও কখনও এরকম ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করবে না।

আজ আর নয়। তুমি ভালো থেকো। তোমার আব্বা-আম্মাকে আমার সালাম দিও।

ইতি
তোমার বন্ধু
যাকের

প্রেরক,	প্রাপক,
নাম : যাকের	নাম : মসসিন
ঠিকানা : উত্তরা, ঢাকা	গ্রাম : বড়াই গ্রাম
	ডাকঘর : কড়ই গ্রাম
	জেলা : কুড়িগ্রাম

ডাক টিকেট

৫. বন্ধুর পিতৃবিয়োগে সান্ত্বনা দিয়ে পত্র লিখুন।

০২ মে ২০১৬
ঢাকা

প্রিয় শোভন,
প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। গতকাল তোমার চিঠি পেয়ে মনটা খুব খারাপ লাগছে। চিঠিতে তোমার বাবার হঠাৎ মৃত্যুর সংবাদ আমাকে বেশ মর্মাহত করেছে। দোয়া করি স্বজন হারানোর এ ব্যথা তুমি সইতে পার।
চিঠিতে জানতে পারলাম, ডেঙ্গুজ্বরে চাচা মারা গেছেন। তিনি যে এত অল্প সময়ে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন তা ভাবতে পারিনি। তিনি আমাকে কতো স্নেহ করতেন। তিনি আমাকে সবসময় অনেক উপদেশ দিতেন। তাঁর হাসিমাখা মুখখানা সর্বদাই আমার চোখে ভাসছে। আমার চোখের জল বাধা মানছে না। কিন্তু করার কিছুই নেই। কারণ সবাইকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাই আমাদের সকলকে এ বিপদের দিনে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। মনে রেখো, কারো বাবা চিরকাল বেঁচে থাকে না। এটাই বাস্তবতা, এটাই চরম সত্যি। তোমার উপর এখন অনেক দায়িত্ব- এ কথা মাথায় রেখে নিষ্ঠার সঙ্গে তুমি তোমার কর্তব্য পালন করবে। পড়াশুনায় আরো বেশি মনোযোগী হতে হবে, যাতে একদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পার। তাই তুমি সব দুঃখ-বেদনা অতিক্রম করে ধৈর্য ধারণ কর— এটাই আমার কামনা। তুমি ভাল থেকো।

তোমার মাকে আমার সালামও কনাকে স্নেহ জানিও। দোয়া করি, তোমার বাবার বিদেহী আত্মা যেন শান্তি পায়।

ইতি

তোমার বন্ধু

সোহেল

		ডাক টিকেট
প্রেরক, সোহেল হোসেন ৪২, বড় বাজার ঢাকা- ১২১০।	প্রাপক, নাম : শোভন চৌধুরী ২/৩ স্টেশন রোড খুলনা- ৩১৩২	

আবেদনপত্র বা দরখাস্ত

১.বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির জন্য ছুটি মঞ্জুর করতে আবেদনপত্র লিখুন।

১১ এপ্রিল ২০১৬
প্রধান শিক্ষক
উত্তরা মডেল হাইস্কুল, ঢাকা।

বিষয় :ছুটির জন্য আবেদন।

জনাব,
সবিনয়ে নিবেদন এই যে, আমি আপনার স্কুলের ৯ম শ্রেণির একজন নিয়মিত ছাত্র। আমি গত ২-৪-১৬ থেকে ৫-৪-১৬ তারিখ পর্যন্তঅসুস্থতার কারণে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারিনি।
অতএব, বিনীত প্রার্থনা এই যে, উক্ত কারণে উল্লেখিত দিনগুলো বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার জন্য ছুটি মঞ্জুর করতে আপনার সুআজ্ঞা হয়।

বিনীত
আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র
(আরেফিন শুভ)
নবম শ্রেণি, রোল- ৬, বিজ্ঞান শাখা
উত্তরা মডেল হাইস্কুল, ঢাকা।

২. বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদনপত্র লিখুন।

২২ মার্চ ২০১৬
প্রধান শিক্ষক
মডেল হাইস্কুল, খুলনা।

বিষয় : বিনা বেতনে পড়ার আবেদন।

জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি আপনার স্কুলের দশম শ্রেণির একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী। গত বার্ষিক পরীক্ষায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার বাবা একজন দরিদ্র কৃষক। আমাদের তিন ভাই-বোনের লেখাপড়া ও ভরণ-পোষণ আমার বাবার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। বাবার স্বল্প আয়ে আমাদের সংসার চলে না। তাই আমাকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ প্রদান করলে বিশেষভাবে উপকৃত হব।
অতএব, বিনীত প্রার্থনা, আমাকে বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আজ্ঞা হয়।

বিনীত

আপনার একান্ত অনুগত
(নার্গিস সুলতানা)
দশম শ্রেণি, শাখা- বিজ্ঞান, রোল নং- ১
মডেল হাইস্কুল, খুলনা।

৩. ‘প্রশংসাপত্র’ চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট দরখাস্ত।

১০ জুন ২০১৬
প্রধান শিক্ষক
মডেল হাইস্কুল, কুমিল্লা।

বিষয় : প্রশংসাপত্রের জন্য আবেদন।

জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি আপনার স্কুলের একজন নিয়মিত ছাত্র। ২০১৪ সালে কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় আমি জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি। স্কুলে গত পাঁচ বছর অধ্যয়ন কালে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আমি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলাম। কোনো আইনশৃঙ্খলা বিরোধী কাজের সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। বর্তমানে আমি ঢাকার স্বনামধন্য একটি সরকারী কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক। তাই আমার একটি প্রশংসাপত্র প্রয়োজন।
অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে চারিত্রিক ও শিক্ষা বিষয়ক প্রশংসাপত্র প্রদান করতে আপনার একান্ত মর্জি হয়।

বিনীত

আপনার একান্ত অনুগত
(আরমান সোহেল)
এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র
পরীক্ষার ক্রমিক নং : ১২১, রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২১৩১
বিজ্ঞান শাখা, মডেল হাইস্কুল, কুমিল্লা।

৪. আপনার বিদ্যালয়ে একটি ক্যান্টিন খোলা প্রয়োজন এ মর্মে প্রধান শিক্ষকের নিকট একখানা দরখাস্ত লিখুন।

২৫ এপ্রিল ২০১৬
প্রধান শিক্ষক
আইডিয়াল স্কুল, মতিঝিল, ঢাকা।

বিষয় : ক্যান্টিন স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিদ্যালয়ের অনাবাসিক শিক্ষার্থী। প্রতিদিন আমরা অনেক দূর-দূরান্ত থেকে স্কুলে আসি। নানা কারণে বাসা থেকে টিফিন আনা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। তাছাড়া স্কুলের টিফিন পিরিয়ডের স্বল্পতম সময়ে ক্যাম্পাসের বাইরে গিয়ে টিফিন কিনে আনা শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ অবস্থায় স্কুলের ভেতরে একটি ক্যান্টিন স্থাপন করা হলে শিক্ষার্থীদের এ সমস্যার নিরসন হতে পারে।
অতএব, মহোদয়ের কাছে প্রার্থনা যে, শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে স্কুল ক্যাম্পাসে একটি ক্যান্টিন স্থাপনের ব্যবস্থা করলে আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হব।

বিনীত

অনাবাসিক শিক্ষার্থীবৃন্দ
আইডিয়াল স্কুল, মতিঝিল, ঢাকা।

৫. শিক্ষা সফরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদনপত্র লিখুন।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
প্রধান শিক্ষক
উত্তরা হাইস্কুল
ঢাকা।

বিষয় : শিক্ষা সফরে যাওয়ার প্রয়োজনীয় অর্থ ও অনুমতির জন্য আবেদন।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা আপনার স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রী। আগামী মাসের শেষ সপ্তাহে আমরা কক্সবাজারে শিক্ষাসফরে যেতে আগ্রহী। প্রকৃতির কোলাহলমুক্ত পরিবেশে সমুদ্রের বিশালতাকে আমরা খুব কাছ থেকে দেখতে চাই। এ প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ অবলোকনের মাধ্যমে আমাদের মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যাবে। সাথে সাথে আমরা প্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করব। এজন্য আমাদের আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন, আমাদের শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বরাদ্দ করতে আপনার সুআজ্ঞা হয়।

বিনীত

বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির
শিক্ষার্থীবৃন্দ।

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্র

১. ডাকঘর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য পত্র রচনা করুন।

০২ এপ্রিল ২০১৬
সম্পাদক,
দৈনিক ইত্তেফাক
১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।

বিষয় : সংযুক্ত পত্র প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত *'দৈনিক ইত্তেফাক'* পত্রিকায় জনগুরুত্বপূর্ণ পত্রটি প্রকাশ করলে বিশেষভাবে বাধিত হব।
নিবেদক
হাকিম আসিফ
আগরপুর, কিশোরগঞ্জ।

ডাকঘর চাই

কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর থানার অন্তর্গত আগরপুর একটি ঘনবসিতপূর্ণ গ্রাম। এ গ্রামে প্রায় ১২ হাজার লোকের বসবাস। এ গ্রামের লোক চাকরি, ব্যবসা, লেখাপড়া প্রভৃতি কাজে ঢাকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত। ফলে প্রতিদিনই এ গ্রামে শত শত চিঠি, টেলিগ্রাম, মানি-অর্ডার আসছে এবং অনুরূপ সংখ্যক বাইরে যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে কোনো ডাকঘর নেই। ফলে গ্রামবাসীকে তিন মাইল দূরে সরারচর ডাকঘরে যেতে হয়। একটা ডাকঘরের অভাবে আগরপুর গ্রামের বিশাল জনগোষ্ঠী নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছে। তাই এ গ্রামে একটি ডাকঘর স্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

ডাক বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন, কিশোগঞ্জ জেলার আগরপুর গ্রামে একটা ডাকঘর স্থাপন করা হোক। এতে গ্রামের জনসাধারণ যেমন উপকৃত হবে তেমনি সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে।

নিবেদক
আগরপুর গ্রামবাসীর পক্ষে
হাকিম আসিফ
আগরপুর, কিশোরগঞ্জ।

২. দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে সংবাদপত্রে একটি চিঠি লিখুন।

০২ এপ্রিল ২০১৬
সম্পাদক,
দৈনিক জনকণ্ঠ
মতিঝিল, ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত *'দৈনিক জনকণ্ঠ'* পত্রিকায় নিম্নোক্ত পত্রটি প্রকাশের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।
বিনীত
আশফাক চৌধুরী
রামনগর, ভোলা।

রামনগরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের আবেদন

ভোলা জেলার রায়পুরা থানার অন্তর্গত রামনগর একটি জনবহুল গ্রাম। এখানে লোকসংখ্যা প্রায় দশ হাজার। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ গ্রামে কোন ডাক্তার নেই, কোন চিকিৎসালয়ও নেই। ডাক্তারেরকাছে যেতে হলে ২০/৩০ মাইল দূরে যেতে হয়। ফলে প্রতি বছর জন্ডিস, কলেরা, আমাশয়, জ্বর প্রভৃতি রোগে বহু মানুষ অকালে প্রাণ হারায়। বিনা চিকিৎসার কারণে এখানে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। তাই এই গ্রামে একটি সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

অতএব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট এলাকাবাসীর আকুল আবেদন এই যে, অনতিবিলম্বে এই গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে গ্রামের দুস্থ ও গরীব মানুষদের অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে
আশফাক চৌধুরী
রামনগর, ভোলা।

৩. আপনার এলাকার বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য সংবাদপত্রে একটি চিঠি লিখুন।

০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
সম্পাদক,
দৈনিক সংবাদ, ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত *'দৈনিক সংবাদ'* পত্রিকায় নিম্নোক্ত পত্রটি প্রকাশের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।
নিবেদক
আমান বাশার
বাজনাব, নরসিংদী।

বন্যার্তদের জন্য সাহায্য চাই

গত ১২ জুলাই থেকে নরসিংদী জেলার বেলাব থানার বাজনাব গ্রামে সর্বত্র বন্যার পানি থৈ থৈ করছে। চারিদিকে শুধু পানি আর পানি। ভয়াবহ বন্যায় এ গ্রামের জনজীবন বিপন্ন। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের জোয়ার এবং অবিরাম বর্ষণের ফলে সৃষ্ট বন্যা মানুষ এবং গবাদি পশুর জীবন কেড়ে নিচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ পানিবন্দী। মানুষ এবং গবাদিপশু একসাথে আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাস করছে। ফলে খাদ্য এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে দেখা দিয়েছে ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, যা মহামারী আকারে ছড়াচ্ছে। তাই অত্র এলাকায় অবিলম্বে খাদ্য, পানীয় জল ও চিকিৎসা দরকার।

অতএব, অত্র এলাকার বন্যাদুর্গত মানুষদের প্রাণ রক্ষার্থে অবিলম্বে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে
আমান বাশার
বাজনাব, নরসিংদী।

৪. আপনার এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবের কথা জানিয়ে সংবাদপত্র সম্পাদককে একটি চিঠি লিখুন।

১১ মার্চ ২০১৭
সম্পাদক,
দৈনিক ইনকিলাব
২/এ আর.কে. মিশন রোড
ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত *'দৈনিক ইনকিলাব'* পত্রিকায় এইসঙ্গে প্রেরিত পত্রটি প্রকাশ করলে কৃতার্থ হব।
নিবেদক
মতিন রহমান
হারিয়াকান্দা, কিশোরগঞ্জ।

হারিয়াকান্দা গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল চাই

কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর থানার অন্তর্গত হারিয়াকান্দা একটি জনবহুল গ্রাম। এ গ্রামে প্রায় আট হাজার লোকের বসবাস। গ্রামটি যোগাযোগের দিক থেকে বেশ পিছিয়ে। এ গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের তীব্র অভাব। এখানে পুকুরের সংখ্যা খুবই কম। যেগুলো আছে, খরা মৌসুমে সেগুলো শুকিয়েও যায়। গ্রামে টিউবওয়েলের সংখ্যাও খুব কম। ফলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে প্রতি বছর বহু লোকের মৃত্যু হয়। আর ডায়রিয়া, জন্ডিস, টাইফয়েড– এ রোগগুলো এ গ্রামের মানুষের নিত্যসঙ্গী। তাই গ্রামবাসীকে অকাল মৃত্যু ও মহামারী রোগের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অবিলম্বে এলাকায় গভীর নলকূপ বসানো দরকার।

অতএব, অনতিবিলম্বে আমাদের গ্রামে কমপক্ষে ছয়টি গভীর নলকূপ বসিয়ে এই অকাল মৃত্যু রোধের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

নিবেদক

এলাকাবাসীর পক্ষে
মতিন রহমান
হারিয়াকান্দা, কিশোরগঞ্জ।

৫. আপনার গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সংবাদপত্রে একটি চিঠি লিখুন।

১৬ এপ্রিল ২০১৭
সম্পাদক,
দৈনিক সমকাল
১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা।

বিষয় : সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশের জন্য আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত *'দৈনিক সমকাল'* পত্রিকায় নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করলে বিশেষভাবে বাধিত হব।
নিবেদক
মাসুদ চৌধুরী
রামদী, কিশোরগঞ্জ।

প্রাথমিক বিদ্যালয় চাই

কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর থানার অন্তর্গত রামদী একটি জনবহুল গ্রাম। এ গ্রামে প্রায় ১২ হাজার লোকের বসবাস। স্কুলগামী ছেলেমেয়ের সংখ্যাও কয়েক হাজার। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। শিশু-কিশোরদেরকে স্কুলে যেতে হলে প্রায় ৪ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয়। ছোট ছোট শিশুদের পক্ষে এতদূর পথ আসা-যাওয়া করে লেখাপড়া করা মোটেই সম্ভব নয়। তাই উক্ত গ্রামে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা অতি আবশ্যক।

অতএব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, খুব শীঘ্রই এই গ্রামে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পথ সুগম করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে
মাসুদ চৌধুরী
রামদী, কিশোরগঞ্জ।

মানপত্র ও স্মারকলিপি

১. আপনার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে বিদায় অভিনন্দনপত্র লিখুন।

তারিখ : ১১.০৪.২০১৭

উত্তরা হাইস্কুলের মাননীয় প্রধান শিক্ষক
শ্রদ্ধেয় অমিত হাসান সাহেবের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে
শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে মহান শিক্ষাগুরু,

আমাদের সশ্রদ্ধ চিত্তের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমাদের মন-প্রাণ আজ ব্যথিত। অতীতের এক আলোকময় দিনে একনিষ্ঠ কর্মস্পৃহা নিয়ে আপনি এই স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন। সুদীর্ঘকাল আপনার ভালবাসা, কর্মনিষ্ঠা, আন্তরিকতা ছিল আমাদের চলার পথের পাথেয়। আর অসংখ্য শিক্ষার্থীর জীবনকে আপনি করেছেন আলোকিত। তাই আজ আপনার বিদায়লগ্নে শুধুই মনে পড়ছে বিদায়ের বাণী–

"যেতে নাহি দিব হায়/তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।"

হে কর্মবীর,

আপনার কাজ থেকে আমরা কোনদিন কোন কিছুর অভাববোধ করিনি। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে আপনি ছিলেন আদর্শ ও ন্যায়ের প্রতীক। উত্তরা হাইস্কুলের উত্তরোত্তর সুনাম বৃদ্ধিতে আপনি রেখেছেন অনন্য অবদান। স্কুলের সার্বিক পরিচালনায়, শিক্ষাদান, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে আপনি ছিলেন আমাদের অভিভাবক। একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে আপনাকে আমরা কোনদিন ভুলব না।

হে বিদায়ী সাধক,

পেয়ে হারানোর ব্যথায় আজ আমরা ভারাক্রান্ত। তাই আপনাকে বিদায় দিতে কান্নায় আমাদের হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে। আপনাকে ঘিরে অনেক সুখের স্মৃতি বার বার স্মৃতিপটে ভাসছে। বিদায়লগ্নে আমাদের প্রার্থনা, আপনি আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। জীবনের নিয়মে আপনি এই স্কুল থেকে অবসর নিলেও আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় থাকবেন চিরদিন অম্লান।

প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘায়ু হোন। আপনার অনাগত দিনগুলো সুস্থ, সুন্দরভাবে কাটুক, এ আমাদের আন্তরিক কামনা।

আপনার স্নেহধন্য

ছাত্রবৃন্দ
উত্তরা হাইস্কুল, ঢাকা।

২. নতুন প্রধান শিক্ষকের আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা জানিয়ে মানপত্র।

০৮ মার্চ ২০১৭
কিশোরগঞ্জ

কুলিয়ারচর মডেল হাইস্কুলের নবাগত প্রধান শিক্ষক
জনাব আকবর হোসেনের যোগদান উপলক্ষে
শ্রদ্ধা-অভিনন্দন।

হে নবাগত শিক্ষাগুরু,
আপনার আগমনে কুলিয়ারচর মডেল হাইস্কুলটি আজ আনন্দে উদ্বেলিত। আপনার মত একজন সুদক্ষ ও প্রজ্ঞাবান শিক্ষকের পদার্পণে আমরা ধন্য, গৌরবান্বিত। আর আপনার হাতের ছোঁয়ায় আমাদের জীবন হবে আলোকিত। আপনি আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

হে জ্ঞানতাপস,
আপনার কর্মনিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ভালবাসা আমাদের অন্তরে জ্বালাবে জ্ঞানের আলো। সেই আলোয় আলোকিত হয়ে আমরা দেশকে গড়ব। এই স্কুলের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে আপনার মতো একজন যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বের প্রয়োজন। আমাদের কামনা, আপনার অভিভাবকত্ব এই স্কুলটিকে নিয়ে যাবে গৌরব ও খ্যাতির শীর্ষে।

হে মহান বীর,
আমাদের বিশ্বাস, আপনার যোগ্য নেতৃত্ব হবে আমাদের চলার পথের পাথেয়। শিক্ষাঙ্গন হবে আরো প্রাণবন্ত। আপনার স্নেহচ্ছায়া জ্ঞানের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হব আমরা। নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে অবিচল থেকে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এ আমাদের প্রত্যাশা। এ প্রত্যাশা নিয়েই আমরা আজ আপনাকে বরণ করে নিচ্ছি।

প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘায়ু হোন। আপনার চলার পথ হোক কুসুম-কোমল।

আপনার গুণমুগ্ধ

ছাত্রবৃন্দ
কুলিয়ারচর মডেল হাইস্কুল
কিশোরগঞ্জ।

৩. খ্যাতিমান কবি বা সাহিত্যিকের আগমন উপলক্ষে অভিনন্দনপত্র রচনা করুন।

১০ জুন ২০১৭

নারায়ণগঞ্জ।

সোনারগাঁ মডেল স্কুলে নন্দিত কথাসাহিত্যিক
মুহাম্মদ জাফর ইকবালের আগমনে
হৃদয়োষ্ণ শ্রদ্ধার্ঘ্য

হে মহান অতিথি,
প্রাকৃতিক শোভা, প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন, বাংলার বারভূঁইয়ার অন্যতম বীর ঈশা খাঁর স্মৃতি বিজড়িত সোনারগাঁ আজ আপনার পদধূলিতে ধন্য। ঐতিহ্যবাহী এই অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনার আগমনে আমরা আনন্দিত, উচ্ছ্বসিত। আপনি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

হে বরেণ্য কথাশিল্পী,
কথাসাহিত্যিক হিসেবে আপনার জনপ্রিয়তা আকাশস্পর্শী। সায়েন্স ফিকশন ও কিশোরজীবন রূপায়ণে আপনার লেখনীর শৈল্পিক পাণ্ডিত্য আমাদেরকে কল্পনার জগতে নিয়ে যায়। আপনার লেখা আমাদেরকে বই পড়ার আনন্দ দেয়। তাই আজ আমরা আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে অভিভূত ও গর্বিত।

হে মহান শিক্ষাবিদ,
আপনার মত এই স্কুলে একজন মহান শিক্ষাগুরুর আগমন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমান প্রজন্মকে আলোকিত মানুষ, সৃজনশীল লেখার পাশাপাশি কম্পিউটার, গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষায় আপনার অবদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আপনি দীর্ঘজীবী হোন। আপনার বলিষ্ঠ লেখনী বর্তমান প্রজন্মকে সত্যানুসন্ধানের পথ দেখাবে, আপনার সাহিত্যকর্ম আমাদের জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করবে- এই আমাদের একান্ত কামনা।

আপনার গুণমুগ্ধ

ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
সোনারগাঁ মডেল স্কুল
নারায়ণগঞ্জ।

৪. একজন মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে অভিনন্দনপত্র রচনা করুন।

০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

নারায়ণগঞ্জ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী
জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ-এর আগমন উপলক্ষে
মোহনগঞ্জ হাইস্কুলের পক্ষ থেকে
প্রাণঢালা অভিনন্দন

হে জন দরদি,

আপনার শুভাগমনে মোহনগঞ্জ হাইস্কুলটি আজ আনন্দে উদ্বেলিত। আমাদের মাঝে আপনার মত গুণীজনকে পেয়ে আমরা ধন্য ও আনন্দিত। আপনি আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

হে শিক্ষা বন্ধু,

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় আপনার অবদান অনস্বীকার্য। আপনার নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় শিক্ষাব্যবস্থায় এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান পদ্ধতির ব্যবহার ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সারাবিশ্ব আজ আপনার কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

হে দেশপ্রেমিক,

নানা সমস্যায় জর্জরিত আমাদের এ স্কুলটি। তাই আপনার কাছে আমাদের চাওয়া অনেক। আলোকিত সমাজ তথা শিক্ষাব্যবস্থায় আপনার উন্নয়নের কথা শুনে আমরা আশাবাদী হয়ে আছি। তাই অত্র স্কুলের কিছু সমস্যার সমাধানকল্পে আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

* **বিজ্ঞানাগারের অভাব–** একটি মানসম্মত বিজ্ঞানাগার চাই। তাতে বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠুভাবে তাদের বিজ্ঞান ক্লাশ করতে পারে।
* **স্কুল লাইব্রেরির অভাব–**কোনো লাইব্রেরি না থাকায় এ স্কুলের অধ্যয়নরত তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই একটি লাইব্রেরি স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।
* **প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও সাহিত্য–** সাংস্কৃতিক চর্চার সরঞ্জামাদির অভাব রয়েছে। তাই উক্ত সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা কামনা করছি।
* **বৈদ্যুতিক পাখা–** প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের প্রত্যাশা, উল্লেখিত সমস্যাগুলো বিশেষভাবে বিবেচনা করে অবিলম্বে সমস্যাসমূহের সমাধান করে মোহনগঞ্জ হাইস্কুলের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। আপনি দীর্ঘজীবী হোন। আলোকিত সমাজ নির্মাণে আপনার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

আপনার গুণমুগ্ধ
ছাত্রবৃন্দ
মোহনগঞ্জ হাই স্কুল
নারায়ণগঞ্জ।

আমন্ত্রণ বা নিমন্ত্রণপত্র

১. বিজয় উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র লিখুন।

সুধী

আগামী ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৬, মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমাদের স্কুলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এলাকার বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা বীরউত্তম বদরুল আলম। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।

অনুষ্ঠানে আপনি আমন্ত্রিত।

তারিখ : ১০ই ডিসেম্বর ২০১৬
কুলিয়ারচর।

বিনীত
কুলিয়ারচর পাইলট স্কুলের
শিক্ষার্থীদের পক্ষে
কবির হোসেন
কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ।

অনুষ্ঠান সূচি

সকাল ৮.৩০ মি.	:	র‌্যালি
সকাল ৯.০০টা	:	সম্মানিত অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ
সকাল ৯.৩০ মি.	:	আলোচনা সভা
সকাল ১১.০০টা	:	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
সকাল ১২.৩০ মি.	:	সমাপ্তি।

২. রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র লিখুন।

সুধী

আগামী ২৫শে বৈশাখ ১৪২৩, ৭ই মে ২০১৬, শনিবার, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী পালিত হবে। এ উপলক্ষে ঐদিন সকাল দশটায় উত্তরা মডেল হাইস্কুল মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে আপনি আমন্ত্রিত।

তারিখ : ২২ শে মে ২০১৬
উত্তরা, ঢাকা

বিনীত
উত্তরা মডেল হাইস্কুলের
ছাত্রদের পক্ষে
হাসান রেজা
সাংস্কৃতিক সম্পাদক।

অনুষ্ঠান সূচি

সকাল ১০.০০টা	:	অতিথিদের আসন গ্রহণ
সকাল ১০.১০ মি.	:	আলোচনা সভা
সকাল ১১.০০টা	:	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
সকাল ১২.৩০ মি.	:	সমাপ্তি।

৩. বার্ষিক মিলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র লিখুন।

সুধী
শুভেচ্ছা নিবেন।
আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী ২০১৬, শনিবার সকাল ৮.০০টায় কিশোরগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে স্কুলের বার্ষিক মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান।

অনুষ্ঠানে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

তারিখ : ৩০ জানুয়ারি ২০১৬
কিশোরগঞ্জ

বিনীত
কিশোরগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের
শিক্ষার্থীবৃন্দ

অনুষ্ঠান সূচি

সকাল	৮.০০টা	:	অতিথিদের আসন গ্রহণ
সকাল	৮.১৫ মি.	:	পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ
সকাল	৮.৩০ মি.	:	বিশেষ অতিথির বক্তব্য
সকাল	৮.৪০ মি.	:	হামদ্ ও নাত
সকাল	৯.৩০ মি.	:	মিষ্টি বিতরণ
সকাল	১০.৩০ মি.	:	সমাপ্তি।

৪. নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র লিখুন।

২০শে মে ২০১৭
কিশোরগঞ্জ

সুধী
আগামী ২৫শে মে ২০১৭, ১১ই জ্যেষ্ঠ ১৪২৩, শনিবার, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট নজরুল গবেষক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। এ উপলক্ষে ঐদিন সকাল দশটায় আগরপুর হাইস্কুল মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

বিনীত
আগরপুর হাইস্কুলের
শিক্ষার্থীদের পক্ষে
তৌহিদ রহমান
সাংস্কৃতিক সম্পাদক।

অনুষ্ঠান সূচি

সকাল	৯:৩০ মি.	:	অতিথিদের আসন গ্রহণ
সকাল	৯:৪০ মি.	:	আলোচনা সভা আলোচক : অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম
সকাল	১০:৪০ মি.	:	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
সকাল	১২:৩০ মি.	:	সমাপ্তি।

বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক পত্র

১. ভি.পি.পি করে বই পাঠানোর জন্য পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট পত্র করুন।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
কর্মাধ্যক্ষ
তাম্রলিপি,
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা।

জনাব,

সালাম রইল। নিম্নলিখিত বইগুলো অতিসত্বর নিম্ন ঠিকানায় ভি.পি.পি যোগে পাঠালে বিশেষভাবে উপকৃত হব। বই প্রাপ্তির সঙ্গেসঙ্গে মূল্য প্রেরণের নিশ্চয়তা রইল। অনুগ্রহ করে শীঘ্রই বইগুলো পাঠানোর জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার বিশ্বস্ত
আপেল মাহমুদ
নবম শ্রেণি (বিজ্ঞান)
রোল-১
উত্তরা মডেল হাইস্কুল
ঢাকা।

বইয়ের তালিকা :

১. বাংলাপিডিয়া (১০ খণ্ড) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।
২. ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৩. বেসিক আলী (৭ খণ্ড), পাঞ্জেরী পাবলিকেশনস লি. ঢাকা।

	ডাক টিকেট
প্রেরক আপেল মাহমুদ উত্তরা মডেল হাই স্কুল ঢাকা	প্রাপক, কর্মাধ্যক্ষ তাম্রলিপি, ৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা।

২. মালামাল রপ্তানির জন্য অন্য কোনো দেশের কোম্পানির সাথে যোগাযোগ স্থাপনের পত্র।

৪ এপ্রিল ২০১৭

কর্মাধ্যক্ষ
সোনার বাংলা
পশ্চিম বঙ্গ
কলকাতা

জনাব,
শুভেচ্ছা রইল। আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, 'তাম্রলিপি' প্রকাশনী, ৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ থেকে বাংলাভাষায় প্রকাশিত গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, বিজ্ঞান, ইতিহাস আপনার কোম্পানির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসাভিত্তিক প্রসারে আগ্রহী।

আপনার অনুমতি পেলে আমি গ্রন্থতালিকা ও নিয়মাবলি পাঠাব। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানিয়ে দ্রূত চিঠি লিখার অনুরোধ করছি।

শুভেচ্ছাসহ
প্রধান ব্যবস্থাপক
তাম্রলিপি প্রকাশনী
৩৮/২ক, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

	ডাক টিকেট
প্রেরক প্রধান ব্যবস্থাপক তাম্রলিপি প্রকাশনী বাংলাবাজার, ঢাকা	প্রাপক, সোনার বাংলা পশ্চিম বঙ্গ কলকাতা

ইউনিট ৯

অনুবাদ

উদ্দেশ্য

এ ইউনিটটি পড়ে আপনি–

- অনুবাদ কী তা লিখতে পারবেন।
- অনুবাদের প্রকারভেদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করার পদ্ধতি বুঝতে পারবেন।
- কোন ভাষায় অনুবাদ করলে অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল ও মাধুর্যপূর্ণ হবে তার কৌশল জানতে পারবেন।

কোনো রচনা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করাকে অনুবাদ বলে। বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য বিনিময়ের প্রধান উপায় হচ্ছে অনুবাদ। বিদেশি বিভিন্ন ভাষা হতে বাংলায় অনুবাদ করা যায় এবং বাংলা থেকেও অন্য ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব। তাই এক কথায় অনুবাদ হল ভাষান্তর। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর সব ক্ষেত্রে সহজ নয়। কোনো বিষয়কে রূপান্তরিত করতে হলে উভয় ভাষার গঠন কৌশল, রীতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব গঠনভঙ্গি, প্রকাশরীতি ও বৈশিষ্ট্য আছে। অনুবাদে সে বৈশিষ্ট্যের যথাযথ প্রতিফলন দরকার। মোট কথা, অনুবাদে মূল সুরটি কিছুতেই বিকৃত করা যাবে না। অনুবাদ হল এক ধরনের শিল্প। অনুবাদ কর্মে যদি ভাষায় দক্ষতা আর মূলের রূপ, রস, স্বাদ ও সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন থাকে তবে অনায়াসে তা শিল্পকে ছুঁয়ে যেতে পারে। বিশ্বের প্রায় সব তথ্য ও জ্ঞান ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাওয়া যায়। তাই ইংরেজি ভাষা থেকে অনুবাদের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। সাহিত্য ও জ্ঞানের বইপত্র, পত্রিকা ইত্যাদি পাঠের অভ্যাসে এ ধরনের দক্ষতা গড়ে উঠে।

অনুবাদ মূলত দুই প্রকার :

১. আক্ষরিক অনুবাদ

২. ভাবানুবাদ

মূল ভাষার প্রতিটি শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার করে যে অনুবাদ করা হয় তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলে। মূল ভাষার ভাব ঠিক রেখে সুবিধামত নিজের ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করাকে ভাবানুবাদ বলে। এ ক্ষেত্রে মূল রচনার প্রতিটি শব্দের অনুবাদ করা হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়–'Cut your coat according to your cloth'. বাক্যটি যদি 'কাপড় অনুযায়ী তোমার কোট কাট' হয় তাহলে এটি হবে আক্ষরিক অনুবাদ। আর যদি বলা হয় 'আয় বুঝে ব্যয় কর' তাহলে তা হবে ভাবানুবাদ।

আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদের কোনো সঠিক নিয়ম নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে অনুবাদ আক্ষরিক কিংবা ভাবানুবাদ হয় এটা নির্ভর করে অনুবাদের বিষয়ের ওপর। মোট কথা যে, পদ্ধতিতে অনুবাদ করলে ভাষা মূলের কাছাকাছি, সহজ- সরল আর প্রাঞ্জল হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে অনুবাদ করা বাঞ্ছনীয়।

অনুবাদের লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. অনুবাদের অংশটি বার বার পড়ে ভেতরের ভাবটুকু ভালভাবে বুঝে নিতে হবে।
২. মূল বাক্যে যে ক্রিয়া ও বাচ্য থাকে অনুবাদেও সেই বাচ্য ও ক্রিয়াপদ নির্দেশ করতে হবে।
৩. কঠিন ভাষা এড়িয়ে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করা উচিত।
৪. ভাষার সৌন্দর্য রক্ষার জন্যে মূলের বড় বাক্যকে ভেঙে ছোট ছোট করে অনুবাদ করা উচিত।
৫. পরিভাষা দুর্বোধ্য হলে মূল শব্দটি ব্যবহার করা চলে।
৬. মূল অংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি অনুবাদের ক্ষেত্রেও একইভাবে রূপান্তরিত হবে।

৭. মূল রচনার ভাষা রীতি অনুবাদেও প্রতিফলিত হওয়া দরকার।

৮. ইংরেজি নামগুলো ইংরেজি নামরূপেই অনুবাদ করতে হবে।

৯. অনুবাদ কালে কোনো বাক্যের ব্যাখ্যা অপ্রয়োজনীয়। ভাষার চেয়ে ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখা জরুরি।

১০. অনুবাদ এক ধরনের শিল্প। এর ভাব ও ভাষায় সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

অনুবাদের দৃষ্টান্ত

১. Nizam-ul-Mulk was very fond of reading. He owned a great number of books and from these books he continuaslly increased his knowledge of the world. He said to himself, if the young peoples of my country learned to read, they would learn how to live a good life. This would bring happiness to them and to their friends.

অনুবাদ : নিযাম-উল-মূলক পড়াশোনা খুব পছন্দ করতেন। তাঁর প্রচুর বই ছিল এবং এসব বই থেকে তিনি ক্রমাগত বিশ্ব জ্ঞান বৃদ্ধি করতেন। তিনি নিজে বলতেন, যদি আমার দেশের তরুণরা পড়তে শিখত, তাহলে ভাল জীবন যাপন সম্পর্কে শিখতে পারত। এতে তাদের নিজের ও বন্ধুদের জীবনে সুখ আনতে পারত।

২. He who loves his country is a patriot. The patriots love their own country more than their own life. They are ready to sacrifice their lives for the welfare of the country. Everyone respects them. They remain alive even after their death.

অনুবাদ : যে দেশকে ভালবাসে সে দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমিকেরা নিজের জীবনের চেয়ে নিজের দেশকে ভালবাসে। তাঁরা দেশের মঙ্গলের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত। তাঁদের সবাই সম্মান করে। মৃত্যুর পরও তাঁরা বেঁচে থাকে।

৩. Students should observe the laws of life. They should rise from the bed early in the morning and go out for a walk. Besides these, they should take to perform all things, which are necessary for the preservation of health.

অনুবাদঃ ছাত্রদের জীবনের বিধান মেনে চলা উচিত। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে তাদের বাইরে হেঁটে বেড়ানোর জন্য যাওয়া উচিত। তাছাড়া স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাদের যত্নবান হওয়া উচিত।

৪. The prosperity of Bangladesh as a whole depends on the flourishing of jute industries in our country. Our golden fibre is really more precious than gold. It is the source of our present prosperity and progress.

অনুবাদঃ বাংলাদেশের উন্নতি সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের পাটশিল্পের সম্প্রসারণের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের সোনালি আঁশ আসলেই সোনার চেয়ে দামি। এটি আমাদের বর্তমান উন্নতি ও অগ্রগতির উৎস।

৫. Students of today will lead the nation tomorrow. But if their education is not complete, would they be able to lead the country to peace and prosperity?

অনুবাদঃ আজকের ছাত্ররা আগামী দিনে জাতির নেতৃত্ব দেবে। কিন্তু তাদের শিক্ষা যদি সম্পূর্ণ না হয়, তবে কি তারা দেশকে শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে সামর্থ হবে?

৬. Youth is the best time when there is freshness and vigour in mind and body. This is the time when it is most necessary for one to remember the maxims you sow so you will reap'. This is, as it were, the sowing season of man and if he wants to reap the harvest of prosperity and happiness, he must sow the seed of industry, truthfulness, virtue and honesty in this season.

অনুবাদঃ যৌবন হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সময় যখন মনে ও দেহে সজীবতা এবং প্রাণশক্তি থাকে। এইটিই সেই সময় যখন যেমন কর্ম তেমন ফল' প্রবাদ বাক্যটি স্মরণ রাখা অতীব প্রয়োজন। এটা, আগেও যেমন ছিল, মানুষের বীজ বপনের কাল এবং যদি সে সমৃদ্ধ ও সুখের ফসল তুলতে চায় তাহলে এই কালেই তাকে পরিশ্রম, সত্যবাদিতা, সদ্গুণ ও সততার বীজ বুনতে হবে।

৭. Water is another important asset. Its main source is the rain that builds streams, lakes and rivers. We have rain during the monsoon. The monsoon is the seasonal wind that blows in from the Bay of Bengal.

অনুবাদ: পানি হচ্ছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তার প্রধান উৎস হচ্ছে বৃষ্টি– যা খালবিল, হ্রদ ও নদী তৈরি করে। আমরা মৌসুমি বায়ু প্রবাহকালে বৃষ্টি পেয়ে থাকি। মৌসুমি বায়ু হল ঋতুভিত্তিক বায়ু যা বঙ্গোপসাগর থেকে প্রবাহিত হয়।

৮. Many years ago people did not have maps in books. They made their own maps. Alexander went from Greece to India, but he did not have a map.

অনুবাদ: বহু বছর পূর্বে বইপুস্তকে মানচিত্র ছিল না। লোকে নিজেদের প্রয়োজনে মানচিত্র তৈরি করত। আলেকজান্ডার গ্রিস থেকে ভারতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে মানচিত্র ছিল না।

৯. A teacher can never truly teach unless heis still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to born its own flame.

অনুবাদ: নিজে না শিখে একজন শিক্ষক কখনও প্রকৃতভাবে শেখাতে পারেন না। নিজের শিখা না জ্বালিয়ে একটি প্রদীপ কখনো অন্য প্রদীপ জ্বালাতে পারে না।

১০.One night Abu was sleeping in his room. It was about midnight. Suddenly, there was a strange light in Abu's room. Abu woke up. He was writing something in his book.

অনুবাদ: এক রাতে আবু তাঁর কক্ষে ঘুমাচ্ছিলেন। তখন ছিল মধ্যরাত। হঠাৎ দেখা গেল আবুর কক্ষে এক অদ্ভুত আলো। আবু জেগে উঠলেন। তিনি তাঁর বইতে কী যেন লিখছিলেন।

১১.A patriot is a man who loves his country, works for it and is willing to fight and die for it. Every soldier is bound to do his duty. But the best soldiers do more than this. They risk their lives because they love the country they are fighting for.

অনুবাদ: দেশপ্রেমিক হচ্ছেন তিনি, যিনি দেশকে ভালবাসেন, দেশের জন্য কাজ করেন এবং দেশের জন্য যুদ্ধ করতে এবং মরতেও প্রস্তুত থাকেন। প্রত্যেক সৈনিক নিজ কর্তব্য করতে বাধ্য। কিন্তু উত্তম সৈনিক তার চেয়েও বেশি করে। তারা তাদের জীবনের ঝুঁকি নেন কারণ তারা দেশকে ভালোবেসে তার জন্য যুদ্ধ করেন।

১২.We live in a society. So we must learn to live in peace and amity with others. We have to respect other life and property. We have a lot of duties and responsibilities to the society.

অনুবাদ: আমরা সমাজে বাস করি। তাই অন্যের সঙ্গে শান্তিতে ও সৌহার্দে বাস করা আমাদের শিখতে হবে। অন্যের জীবন ও সম্পত্তির প্রতি আমাদের সম্মান দেখাতে হবে। সমাজের প্রতি আমাদের অনেক কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে।

১৩.The only reason I ever read a book in my spare time, that is to say, is because I except pleasure from it. If likes it, I go on. If it bores me, I stop. No one can bully me into linking what I don't like.

অনুবাদ: আমি অবসর সময়ে বই পড়ি তার প্রধান কারণ, বলতে গেলে, আমি তা থেকে আনন্দ পেতে চাই। যদি পছন্দ হয় আমি পড়তে থাকি। যদি তা আমার বিরক্তির উদ্রেক করে আমি পড়া থেকে বিরত থাকি। যা আমি পছন্দ করি না তা কেউই আমাকে গায়ের জোরে পছন্দ করাতে পারে না।

১৪.Modern Science is teaching us that no one lives alone. Co-operation between individuals and then between families, was essential to the life of man when he competed with animals of field and forests.

অনুবাদ: আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের শেখায় যে কেউই একা বাস করতে পারে না। পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা এবং তারপর পরিবারের সঙ্গে পরিবারের সহযোগিতা মানবজীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; যেহেতু তাকে মাঠে এবং বনে পশুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকতে হচ্ছে।

১৫.Man has developed science through study and labour. Science has given him machines, which have made him as powerful as the Gods of old. Nature has revealed many of her secrets to him and more and more mysteries are being daily exposed.

অনুবাদ: মানুষ পড়াশোনা ও শ্রমের মাধ্যমে বিজ্ঞানের উন্নতি করেছে। বিজ্ঞান তাকে যন্ত্র দিয়েছে যা তাকে পৌরাণিক দেবতার মতো শক্তিশালী করেছে। প্রকৃতি তার বহু গোপন বিষয় তার নিকট উন্মোচন করেছে এবং আরো অনেক অনেক রহস্য প্রতিদিনই উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে।

১৬.Man is the architect of his own fortune. If he makes a proper division of his time and does his duties accordingly, he is sure to improve and prosper in life, but if he does otherwise he is sure to repent when it is too late and he will have to drag a miserable existence from day to day.

অনুবাদ: মানুষ তার নিজের ভাগ্যনির্মাতা। সে যদি তার সময়কে সুষ্ঠুভাবে ভাগ করে এবং সেভাবে কতর্ব্য করে যায় তবে সে নিশ্চয়ই জীবনে উন্নতি করবে এবং সৌভাগ্যশালী হবে। কিন্তু সে যদি উল্টোটা করে তাহলে সে নিশ্চয়ই অনুশোচনা করবে, অবশ্য তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে এবং তাকে দিনের পর দিন শোচনীয়ভাবে বেঁচে থাকতে হবে।

১৭.Knowledge is vaster than ocean. The more we gather knowledge, the more our thirst increases. So any kind of restriction on the pursuit of knowledge is not at all desirable. Everybody has the right to walk freely in the ocean of knowledge.

অনুবাদ: জ্ঞান সমুদ্র থেকেও বিস্তৃত। আমরা যত জ্ঞান অর্জন করি তত আমাদের তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়। কাজেই জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়। জ্ঞানের সমুদ্রে স্বাধীনভাবে বিচরণের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

১৮.A garden is not a source of beauty only. It is also a source of income to men. Men for their great love for flowers, decorate their homes with them on different occasion. Men love flowers, for they are the symbols for beauty and purity.

অনুবাদ: বাগান শুধু সৌন্দর্যেরই আকর নয়। এটি আয়েরও উৎস বটে। ফুলের প্রতি মানুষের অসীম ভালবাসার দরুন তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফুল দিয়ে বাড়ি সাজায়। মানষ ফুল ভালবাসে কারণ ফুল সৌন্দর্য ও পবিত্রতার প্রতীক।

১৯.Youth is the best time in our life. We must sow the seeds of industry, truthfulness, virtue and honesty in this season to reap the harvest of prosperity and happiness.

অনুবাদ: আমাদের জীবনে যৌবন হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সময়। এ ঋতুতে আমাদের পরিশ্রম, সত্যবাদিতা, সদ্‌গুণ এবং সাধুতার বীজ বপন করতে হবে যাতে আমরা উন্নতি ও সুখের ফসল আহরণ করতে পারি।

২০.Walking is best suited to all kinds of health. Both the young and the old can walk and help their body function as long as they live. On the other hand, gymnastic exercises are best suited to young people only.

অনুবাদ: সব ধরনের স্বাস্থ্যের জন্য হাঁটা সবচাইতে উপযোগী। যুবক ও বৃদ্ধ উভয়ই, যতদিন বেঁচে আছে, হাঁটতে পারে এবং শরীরকে সচল রাখতে পারে। অন্যদিকে শারীরিক ব্যায়ামাদি কেবল তরুণদের জন্যই বেশি উপযোগী।

২১.The best sort of character cannot be formed without efforts. This needs the exercise of constant self-watchfulness, self-discipline and self-control. We should remember that character is the crown and glory of life.

অনুবাদ: প্রচেষ্টা ছাড়া উত্তম চরিত্র গঠন করা যায় না। এতে প্রয়োজন অনবরত সতর্কতা, স্ব-নিয়মানুবর্তিতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অনুশীলন। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, চরিত্র হচ্ছে জীবনের রাজমুকুট ও গৌরব।

২২.We should bear the courage to say the right thing. We need not fear man nor care for what others think of so. So long as our purpose is honest God will be on our side. And with his help we shall be able to encourage the weak.

অনুবাদ: আমাদের সত্য বলার সাহস থাকা উচিত। আমাদের মধ্যে লোকভয় থাকার দরকার নেই, কিংবা অন্যেরা আমাদের সম্বন্ধে কী ভাবছে তাও খেয়াল করার দরকার নেই। যতক্ষণ আমাদের উদ্দেশ্য সৎ থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহ্ আমাদের সহায় হবেন। আর তাঁর সাহায্য নিয়ে আমরা দুর্বলকে উৎসাহিত করে তুলতে পারব।

২৩.A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher makes lesson interesting. He keeps pupils and students awake. He also makes them confident and proves them clever. Everybody has something valuable inside him. A good teacher discovers the treasure hidden inside each student.

অনুবাদ: একজন ভাল শিক্ষক যে-কোনো দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। বাংলাদেশে ভাল শিক্ষকের দরকার। একজন সুশিক্ষক পাঠকে আনন্দদায়ক করে তোলেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীকে জাগ্রত রাখেন। তিনি তাদের আত্মপ্রত্যয়ী এবং চালক-চতুরও করে তোলেন। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু মূল্যবান জিনিস রয়েছে। সুশিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে লুকায়িত সেই সম্পদ আবিষ্কার করেন।

২৪.Books are men's best companions in life. You must have very good friends but you cannot get them when you need them. They may not speak gently to you. One or two may prove false and do much harm. But books are always ready to be by your side. Some books may make you laugh.

অনুবাদ: বই মানব-জীবনের সর্বোত্তম সঙ্গী। তোমার নিশ্চয়ই খুব ভাল বন্ধু আছে, কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে তুমি তাদের কাছে নাও পেতে পার। তারা তোমার সঙ্গে ভদ্রভাবে আলাপ নাও করতে পারে। দু-এক জন বিশ্বাসঘাতকও হতে পারে এবং তোমার সমূহ ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু বই সব সময় তোমার কাছে থাকতে প্রস্তুত। কিছু কিছু বই তোমাকে হাসাবে, কিছু বই হয়তো-বা তোমাকে আনন্দ দেবে। কোনো কোনো বই আবার তোমাকে জ্ঞান এবং নতুন ধারণাও দিতে পারে।

২৫.A man's sight is his greatest treasure. There is no greater misfortune in life than blindness. A blind person cannot see the beauties of nature. He cannot see people's faces. He cannot see the lovely hues of the butterfly.

অনুবাদ: দৃষ্টিশক্তি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। অন্ধত্বের চেয়ে জীবনে বড় কোনো দুর্ভাগ্য নেই। অন্ধ ব্যক্তি প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে পায় না। সে মানুষের মুখ দেখতে পায় না। সে দেখতে পায় না প্রজাতির মন-মাতানো বর্ণ-বৈচিত্র্য।

২৬.There are many ways of taking physical exercise. It can be secured either by walking or gymnastics. Walking is best suited to all kinds of health. Both the young and the old can walk and help their body function as long as they live.

অনুবাদ: ব্যায়াম করার অনেক উপায় আছে। তা ভ্রমণ বা শরীরচর্চার মাধ্যমে করা যেতে পারে। সব ধরনের স্বাস্থ্যের জন্য ভ্রমণ উপযোগী। যুবক-বৃদ্ধ উভয়ই ভ্রমণ করার মাধ্যমে আমৃত্যু তাদের শারীরিক কর্মক্ষমতা অটুট রাখতে পারে।

২৭.Bangladesh is the land of our birth. The blue sky and the fresh air of this land are very dear to us.It is our duty to build up our dear Bangladesh. It is our sacred duty. If we do our respective duties, then only our country will make progress.

অনুবাদ: বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। এদেশের নীল আকাশ আর নির্মল বাতাস আমাদের খুবই প্রিয়। আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে গড়ে তোলা আমাদের কর্তব্য। এটা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। যদি আমরা আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করি তবেই আমাদের দেশ উন্নত হবে।

২৮.Dishonest men are never trusted. They adopt dishonesty to achieve success. They cannot hide their dishonesty for long. It is exposed sooner or later. They deceive others once or twice. But if they are once known to be dishonest they are never more trusted.

অনুবাদ: অসৎ ব্যক্তিদের কখনও কেউ বিশ্বাস করে না। তারা সফলতা অর্জন করতে অসততার আশ্রয় নেয়। তারা চিরতরে তাদের অসততা লুকাতে পারে না। আগে বা পরে এটা প্রকাশিত হয়েই যায়। তারা অন্যদের কখনো না কখনো প্রতারিত করবেই। কিন্তু তারা যদি একবার অসৎ হিসেবে পরিচিত হয়ে যায়, তাহলে আর কখনও কেউ তাদের বিশ্বাস করে না।

২৯.Education is the backbone of a nation. No progress can be possible without education. Ignorance is like darkness. So the light of education is necessary for society. Everybody will have to appreciate this

truth. Students both boys and girls must be conscious of their responsibility. Otherwise the nation will not be able to see the light of hope.

অনুবাদঃ শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোনো অগ্রগতি সম্ভব নয়। অজ্ঞতা অন্ধকারতুল্য। সমাজের জন্যে তাই শিক্ষার আলো দরকার। প্রত্যেককে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে। ছাত্রছাত্রী উভয়কেই তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অন্যথায় জাতি আশার আলো দেখতে পারবে না।

৩০.I am fond of collecting foreign stamps. I have chosen it because it is both interesting and instructive. As one goes on collecting, he comes in direct touch with geographical, historical and social conditions of various countries. The pictures of various things of interest rare animals, beautiful sights- all these are thought provoking.

অনুবাদঃ বিদেশি ডাকটিকেট সংগ্রহ করা আমার পছন্দ। আমি এটা পছন্দ করেছি কারণ এটা একদিকে যেমন মজাদার তেমনি গঠনমুলক। একজন ডাকটিকেট সংগ্রহকারীর পক্ষে বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক অবস্থার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে পারে। দুর্লভ বিভিন্ন প্রাণির ছবি, সুন্দর দৃশ্যাবলি চিন্তাশক্তি বাড়ায় ।

৩১.Once a crow was very thirsty. After some time he found a jar. But when he flew to it, he found that there was little water in it and that is very low. So he could not have a drink. Then taking a few pebbles he dropped them one after another into the jar.

অনুবাদঃ একদা একটি কাক খুব তৃষ্ণার্ত ছিল। কিছুক্ষণ পর সে একটা কলসি দেখতে পেল। কিন্তু সে যখন কলসির কাছে গিয়ে দেখল ওটির তলায় সামান্য একটু পানি রয়েছে। তাই সে পান করতে পারল না। তারপর সে কলসির মধ্যে একটি একটি করে পাথরের নুড়ি ফেলতে লাগল।

৩২.Students are the source of future hope and strength of our country. Much depends on how they spend their time and energy now. They have in the first place to acquire good knowledge and experience. Secondly, they have to look around and study the conditions of the people, their ways of living and see in what directions reforms are necessary.

অনুবাদঃ ছাত্ররা আমাদের দেশের ভবিষ্যতের আশা ও শক্তির উৎস। সেটি নির্ভর করে বর্তমানে তারা কীভাবে তাদের সময় ও শক্তির ব্যয় করবে তার ওপর। প্রথমত, তাদের ভালো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাদের চারপাশের জনগণের অবস্থা ও জীবন ধারা পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং দেখতে হবে কী ধরনের নির্দেশনা সংস্কার তাদের প্রয়োজন।

৩৩.Self-reliance means depending on one's own elf. It is a great virtue. Self help is the best help; God helps those who help themselves. So everybody must rely on his own abilities to be self reliant. A self reliant man has confidence in his own abilities. He takes heart in the face of difficulties.

অনুবাদঃ আত্মনির্ভরশীলতা বলতে নিজের ওপর নির্ভরশীলতাকে বুঝায়। এটি একটি মহৎ গুণ। নিজেকে সহায়তাই উত্তম সহায়তা। বিধাতা তাদেরকে সহায়তা করে যারা নিজেদেরকে সহায়তা করে। সুতরাং প্রত্যেককেই আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠতে হবে। একজন আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি নিজের সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস রাখে। একজন স্বাবলম্বী সাহসিকতার সাথে সমস্যাবলি মোকাবেলা করে।

৩৪.We are the citizen of an independent country. Independence is the birth-right of man. But no nation can achieve independence without efforts. Again, the people of a country must be determined to preserve that independence. It is the sacred duty of every citizen to preserve the independence of his motherland.

অনুবাদঃ আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু চেষ্টা ছাড়া কোনো জাতিই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না। আবার, দেশের জনগণকে স্বাধীনতা ধরে রাখার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করা প্রতিটি নাগরিকেরই পবিত্র কর্তব্য।

৩৫.Smoking is very harmful. It is expensive too. It pollutes the environment. Those who smoke cannot live long. So, everyone should give up smoking.

অনুবাদঃ ধূমপান খুব ক্ষতিকর। সেইসঙ্গে ব্যয়বহুলও। এটি পরিবেশকে দূষিত করে। যাঁরা ধূমপান করে তারা বেশিদিন বাঁচতে পারেন না। তাই প্রত্যেকেরই উচিত ধূমপান ত্যাগ করা।

৩৬.Cleanliness is a virtue. It is the habit of keeping the body and all other things free from darts. Without a clean body one cannot have a pure mind. Cleanliness keeps health sound. It is also a mark of politeness. Good health keeps mind sound.

অনুবাদঃ পরিচ্ছন্নতা একটি গুণ। শরীর ও অন্য সবকিছু ময়লামুক্ত রাখার একটি অভ্যাস এটি। বিশুদ্ধ মনের জন্য চাই পরিচ্ছন্ন দেহ। পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য রক্ষা করে। এটা বিনয়েরও লক্ষণ। ভালো স্বাস্থ্য মনকে প্রফুল্ল রাখে।

৩৭.Punctuality is to be cultivated and formed into a habit. This quality is to be acquired through all our works from our childhood. Childhood is the seed-time. The habit formed at this time will continue all through our life. æEverything at right time" should be our motto.

অনুবাদঃ সময়ানুবর্তিতার চর্চা করে একে অভ্যাসে পরিণত করতে হয়। শৈশবকাল থেকেই বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে এই গুণ অর্জন করতে হয়। শৈশব হচ্ছে বীজ বপনের সময়। এ সময়ে গড়ে ওঠা অভ্যাসই আমাদের মধ্যে সারা জীবনে বজায় থাকে। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 'যথাসময়ে যথা কাজ।'

৩৮.Honesty is a noble virtue. It is the secret of success in every sphere of life. The value of honesty is very great. It wins love, respect and fearlessness. An honest man passes his days in respect and happiness. Honesty is the best policy.

অনুবাদঃ সততা মহৎ গুণ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের গোপন রহস্য হলো সততা। সততার মূল্য খুবই বেশি। সততা দিয়ে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও নির্ভীকতা জয় করা যায়। সৎ ব্যক্তি সুখে ও মর্যাদায় দিন অতিবাহিত করে। সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

৩৯.In this life there are no gains without pains. Life indeed, would be dull if there were no difficulties. Games lose their interest, if there is no struggle and if the result is a foregone conclusion. Both winner and loser enjoy a game most if it is closely contested to the last.

অনুবাদঃ কষ্ট ছাড়া এ জীবনে কিছুই অর্জিত হয় না। বস্তুত, বাঁধা-বিঘ্ন না থাকলে জীবন হয়ে পড়ে নিরানন্দ। খেলায় যদি প্রতিযোগিতা না থাকে আর তার ফলাফল পুর্বনির্ধারিত হয়, তবে সে খেলা তার মজা হারিয়ে ফেলে। খেলায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হলে বিজয়ী এবং বিজিত উভয়েই তা দারুণ উপভোগ করে।

৪০.Students have youth and energy. They are filled with high ideals. They are free from the responsibility of maintaining families. So, it is easy for them to devote themselves to social service.

অনুবাদঃ ছাত্রদের আছে তারুণ্য ও শক্তি। তারা উচ্চ আদর্শে ভরপুর। পরিবার চালানোর দায়িত্ব থেকে তারা মুক্ত। কাজেই, সমাজসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করা তাদের পক্ষে সহজ।

৪১.One of the most famous of the early travellers of the world was Marco Polo. He was born in Venice in 1954. A.D. When Marco was a boy of fifteen, his father decided to go to China. Marco was not very strong and was too dedicate to go on such a long journey. But he was brave and persuaded his father to take him with him.

অনুবাদঃ সেকালে পৃথিবীর বিখ্যাত পর্যটকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মার্কো পেলো। তিনি ভেনিস শহরে ১২৫৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মার্কোর বয়স যখন পনেরো, সেই সময় তাঁর পিতা চীন দেশে যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। মার্কোর স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো ছিল না। এই দীর্ঘ ভ্রমণের পক্ষে তা ছিল একেবারেই অনুপযোগী। কিন্তু তিনি ছিলেন সাহসী এবং তিনি পিতাকে তাঁর সহযাত্রী করে নেবার জন্য সম্মত করালেন।

৪২.Hercules was a great hero. He was once going on his way to an unknown place, when he saw a gaint. The giant was even taller than a mountain and was holding the sky on his head. He asked Hercules, Who are you and what do you want? The hero said, 'I am Hercules and am going to the garden of Golden Applies'.

অনুবাদ: হারকিউলিস ছিলেন একজন মস্ত বীর। একবার এক অচেনা জায়গায় যাওয়ার পথে তিনি এক দৈত্যকে দেখতে পেলেন। দৈত্যটি ছিল পাহাড়ের চেয়েও লম্বা এবং সে তার মাথায় করে আকাশ ধরে রেখেছিল। সে হারকিউলিসকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে এবং কী চাও? সেই বীর বলল, 'আমি হারকিউলিস এবং আমি সোনালি আপেলের বাগানে যেতে চাই।'

৪৩. Books introduce us with the best society; they bring us into the presence of the greatest minds that have ever lived. We have what they said and did. We see them as if they were really alive. We became participators in their thoughts. We sympathise with them.

অনুবাদ: গ্রন্থের মাধ্যমেই আমরা সর্বোত্তম সমাজের পরিচয় পাই। গ্রন্থ আমাদের শ্রেষ্ঠ মননশীল ব্যক্তিদের অস্তিত্বের কাছে নিয়ে আসে। আমরা তাদের কথা ও কাজে স্বচ্ছন্দে জ্ঞাত হই। আমরা দেখি, যেন তারা সত্যিই জীবিত। আমরা তাদের চিন্তাধারার অংশগ্রহণকারী হয়ে পড়ি। তাদের সঙ্গে আমরা সমব্যথী হয়ে যাই।

৪৪. Patriotism is love for one's country. It is powerful sentiment and wholly unselfish and noble. A patriot can sacrifice even his own life for the welfare of his country. It is idealism that gives courage and strength. But false patriotism makes a man narrow-minded and selfish.

অনুবাদ: নিজের দেশকে ভালোবাসাই স্বদেশপ্রেম। এটি এক প্রবল ভাবাবেগ, যা স্বার্থহীন ও মহৎ। স্বদেশের কল্যাণ কামনায় একজন দেশপ্রেমিক নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারেন। এটি একটি আদর্শ, যা দেয় সাহস ও শক্তি। কিন্তু মেকি স্বদেশপ্রেম মানুষকে সংকীর্ণমনা ও স্বার্থপর করে তোলে।

৪৫. Honesty is a great virtue. If you do not deceive others, if you do not tell a lie, if you are strictly just and fair in your dealing with others, you are an honest man. Honesty is the best policy. An honest man is respected by all. No one can prosper in life if he is not honest.

অনুবাদ: সততা মহৎ গুণ। যদি অপরকে প্রতারণা না কর, মিথ্যা না বল, অন্যের সঙ্গে যথার্থ ও ন্যায়সংগত আচরণ কর, তবে তুমি সৎ ব্যক্তি। সততাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। সৎ ব্যক্তিকে সকলেই সম্মান করে। সততা ব্যতীত কেউ জীবনে উন্নতি করতে পারে না।

অনুশীলনী

অনুবাদের উদাহরণ

১. Cricket is a popular game. The game has achieved popularity in Bangladesh too like the other countries of the world. Bangladesh has been trying to achieve a success in the cricket for long. We are happy that our country earns the capability to join the world cup tournament by winning the last ICC trophy.

২. Bangladesh is a land of rivers. The rivers fall into the Bay of Bengal. Many towns, ports and villages stand on both sides of these rivers. In the rainy season, these rivers assume a terrible look but in the winter they remain quite calm.

৩. Students should abide by the rules of health. They will get up early in the morning. They must be industrious. Industry is at the root of all prospers. An idle man cannot make any progress in life.

৪. Always speak the truth. Never tell a lie. Nobody believes a liar. Even if he speaks the truth he is considered to be a liar. Nobody in the world is unfortunate as he.

৫. We are living in an age of science. Science has discovered and invented many things. We use them in our daily life for our comfort and convenience. Electricity is one of the greatest and most important gift of science to man. Electricity has almost changed the mode of our life.

৬. Student life is the stage of preparation for future. This is the most important period of life. A student is young today. But he will be a man tomorrow. He has different duties. He should perform them all. As a student, his first duty is to study and learn. He should be careful to his lessons.

৭. Computer is the new miracle of science. It can make thousand of calculations in a moment. It can store in its memory millions of facts and figures. It can also recall them at ease. In our country the use of computer is growing rapidly. Now a day's computers are used in banks, shops, airlines, offices, libraries, everywhere. It seems that computer is going to dominate the future civilization of man.

৮. No man cannot live alone. When we are children then family protects us. When we grow up, we need the help of all the people around us. If we try to live alone, our lives are no other than those of animals. Our father and mother, our teachers, our government, all these train us to do our duty.

৯. The life of a student is a life of preparation, preparation for the struggle of life. To make him ill fitted for the struggle, education is necessary. Students of today will lead the nation tomorrow. But if their education is not completed, would they be able to lead the country to peace and prosperity?

১০. He who loves his country is a patriot. The patriots love their country more dearly than their lives. They are ready to lay down their lives for the welfare of their country. Everybody honours them. They live even after their death.

১১. The newspaper is a very useful thing. At present we find many newspapers in Bangladesh. Newspaper helps the progress of a nation. People are eager to know what is going on in the world. They can know this and that by reading the newspaper. It gives us all sorts of news of our own land as well as foreign lands.

১২. A boy may be very bad at subjects like history, geography and even English. But he may be very clever with his hands; He may be able to make excellent models of aeroplane or of trains. If so, he might become a useful teacher at wood work, rather than an unhappy clerk in an office.

১৩. The necessity of learning English cannot be ever-stated. English is an international language. It is essential in our day-to-day activities. We must know English in order to go in for any job. There is handily any situation where the employees can do without English.

১৪. Bangladesh is not a very big country. But it is one of the most densely populated countries in the world. More than one hundred and four million people live in this small country. Its population is still on the increase. If the present rate of increase continues uncontrolled, her population will be doubled within next twenty years.

১৫. A newspaper is a store-house of knowledge. We can know the condition, manners and customs of other countries of the world from newspaper. It is in fact the summary of all current history. It supplies information to all classes of people. The businessman fined the condition of the world market about his goods through newspaper.

১৬. Cricket is a popular game. The number of cricket fans is increasing all over the world. In many countries of the world, cricket is being practised now. Cricket culture is not new in this sub-continent. Bangladesh has advanced a lot in cricket. Now in the Cricket World Bangladesh is a popular name.

১৭. Nobody can prosper without labour. Either money or education, you have to work hard to acquire it. Those who are idle, lag behind forever. All who have acquired higher status in the society are industrious. Hear in mind that industry is the key to progress.

১৮. Our country is full of natural resources. Our development depends on the proper use of these resources. To idle away time will not do. It is our duty to build up our country. For this, all of us have to work hard because without industry no nation can prosper. We shall have to bear in mind that industry is at the root of good luck.

১৯. Rice is our staple food. Our country has produced plenty of paddies this year. Poor people are expecting to get two handfuls of rice. All of us should work hard with a view to overcoming poverty. It is not possible to produce more crops without hard labour.

২০. Socrates did not teach in a school. Instead he taught in the streets, in the market places, where the young men were likely to be found. He taught that man must be good to be happy. He often said that he was wiser than other men, because he understood how little he known.

২১. Student life is the preparatory period for struggle. The necessity of education is endless to enable a student for this struggle. Only education does not make a student ideal. A good student has to have other qualities. The student who is intelligent in studies, good at behaviour, obedient to parents and teachers, is a good one.

২২. Tress is our friends. It helps us in different ways. It gives us shade, food, fuel, medicine and oxygen. Trees make our environment beautiful. Trees are our valuable wealth. It is very much necessary to make a forestation programme successful.

২৩. We must make the best use of our animals. Bangladesh is an agricultural country. There is almost no mechanized cultivation. All the works of cultivation depend on animal power. That is why, working animals are badly needed.

২৪. The great advantage (সুবিধা) of early rising is the good start it gives in our day's work. The early riser has done huge quantity of hard work before other men have got out of bed. In early morning the mind is fresh (সতেজ) and there are fewer disturbances. So, the work done at that time is generally will be done. By beginning so early, he knows that he has plenty of time to do all the work thoroughly. He is not, therefore, tempted (প্রবৃত্ত হওয়া) to hurry.

২৫. Home is the first school where the child learns his first lesson. He sees, hears and begins to learn at home. It is the home that builds his character. In a good home honest and healthy men are made. But indulgence at home spoils a child.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. অনুবাদে মূলের ভাব–
ক. থাকবে　　খ. থাকবে না

২. অনুবাদ হবে–
ক. কঠিন　　খ. প্রাঞ্জল

৩. মূল বাক্যের ক্রিয়া ও বাচ্য অনুবাদে–
ক. থাকবে　　খ. থাকবে না

৪. মূল রচনার ভাষারীতি অনুবাদে প্রতিফলিত–
ক. হবে　　খ. হবে না

৫. মূলের বড় বাক্য অনুবাদে–
ক. বড় হওয়া উচিত　　খ. ছোট হওয়া উচিত

৬. অনুবাদে কোনো বাক্যের ব্যাখ্যা–
ক. প্রয়োজনীয়　　খ. অপ্রয়োজনীয়

উত্তরমালা : ক.

১. ক　২. খ　৩. ক　৪. ক　৫. ক　৬. খ

ইউনিট ১০
প্রবন্ধ রচনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে শিক্ষার্থী–

- কথাসাহিত্যের বিশেষ শাখা হিসেবে প্রবন্ধের স্বরূপ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- প্রবন্ধের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- কোনো বিষয় সম্পর্কে নিজের বক্তব্য কীভাবে সুশৃঙ্খলভাবে লিখতে হয় তা শিখতে পারবেন।
- বক্তব্য কীভাবে বিস্তৃত অথচ নির্মেদ করতে হয় তা শিখতে পারবেন।

প্রবন্ধ কী?

প্রবন্ধ হচ্ছে কথাসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। প্রবন্ধ শব্দটিকে ভাঙলে পাওয়া যায় 'প্র+বন্ধ'। 'প্র' অর্থ এখানে প্রকৃষ্ট। 'বন্ধ' অর্থ বন্ধন। অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন বা বাঁধা। কোনো বিষয় সম্পর্কে লেখকের বক্তব্যকে যুক্তি, তর্ক, তত্ত্ব, তথ্য, দৃষ্টান্ত, প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সহযোগে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে উপস্থাপনের নামই প্রবন্ধ। প্রবন্ধে সাধারণত কোনো বিষয় সম্পর্কে লেখক তাঁর নিজস্ব ভাবনার প্রকাশ ঘটান। প্রবন্ধকে সাধারণভাবে রচনাও বলা হয়ে থাকে।

প্রবন্ধের শ্রেণিবিভাগ

প্রবন্ধ সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে–

১. বস্তুনিষ্ঠ ভাবগম্ভীর প্রবন্ধ বা তন্ময় প্রবন্ধ এবং

২. ব্যক্তিনিষ্ঠ লঘু চালের প্রবন্ধ বা মন্ময় প্রবন্ধ

বস্তুনিষ্ঠ ভাবগম্ভীর প্রবন্ধ অত্যন্ত গোছানো, পরিকল্পিত, যুক্তিনিষ্ঠ, ব্যক্তিনিরপেক্ষ হয়ে থাকে।

আর ব্যক্তিনিষ্ঠ লঘুচালের প্রবন্ধে কোনো বিষয় সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আবেগ-অনুভূতি বিচার-বিশ্লেষণ, সচেতন যুক্তিনিষ্ঠতা, তত্ত্ব, তথ্য, প্রামাণিক উদ্ধৃতি ছাড়াই উপস্থাপিত হয়। এই কারণে এ ধরনের প্রবন্ধের চলন হয় লঘু বা হালকা।

প্রবন্ধ রচনার কৌশল

১. যে বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ লেখা হবে সে বিষয়-সংশিষ্ট বিভিন্ন তথ্য ও উপকরণ আগেই ঠিক করতে হবে।

২. যে বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা হবে সেই বিষয়ের ওপর নানা দিক থেকে আলো ফেলতে হবে। অর্থাৎ যতভাবে বিষয়টিকে দেখা যায় ততগুলো উপশিরোনাম বা অনুচ্ছেদ ঠিক করতে হবে।

৩. উপশিরোনামগুলো বা অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে একটি ঐক্য থাকতে হবে।

৪. একই কথার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৫. অনাবশ্যক উদ্ধৃতি, তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬. প্রবন্ধে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ ঘটানো থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রবন্ধের ভাষা হবে সরল ও প্রাঞ্জল কিন্তু অব্যর্থ।

৭. প্রবন্ধ লেখার সময় এর মূল কাঠামোর দিকে নজর রাখা জরুরি। প্রবন্ধের মূল কাঠামোর তিনটি অংশ থাকা আবশ্যক– ভূমিকা, মূল অংশ এবং উপসংহার।

একটি ভালো প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য

১. একটি ভালো প্রবন্ধের বক্তব্য হবে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সম্পূর্ণ।

২. প্রবন্ধের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সম্পর্ক হবে জৈবিক। গঠনগত ঐক্য প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৩. প্রবন্ধের মধ্যে প্রাবন্ধিকের চিন্তার স্বচ্ছতা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

৪. প্রবন্ধের মধ্যে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য যথাযথভাবে বিন্যাস করতে হয়।

বাংলাদেশের কৃষক

সূচনা : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা আশিভাগের বেশি মানুষ কৃষিকাজ করে জীবন ধারণ করেন। এজন্য বাংলাদেশকে কৃষি প্রধান দেশ বলা হয়ে থাকে। কৃষকরাই আমাদের দেশের প্রাণ। তাঁরা দিনরাত পরিশ্রম করে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখেছেন। দেশের কল্যাণে, দেশ ও দশের সহযোগিতায় তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের খাদ্যের যোগান দিয়ে থাকেন। কৃষকের প্রতি আমাদের সম্মানের অন্ত নেই। কবি, দার্শনিক বা লেখকগণ তাঁদের অবদানকে স্বীকার করেছেন। কবি কৃষকদের সম্পর্কে বলেছেন−

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা

দেশ মাতারই মুক্তিকামী দেশের সে যে আশা।

কৃষকদের অতীত : পৃথিবীতে মানুষের সংস্কৃতি শুরু হয় কৃষিকাজের মাধ্যমে। আমাদের দেশেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। নদী, নালা, খালবিলের সমারোহ আমাদের এই বাংলা ভূমি। এখানে এক সময় ছিল গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু আর নালা ভরা মাছ। তখন কৃষকের মুখে হাসি ফুটে উঠত। প্রকৃতির অনুকূল হলেই কৃষক তাঁর কাঙ্ক্ষিত ফসল ঘরে তুলতেন। নিজেদের উৎপাদিত ফসল দিয়েই তাঁদের প্রয়োজন মিটে যেত। অভাব তাঁদেরকে তাড়া করে বেড়াত না। কাজেই তাঁদের জীবন ছিল সহজ, সরল, নিরাপদ ও সুখময়। কৃষকদের কণ্ঠে উচ্চারিত নিচের লোকগীতির চরণেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়-

আমরা চাষী ফসল ফলাই

গোলা ভরা ধান

বাড়ির গাছে সবরী কলা

বাটা ভরা পান।

কৃষকদের বর্তমান অবস্থা : বর্তমানে প্রযুক্তি উন্নতির ফলে কৃষকদের কর্মকাণ্ডে প্রযুক্তিগত অনেক জিনিসের ব্যবহার হচ্ছে। পূর্বের তুলনায় তাঁদের কষ্ট অনেক লাঘব হয়েছে। তাঁরা আর অমানবিক পরিশ্রম করেন না। তারপরও আমাদের দেশের কৃষকদের সেই প্রাচুর্য নেই। অধিক জনসংখ্যার চাপে আবাদী জমি কমে যাওয়ার ফলে কৃষকদের এই অবস্থা। অন্যদিকে, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, কৃষকদেরকে দিনের পর দিন খারাপ অবস্থারে দিকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতির কারণে কৃষকেরা কৃষিকাজে আশানুরূপ ফসল পাচ্ছে না। সারের মূল্যবৃদ্ধি, কৃষিকাজের উপকরণের দাম, কাজের লোকের সঙ্কট ও অধিক টাকা খরচের কারণে কৃষকেরা লাভবান হতে পারছেন না। তাই বাধ্য হয়ে অনেক কৃষক অন্য পেশা গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। নিরূপায় বাংলাদেশের কিছু কৃষক তাঁদের পূর্বের পেশা চালিয়ে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কৃষকদের অবস্থা পরিবর্তনের উপায় : বাংলাদেশের কৃষিকাজকে বাঁচাতে হলে কৃষকের অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। কৃষকদের উন্নতির সঙ্গে আমাদের দেশের উন্নয়নের প্রশ্নটিও জড়িত। কৃষকদের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করতে হলে তাঁদেরকে সরকারিভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। বর্তমান সরকার কৃষকদের উন্নতির লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, স্বল্পমূল্যে সার বিতরণ ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কিন্তু এসব কমকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে না, ফলে প্রকৃত ও অভাবী কৃষকেরা এর সুফল পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকারকে আরও সজাগ থাকতে হবে। যত্রতত্র ঘরবাড়ি, শিল্পকারখানা স্থাপন করে যাতে কৃষকের আবাদী জমি নষ্ট না হয় সেদিকে সরকারকে খেয়াল রাখতে হবে। কৃষকেরা যাতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অধিক শস্য উৎপাদন করতে পারে, সেদিকটিও সরকারকে নজরে আনা উচিত। ফসল বিক্রি করে কৃষকেরা যাতে ন্যায্য মূল্য পায় তাও সরকারকে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এসব বিষয় সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করলে কৃষকদের ভাগ্যের উন্নতি করা সম্ভব।

বাংলাদেশে কৃষকের গুরুত্ব : বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষি পেশার সঙ্গে সংশিষ্ট। এদেশের কৃষির উন্নয়নের সঙ্গে দেশের উন্নতিও জড়িত। আমাদের প্রধান খাবার এ দেশের কৃষকেরাই উৎপাদন করে থাকে। এসব পণ্য আমরা স্বল্প মূল্যেই ক্রয় করতে পারি। কিন্তু দেশের কৃষির অবস্থা যদি ভালো না হয়, কৃষকেরা যদি তাঁদের পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যুক্ত হয়, তবে আমাদের দেশের প্রধান শস্য অন্য দেশ থেকে আমদানি করতে হবে। এসব পণ্য অধিক মূল্যে ক্রয় করতে হবে যা আমাদের অনেকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। দেশের যে অগ্রযাত্রা কৃষিবিপবের মাধ্যমে সূচিত হয়েছে তা ধরে রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই আমাদের দেশের কৃষির গুরুত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই কৃষিকে ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশের কৃষকের গুরুত্ব কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

উপসংহার : আমাদের দেশের কৃষকের গৌরোবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। তাঁরা আমাদের দেশের খাদ্যের যোগানদাতা। কৃষকই আমাদের দেশের প্রাণ। তাঁদের উন্নয়ন ছাড়া বাংলাদেশের উন্নয়নের চাকা ঘোরানো সম্ভব নয়। তাই কৃষকের অতীত ইতিহাস ফিরিয়ে আনতে হবে। কৃষকেরা যাতে লাভবান হয় সেদিকে সরকারকে নজর দেয়া প্রয়োজন। কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে- এই শোগান সামনে রেখে তাদের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। কবির কথায়– 'বাঁচতে হলে লাঙল ধররে আবার এসে গাঁয়'।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)

সূচনা : আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি মানব জাতিকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। তিনি ইসলাম ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।

জন্ম ও বংশ পরিচয় : আরব জাতি ও ইসলামের অন্ধকার যুগে তিনি ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের **১২ই** রবিউল আউয়াল সোমবার সুবেহ সাদিকের সময় মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুলাহ এবং মাতার নাম আমিনা। তাঁর জন্মের ছয়মাস পূর্বে পিতা এবং জন্মের ছয় বছর পর মাতা মারা যান। তারপর পিতামহ আবদুল মোতালেব তাঁকে লালন পালন করেন। পিতামহের মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বাল্যকাল ও কৈশোর কাল : ছোটকাল থেকেই হযরত মুহাম্মদ (স.) অত্যন্ত ধার্মিক, পরিশ্রমী ও সত্যবাদী ছিলেন। শৈশবে তিনি চাচা আবু তালিবের মেষ চরাতেন। এ কাজে তিনি কখনও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেননি। বাল্যকাল হতেই তাঁর সততা ও সত্যবাদিতার কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এসময় কাল থেকেই লোকে তাঁকে আল আমিন উপাধি দেয়।

যৌবন ও সাধনা : বাল্যকাল থেকেই হযরত মুহাম্মদ (স.) ইসলাম ধর্ম, ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে ভাবতে থাকেন। তিনি সব সময় স্রষ্টার আরাধনায় মগ্ন থাকতেন। কীভাবে আরব জাতি তথা মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে ভাবতে থাকেন। **২৫** বছর বয়সে তিনি খাদিজা নামে আরবের অন্যতম এক ধনি মহিলার প্রতিনিধি হিসেবে সিরিয়ায় বাণিজ্যের উদ্দেশে গমন করেন। হযরতের গুণে এবং রূপে মুগ্ধ হয়ে ৪০ বছরের খাদিজা তাঁকে বিয়ে করেন।

ধর্ম প্রচার : বিবি খাদিজাকে বিয়ে করার পর হযরত মুহাম্মদ (স.) আরও দীনের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সর্বদা ধ্যানে মগ্ন থাকতে লাগলেন। ৪০ বছর বয়সে তাঁর উপর ওহি নাযিল হলে তিনি নবুয়্যত প্রাপ্ত হন। জিব্রাইল (আ.) ওহি তথা কোরআন শরিফের আয়াতগুলো আল্লাহর হুকুমে হযরত মুহাম্মদের কাছে নিয়ে আসতেন। তারপর তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। এর মূল কথা হলো আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর প্রেরিত রাসূল। ধর্ম প্রচার কালে তাঁর হাতে মহিলাদের মধ্যে বিবি খাদিজা (রা.) এবং পুরুষদের মধ্যে হযরত আবুবকর (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হন। দিনের পর দিন ইসলামের পতাকাতলে অনেকেই শরিক হতে লাগলেন। এভাবে ইসলামের আলোয় আলোকিত হয় পুরো বিশ্ব। সমাজ থেকে অন্যায়, অত্যাচার, কুসংস্কার দূর হতে থাকে। হযরত মুহাম্মদ (স.) ইসলাম ধর্ম প্রচারে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। ইসলাম ধর্ম চারিদিকে প্রচার হতে লাগল।

হযরত মুহাম্মদের বিপদকাল : হযরত মুহাম্মদের প্রচেষ্টায় সমাজ থেকে অন্যায়, অত্যাচার, কুসংস্কার দূর হতে থাকে। হযরত মুহাম্মদ (স.) ইসলাম ধর্ম প্রচারে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। ইসলাম ধর্ম চারিদিকে প্রচার হতে লাগল।

হযরত মুহম্মদের বিপদকাল : হযরত মুহাম্মদের প্রচারিত ইসলাম যখন আরববিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তখন ইসলামের বিপথগামী ও ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থানকারীরা হযরত মুহাম্মদ (স.) অন্যায়ভাবে মেরে ফেলা ও তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্য কতিপয় লোক মরিয়া হয়ে উঠল। এমতাবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (স.), হযরত আবুবকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় হিযরত করলেন। ধর্মের জন্য তিনি অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ওহুদের যুদ্ধ ব্যতীত তিনি প্রায় সব যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

চরিত্র : হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন আদর্শ মানব। মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি। তাঁর প্রচারকৃত ইসলাম শান্তি ও ন্যায়ের ধর্ম। তিনি ছিলেন একজন ধর্ম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক, আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী, ন্যায়পরায়ণ শাসক, ধৈর্যশীল এবং সমভাবে করুণাশীল। এমন কোনো মহৎ গুণাবলি নেই যা হযরত মুহাম্মদের ছিল না। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন সবার প্রিয়, সচ্চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন আল আমিন বা বিশ্বাসী– মানব জাতির অন্যতম পথ প্রদর্শক।

মৃত্যু : হযরত মুহাম্মদ (স.) ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের রবিউল আউয়াল মাসের **১২** তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

উপসংহার : হযরত মুহাম্মদ ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব ও ইসলামের শেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি বা রাসূল পৃথিবীতে আগমন করবেন না। তিনি ছিলেন মহান আল্লাহ তাআলার প্রিয় মানুষ। তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে।

চরিত্র

সূচনা : চরিত্র মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। চরিত্রবান লোককে সবাই বিশ্বাস ও পছন্দ করে। মনে রাখতে হবে ধন দৌলত, রূপ-মাধুর্য, আভিজাত্য মানুষের আসল পরিচয় নয়, তার আসল পরিচয় হলো চরিত্র-গুণে। চরিত্রবান লোক দেশ ও দশের সম্পদ এবং গৌরব।

চরিত্রের সংজ্ঞা : চরিত্র বলতে একজন মানুষের কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্মবোধ, ন্যায়বোধ, মূল্যবোধ ও আদর্শের সমন্বিত প্রকাশ বুঝায়। চরিত্র মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে অগ্রগামী করে। সত্যনিষ্ঠা, আত্মসংযম, ত্যাগ, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যানুরাগ ইত্যাদি চরিত্রবান লোকের লক্ষণ।

সচ্চরিত্রের লক্ষণ: চরিত্রবান লোক সবার প্রিয়। এরূপ লোককে সবাই ভালোবাসে ও পছন্দ করে। কারণ চরিত্রবান লোক অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় না, কাউকে ক্ষতি করে না। সর্বদা দেশ ও জনগণের কল্যাণে সে আত্মনিয়োগ করে। তিনি সদালাপী, বিনয়ী, জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। একমাত্র সৃষ্টিকর্তার নিকট তিনি মাথানত করেন। সর্বদা সত্যকে ধারণ করেন, কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না। সমাজের মূল্যবোধ, আদর্শ তিনি রক্ষা করে চলেন। প্রাত্যহিক জীবন থেকে শুরু করে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি সত্যকে গ্রহণ করেন, মিথ্যাকে বাদ দিয়ে জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। একমাত্র সৃষ্টিকর্তার নিকট তিনি মাথানত করেন। সর্বদা সত্যকে ধারণ করেন, কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না। সমাজের মূল্যবোধ, আদর্শ তিনি রক্ষা করে চলেন। প্রাত্যহিক জীবন থেকে শুরু করে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি সত্যকে গ্রহণ করেন, মিথ্যাকে বাদ দিয়ে চলেন। তাঁর দ্বারা মানবের অপকার হয় না, সর্বদা কল্যাণ সাধিত হয়। শত্রুরাও তাঁকে বিশ্বাস করে।

চরিত্রবান ব্যক্তি আত্মত্যাগী : চরিত্রবান লোক কেবল নিজের কথা ভাবেন না তিনি দেশের, সমাজের তথা পরিবারের সবার কথাই ভাবেন। ভয়, অন্যায়, জুলুম কিছুতেই তিনি সত্যত্যাগ করেন না। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহম্মদ (সা.) ছিলেন সচ্চরিত্রের প্রকৃত উদাহরণ। তিনি সবার মঙ্গলের জন্য কাজ করেছেন। তিনি নিজের জন্য কমই ভেবেছেন। মানব জাতির কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করে মানবের জীবনকে তিনি আলোকিত করে গেছেন।

চরিত্রহীনতার কুফল : চরিত্রহীন ব্যক্তি পশুর সমান। তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। চরিত্রবান ব্যক্তির ধন, শিক্ষা, আভিজাত্য যা-ই থাকুক না কেন, কেই তাকে বিশ্বাস করে না, কেউ তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। চরিত্রহীন লোক ইহজগতে কেবল ঘৃণিত নয়, পরজনমেও সে আলাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে। কাজেই চরিত্রহীনতার পরিণাম ভয়াবহ। ইংরেজিতে বলা হয়–

When money is lost, nothing is lost,
When health is lost, something is lost,

But when charachter is lost, everything is lost.

মহামানবের আদর্শ : পৃথিবীতে অনেক মনীষী বা সাধারণ মানুষ চরিত্রের গুণে মহামানব হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.), হযরত ঈসা (আ.), হাজী মুহম্মদ মহসীন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জগদীশচন্দ্র বসু, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রা.) প্রমুখ চরিত্রের গুণে পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন। আবার পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকের কথাই শোনা যায়, যারা কুচরিত্রের কারণে পৃথিবীতে ধ্বংস হয়েছেন।

উপসংহার : চরিত্রই হচ্ছে মানব জীবনের মুকুট। চরিত্রবান লোককে সবাই শ্রদ্ধা করে। তিনি পরিবার, সমাজ ও দেশের আলোকবর্তিকা; তাঁর আলোয় আলোকিত হয় বিশ্ব। সুতরাং প্রত্যেকেই চরিত্রবান হওয়া উচিত।

অধ্যবসায়

ভূমিকা : অধ্যবসায় মানুষের সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি। অধ্যবসায় ছাড়া জীবনে সাফল্য অর্জন করা যায় না। পৃথিবীতে যাঁরা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছেন, তার মূলে রয়েছে অধ্যবসায়। পৃথিবীতে যা কিছু মহান, সুন্দর ও কল্যাণকর– তার সবই অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে।

অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা : জীবনের সব ক্ষেত্রেই অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভালো কাজ সম্পদানের জন্য প্রয়োজন ধৈর্য ও সহনশীলতা, কারণ প্রতিটি মহৎ কাজের সামনে থাকে বড় রকমের বাধা। সেই বাধাকে অতিক্রম করে সাফল্য অর্জন করতে হয়। কোনো কাজ করতে গিয়ে যদি কারো ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, তবে সেকাজে সাফল্য অর্জন করা যায় না। এসব বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে সামনে চলার নাম জীবন। আর এ ধরনের কাজ বাস্তবায়ন করা যায় অধ্যবসায়ের মাধ্যমে। মনে রাখতে হবে, দুঃখের পরে সুখ আসে, অন্ধকারের পরে আসে আলোর দ্যুতি। ঠিক তেমনি ব্যর্থতার পরে আসে সফলতা। ব্যর্থতা জীবনে আসবে এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু তার ভয়ে কাজ থেকে দূরে থাকলে উন্নতির সন্ধান পাওয়া যায় না। কবি লিখেছেন–'একবার না পারিলে দেখ শতবার'। সত্যিই বার বার পরিশ্রম করলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত : পৃথিবীতে অনেক মানুষ অধ্যবসায়ের গুণে অমর হয়ে আছেন। স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুশ ইংরেজদের সঙ্গে পর পর ছয়বার যুদ্ধে পরাজিত হন। পলায়নরত অবস্থায় তিনি এক গুহায় শুয়ে চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এ সময় তিনি দেখতে পেলেন, একটা মাকড়সা বার বার একটি স্তম্ভের গায়ে ওঠার চেষ্টা করছে, কিন্তু খানিকটা উঠেই পড়ে যাচ্ছে। এভাবে মাকড়সাটি ছয়বার ব্যর্থ হয়ে সপ্তমবারের চেষ্টায় দেয়ালের গায়ে উঠতে সক্ষম হয়। এই ঘটনা থেকে তিনি অনুপ্রেরণা পেলেন। তিনি আবার তাঁর সৈন্য সামন্ত সাজিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। সপ্তমবারে রাজা রবার্ট ব্রুশ তাঁর দেশকে রক্ষা করতে সক্ষম হলেন। ফরাসি দেশের বিখ্যাত রাজা নেপোলিয়ান একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অধ্যবসায়ের গুণে তিনি সে দেশের ভাগ্যবিধাতা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। অধ্যবসায়ের দ্বারা কলম্বাস আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকা। বিজ্ঞানী নিউটন বলতেন, 'আমার আবিষ্কারের কারণ প্রতিভা নয়, বহু বছরের সাধনা ও পরিশ্রমের ফল।'

উপসংহার : অধ্যবসায় জীবনে সাফল্য অর্জনের চালিকাশক্তি। পৃথিবীতে যাঁরা বরণীয় ও স্মরণীয় হয়েছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন অধ্যবসায়ী। কাজেই অধ্যবসায়ীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমাদের উচিত জীবনকে সুন্দর করে তোলা। ছাত্রজীবন থেকেই অধ্যবসায়ী হলে সারাজীবন এ ধারা বজায় থাকার সম্ভাবনা থাকে। মনে রাখতে হবে, জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে অধ্যবসায়ের কোনো বিকল্প নেই।

মানব-কল্যাণে বিজ্ঞান

সূচনা : বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের অবদান ছাড়া আমাদের জীবন প্রায় অচল হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের কল্যাণেই পৃথিবীতে মানুষের বসবাস সহজ হয়েছে। আদিম জাতি থেকে মানুষ সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়েছে বিজ্ঞানের কল্যাণে। এভাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণে অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দিয়েছে।

বিজ্ঞানের অবদান : আধুনিক বিশ্বের সর্বত্র বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। মানব সভ্যতার এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে বিজ্ঞানের হাত নেই। বিজ্ঞান আবিষ্কারের ফলে জলে-স্থলে-আকাশে মানুষের ভ্রমণ সম্ভব হয়েছে। বিশ্ব আজ মানুষ হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে বিজ্ঞানের কল্যাণে। বিজ্ঞানের অন্যতম আবিষ্কার হলো বিদ্যুৎ। এ আবিষ্কারের ফলে মানব সভ্যতা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের যোগাযোগ সহজ হয়েছে। বিজ্ঞানের গুরুত্ব এক কথায় অপরিসীম।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান : বিজ্ঞানের অবদানের ফলে চিকিৎসা শাস্ত্রে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিজ্ঞানের অবদানে ঔষধ আবিস্কার করে মানুষ মরণব্যাধি অসুখ জয় করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়া নানারকম চিকিৎসা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে।

কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান : কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কল্যাণে উন্নত যন্ত্রপাতি ও আধুনিক কৌশল ব্যবহার করে মানুষ অধিক ফসল উৎপাদন করছে। রাসায়নিক সার ব্যবহার করে কৃষকেরা পূর্বের তুলনায় অধিক ফসল উৎপাদন করছেন।

যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান : বর্তমান আধুনিক কালের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিজ্ঞান কল্যাণ অনস্বীকার্য। কম্পিউপার, মোবাইল, জাহাজ ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে মানুষের যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে মানুষ ঘরে বসেই তথ্য আদান প্রদান ও দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণ করতে পারছে বিজ্ঞানের কল্যাণে।

বিজ্ঞানের অপকারিতা : বিজ্ঞান কেবল মানুষের কল্যাণ সাধন করেছে তা নয়, বিজ্ঞান মানুষের অনেক ক্ষতিও করেছে। এটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে মানব সভ্যতা আজ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে মানুষ, মানুষের ক্ষতি করে চলেছে। প্রতিদিন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ বিজ্ঞানের অপব্যবহার করে হাজার হাজার ঘরবাড়ি, ফসল ও মানুষের প্রাণনাশ করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আমেরিকার বোমাবর্ষণের ফলে ধবংসযজ্ঞ তারই বাস্তব প্রমাণ। বর্তমানে খুন, রাহাজানি, অন্যায়, অত্যাচার বেড়ে চলেছে বিজ্ঞানের অপব্যবহারে মাধ্যমে।

উপসংহার : বর্তমান মানুষের এই সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে সহজ করেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে বিজ্ঞান গতিময় করে তুলেছে। বিজ্ঞানের অপব্যবহার বাদ দিয়ে বিজ্ঞানকে মানবের কল্যাণে ব্যবহার করলে মানুষের জীবন আরও সুন্দর ও সমৃদ্ধ হবে। মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা আরও সাবলীল হবে এবং সুন্দর হবে– এই প্রত্যাশা সবার।

কম্পিউটার

সূচনা : বর্তমান যুগের বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো কম্পিউটার। কম্পিটার আবিষ্কারের ফলে মানুষ পৃথিবীকে জয় করতে সক্ষম হয়েছে। অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, অদেখাকে দেখা প্রভৃতি মানুষ সহজ করেছে কম্পিউটার আবিষ্কারের মাধ্যমে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কারের পেছনে এই কম্পিউটারের রয়েছে অসাধরণ ভূমিকা। শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষার পদ্ধতিকে আধুনিকায়ন করতে বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই শিক্ষার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে কম্পিউটারের গুরুত্ব অধিক। মোট কথা, কম্পিউটার আবিষ্কারের ফলে মানুষের জীবন পূর্বের তুলনায় অনেক সহজ সমৃদ্ধ হয়েছে।

কম্পিউটার কী : কম্পিউটার ইংরেজি শব্দ। কম্পিউটার শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে। এর অর্থ গণনাকারী বা হিসাব গণনাকারী যন্ত্র। যে যন্ত্রের সাহায্যে গাণিতিক যুক্তি ও সিদ্ধান্তমূলক কাজ নির্ভুল করা যায়, তাকে বলা হয় কম্পিউটার। এ যন্ত্রের জনক হলেন চার্লজ ব্যাবেজ। ইলেকট্রনিক এ যন্ত্রটি যোগ, বিয়োগ, গুণভাগের হিসাব ছাড়াও দ্রত গতিতে অসংখ্য ড্যাটা গ্রহণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অতি দ্রুত বিশেষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিতে পারে। মানুষের যে হিসাব করতে সময় লাগতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কম্পিউটার মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তা সম্পন্ন করতে পারে।

উদ্ভবকাল : কম্পিউটার এক অত্যাধুনিক যন্ত্র যার উদ্ভাবন ও বিকাশ চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। ফরাসি গণিতবিদ বেইজি প্যাসকেল **১৬৪২** সালে যোগ বিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম গণনাযন্ত্র উদ্ভাবন করেন। **১৬৭১** সালে লেবনিজ উদ্ভাবন করেন ক্যালকুলেটর এবং চার্লস ব্যারেজ আধুনিক ক্যালকুলেটর উদ্ভাবন করেন **১৮১২** সালে। **১৯৪৪** সালে হার্ভার্ড

বিশ্ববিদ্যালয় ও আই ভি এম কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয় ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল কম্পিউটার। ১৯৪৬ সালে প্রথম উদ্ভাবন হয় ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। ১৯৭১ সালের পর থেকে কম্পিউটারের জগতে এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং দীর্ঘ পরিক্রমায় কম্পিউটার আজ এই রূপ ও আকার ধারণ করেছে।

কাঠামো : কম্পিউটারের দুটি দিক রয়েছে– কম্পিউটারের যান্ত্রিক সরঞ্জাম বা হার্ডওয়ার এবং প্রোগ্রাম সরঞ্জাম বা সফ্টওয়ার। তথ্য গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয় প্রবেশমুখ অংশ, অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয় গাণিতিক অংশ, তথ্য সংরক্ষণের জন্য স্মৃতি এবং নিয়ন্ত্রণবর্তনী হলো যান্ত্রিক সরঞ্জাম বা হার্ডওয়ারের অন্তর্গত। যান্ত্রিক এই অংশ কর্মক্ষম ও কার্যকর হয়ে উঠতে সাহায্য নেয় প্রোগ্রাম অংশের। প্রোগ্রাম আবার দুই ধরনের। ব্যবহারিক পোগ্রাম ও পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম। ব্যবহারিক প্রোগ্রাম গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে এবং পদ্ধতি প্রোগ্রাম কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

কম্পিউটারের প্রোগ্রাম : বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারে যে মেমোরি থাকে তার সমষ্টিকে বলা হয় কম্পিউটার প্রোগ্রাম। কম্পিউটারের কাজ বা প্রক্রিয়া বোঝানোর জন্য যে ভাষার প্রয়োজন হয়, তাকে বলা হয় কম্পিউটারের ভাষা। এ ভাষা ব্যবহার করা হয় বাইনারি পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে।

প্রকারভেদ : কম্পিউটারকে কয়েকভাগে ভাগ করা হয়েছে। কম্পিউটারের ব্যবহার ও প্রকৃতি অনুযায়ী সুপার কম্পিউটার, মেইনফ্রেম কম্পিউটার, মিনি এবং মাইক্রো কম্পিউটার প্রভৃতি ভাগে কম্পিউটারকে ভাগ করা হয়েছে।

কম্পিউটারের গুরুত্ব : চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি, গবেষণা, পুস্তক-প্রকাশনা, যোগাযোগ, তথ্য সংরক্ষণ, সংবাদ প্রচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে কম্পিউটারের অবদান অনস্বীকার্য। কোনো দেশের উন্নতি করতে হলে প্রথমে দরকার সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন। শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার করে শিক্ষার উন্নয়নে মানুষ সাফল্য অর্জন করেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় কম্পিউটার সাফল্য এনেছে। অতি সহজেই এই যন্ত্রের সাহায্যে যোগাযোগ করা যায়। এভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কম্পিউটার ব্যবহার করে মানুষ উন্নতির শিখরে আরোহণ করছে এবং পৃথিবীকে সুন্দর ও সুখময় করে তুলেছে।

অপকারিতা : কম্পিউটার অপব্যবহার করে একদল বিভ্রান্ত লোক দেশ ও জনগণের ক্ষতিসাধন করে চলেছে। অর্থ, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মানুষ এসব অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। কাজেই তারা মানুষের কল্যাণ না করে মানুষের অকল্যাণ করে চলেছে। এটি কম্পিউটারের দোষ নয়। যে কম্পিউটার নামক যন্ত্রটি ব্যবহার করছে, তার মনের সমস্যা ও চিন্তা চেতনার সমস্যা।

উপসংহার : কম্পিউটার এক সম্ভাবনাময় যন্ত্র। এ যন্ত্র সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে মানবকল্যাণের দিক আরো উন্মোচিত হবে। মানুষের জীবনকে কম্পিউটার যেভাবে বদলে দিয়েছে সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হলে এ যন্ত্রকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। জাতীয় জীবনের সবক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে পারলেই এ থেকে প্রকৃত সুযোগ ভোগ করা যাবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সূচনা : মানুষ জন্মের পরে যে-ভাষা আয়ত্ত করে তাকে বলা হয় মাতৃভাষা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বলতে বোঝায় যে-মাতৃভাষাটি আন্তর্জাতিকভাবে বছরের কোনো একটি দিনে পালন করা হয়। ভাষা একটি জাতির ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা হলো বাংলা। এ ভাষায়ই এদেশের মানুষ কথা বলে, লেখন লেখে। তাই মাতৃভাষার প্রতি এদেশের মানুষের রয়েছে অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। এদেশের মানুষ বুকের তাজা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করেছে। সেই থেকে বাঙালি পরম শ্রদ্ধার সাথে তাদের আত্মত্যাগের মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণ করে আসছে। গত ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কো সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের ভাষা শহিদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বাংলা ভাষার অতীত : বাংলা ভাষার জন্ম আজ থেকে প্রায় ১১০০ বছর পূর্বে। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ– এ বৌদ্ধ সাধকদের ধর্মতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। ধর্মতত্ত্ব বর্ণনার পাশাপাশি ফুটে উঠেছে তৎকালীন মানুষের নানা সুখ-দুঃখের বাস্তব ছবি। মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান শাসনামলে রাজভাষা সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা থাকায় বাংলা ভাষা তেমন মর্যাদা পায়নি। কিন্তু সময়ের আবর্তে এক সময় মুসলমান শাসকেরা রাজভাষা চর্চা শুরু করেন এবং বাংলা ভাষার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেন।

উনিশ শতকে বাংলা ভাষা সৃজনশীল কর্মের মধ্য দিয়ে আরো প্রতিষ্ঠিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থ *গীতাঞ্জলি* নোবেল পুরস্কার পেলে বাংলা ভাষা বিশ্বে সাদরে আসীন হয়। এভাবে বাংলা ভাষা নানা বিবর্তনের মাধ্যমে আজকের অবস্থানে আসীন হয়েছে। সর্বশেষ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ আমাদের বাংলা ভাষার মর্যাদাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলেছে।

বাংলা ভাষার জয়যাত্রা : ১৯৫২ সালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা পাকিস্তানের সংবিধানে অন্যতম রাষ্টভাষার স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়। তখন থেকে বাংলা ভাষা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলো সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। ফলে বাংলা ভাষা চর্চার অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হয় বাংলাদেশ।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার : বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেও এবং সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের কথা বলা হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন– শিক্ষা, অফিস-আদালত, ও চর্চার বাহন হিসেবে বাংলা ভাষা কতটা গ্রহণীয় হচ্ছে তা দেখা দরকার। আমাদের দেশে বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরে বাংলা প্রধান বাহন। বাংলার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি এবং আরবি ভাষাও শিক্ষা দেয়া হয়। এছাড়া অন্য একটি ধারা যেখানে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়, সেখানে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা শেখানো হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা সর্বস্তরে ব্যবহারে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে বই, জার্নাল, গবেষণাকর্ম ইত্যাদি বাংলা ভাষায় সমাপণ জরুরি হলেও সম্ভব হচ্ছে না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের বাংলায় যথাযথ গ্রন্থ রচনা করতে হবে। এতে করে ইংরেজির প্রতি শিক্ষার্থীদের নির্ভরশীলতা কমবে।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি : একুশে ফেব্রুয়ারি কেবল আমাদের দেশের মাতৃভাষা দিবস নয়, এ দিবসটি এখন সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ১৯৯৭ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার জন্য বাংলাদেশের অনন্য ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ এবং শহিদের প্রতি সারা বিশ্বে স্মরণীয় রাখতে এ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ছাড়াও প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিকে ইউনেস্কোর ১৮৮ দেশ এবং ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। ইউনেস্কোর এ সিদ্ধান্তে বিশ্বের সব ভাষা সম্মানিত হল। ১৯৯৭ সালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়।

উপসংহার : বাংলা আমাদের প্রাণের ভাষা, বাংলা আমাদের মমতার ভাষা। এ ভাষায় সাহিত্যচর্চা এবং কথা বলার অধিকার আদায়ের জন্য ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি অনেক তাজা প্রাণ বাংলাদেশের রাজপথকে রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছিল। তাঁদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলা ভাষার চর্চা ধারণ করতে হবে আমাদের মননে ও প্রতিটি কর্মের মধ্য দিয়ে। মাতৃভাষা, মাতৃভূমি ও মাতা এই পরম বস্তুটিকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। তবেই আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিকে সঠিকভাবে চর্চা ও মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

সংবাদপত্র

সূচনা : বর্তমান সভ্যতার বাহন হলো সংবাদপত্র। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সংবাদপত্র না হলে চলে না। আদিম কালে মানুষ কেবল খাদ্য সংগ্রহ ও ক্ষুধা নিবারণের কাজেই ব্যস্ত থাকত। কিন্তু সভ্যতার উৎকর্ষের ফলে মানুষ কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে না, তারা আরও অনেক কিছু , অনেক দেশের কথাও জানতে চায়। মুহূর্তের মধ্যেই মানুষ এক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খবর জানতে পারে সংবাদপত্রের মাধ্যমে। বিভিন্ন দেশের নানা ঘটনার সাথে নিজেদেরকে পরিচিত করার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের অনন্যসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষিত মানুষের কাছে সংবাদপত্র হচ্ছে জ্ঞানের ভাণ্ডার।

সংবাদপত্রের ইতিহাস : সর্বপ্রথম কখন, কোথায় সংবাদপত্রের প্রচলন হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। অনেকে মনে করেন, ইতালির ভেনিস শহরে প্রথম সংবাদপত্রের ব্যবহার দেখা যায়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, চীন দেশের অভিজাত বংশীয়দের জন্য সর্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে এক ধরনের হাতে লেখা সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল গেজেট নামে একটি ইংরেজি সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত

হয়। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাংলা সাময়িক পত্র দিগদর্শন প্রকাশিত হয়। একই বৎসর ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত সম্পাদিত *সংবাদ প্রভাকর* প্রথমে সাপ্তাহিক ও ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। সেই থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বহু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এরপর দেশে বিভাগের পরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সংবাদপত্র *দৈনিক আজাদ* প্রকাশিত হয়।

সংবাপত্রের প্রকারভেদ : সংবাদপত্র নানা প্রকারের হয়ে থাকে। এর মধ্যে দৈনিক, সাপ্তাহিক, অর্ধসাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক প্রভৃতি বেশি প্রচারিত হয়। এ সংবাদপত্রগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্বারোপ করে থাকে। তবে মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক প্রভৃতি পত্রিকাগুলো সাধারণত শিল্পসাহিত্য বা বিজ্ঞান গবেষণামূলক হয়ে থাকে।

সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা : সংবাদপত্র মানুষের বিভিন্নভাবে উপকার করে থাকে। সংবাদপত্রকে বলা হয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। কারণ সব ধরনের জ্ঞান এই সংবাদপত্র থেকে আহরণ করা যায়। বর্তমান আধুনিক যুগে সংবাদপত্র ছাড়া যেন আমাদের চলে না। এর মাধ্যমেই আমরা বর্তমান শিক্ষা, প্রশাসন, বাণিজ্য, খেলাধুলা, বৈদেশিক রাজনীতি, বাজার দর, বৈদেশিক সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হই। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি, নতুন ক্রিয়াকর্ম, প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে আমরা প্রতিনিয়ত নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারি। সংবাদপত্র আমাদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ ও প্রসারিত করে দিয়েছে। সংবাদপত্রে জনসাধারণের মতামত, দাবি-দাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা, সরকারি কর্মচারীদের দোষ ত্রুটি, দুর্নীতির সমালোচনা করে। ফলে জনগণের মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা তৈরি হয়। সংবাদপত্রে বিভিন্ন গঠনমূলক সমালোচনা হয় বলে সাধারণ মানুষ ও সরকার উভয়পক্ষই উপকৃত হয়। এছাড়া সমাজ সেবামূলক প্রচারে, দুর্নীতি ও কুসংস্কার দূর করতে জনগণ দেশের সাথে সরকারের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনে, জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ ও রাষ্ট্রের সব শ্রেণির মানুষ নানাভাবে সংবাদপত্রের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে।

অপকারিতা : সংবাদপত্র অনেক সময় জনগণের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিস্বার্থ বা কোনো গোষ্ঠীকে প্রাধ্যান্য দিয়ে সংবাদ প্রচারিত হলে তা দেশের অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে। তাই সংবাদপত্রকে নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ ও মানবকল্যাণী হতে হবে।

উপসংহার : সংবাদপত্র মানুষের নিত্যদিনের বন্ধু। সংবাদপত্র মানুষের জ্ঞানকে আরও বিকশিত করেছে। জীবন ও জগতকে জানার এক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে চলেছে সংবাদপত্র। কাজেই দলীয় সিদ্ধির জন্য সংবাদপত্রে গুজব, উস্কানিমূলক তথ্য, মিথ্যা ও বানোয়াট খবর প্রচার না করে বস্তনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার করলে তা দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করবে। আর এরূপ সংবাদপত্রই সবার দাবি।

বই পড়ার আনন্দ

সূচনা : বই হলো জ্ঞানের বাহন। বই পড়ার মাধ্যমে পৃথিবীর সার্বিক জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। বই পড়ে মানুষ হৃদয় মনে এক অপূর্ব শিহরণ লাভ করে। জগতে জ্ঞান আহরণের দুটো পথ আছে- তার মধ্যে একটি হলো ভ্রমণ করা, অন্যটি বই পড়া। ভ্রমণ করার স্বাস্থ্য ও অর্থ সবার থাকে না। কাজেই জ্ঞান আহরণের সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো বই পড়া। বই পাঠ করে মানুষ বিশাল পৃথিবীর খবরাখবর জানতে পারে। বই পাঠ করে মানুষ জগতের প্রকৃত সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের সন্ধান পায়। বই পাঠ করে মানুষ জ্ঞানী হয়, সত্যানুরাগী হয় এবং সৎ ও নিষ্ঠার দীক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাই বই পাঠ আমাদের জন্য আনে বিস্ময়, নীতি, সহানুভূতি, স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা, ভক্তি-প্রীতি, প্রেম প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি।

বইয়ের উৎস : বই মানুষের জীবন সুন্দর করে। বই মানুষের সৎ চিন্তার ফসল। মানুষ যুগ যুগ ধরে প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে যে অভিজ্ঞতার সম্ভার গড়ে তুলেছে, সেই অভিজ্ঞতার নির্যাস হলো বই। মানুষ তার জীবনের বিশেষ অভিজ্ঞতাগুলোকে সুবিন্যস্ত করে সাজিয়ে এক অবর্ণনীয় শৈল্পিক রূপদান করেছে বইয়ের মাধ্যমে। প্রত্যেক সমাজে এমন লোক আছেন যাঁরা জীবন ও জগতের প্রতিটি ঘটনাকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেন। আর এ উপলব্ধিজাত জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁরা বই রচনা করেন। তবে সবাই বই রচয়িতা হতে না পারলেও সবাই নির্দ্বিধায় পাঠক হতে পারেন। বই পড়ার মাধ্যমে সবাই বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন এবং অজানাকে জানার সর্বোত্তম আনন্দ লাভ করতে পারেন।

বইয়ের বৈচিত্র্য: বিভিন্ন ধরনের বই থেকে মানুষ বিভিন্ন ধররেন আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করে থাকেন। তাই সভ্য সমাজের মানুষের জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাবলির সাহচর্য। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, অর্থনীতি, সমাজনীতি, আইন, ধর্মীয় প্রভৃতি বই থেকে মানুষ লাভ করে আনন্দ, শিক্ষা ও জ্ঞান। এক এক ধরনের বই মানুষকে এক এক ধরনের আনন্দ ও জ্ঞান দিয়ে থাকে। অতীতের ঐতিহ্য, নানা অনুশীলন ও বিচিত্র ভাবধারা সংরক্ষিত হয়েছে গ্রন্থরাজির মধ্যে। এখানে এসে একত্র হয়েছে বিভিন্ন জাতির বিচিত্র জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের স্রোতধারা।

বই পড়ার গুরুত্ব : বই পড়ার গুরত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এ সভ্য সমাজে বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র চলছে প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে মানুষকে অনেক কিছুই শিখতে হয়। আর এই শিক্ষা বা জানার অন্যতম উপায় হলো বই পড়া। মানুষের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলায় বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীতে যাঁরা বড় হয়েছেন, জীবনকে সুন্দর করেছেন এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন বইপ্রেমী। তাঁদের অন্যতম উপাদান ছিল বই, বই পড়া ছিল তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রধান কাজ।

বই পড়ার আনন্দ : বই মানুষের জীবনের অফুরন্ত আনন্দের উৎস যোগায়। মানুষের এ সংগ্রামমুখর জীবনের সবক্ষেত্রে দুঃখ- বেদনার হাতছানি রয়েছে। মানুষ অবসর সময়ে বই পড়ে তার দুঃখ-বেদনা ভুলে থাকতে চায়। এমনকি বই মানুষকে জীবনীশক্তি প্রদান করতে সক্ষম। জীবনের প্রকৃত আনন্দের উৎস নির্মল আত্মা। আর বই পাঠে মানুষের আত্মা বিশুদ্ধতা লাভ করে। একটি উত্তম বই মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দ দিতে পারে। কারণ বইয়ের কথাগুলি জীবন থেকে আলাদা নয় বরং জীবন সম্পৃক্ত। বই জীবনের সমস্যা ও তার সমাধান নিয়েই কথা বলে। বই মানুষকে হতাশ করে না বরং আশাবাদী করে তোলে। আর এ আশাই তো জীবনের একমাত্র ভেলা। সুতরাং বই পড়ার মাধ্যমেই মানুষ জীবনের শ্রেষ্ঠতম এবং বিশুদ্ধতম আনন্দ পেতে পারে।

উপসংহার : বই মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বই পড়ে যদি কেউ আনন্দ লাভ করতে পারে তবে তার বই পড়া সার্থক। বই পড়লে মানুষের জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত হয় এবং মানুষ অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকে। একজন প্রকৃত বই পাঠক কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে না। কাজেই বই পড়ে নিজে আনন্দ লাভ করতে হবে এবং বইয়ের আলোয় আলোকিত করতে হবে অন্যের জীবন। তাই কেবল পাশের জন্য নয় আনন্দ লাভের জন্য বই পড়া উচিত।

বাংলাদেশের দুর্নীতি ও তার প্রতিকার

সূচনা : বাংলাদেশের মত উন্নয়শীল দেশে দুর্নীতি উন্নতির অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছে। শোষণহীন ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয় বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে আশা করেছিল তা আজ দুর্নীতির কারণে বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। কোনো সময় এ দুর্নীতি জাতীয় জীবনের অভিশাপ হিসেবে দেখা দেয়। তাই বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটাতে হলে দুর্নীতি দমন করতে হবে।

দুর্নীতির সংজ্ঞা : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ও ধর্মের বিধি নিষেধ বা রীতিনীতি দ্বারা মানুষের জীবন পরিচালিত হয়। আর সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধাচারণকে বলে দুর্নীতি। দুর্নীতি ব্যাপক ও জটিল প্রত্যয়। এর গতি– প্রকৃতি বহুমুখী ও বিচিত্র ধরনের বিধায় এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা কঠিন। সাধারণত ঘুষ, বল প্রয়োগ বা ভয় প্রদর্শন, প্রভাব এবং ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনকে দুর্নীতি বলে।

রাষ্ট্রীয় কাজে দুর্নীতি : অফিস-আদালতে ঘুষ বেড়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নানা প্রকার দুর্নীতি দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি করেছে। এসব কথা কেবল কথাই নয়, তা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ছাত্ররা পরীক্ষার হলে নকল করে পাশ করতে চায়। কেউ বুঝে নকল করে, আবার কেউ বা না বুঝে গতানুগতিক ধারার অনুসরণ করে। বর্তমানে এক শ্রেণির অসাধু লোক প্রশ্ন ফাঁস করে তা কোমলমতি শিক্ষার্থীর নিকট বিক্রি করে। অভিযোগ শোনা যায় এক শ্রেণির শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও। তাঁরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন না। তাঁরা দায়িত্ব পালন না করে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন। অফিস আদালতে দুর্নীতি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। আমাদের দেশে দুইভাবে দুর্নীতি হতে দেখা যায়। এক. দারিদ্র্য ও অস্বচ্ছলতার সুযোগে এবং দুই. ক্ষমতার লোভের আতিশয্যে। দুর্নীতি ছোঁয়াচে রোগের মত সংক্রামক। আর এ নীতিহীনতা যদি সমাজে একবার দেখা দেয়, তা দমন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আজ আমাদের

ধর্মীয় জীবন দুর্নীতিমুক্ত, রাষ্ট্রীয় জীবনের দুর্নীতি আর অফিস আদালতে এর কালো হাত আরও প্রসারিত। প্রশাসনে দুর্নীতির কথা বাংলাদেশের সবাই জানেন। যেখানে শিক্ষার আলো বিতরণ করা হয় সেখানেও দুর্নীতির কালো হাতের অশুভ ছোঁয়া বিরাজ করছে। শাসন ব্যবস্থার শিথিলতা, ক্ষমতায় টিকে থাকার মোহ, এবং ধনসম্পদ আহরণের আকাঙ্ক্ষা থেকেই যুগে যুগে দুর্নীতির ভিত রচিত হয়েছে। আমাদের দেশের দুর্নীতির মূলেও এ বিষয়গুলি সক্রিয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

দুর্নীতির কুফল : দুর্নীতি জাতীয় জীবনকে কলংকিত করে তোলেছে। দুর্নীতি কোনো সুফল বয়ে আনে না। আমাদের দেশ দুর্নীতির কারণে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে বারবার। বিশ্বের মানুষের কাছে আমরা দিন দিন হীন হয়ে পড়েছি। এ অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে জাতিকে সত্য ও ন্যায়ের জাতিকে সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে উজ্জীবিত করতে না পারলে দুর্নীতির অশুভ হাত আমাদের উন্নয়নকে আরও গ্রাস করবে। দুর্নীতির কারণে আমাদের দেশের জ্ঞানের দরজাও প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। ধর্মজীবন মিথ্যা অহমিকার অসার আবরণে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত দুর্নীতির কালো থাবা আমাদের সার্বিক উন্নতির পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে।

দুর্নীতি প্রতিকারের উপায় : আমাদের সমাজ থেকে দুর্নীতি নামক কালো বস্তুটিকে উৎখাত করা জরুরি। প্রথমে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন জনগণের সচেতনতা। মূল্যবোধ, আদর্শ ও আইনের দ্বারা দেশ শাসিত হলে দুর্নীতির মাত্রা আপনা আপনি কমে যায়। রাষ্ট্রের অধিপতিরা যদি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেন তাহলে সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করা সম্ভব। মানুষের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করা গেলে মানুষ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন না। প্রকৃত শিক্ষা দুর্নীতি নির্মূলের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। দেশের বেকার সমস্যা দূর করে, দেশের মানুষকে সঠিক ও মানসম্মত চাকুরির ব্যবস্থার মাধ্যমে এ দুর্নীতি হ্রাস করা সম্ভব হতে পারে। ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত দুর্নীতির এ কালো হাতের ছোঁয়া যাতে কোনো ক্রমেই বিস্তার লাভ করতে না পারে সে জন্য দেশের মানুষের সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

উপসংহার : দুর্নীতি কোনো দেশকে ভালো কিছু দিতে পারে না। কাজেই বাংলাদেশের মানুষ দুর্নীতিকে দমন করতে চায়। সকল প্রকার দুর্নীতির প্রধান আশ্রয় হলো দারিদ্র্য। বাংলাদেশে পূর্বের ন্যায় দারিদ্র্য নেই কিন্তু দুর্নীতি রয়েছে। এ দুর্নীতিরোধে ন্যায়বান ও নিষ্ঠাবান নাগরিক দরকার। সেই সঙ্গে প্রয়োজন সত্য ও ন্যায়ের ধারক ও বাহক শাসকগোষ্ঠী। তারা দুর্নীতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

সূচনা : প্রকৃতি তার নিজস্ব গতিতে চলে। প্রকৃতির গতি রোধ করা যায় না। প্রকৃতির আশীর্বাদ আমাদের দেশের মাটি ও ভূমিকে উন্নত করেছে। বন্যার পলি আমাদের দেশের মাটিকে উর্বর করে বলে ফসল বেশি উৎপন্ন হয়। তবে পৃথিবীতে যত মানুষ বাড়ছে আর ততই প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ কারণে মাঝে মধ্যে প্রকৃতির বিরূপ প্রভাব পড়ছে আমাদের জনসাধারণের উপর।

বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ : মানুষ পরিবেশের বিনষ্টের জন্য দায়ী– একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃতির বিরূপ প্রভাবের ফলে আমাদের দেশে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে যে সব দুর্যোগ আকস্মিকভাবে প্রকৃতিগতভাবে ঘটে থাকে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, খরা, ভূমিধ্বস, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি। এ ধরনের দুর্যোগে প্রতিবছর আমাদের দেশের বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে, ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়, ঘরবাড়ি ও অনেক স্থাপনা নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে এবং মানবিক সাহায্যের দরকার হয়।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা : বাংলাদেশে বন্যা, খরা, রোগজীবাণু অনেক মানুষের জীবন ও সম্পদ কেড়ে নিয়েছে অনেক বার। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। বাংলাদেশের ১৯৮৮ সালের বন্যার ভয়াবহতা ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। দেশের প্রায় জেলায় একযোগে বন্যা কবলিত হওয়ায় মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করেছিল। এছাড়া এ বন্যায় অনেক মানুষ মারা গিয়েছিল এবং অনেক পশুপাখি মারা পড়েছিল এবং ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি ছিল বলে মানুষ প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ১৯৯১ সালে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার উপকূল দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মারা যায় দেড় লক্ষাধিক মানুষ। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপক ক্ষতি হলেও দক্ষিণ এশিয়ায় এর প্রকোপ অনেক বেশি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্যায় মানুষের

ব্যাপক ক্ষতি ও প্রাণহানি। খরায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষিখাত। ফলে কৃষিনির্ভর অর্থনীতি পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে প্রতিবছর বন্যা ও খরায় বাংলাদেশে ফসলের প্রচুর ক্ষতি হয় এবং মানুষের দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে।

প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায় : প্রকৃতির এ বিরূপ প্রভাব দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এ অবস্থার আরও অবনতি হবে। কাজেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার বড় উপায় হলো যে সমস্ত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে, সে সমস্ত কাজ না করা। যেমন, মানুষ পৃথিবীতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে বলে বাতাসে মানুষের ক্ষতিকর উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব কারণে প্রকৃতি বিরূপ হয়ে পড়ছে এবং নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাঝে মধ্যেই হানা দিচ্ছে। এরপরেও যথাযথ ব্যবস্থা নিলে পারলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে মানুষ রক্ষা করা যায়। যেমন যেসব কারণে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে তা বন্ধ করে একটি পরিবেশ বান্ধব সমাজ বিনির্মাণ প্রয়োজন। জনগণকে ঘুর্ণিঝড়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য যথাসময়ে আগাম সতর্কবার্তা প্রদান করা আবশ্যক। বন্যার সময় ও বন্যা পরবর্তী অসহায় মানুষকে সাহায্য দিয়ে তাদের মৃত্যু ও কষ্ট লাঘব করা সম্ভব। এ ছাড়া দুর্যোগের পরেও পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন, দুর্যোগ প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষে অবকাঠামোগত ও সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ। বর্তমানে বাংলাদেশে দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে পূর্বের তুলনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হয়।

উপসংহার : বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়। এসব দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষে বাংলাদেশে উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষিত লোকের অভাব রয়েছে। এসব সমস্যা দূর করে দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা হ্রাস করা সম্ভব। মানুষের মধ্যে পূর্বের তুলনায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতির পরিমাণও হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে সরকারের পদক্ষেপ আরও যথাযথ হলে মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ অতিক্রম করে আবার নতুনভাবে বসবাসের পথ খুঁজে পাবে বলে সবার ধারণা।

বাংলাদেশের ঋতুবৈচিত্র্য

ভূমিকা : বাংলাদেশ ঋতুবৈচিত্র্যের এক অপার লীলাভূমি। মূলত এই ভূ-খণ্ডে রয়েছে ছয়টি ঋতু, যা পৃথিবীতে বিরল। ছয়টি ঋতু হল– গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। এক এক ঋতুর এক এক রকম বৈচিত্র্য। এই ঋতুগুলো আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। জীবন-জীবিকার সাথে সাথে ঋতুগুলো আমাদের আনন্দেরও উৎস হিসাবে কাজ করে। এক এক ঋতু সারা বাংলাদেশকে সৌন্দর্যে, ফুলে, ফলে, শস্য-সম্ভারে ভরিয়ে তোলে। আবার এই ঋতুর প্রভাবেই কবি মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে; জন্ম দেয় অমিয় সুধার মতো অসংখ্য কবিতা। এখানে রয়েছে যেমন গ্রীষ্মের রুদ্র মূর্তি, তেমনি রয়েছে শরৎ, হেমন্তের মতো আরামদায়ক ঋতু। শীত যেমন আসে জীর্ণতা নিয়ে, তেমনি বর্ষা সিক্ততায় ভরিয়ে দেয় এই ভূ-খণ্ডকে। আবার বসন্ত ভরে দেয় ফুলে ফুলে বন আর উপবন। এভাবেই ঋতু বৈচিত্র্য ধরা দেয় আমাদের সোনার বাংলাদেশে।

ঋতুবৈচিত্র্য ও ভৌগোলিক কারণ : বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণেই বিচিত্র ঋতুতে সমৃদ্ধ হয়েছে। কেননা, বাংলাদেশের উত্তরাংশে রয়েছে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বিশাল জলরাশি বঙ্গোপসাগর। ভৌগোলিকভাবে এর ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করায় ঋতুর বিচিত্রতা লক্ষ করা যায়।

গ্রীষ্ম : বাংলাদেশে ঋতুচক্র শুরু হয় গ্রীষ্ম দিয়ে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস মিলে গ্রীষ্ম ঋতু। এ-সময় প্রকৃতি তার রুক্ষতার দুয়ার খুলে দেয়। তখন জনজীবন থেকে শুরু করে প্রকৃতির মধ্যে নেমে আসে বিবর্ণতার ছায়া। এ-যেন এক রুক্ষ মেজাজের সন্ন্যাসী। মাঠ, ঘাট, পুকুর, নালা শুকিয়ে যায় এবং জলের জন্য এক ধরনের হাহাকার লেগে যায় প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতিকে নতুন করে সাজানের জন্যই যেন গ্রীষ্মের আপ্রাণ চেষ্টা। সে দুঃখের পরে সুখের বার্তাবাহকের মতো কাজ করে। কৃষক, মজুর, জেলে, মাঝি সবার মধ্যে বেঁচে থাকার সংগ্রামের জন্য এক ধরনের দৃঢ়তার জন্ম দেয়।

বর্ষা : গ্রীষ্মের দাবদাহের পর আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস বর্ষাকে স্পষ্ট করে তোলে। বর্ষা আসে যেন সমস্তরুক্ষতাকে ধুয়ে মুছে দিতে। নির্জীব প্রাণে ফিরে আসে সজীবতার অনিঃশেষ ছোঁয়া। তখন প্রকৃতির সাথে সাথে কবি মনও যেন বৃষ্টিকে আলিঙ্গন করতে চায় বিশাল ব্যাকুলতায়। তাই তো 'রূপসী বাংলা'-র কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন–

এই জল ভাল লাগে;– বৃষ্টির রূপালী জল কত দিন এসে
ধুয়েছে আমার দেহ– বুলায়ে দিয়েছে চুল– চোখের উপরে
তার স্নিগ্ধ শান্ত হাত রেখে কত খেলিয়াছে,–

বর্ষা পল্লী-প্রকৃতি ভিজিয়ে দিয়ে নতুন সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে হাজির হয়। বর্ষায় নিচু ভূমি ডুবে যায়। নদীর দুকূল প্লাবিত হয়ে যায়। মনে হয় আমরা পানির ওপর ভাসছি। তাই তো ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ. পি. জে. আব্দুল কালাম বাংলাদেশ সম্পর্কে বলেছেন– You are water people. আবার, অতিরিক্ত বর্ষণে জন জীবনে নেমে আসে দুর্ভোগ। এভাবেই বর্ষা মূলত বাংলাদেশের মানুষের জীবনকে রাঙিয়ে দিয়ে যায় বহু বিচিত্রতায়।

শরৎ : ভাদ্র ও আশ্বিন মিলে দেখা দেয় শরৎ।শরতের কথা মনে পড়লে প্রথমেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে আসে কাশফুল, নীলাকাশে সাদা মেঘের ভেলা, সুন্দর মনোরম আবহাওয়ার কথা। শরতের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি তাই বলেছেন–

শরতের শোভা, বড় মনোলোভা মুগ্ধ আজিকে আঁখি,
মহা-শিল্পীকে খুঁজে খুঁজে ফেরে খাঁচায় বদ্ধ পাখি।

কবির মনে হয়, এ-যেন অলৌকিক এক শিল্পীর আঁকা প্রকৃতির ছবি। আর সেই 'মহা-শিল্পীকে'-ই যেন মুগ্ধ মানুষ খুঁজে ফেরে। এছাড়া শরৎকালে শিউলি ফুলের গন্ধ, জ্যোৎস্নারাত যেন তার আপন মহিমায় বাংলার প্রকৃতিকে ভরিয়ে দেয়।

হেমন্ত : কার্তিক আর অগ্রহায়ণ মিলে হয় হেমন্তকাল। হেমন্তকাল সোনালি ফসলসহ যেন পূর্ণতার প্রতীক হয়ে ধরা দেয়। পাকা ধান এ-সময়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। কৃষকের মুখ হাসিতে ভরে দেয় এ-ঋতু। এ-ঋতু যেন কৃষকের সরল হাসির মতোই সুন্দর। এ-সময় শীতের আমেজ এসে ধরা দেয় বাংলার প্রকৃতিতে। এ-ঋতু শীত-সন্ন্যাসীর আগমনী বার্তাবাহকের ভূমিকা পালন করে। এ-সময় বাংলার কৃষকের ঘরে ঘরে শুরু হয় নবান্ন উৎসব। যা বাঙালি সংস্কৃতির চিরায়ত রূপ। তাই তো এ-ঋতুর প্রতি মানুষের মুগ্ধতার শেষ নেই।

শীত : পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীত কাল।শীত বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা বয়ে নিয়ে আসে। যেন কুয়াশার চাদর দ্বারা মোড়া এক ধ্যানস্থ সন্ন্যাসী। এ-সময় প্রকৃতি বিবর্ণ হয়ে যায়, গাছের পাতা খসে পড়ে যায়। সূর্য যেন মুখ ফিরিয়ে নেয় প্রকৃতি থেকে। এ-ঋতু ধনিদের জন্য যতটা আরামের গরিবদের জন্য ততটা আরামের নয়। কারণ, গরিব মানুষ গরম পোশাকের অভাবে দুর্ভোগ সহ্য করে। ধনিদের মধ্যে মানবতা ও সহানুভূতির একটা নমুনা বোঝা যায়, যখন তারা শীতার্ত গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ায় গরম কাপড় নিয়ে। এ-ঋতুতে অনেক শাক-সবজি পাওয়া যায়, যা আমাদের শরীরে ভিটামিনের চাহিদার অনেকটাই পূরণ করে।

বসন্ত : বসন্ত যেন ফুলের সবুজ পাতায় ভরে ওঠার, নতুনের বার্তা নিয়ে আসার ঋতু। একে বলা হয় ঋতুরাজ। তাই তো কবি এ-ঋতুর কথা বলতে গিয়ে বলেন–

জরাজীর্ণতা কুহেলিকা ভেদী আসিয়াছে ঋতুরাজ।
তার আগমনে বন-উপবন ধরিয়াছে নব সাজ।

এ-ঋতুতে প্রকৃতি যেন বিচিত্র ফুলের পসরা সাজিয়ে বসে থাকে। চারিদিকে যেন ফুলের মেলা। আর আমরা হয়ে উঠি তার মালি। দখিনা বাতাস বাতাবি নেবু, আমের মুকুলের গন্ধে অধীর আকুল হয়ে ওঠে। কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিমুলের লালে চারিদিকে যেন নান্দনিক আগুন ধরে যায়। কোকিল তার আপন মহিমায় গেয়ে ওঠে আগমনী গান। এভাবেই বসন্ত তার রূপ, রস, গন্ধ ঢেলে দেয় প্রকৃতি মাঝে। প্রত্যাশা দীর্ঘ হলেও প্রাকৃতিক নিয়মেই এই ঋতু স্থায়ী হয় ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস।

উপসংহার : ঋতুর নানা বিচিত্রতায় বাংলাদেশ যেন একটি চলচ্চিত্রের মতো হয়ে উঠেছে। প্রতিটি ঋতু যেন চলচ্চিত্রের এক একটি রঙিন দৃশ্য। এক এক রূপ নিয়ে এক এক ঋতু আসে আর যায়। প্রতিটি ঋতু মেজাজে ভিন্ন। গ্রীষ্ম যেমন রুক্ষতার প্রতীক, বর্ষা তেমনি সিক্ততার প্রতীক। শরৎ যেমন স্নিগ্ধতার প্রতীক, হেমন্ত তেমনি পূর্ণতার প্রতীক। শীত যেমন বিবর্ণতার প্রতীক, বসন্ত তেমনি সজীবতার প্রতীক। এই বৈচিত্র্য বাংলাদেশের মানুষের চরিত্রে এনেছে বিশিষ্টতা। এভাবেই যুগ যুগ ধরে ফুটে আছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডের একটি বৃন্তে ছয়টি ঋতু।

শীতের একটি সকাল

তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। আমি স্বভাবতই আর দশটা ছেলে-মেয়ের মতোই দুরন্ত ছিলাম। পল্লীর শীতের সকালের সঙ্গে আমার সেই দুরন্তপনা নানাভাবে জড়িয়ে আছে। তখন সকালে উঠে খেজুর রস খাওয়ার জন্য গিয়ে দাঁড়াতাম মায়ের পাশে। কখনো বা চলে যেতাম পুকুরের ধারে খেজুর গাছের পাশে, যেখানে গাছি তার বিশেষ কৌশলে হাড়ি ভর্তি রস নিয়ে গাছ থেকে নেমে আসত। তারপর রস নিয়ে আসলে আমরা দুরন্ত ছেলেমেয়েরা পাটকাঠির নল দিয়ে রস খেতাম আর বৃদ্ধ মানুষের মতো ঠকঠক করে কাঁপতাম। আবার কখনোবা বাড়ির পাশেই রোদে পিঠ ঠেকিয়ে তুলতে যেতাম মটরশুঁটি। এভাবে আমার ওই বয়সের শীতের সকাল নানা দুরন্তপনা আর আনন্দে ভরা থাকত। তবে শীতের একটি বিশেষ সকাল আমার স্মৃতিতে আজও অম্লান হয়ে আছে।

আমার বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক এবং আপাদমস্তক একজন কবি ও সুপণ্ডিত। তিনি প্রায়ই আমাকে মধুমতি নদীর কূলে বা বিলের ধারে হাঁটতে নিয়ে যেতেন। একই ধারাবাহিকতায় বাবা একদিন এক শীতের খুব সকালে আমাকে ডাকলেন। আমি এবং বাবা হাঁটতে হাঁটতে সেই শীতের সকালে গেলাম বিলের দিকে। অবশ্যই যেতে হলো খালি পায়ে। কারণ, বাবা বলতেন, 'সকালের শিশির খালি পায়ে স্পর্শ করা চোখের দৃষ্টিশক্তির জন্য উপকারী।' বাবা আরো বলতেন, 'সকালবেলার হাওয়া, হাজার টাকার দাওয়া।'

সেই সকালে বাবা আমার হাত ধরে বিচিত্র জ্ঞানগর্ভ কথা বলতে বলতে এগিয়ে চললেন গ্রামের বাইরের বিলের মধ্য দিয়ে যাওয়া শিশির ভেজা মেঠো পথ ধরে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, বাবা শিশিরের স্পর্শ নিয়ে বললেন দেখো দেখো, 'অরুণ কিরণে শিশির বিন্দু মুক্তার মতো ঝিকিমিকি করছে।'

আমি বাবাকে বললাম, 'এর মানে কী?'

বাবা বললেন, 'অরুণ মানে সূর্য। কিন্তু এটি সকালের সূর্য। তার কিরণে শিশির বিন্দু যেন মুক্তার মতো জ্বলজ্বল করছে।'

সত্যি তাই। দুর্বা ঘাসের সবুজ কার্পেটে মোড়ানো রাস্তার সামনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে মনে হলো আমরা যেন মুক্তা বিছানো এক রাস্তার মাঝ দিয়ে হেটে যাচ্ছি।

আমি চারিদিকে লক্ষ করলাম। দেখলাম, পূর্বদিকে এক ঝাঁক বক উড়ে যাচ্ছে, যেন ভেজা কুয়াশার স্তর ভেদ করে কোনো উষ্ণতার খোঁজে। আমি বিলের ধারে কিছু অপরিচিত পাখি দেখে বাবাকে বললাম, 'এ-পাখিগুলো তো আগে দেখিনি।'

বাবা বললেন, 'এরা অতিথি পাখি। সুদূর সাইবেরিয়া থেকে বা আরো ঠাণ্ডার দেশ থেকে এসেছে।'

বাবাকে প্রশ্ন করলাম, 'সাইবেরিয়া কোথায়?'

বাবা তখন তাঁর ভূগোলের বই যেন আমার সামনে তুলে ধরলেন। আর আমি সুবোধ ছাত্রের মতো তা গ্রহণ করতে লাগলাম।

মাঝে মাঝে দু-একটি পানকৌড়ি দেখলাম বিলের কচুরিপানার মধ্যে। তারা এই ভোরে জনশূন্য রাস্তায় আমাদের দেখে যেন অবাক হয়ে গলা বাড়িয়ে তাকালো। আবার একটু ভয়ও যেন পেল বলে মনে হল। তবু তারা উড়ল না। আবার ঘাপটি মেরে থাকল শীতের প্রচণ্ড প্রতাপে।

দেখলাম দূর্বা ঘাসের কার্পেটে মোড়ানো পথের একপাশে মটরশুঁটির ডগার ওপর শিশিরের বিন্দু। মনে হলো মটরশুঁটি যেন মুক্তার অলংকার পরে আছে।

বাবার হাত ধরে কবি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাশ, জসীমউদ্দীনের কথা শুনতে শুনতে বাড়ি ফিরে দেখি ভাপা পিঠার সমারোহ। মা আমাদের পিঠা খেতে দিলেন। আমরা পরিবারের সবাই মিলে বারান্দায় পাটি পেতে পিঠা খেতে থাকলাম, যেন সবাই মিলে এক ফালি মিষ্টি রোদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পিঠা খাচ্ছি। সেই স্মৃতি, সেই মধুরতা, সেই অমৃত বচন, সেই শীতের সকাল আর কি ফিরে পাব!!

ঝড়ের রাত

আমাদের দেশে ঝড় কোনো পুরাতন বিষয় নয়। এটি ঋতু চক্রের সাথে সাথে এসে আমাদের জন জীবনে এক গভীর রেখাপাত করে যায়। ঝড়কে গ্রামপ্রধান বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে অন্যতম বলে মনে করা হয়। গ্রামাঞ্চলে বাড়ি অথচ ঝড়ের স্মৃতি নেই এমন মানুষ বোধ করি পাওয়া মুশকিল হবে। তবে সেই ঝড়ের স্মৃতি যদি হয় রাতের, তাহলে তা হয়ে ওঠে একটু ভীতিকর। আমার স্মৃতিতে রয়েছে এমনি এক ঝড়ের রাত। পরে জেনেছি ওই রাতের ঝড়টি ছিল স্মরণকালের ভয়াবহ ঝড়গুলোর অন্যতম।

আমি তখন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। আমি গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করি। যথারীতি গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস। দুই-তিন দিন ধরে প্রচণ্ড গরমে কাটল। এত গরম যে, জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতিতে এতটুকু বাতাসও ছিল না। প্রকৃতির মধ্যে সন্ন্যাসীর গাম্ভীর্য বিরাজ করছিল।

সকালবেলা বাবা বললেন, 'নিশ্চয় কোথাও নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে।'

বাবাকে বললাম, 'নিম্নচাপ হলে তো ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে!'

বাবা বললেন, 'ঠিকই বলেছ। আজ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। দেখছ না প্রকৃতি কেমন সন্ন্যাসীর মতো যেন দম বন্ধ করে আছে। অচিরেই সে তার দম ছাড়বে তীব্র বেগে। কতক্ষণ আর দম বন্ধ করে রাখবে বল? ঝড়-বৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।'

তীব্র গরম আর গুমোট আবহাওয়ায় আমাদের বিকেলবেলার খেলাটা সেদিন ভালো জমল না। খেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার পথে সন্ধ্যাবেলাতেই দেখলাম উত্তর পশ্চিমাকাশে কালো মেঘের আবরণ; একটু হাওয়াও বইছে। মা বললেন, 'মনে হয় ঝড় হবে। কোথাও যেন যেও না।' আমি বাড়িতে আছি। বাবা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছেন। আমরা ভাই-বোন এক সাথে বাড়িতে। একই ঘরে অবস্থান করছি।

এদিকে সন্ধ্যার পর থেকে দমকা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। রাত যত গড়াতে লাগল বাতাস ততো প্রবল বেগে বইতে শুরু করল। প্রথমে একটানা বাতাস এবং ক্রমে তা দমকা হাওয়ায় রূপ নিতে লাগল। ঝড়ের তীব্রতা রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এতটা বাড়তে লাগল যে, মনে হচ্ছিল যেন সব ভেঙে-চুরে নিয়ে যাবে। ঝড়ের তীব্রতার সঙ্গে ছিল মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঝলকানি আর বজ্রপাতের শব্দ। বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম, আমাদের উঠানের পাশের দেবদারু গাছ মাঝে-মধ্যেই প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কে যেন গাছটিকে জোর করে ঘাড়ে ধরে তার মাথা মাটিতে চেপে ধরছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে, আবার চেপে ধরছে। ঘরের কাছে কাঁচা-মিঠা আম গাছ থেকে প্রচুর আম পড়ে যাচ্ছে তা আমরা বুঝতে পারছি। অন্যদিন হলে আম কুড়ানোর লোভ হোতো। কিন্তু আজ সেকথা একবারও মনে এল না। কারণ ঝড়ের তীব্রতায় আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড ভয় ঢুকে গিয়েছিল।

আমরা যে-ঘরে ছিলাম, তা টিনের চালা এবং শক্ত কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরি ছিল। তা যেন দমকা হাওয়ায় উড়ে যেতে চায়। মনে হচ্ছিল কে যেন উপর থেকে ঘরের চাল ধরে টান দিচ্ছে। বাবা মাঝে-মধ্যে ঘরের শক্ত কাঠের খুঁটি ধরে দেখছিলেন তা নড়ে কি না। এবং বাবা দেখলেন খুঁটিও মাঝে-মধ্যে নড়ে নড়ে উঠছে। এতকাল আমরা আমাদের যে ঘরটিকে অনড় আর নিরাপদ মনে করতাম, সেই ঘরটিকেও আজ দুর্বল মনে হতে লাগল। মা দোয়া পড়তে থাকলেন। বাবা আমাদের কী করতে হবে ঐ মুহূর্তে তা বলে দিচ্ছিলেন। আমরা পাশের বাড়ি থেকে কান্নার চিৎকার শুনতে পেলাম। তারা ছিল দরিদ্র, তাই তাদের ঘর অতটা শক্ত ছিল না। তখন আমার বাবা তাদেরকে আমাদের ঘরে আশ্রয় নেওয়ার জন্য চিৎকার করে আহবান করলেন।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আকাশের বিদ্যুতের আলোই তখন ভরসা। এমন অবস্থায় প্রতিবেশী কয়েকজন ছেলে-বুড়ো আমাদের বাড়িতে ওই ঝড়ের মধ্যে ছুটে এসে আশ্রয় গ্রহণ করল। শোনা গেল তাদের ঘরের চালা উড়ে গেছে। এবং আশেপাশে বেশ কিছু গাছ পড়ে অবস্থা আরো বেগতিক। এরমধ্যে মাঠের মধ্যে বাড়ি বানানো লোকজন ছুটে এসে আমাদের কাছারি ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। টানা তিনঘণ্টা তীব্র ঝড়ের পর যখন বাতাসের বেগ থেমে গেলে দেখা গেল, আমাদের বাড়ির পাশের সব আমগাছ থেকে সব আম ঝরে গেছে, নারিকেল পড়ে গেছে, তিন চারটি মেহগনি গাছ পড়ে

গেছে। বাড়ির পাশের সবচেয়ে বড় আমগাছটি শিকড়সুদ্ধ উপড়ে গেছে। এটি ছিল আমাদের কাছে অভাবনীয়। আমগাছটিকে দেখে মনে হচ্ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত বীরের মতো। যারা আশ্রয় নিতে এসেছিল তাদের জন্য কিছু শুষ্ক খাবারের ব্যবস্থা করলেন মা।

সকালে দেখা গেল চারিদিকে ঘর-বাড়ি, গাছপালা পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। গ্রামে অনেকের গবাদি পশু মারা গেছে। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। মনে করা হয় এটি ছিল স্মরণকালের কালবৈশাখী ঝড়গুলোর অন্যতম। যা আমার স্মৃতিপটে এখনো দাগ কেটে আছে।

নৌকায় ভ্রমণের একটি অভিজ্ঞতা

ভূমিকা : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। যার অর্থ নদী মাতা যার। অর্থাৎ বাংলাদেশ নামক যে ভূ-খণ্ডটি আছে, তার মা হলো এই নদী। কেননা বাংলাদেশ হলো নদীর গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া একটি ভূ-খণ্ড। সংগত কারণেই নদীতে যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে বহু প্রাচীন কাল থেকে আমরা ব্যবহার করি নৌকা। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদী আর নৌকা বাঙালির গর্বিত উত্তরাধিকার। যে-বাংলাদেশের মানুষের রক্তে মিশে আছে নদী আর নৌকা সেখানকার মানুষের জন্য নৌকা ভ্রমণ কতটা আনন্দের তা সহজেই অনুমান করা যায়। আমি গ্রামে জন্ম নেওয়ায় নদী ও নৌকার সাথে রয়েছে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। একদিনের নৌকা ভ্রমণ এখনও আমার স্মৃতিপটে বিশেষ ছাপ রেখে গেছে। নৌকা ভ্রমণের সেই অভিজ্ঞতা আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য স্মৃতিগুলোর অন্যতম।

আমি তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। আমাদের স্কুল থেকে মধুমতি নদী ভ্রমণ এবং বনভোজনের উদ্দেশ্যে একটি আয়োজন করা হয়।

যাত্রার বিবরণ : তখন ছিল শরৎকাল। সবেমাত্র বর্ষাকাল শেষ হয়েছে। সকালের আকাশে ঝলমলে রোদ আরামদায়ক আবহাওয়া। আমি কয়েকদিন যাবৎ এ-বিষয়টি নিয়ে উত্তেজিত ছিলাম। যাত্রার আগের রাতে প্রায় ঘুমই হয়নি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রস্তুত হয়ে সোজা স্কুলে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি সব বন্ধু এসে পৌঁছেছে। সবার মধ্যে টান টান উত্তেজনা। আমরা বড় একটা নৌকা ভাড়া করেছিলাম সারাদিন ঘোরার জন্য। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী সাথে ছিলেন।

সকাল নয়টায় আমরা নৌকায় উঠে নাস্তা করে যাত্রা শুরু করলাম। পূর্ব দিগন্তে সূর্য পরিষ্কারভাবে কিরণ দিচ্ছিল। আমাদের নৌকা যখন কূল ধরে চলছিল, লক্ষ করলাম, আমাদের নৌকার পালে বাতাস লেগেছে। মৃদু-মন্দ বাতাসের সাথে সাথে দুকূলে কাশফুলের দোল খাওয়া দেখে আমার মন ময়ূরের মতো নেচে উঠল। রাশি রাশি জল মৃদু-মন্দ বাতাসে সামান্য ঢেউ সৃষ্টি করে আমাদের নৌকাকে দোলাচ্ছিল। এদিকে নীলাকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছিল ভিনগ্রহ থেকে পরীরা এসে পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ চোখ ভরে উপভোগ করছে। দূরে দেখলাম সাদা গাঙচিল, মাছরাঙা, দু-একটি বক মাছের সন্ধানে উড়াউড়ি করছে। এগুলো যেন নদীর সৌন্দর্যকে আরো বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। অসংখ্য মাছ ধরার নৌকা দেখলাম। সেসব নৌকায় জেলেরা মাছ ধরছে; রূপালি মাছ। এছাড়া নদীর ঘাটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খালি গায়ে গোসল করছে আর লাফালাফি করছে। এ-যেন তাদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। গ্রামের বধূরা এখানে এসেছে জল নিতে এবং গোসল করতে। তাদের কলসি কাঁখে চলা যেন আবহমান বাংলার চিরন্তন দৃশ্য। তখন আমার বিখ্যাত ঐ গানটির কথা মনে পড়ে গেল–

এখানে রমণীগুলো নদীর মতো,
নদীও নারীর মতো কথা কয়।

হঠাৎ করে আমার এক বন্ধু শুশুক দেখে অনেকটা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু আমাদের এক শিক্ষক বোঝালেন যে, এ-প্রাণীটি ক্ষতিকর নয়। তারা নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য পানির উপরে নাক উঁচিয়ে ধরে। নদীর ধারে ছোট ছোট গ্রামের দৃশ্য নৌকা ভ্রমণের মাধ্যমে ছাড়া আর কোনভাবে উপভোগ করা যায় কি না আমার জানা নেই।

আমরা দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য নদীর তীরের একটি বাজারে গিয়ে পৌঁছলাম। ঘাটে নৌকা বেঁধে খাওয়া শেষ করে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার ফেরার জন্য প্রস্তুত হলাম। এবার আমরা ফিরলাম নদীর অন্য তীর দিয়ে। ফেরার সময় যে তীর দিয়ে আসলাম সেই তীর ঘেঁষে ছিল সবুজ ফসল। সে-সবুজ ফসল বাতাসে দোল খাওয়ার সাথে সাথে মনে হলো যেন

কৃষকের হাসি দোল খাচ্ছে, যা সত্যি অপূর্ব। চোখে না দেখলে তার মর্ম বোঝা যাবে না। ফেরার পথে নদীর দুকূলে সারি সারি সবুজ গাছ দেখে মনে হল কবির সেই গানের কথা–

সবুজ শাড়ি পরি কত না নারী।
দাঁড়ায়ে রয়েছে তারা সারি সারি।

এভাবে সন্ধ্যা যত ঘনিয়ে এল, নদী যেন তার মৃদু-মন্দ ঠাণ্ডা বাতাসের বেগ আরো বাড়িয়ে দিল আমাদের শীতল করার জন্য। মনে হল, নদী সত্যিই মায়ের মতো; অতি আদরে-যত্নে যেন আমাদের সন্তান-স্নেহে লালন পালন করছে আবহমান কাল ধরে।

উপসংহার : নৌকা ভ্রমণ না করলে হয়ত বুঝতাম না নদী কতটা নির্মল, কতটা মিত্র। আমাদের বাঙালির জাতিসত্তার সাথে নদীর মিলন যেন বহুকাল ধরে। তাই প্রকৃতির খুব কাছাকাছি যেতে নৌকা ভ্রমণের কোন দ্বিতীয় বিকল্প আছে কি না আমার জানা নেই।

আমার জীবনের লক্ষ্য

ভূমিকা : মহাকাল ব্যাপক এবং বিস্তৃত। সেই তুলনায় মানুষের জীবন ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে এর ব্যাপ্তি খুব একটা কম নয়। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তি যুক্ত হয়ে অসংখ্য মানুষের কীর্তির ফলেই সৃষ্টি হয় মানব সভ্যতার উৎকর্ষ। কিন্তু এই মানব জীবনকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা দরকার। তা না হলে লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করা মানে হল মরুভূমিতে বালুর চাষ করার সমান। তাই জীবনের শুরুতে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে অর্থাৎ শ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা নিয়ে এগিয়ে চলার মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

লক্ষ্য স্থির করা প্রয়োজন কেন : ছেলেবেলায় শিশুরা যা দেখে তাতেই মুগ্ধ হয়। তাদের মধ্যে অনিঃশেষ মুগ্ধতার পাশাপাশি জন্ম নেয় স্বপ্ন। কেউ মহান আবিষ্কারকের আবিষ্কারের কথা জেনে হতে চায় আবিষ্কারক, আবার কেউ হতে চায় কবি সাহিত্যিকের মতো গুণী, উড়োজাহাজ দেখে কেউ হতে চায় পাইলট। নানামুখী স্বপ্ন তার সামনে হাতছানি দেয়। কেননা স্বপ্নই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। জীবনানন্দের ভাষায় বলতে হয়– 'মরণের হাত ধরে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে।'আর এই স্বপ্নের হাত ধরেই মানুষ সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কারণ মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। এই স্বপ্ন বা লক্ষ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে আমিও আমার জীবনের একটি লক্ষ্য বেছে নিয়েছি। তা হলো আমি ডাক্তার হব। জনসেবাই হবে আমার ব্রত।

চিকিৎসক হতে চাওয়ার কারণ : বাংলাদেশ একটি ছোট অথচ জনবহুল দেশ। এদেশে চিকিৎসাসেবা পাওয়া যেন এক মহা দুর্লভ বস্তুর মতো; বিশেষ করে গ্রামীণ জীবনে। আমাদের দেশে চিকিৎসকের সংখ্যা কম হওয়ায় গ্রামের গরিব অনেক রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। অথচ চিকিৎসার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়া এক শ্রেণির চিকিৎসকের মধ্যে এখন ব্যবসার মানসিকতা ঢুকে পড়েছে। ফলে বড় বড় চিকিৎসকদের নাগাল পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। যে-কারণে মানবসেবার ব্রত নিয়ে মানবসেবার বাতিঘর হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে চাই।

জীবনের লক্ষ্যে করণীয় : আমার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশোনার কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া বরাবরই আমার গণিতশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের প্রতি আলাদা দুর্বলতা রয়েছে। আমি বরাবরই বিজ্ঞান ও গণিতের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি। নানা আবিষ্কার ও প্রাণিবিদ্যার নানামুখী গবেষণায় আমার আকর্ষণ থাকায় পরিবারের সম্মতিতে নবম শ্রেণিতে আমি বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেছি। মাধ্যমিক স্তর পাশ করার পর উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে আমি বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করব। সেখানে আমার বাধ্যতামূলকভাবে জীববিদ্যা পড়তে হবে। আমি যদি পাঠ্যবই ভালমতো বুঝে পড়তে পারি তবে উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় আমি সাফল্যের কৃতকার্য হব বলে আশা রাখি। তারপর ভালভাবে চিকিৎসাবিদ্যা পড়া শেষ করে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে যেকোনো শাখায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে নিজেকে মেলে ধরব।

জনসেবা ও কর্মজীবন : জীবন যদি একটি বৃন্ত হয় তবে জনসেবা ও কর্মজীবন হলো সেই বৃন্তের দুটি সুবাসিত ফুল। এদিক বিবেচনায় বলা যায়, চিকিৎসা বিদ্যায় যতটা জনসম্পৃক্ত হয়ে সেবা করা যায়, অন্য পেশায় এ-সুযোগ খুবই কম। আমি

গ্রামের সহজ-সরল এবং সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের সেবার মাধ্যমে বেঁচে থাকতে চাই। কারণ ত্যাগের মধ্যেই চূড়ান্ত সুখ নিহিত। সুখ সম্পর্কে কবির এই চিন্তা সঠিক বলেই আমি মনে করি–

ত্যাগে ধরা দেয়, বিলাসে পালায়,
এমনই স্বভাব তার

তাই ত্যাগ ও সেবার মহানব্রত নিয়ে বাকি জীবন অতিবাহিত করতে পারলে সেটিই হবে চরম সার্থকতা। এছাড়া, আমি গ্রামে চিকিৎসাসেবার একটি পদ্ধতিগত মডেল তৈরি করতে চাই, যাতে চিকিৎসা-বঞ্চিত গ্রামের মানুষ পেতে পারে যথাযথ চিকিৎসা সেবা।

উপসংহার : প্রত্যেক পেশারই রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। তেমনি চিকিৎসাপেশা শুধু একটি পেশাই নয়, এর অন্তরে রয়েছে বিশিষ্টতা যা অন্য পেশায় খুঁজে পাওয়া কঠিন। এখানে জনসেবা বা মানবসেবার পাশাপাশি রয়েছে সুষ্ঠু সুন্দর জীবন যাপনের নিশ্চয়তা। তাই আমি ডাক্তার হতে চাই। এটি আমার ব্রত বা লক্ষ্য।

একটি নদীর আত্মকথা

আমি নদী পাষাণের বুক চিরে যেন তার স্নেহধারা হয়ে, বিস্তীর্ণ সমতলে বয়ে চলেছি মহাসমুদ্রের দিকে। সেখানেই আমার মিলন, সেখানেই আমার মরণ এবং সেখানেই আমার পূর্ণতা। আমার বুকে নিয়ে বয়ে চলা পলল দ্বারাই বাংলাদেশের জন্ম।

বহমানতাই আমার ব্রত। আমি দুকূল পাবিত করে পলিমাটি নিয়ে বয়ে চলি বাংলার বুক চিরে। আর গঠন করি ভূমি। সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে ভূমির বুক। আর হাসি ফোটে করুণ কৃষকের মুখে। ভাঙা-গড়া আমার ধর্ম। কখনো বিস্তৃত চর জাগিয়ে তুলি, আবার কখনো বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ ভেঙে একাকার করি। কারণ, এটি হলো আমার স্বাভাবিক প্রবণতা। আমি বয়ে চলি এবং চারপাশে পলিমাটির প্রভাবে ফুলে-ফলে ভরে ওঠে। কবির কবিতায় যেন আমার কথাই ধ্বনিত হয়। তাই তো কবি বলে থাকেন–

সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা
সোনার বাংলাদেশ।
যেদিকে তাকাই দেখিবারে পাই
সবুজ বরণ বেশ।

এটি আমার গুণেরই যেন পরোক্ষ প্রকাশ।

আমার বুকের ওপর দিয়ে চলে কত মালবাহী জলযান, মাঝি গেয়ে যায় গান। লঞ্চ জাহাজ চলে দাপটের সাথে। আমার তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে হাট-বাজার, গঞ্জ-গ্রাম, শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। সাদা বক, গাঙচিল, মাছরাঙা আমার ওপর দিয়ে উড়ে চলে যায়। আমি তাদের বেঁচে থাকার প্রধান সহায় হিসেবে কাজ করি। জেলেরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। আমি কখনো রুদ্র রূপ ধরণ করি, আবার কখনো শান্ত নির্মল রূপ ধারণ করি। আমার চরিত্রের মধ্যে আছে কঠোরতা ও কোমলতার এক অসামান্য রসায়ন। আমিই জনপদ গড়ে তুলতে সহায়তা করি, আবার তা ভেঙে নিতেও কুণ্ঠাবোধ করি না। কারণ আমার ওপর মনুষ্যসৃষ্ট নানা অত্যাচার হয়ে থাকে। ভূমি-দস্যুরা আমার বুকের ওপর মাটি ভরাট করে গড়ে তোলে স্থাপনা, আমার বুকের মধ্যে ফেলে দেয় নানা রকম বর্জ্য পদার্থ, আমার মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব করে তোলে বিলুপ্ত প্রায়। আমাকে নিয়েই আবার রচিত হয় কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্য। চলাই আমার ধর্ম। আমি সদ্য বিবাহিতা পলিবধূর মতো এঁকেবেঁকে চলি। তাই তো আমাকে নিয়ে কবি লিখে যান–

এখানে রমণীগুলো নদীর মতো,
নদীও নারীর মতো কথা কয়।

আমার স্বাভাবিক বহমানতায় সাহায্য করলে আমিও আমার দুকূলের জনপদ, জীববৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখব। কারণ, আমাকে আঘাত না করলে আমিও আঘাত করব না।

আমি বহুপথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। আমার চলার ছন্দ আছে। চলার ছন্দে নৃত্য করতে করতে যাওয়ার মাধ্যমে আমি চারপাশ সুজলা-সুফলা করে গড়ে তুলতে চাই। এটিই আমার প্রত্যয়।

দেশ গঠনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা

ভূমিকা : বলা হয় Knowledge is Power। অর্থাৎ 'জ্ঞানই শক্তি'। আর এই অমিত শক্তির ধারক হয়ে উঠতে পারে আমাদের দেশের ছাত্রসমাজ। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে, এই তারুণ্যই পারে পুরো সমাজ-রাষ্ট্রের চেহারা বদলে দিতে। কেননা ছাত্র সমাজই আগামী দিনের রাষ্ট্র পরিচালনার কাণ্ডারি হিসেবে কাজ করবে। তারাই পারে সমস্ত অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতিকে রুখে দিতে। তারা সুন্দর গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে সমস্ত আগামী পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজাতে পারে। সেজন্য অর্জন করতে হবে প্রকৃত শিক্ষা এবং লক্ষ রাখতে হবে অটুট। তা না হলে সমস্ত পরিশ্রম যে মরুভূমিতে বালুর চাষ করার মতো হবে।

ছাত্রসমাজের অতীত ইতিহাস : ছাত্রসমাজ বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডের স্বাধীনতার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, তা ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। **১৯৫২** সালের ভাষা আন্দোলনে এই ছাত্ররা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে ভাষার মান রক্ষা করেছে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। **১৯৬২** সালে শিক্ষার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন করেছে। **১৯৬৯**-এর গণঅভ্যুত্থানে ছাত্ররা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। আসাদের মতো কত শত তরুণ ছাত্র বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে। **১৯৭১** সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো। **১৯৯০**-এর গণআন্দোলনে স্বৈরাচার পতনের ক্ষেত্রে ছাত্ররা ছিল অগ্রগণ্য। ইতিহাসের এই রক্তাক্ত সিঁড়ি বেয়ে, ছাত্ররা জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে দেশ ও জাতির মান রক্ষা করেছে। এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস থেকে ছাত্ররা আগামী দিনে দেশ গঠনে গুরুত্ববহ ভূমিকা পালন করবে। কেননা মনে রাখতে হবে, যার গৌরবময় অতীত নাই, তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনেকটা ফিকে হয়ে যায়।

দেশের সমস্যা সমাধানে ছাত্রসমাজের করণীয় : মাঝে মাঝে নানামুখী সমস্যা সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের মধ্যে। সামাজিক অবক্ষয়, কুসংস্কার, দুর্নীতি, হানাহানি, মারামারি, গণতন্ত্রের অবক্ষয় নানামুখী সমস্যা এসে ভিড় করে। কেননা, সব সময় একটি রাষ্ট্রের বা দেশের অবস্থা শুধু উৎকর্ষ থেকে উৎকর্ষের দিকেই ধাবিত হয় না, অপকর্ষের দিকেও যায়। ফলে এ-সময় ছাত্রসমাজ পারে তাদের সর্বোচ্চ চেতনা দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে এসব সমস্যার সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে। কারণ, ছাত্রসমাজ থাকে সকল প্রকার স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে। ছাত্রসমাজ হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য লেজুড়বৃত্তির রাজনীতির সাথে সংযুক্ত না হয়ে, প্রগতিশীল চিন্তা নিয়ে নানামুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজের ভুলগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। ছাত্রসমাজের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য তাদের ইতিহাস পাঠে মনোযোগী হতে হবে। তারা বিশ্ব-ইতিহাস পাঠ করার মাধ্যমে বর্তমানের ভুলগুলোকে শুধরে দিতে পারবে। কেননা, ছাত্রদেরও রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দীর্ঘ ইতিহাস। প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে রয়েছে জাতিগঠনে সেই ব্যাপক সম্ভাবনা। ভুলে গেলে চলবে না, প্রতিটি ছাত্র হলো এক একটি বাতিঘর, আলোর দিশারি।

দেশ গড়ার ক্ষেত্রে ছাত্রদের করণীয় : ছাত্র জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম পড়াশুনা করা। কেননা, পড়াশুনা করে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সব রকম অন্ধকার দূর করা সম্ভব। ছাত্ররা সমাজের অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করার জন্য সচেতনতামূলক কাজ পরিচালনা করতে পারে। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্রদের হাতে অফুরন্ত সময় থাকে। তারা গণশিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে, সেখানে শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা দিতে পারে। ফলে শিক্ষার আলোয় সবাই উদ্ভাসিত হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন– 'শিক্ষা হলো পরশ পাথরের মতো, আর তা থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাই সংস্কৃতি।' এভাবে ছাত্রসমাজ সমাজ ও রাষ্ট্র, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ ঘটাতে পারে।

পাড়ার কোন জায়গায় ময়লা-আবর্জনা ফেলা দেখলে তা পরিষ্কার করা এবং এ-বিষয়ে জন সচেতনতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ছাত্ররা অগ্রণী হতে পারে।

কোথাও কোন দুর্নীতি অনিয়ম দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করা এবং যথার্থতা সম্পর্কে গণমানুষকে বোঝাতে পারে। এবং এ-ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে পারে।

কোন এলাকায় মাদকের ব্যবহার বেড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আইন শৃঙ্খলাবাহিনীকে খবর দেওয়া বা তাদের এ-ধরনের অপরাধমূলক কর্ম থেকে সরে আসার জন্য অনুরোধ করা বা বোঝানো ছাত্রদের দায়িত্ব। কেননা ছাত্ররা হলো জাতির বিবেকের একটি বড় অংশ।

এছাড়া, কোথাও কোন মানবিক বিপর্যয় দেখা দিলে ছাত্ররা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়লে এরকম সমস্যা থেকে উদ্ধার করা সম্ভব।

ছাত্ররা নারীর ক্ষমতোয়ন, নারীশিক্ষা, লিঙ্গ-সমতা বিধানে সব সময় সোচ্চার থাকবে। এভাবেই একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ গঠন করা সম্ভব।

ছাত্রসমাজ অবসর সময়ে কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কৃষির নতুন নতুন দিক শিখতে পারে। কেননা ভুলে গেলে চলবে না, গ্রামে প্রায় ৮০% লোক বসবাস করে এবং তাদের অধিকাংশ কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত। ছাত্ররা ইচ্ছা করলে সবুজ বনায়ন গড়ে তুলতে পারে। কারণ, যেভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে তা সত্যিই উদ্বেগের বিষয়। এভাবে প্রতিটি স্তরে ছাত্রসমাজ পারে দেশের সমৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং গুরুত্ববহ ভূমিকা পালন করতে।

উপসংহার : ছাত্রসমাজ একটি দেশের সম্পদ। এই সম্পদকে রক্ষণাবেক্ষণ করা রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্বগুলোর মধ্যে একটি। ছাত্রদের স্বদেশপ্রেমে জাগ্রত করা শিক্ষকদের দায়িত্ব। সততা, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাকার সুকুমার বৃত্তি জাগিয়ে তুলতে পারলে সমাজের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে নিমিষে। এই কাজটি সহজেই করতে পাও ছাত্রসমাজ। দেশ ও সমাজকে সুখী সুন্দর ও সমৃদ্ধ করতে ছাত্রসমাজের ভূমিকা অপরিসীম।

শ্রমের মর্যাদা

ভূমিকা : পৃথিবী সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের সাথে শ্রম একটি অনিবার্য বিষয় হিসেবে যুক্ত হয়ে আছে।। শ্রমের দ্বারা তিল তিল করে গড়ে উঠেছে এই সুবিশাল মানবসভ্যতা। এই শ্রমের কল্যাণে আমরা সভ্যতাকে এতদূর নিয়ে আসতে পেরেছি। এই বিশ্বসভ্যতা বিনির্মিত হয়েছে কায়িক শ্রম এবং মেধাগত শ্রমের মাধ্যমে। ফলে শ্রমের উভয় শাখাই সমান মর্যাদার দাবি রাখে। কায়িক বা মেধাগত যে-রকমেরই হোক, উন্নতির সোপান হল শ্রম। একারণেই বলা হয় Industry is the key to success।

যুগে যুগে শ্রমের মহাকাব্যিক ঐতিহাসিকতা : মানুষ নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রাত দিন সমান পরিশ্রম করেছে। এই প্রজন্মের পর প্রজন্মের যে শ্রম, তা দিয়ে রচিত হয়েছে এই মহাকাব্যিক সভ্যতা। বিখ্যাত মনীষী কার্ল মার্কসের মতে– 'শ্রমজীবীরাই সভ্যতা বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।' কিন্তু প্রথম দিকে এই শ্রমজীবীদের কোনো অধিকার ছিল না। তারা শুধু ক্রীতদাস ছিল এবং প্রভুর কথা মতো কাজ করত। কথা না শুনলে প্রহার করা হতো। পরবর্তীতে ইউরোপের সামন্ত প্রভুরা কৃষকদের সাথে দাসের মতো ব্যবহার করত। এরপর ইউরোপে হল শিল্প-বিপ্লব। এই শিল্প-বিপ্লবের প্রধান নিয়ামকও ছিল শ্রমিক-শ্রেণি। কিন্তু তারাও হয়েছে নানাভাবে নিষ্পেষিত। অবশ্য এরই মধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে অনেকাংশে অর্জিত হয়েছে শ্রমিকের মর্যাদা। এছাড়া বলশেভিক বিপবের মাধ্যমে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' শ্লোগান উঠেছিল। তার ধারাবাহিকতা এখনও বিদ্যমান। আমরা প্রতিনিয়ত শ্রমের মর্যাদার জন্য লড়াই করে যাচ্ছি।

শ্রমের অবদান : পৃথিবীর ইতিহাস বিনির্মাণে শ্রমিকের অনিঃশেষ শ্রমের মহিমার অবদান অনস্বীকার্য। শ্রম কেবল সমৃদ্ধিই ডেকে আনে না, তা মানুষকে দেয় সৃষ্টিশীলতার সুখ এবং নির্মাণের অপরিসীম আনন্দ। মানুষ এই শ্রমের দ্বারা করেছে বড় বড় আবিষ্কার। পৃথিবী ছিল এক সময় অন্ধকারময়। এডিসন বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করে এক যুগান্তকারী কাজ করে গেছেন। এটি সম্ভব হয়েছে এডিসনের নিরলস পরিশ্রমের ফলে। তাই ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। শ্রমের মাধ্যমে পৃথিবীর সব আশ্চর্যজনক কর্ম সম্পন্ন হয়েছে, যেমন– ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান, তাজমহলের মতো এত বড় কীর্তি সম্ভব হয়েছে মানসিক এবং কায়িক শ্রমের মাধ্যমে। এছাড়া, চাঁদে যাওয়ার মতো যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে শ্রম এবং অদম্য নিষ্ঠার দ্বারা। প্রবাদে আছে– পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। পৃথিবীতে যত সাফল্য এসেছে তা কেবল পরিশ্রমের মাধ্যমে এসেছে। শ্রম ছাড়া কোনো মহান সৃষ্টিকর্মই সম্ভব ছিল না।

সর্বপ্রকার শ্রমের মর্যাদা : শ্রম প্রধানত দুই প্রকার হয়ে থাকে– মানসিক বা মেধাভিত্তিক শ্রম এবং কায়িক শ্রম। পৃথিবীতে কেবল একমুখী শ্রম দিয়ে কোন মহান কর্ম সুসম্পন্ন হয়নি। মানসিক শ্রম বা মেধাভিত্তিক শ্রম সরল রেখায় চলে না, যেমন- কোন মহান চিন্তাকে যদি আমি বাস্তবে পরিণত করতে চাই তবে আমাকে কায়িক শ্রমের মুখোমুখি হতে হবে। তা ছাড়া

সম্ভব নয়। তাজমহল তৈরীর ক্ষেত্রে যে প্রকৌশলী কাজ করেছিলেন তা বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রায় দুই যুগ অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে নির্মাণ শ্রমিকদের। ফলে বলা যায়, এ দুই ধরনের পরিশ্রমে ফুটে ওঠে ফুল। আর সেই ফুলের সুবাস উপভোগ করে বিশ্ববাসী। তাই যেকোনো সৃষ্টি কর্মের পিছনে প্রয়োজন দুই ধরনের শ্রমের রসায়ন। তবেই সৃষ্টি হয় মহান সৃষ্টি কর্ম।

কেন শ্রম মর্যাদাশীল : কেউ যদি শুধু প্রার্থনা করে যে আমাকে শস্য দাও, তবে সে তা পাবে না। আর যদি প্রার্থনার সাথে সাথে পরিশ্রম করে তবে শস্য পাবে। আবার যদি শুধু পরিশ্রম করে তবে শস্য পাবে। ফলে শ্রম কখনো বিফলে যায় না। এর রয়েছে অনিঃশেষ সুফল। বড় বড় মনীষী প্রমাণ করেছেন, পরিশ্রম করে যে-কোন প্রকার অসাধ্যকে সাধ্যে পরিণত করা সম্ভব। অনেক মনীষী বলে থাকেন, অনিঃশেষ পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই প্রতিভাবান হয়ে ওঠা যায়। তাই ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু জাতীয় জীবনে পরিশ্রমের কোন বিকল্প নাই। মৌমাছি ক্ষুদ্র প্রাণী। দূর-দূরান্ত থেকে মধু সংগ্রহ করে তারা মৌচাক গড়ে তোলে। এতেই তাদের মর্যাদা, এতেই তাদের আনন্দ। এরকম হাজার হাজার উদাহরণ আমরা সমাজ-জীবন থেকে গ্রহণ করে শ্রমকে মর্যাদার শীর্ষে তুলে ধরতে পারি।

উপসংহার : পৃথিবীর ইতিহাস শ্রমজীবী মানুষের ইতিহাস। কেননা মাঠের করুণ কৃষক থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী পর্যন্ত সবাই যেন শ্রমের এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা বা অন্যকে অবজ্ঞা করার কোন সুযোগ নেই। এই শ্রমজীবী মানুষের হাতের পরশে পৃথিবী হয়ে উঠেছে স্বর্গের মতো। তাই শ্রমের মর্যাদা যুগে যুগে অক্ষুণ্ন থাকবে এবং আমরা ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত শ্রমের জয়গান গেয়ে যাব। এই হোক আমাদের ব্রত।

পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার

ভূমিকা : পরিবেশ এবং মানুষ পরিপূরক শব্দ-যুগল। পরিবেশই প্রাণের ধারক, জীবনীশক্তির যোগানদাতা। মানুষ বা প্রাণিকূল পরিবেশের সুস্থতার মধ্যে নিজেদেরকে অভিযোজিত করেছে। কিন্তু সেই পরিবেশ যদি ক্রমাগত দূষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিকূলকতার মধ্যে চলে যায়, তবে প্রাণিকূলের অস্তিত্ব পড়বে হুমকির মুখে। এটিই স্বাভাবিক। মানব সভ্যতার উৎকর্ষের সাথে সাথে পরিবেশের ওপর নানা রকম অত্যাচার আসে। আর তাতে বিপন্ন হয় এই মানব সভ্যতা। কিন্তু পরিবেশের এই দূষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা রয়েছে।

পরিবেশ দূষণের নানামুখী কারণ ও ফলাফল : পরিবেশ দূষণের নানামুখী কারণ রয়েছে। কোনো একটি বিশেষ কারণে পরিবেশ দূষিত হয় না। পরিবেশ দূষণের কিছু কারণ নির্দেশ করা যায় :

(১) **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ। আয়তনের তুলনায় এর জনসংখ্যা বেশি। প্রতিবর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১০৩৫ জন লোক বাস করে। আর এসব মানুষের জীবন-জীবিকার জন্য খাদ্য থেকে শুরু করে বস্ত্র পর্যন্ত সব পরিবেশের নানা উপাদান থেকে সংগ্রহ করতে হয়। ফলে পরিবেশের ওপর পড়ে ব্যাপক চাপ। উদাহরণস্বরূপ, জনসংখ্যা বেড়ে গেলে বন উজাড় হয়, আবাদী জমি কমে যায়, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়, শিল্পায়ন বেড়ে যায়, নগরায়ন বেড়ে যায়। ফলে নানামুখী কারণে পরিবেশ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

(২) **রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার :** কৃষিকাজে এখন ব্যাপকভাবে রাসায়নিক দ্রব্য, কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে উচ্চ ফলন হলেও পানি দূষণের মাত্রা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। যা সত্যিই মানুষের জন্য ভয়াবহ বার্তা বহন করছে। এছাড়া এ-রাসায়নিক পদার্থ থেকে বায়ু দূষিত হচ্ছে।

(৩) **কলকারখানা বৃদ্ধি :** কলকারখানা বৃদ্ধির ফলে কালো ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে, যা এসিড বৃষ্টি ঘটিয়ে জীব জগতের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে। এছাড়া, কলকারখানার বর্জ্য সরাসরি নদীর পানিতে গিয়ে পড়ছে। ফলে নদীগুলো হারিয়ে ফেলছে তাদের জীবনী-শক্তি। এভাবে মৎস্য সম্পদের ঘাটতি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। পাশাপাশি নদীর জীব-বৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখোমুখি হচ্ছে।

(৪) **অপরিকল্পিত ইটভাটা নির্মাণ :** অপরিকল্পিতভাবে যত্রতত্র ইটভাটা নির্মাণ করে মাটি কেটে আবাদী জমি নষ্ট করা হচ্ছে এবং বন উজাড় করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। ফলে মানুষ নানামুখী রোগব্যাধির মুখোমুখি হচ্ছে। কারণ ইটভাটার ধোঁয়া, বর্জ্য বা ছাই পার্শ্ববর্তী জমির ফসল নষ্ট করে উর্বরতা শক্তি নষ্ট করে দিচ্ছে।

(৫) **যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধি :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে যানবাহনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পেট্রোল, ডিজেল ব্যবহারের ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনো-অক্সাইড বৃদ্ধি পেয়ে জলবায়ুকে আরো উষ্ণ করে দিচ্ছে। এছাড়া জলযান থেকে যে-ধরনের তেল বর্জ্য পানির সাথে মিশে যাচ্ছে, তা নদী দূষণের বড় রকমের কারণ বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এর ফলে নদীর যত প্রাণী আছে সব হুমকির মুখে পড়ছে। এছাড়া যানবাহনগুলো থেকে যে বিষাক্ত ধোঁয়া বের হচ্ছে, তা মানুষের নানা রকম রোগ ব্যাধির জন্য দায়ী।

(৬) **বন উজাড় :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বন উজাড় হচ্ছে ব্যাপকভাবে। যেখানে বন থাকার কথা মোট আয়তনের ২৫% সেখানে বাংলাদেশে রয়েছে মাত্র ১৩%। এটা সত্যিই উদ্বেগের বিষয় যে, বনদস্যু থেকে শুরু করে দায়িত্বশীল কর্তা ব্যক্তিরা বন-উজারে নানামুখী অপতৎপরতা চালাচ্ছে। ফলে পরিবেশ তার ভারসাম্য হারচ্ছে।

(৭) **পানির নিচের স্তরের ব্যবহার :** পানির নিচের স্তরের ব্যবহারের ফলে পানির স্তর আরো নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকট বাড়ছে। এবং আর্সেনিকের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে চলছে। দেশের প্রায় ৬১টি জেলায় আর্সেনিক ধরা পড়েছে।

(৮) **বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব :** দেশের বড় বড় শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এক করুণ দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠে। এই অব্যবস্থিত বর্জ্য প্রতিনিয়ত দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং বায়ু দূষণ করে।

(৯) **উচ্চ-শব্দ :** শহরে শব্দ দূষণ এক বিপজ্জনক পর্যায়ে চলে গেছে। যত্রতত্র হর্ন বাজানো, বাজি-পটকা ফুটানো, জনবসতির মধ্যে বিমানবন্দর ও কলকারখানা স্থাপনের ফলে শব্দ দূষণ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় চলে গেছে। যার কারণে পরিবেশ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এছাড়া নষ্ট হচ্ছে সামাজিক পরিবেশ।

প্রতিকার : পরিবেশ দূষণের প্রতিকার এখনই না করলে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। কেননা পরিবেশ দূষণের সাথে সাথে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখোমুখি হচ্ছে। এ-থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া খুবই জরুরি:

(১) **বনায়ন সৃষ্টি :** বাংলাদেশে মোট বনভূমির শতকরা মাত্র ১৩ ভাগ বন রয়েছে। তা আরো বৃদ্ধির জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন। ফলে সামাজিক বনায়নকে একটি গণ-আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। বনায়নের জন্য পুরস্কার ঘোষণার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) **জ্বালানীর বিকল্প ব্যবহার :** আমরা যে ডিজেল, কেরোসিন, পেট্রোলের মতো জৈব জ্বালানী প্রতিদিন ব্যবহার করি, তার পরিবর্তে বাতাস, সৌর ও পানি-মাধ্যমে শক্তির ব্যবহার করলে পরিবেশ দূষণ অনেকাংশে কমে আসবে। সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে।

(৩) **শিল্পকারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :** শিল্প কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে ঐ বর্জ্য নদীতে গিয়ে নদীর কোন ক্ষতি না করতে পারে। এ-বর্জ্য পরিশোধনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে।

(৪) **কৃষিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানো :** কৃষি জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের দিকে নজর দিতে হবে। যাতে ফসল থেকে শুরু করে মাটি, পানি দূষণের হাত থেকে রক্ষা পায়।

(৫) **ইট ভাটায় বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার :** ইট ভাটায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বৃক্ষ নিধন কমিয়ে পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার আইনের মাধ্যমে তা করতে পারে।

(৬) **যত্রতত্র বর্জ্য না ফেলা :** শহরের নানা এলাকায় বর্জ্য থাকায় পরিবেশ নষ্ট হয়। এ-থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট স্থান। এই বর্জ্য আবার রিসাইক্লিং-এর মাধ্যমে নতুন কিছু তৈরি করা যায়।

(৭) **ক্রটিপূর্ণ যানবাহন ব্যবহার না করা :** ক্রটিপূর্ণ যানবাহন ব্যবহার করলে জ্বালানীর অর্ধ-দহনের ফলে কার্বন-মনো-অক্সাইডের মতো ক্ষতিকর গ্যাস মানব শরীরে প্রবেশ করে ব্যাপক ক্ষতি করে এবং ওজোন স্তর ছিদ্র করে দেয়। ফলে ক্রটিপূর্ণ যানবাহন ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা উচিত।

(৮) **সরকারের করণীয় :** সরকারের উচিত আইনের মাধ্যমে পরিবেশকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা এবং যারা পরিবেশের ক্ষতি করবে, আইনকে অমান্য করবে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মুখোমুখি করা।

(৯) **গণসচেতনতা বৃদ্ধি :** মানুষের মাঝে পরিবেশ সুস্থ রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে নানা প্রচার তুলে ধরা উচিত। তাতে করে পরিবেশ দূষণ রোধে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় আমরা পাব সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ।

(১০) **গণমাধ্যমের ভূমিকা :** আধুনিক যুগে গণমাধ্যমের যে যুগান্তকারী বিপব সাধিত হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই প্রিন্ট-মিডিয়া থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে মানুষ সচেতন হবে এবং দূষণ অনেকাংশে কমে আসবে। তাই নিয়ম করে গণমাধ্যমকে একাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উপসংহার : সুস্থ পরিবেশ, সুস্থ পৃথিবী– এই শোগানে যখন বিশ্ব-মানব মুখর, ঠিক একই সময়ে চলছে নির্বিচারে পরিবেশ দূষণের মহাযজ্ঞ। ফলে সবশ্রেণির মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলার মাধ্যমেই কেবল সম্ভব পরিবেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা। মনে রাখতে হবে আমাদের পরিবেশ আমাদের জীবন।

নারীশিক্ষা

ভূমিকা : বর্তমান সভ্যতা মানুষের ক্রমাগত শিক্ষার ফল। কেননা শিক্ষা হলো পরশ পাথরের মতো। শিক্ষার সংস্পর্শে আসলে মানুষের মন আলোকিত হয়ে যায়। তাই একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতিকে গঠনের পূর্বশর্ত হলো শিক্ষা। বিশ্বে মোট জনগণের প্রায় অর্ধেক নারী। অথচ এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ আজও কোন কোন সমাজে নিগৃহিত, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। একটি দক্ষ, মর্যাদাপূর্ণ, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীদের শিক্ষার সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পেটো তাঁর 'Republic' গ্রন্থে বলছেন– 'রাষ্ট্র যখন তার সকল নাগরিককে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা নিচ্ছে না, তখন সে রাষ্ট্র আর কী করছে তাতে কিছু যায় আসে না। শিক্ষাহীন নাগরিক সর্বার্থে অদক্ষ।' এ-বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝাই যাচ্ছে রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। নারী তার বাইরে কিছু নয়।

নারীশিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি : কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, ক্রমশ নারী হয়ে ওঠে। পুরুষশাসিত সমাজই তাকে করে রেখেছে ঘরমুখো। কিন্তু এক সময় যখন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তখন নারীর স্বাধীনতা ও সার্বিক মুক্তি ছিল। কিন্তু পুরুষের প্রাধান্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে নারী হয়ে যায় ঘরমুখো। এরপর নারীকে তার কাঙ্ক্ষিত মুক্তির জন্য করতে হয়েছে এবং হচ্ছে দীর্ঘ সংগ্রাম। মুক্তির জন্য নারী প্রয়োজন অনুভব করেছে শিক্ষা গ্রহণের। নারীশিক্ষার ইতিহাস পাঠ করতে গেলে দেখা যায়, প্রথমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় পাশ্চাত্যে। তাও বেশি দিনের কথা নয়। আধুনিককালে কিছু কিছু নারীর কথা জানা যায়। মেরি ওলস্টোন ক্র্যাফট (১৭৫৯-১৭৯৭)-এর সময়েও নারীশিক্ষা অতটা সহজসাধ্য ছিল না। তাঁর সময়ে নারীশিক্ষার সুযোগ ছিল সংকুচিত। কেননা বাসায় লেখাপড়ার তেমন সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের চেষ্টা শিক্ষা চালিয়ে যান।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের এখানেও নারীদের শিক্ষার কিছুটা ঢেউ পরিলক্ষিত হয়। তাও সহজ ছিল না। নারীদের জন্য ছিল না কোন বিশেষ স্কুল। দু-একটি থাকলেও সবার সেখানে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কেননা আমরা বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)-এর দিকে তাকালে বুঝতে পারি, তার জীবনে ব্যাপক সংগ্রাম করে শিক্ষা অর্জন করতে হয়েছে। নানা রকম কুসংস্কারে আবদ্ধ থেকে নারীশিক্ষা যুগে যুগে হয়েছে দলিত। এখনও এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা দেখছি নারীশিক্ষার অগ্রগতি খুব বেশি নয়; অন্তত পুরুষের তুলনায়। তারপরও নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে দৃপ্ত পায়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে দার্শনিক-সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, 'ইতিহাস সম্পর্কে যার কোন ধারণা আছে, তিনিই জানেন যে নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া কোন বড় সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।' অতএব, নারীকে সমাজ পরিবর্তনে সম্পৃক্ত করতে হলে অবশ্যই শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। তা বর্তমান বিশ্ব বুঝতে পেরেছে চমৎকারভাবে।

বর্তমানে নারী-শিক্ষার হালচাল : স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে যে গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা বাস্তবায়নের জন্য নারীর অংশগ্রহণ এক অনিবার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য শিক্ষায় অনগ্রসরদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত

করতে হবে। তবে সরকার নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বি.এ (পাস কোর্স) পর্যন্ত নারীশিক্ষা বিনাবেতনে করাসহ উপবৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে পুরুষের পাশাপাশি নারী-শিক্ষার্থীর সংখ্যাগত সমতার কথা উলেখ করা হয়েছে। এছাড়া নারীশিশু বিদ্যালয় থেকে যাতে ঝরে না পড়ে, সেজন্য সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শুধু শহরে নয়, গ্রামেও নারীশিশু-শিক্ষার পরিমাণ প্রায় অর্ধেক। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীরা খুব বেশিদূর এগিয়ে আসতে পারছে না। এজন্য সরকার টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

নারীশিক্ষা ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ : প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান অগ্রগতি সত্ত্বেও নারীশিক্ষার সামগ্রিক অবস্থা খুব একটা সুখকর নয়। ব্যাপক সংখ্যক নারী এখনও সেই প্রাচীন অন্ধ কুসংস্কারের প্রকোষ্ঠে বন্দী রয়েছে। নারীশিক্ষার অন্তরায় হিসেবে যে কারণগুলো বেশি চোখে পড়ে তা নিম্নরূপ−

১. কুসংস্কার নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়গুলোর মধ্যে একটি। এখনও গ্রামে প্রায় অশিক্ষিত মানুষ মনে করে নারীদের বেশি পড়ালেখা করতে নাই। তারা শুধু স্বামীর ঘরে অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে থাকবে।
২. বাল্যবিবাহের কারণে নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে। কারণ বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজে এখন একটি ব্যাধির মতো ছড়িয়ে গেছে।
৩. চরম দারিদ্র্য নারীশিক্ষার প্রধান অন্তরায় হিসাবে পরিগণিত হয়।
৪. নারীকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার জন্য যে সামগ্রিক পরিবেশ এবং অবকাঠামো প্রয়োজন, তা এখনো পুরোপুরিভাবে দৃশ্যমান নয়।
৫. পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এখনো নারীশিক্ষার অন্তরায় বলে মনে করেন শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ। এ-অবস্থা থেকে অর্থাৎ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরুষদের সরে আসতে হবে।

নারীশিক্ষা প্রসারে করণীয় : নারী আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। ফলে, সরকার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত নারীশিক্ষার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। কারণ, প্রগতি পুরুষের ক্রমবর্ধমান একক উন্নয়নের মাধ্যমে সম্ভব নয়। কেননা, কার্ল মার্কস আরো বলেন− 'নারীর সামাজিক অবস্থান দ্বারাই সমাজ প্রগতির মাত্রা নির্ধারণ করা চলে।' আর সেই প্রগতির জন্য নারীশিক্ষা প্রসারের উপায় বের করতে হবে। নারীশিক্ষা প্রসারে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে−

১. সরকার মাঝে মাঝে যে শিক্ষানীতি করে থাকে সেখানে নারীর শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
২. নারীরা যাতে নির্বিঘ্নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে সেজন্য সরকারের উচিত বিশেষ নিরাপত্তা বিধান করা।
৩. ঘন ঘন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলে নারীশিশুরা স্কুলে যেতে আগ্রহবোধ করবে। কোন প্রকার কষ্ট ছাড়া তারা স্কুলে গমন করতে পারবে।
৪. যদিও প্রাথমিক থেকে শুরু করে ডিগ্রি পর্যন্ত উপবৃত্তির ব্যবস্থা আছে, তবু বেশি পরিমাণ উপবৃত্তির ব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এ-ব্যবস্থা করলে নারীশিক্ষা বৃদ্ধি পাবে।
৫. নারীশিক্ষা অগ্রগতিকে সামাজিক আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে বিভিন্ন সংগঠন থেকে পরিবার পর্যন্ত সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সমাজ বা রাষ্ট্র যদি হয় একটি দুই চাকার গাড়ি, তবে নারী সেই গাড়ির এক চাকা আর পুরুষ তার অন্য চাকা। এই সমাজ-গাড়ির এক চাকা নারীকে ছোট রেখে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন বেশি দূর অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব নয়। গাড়ি সচল রাখতে হলে দুই চাকা যেমন সমান রাখতে হয়, তেমনি সমাজের অগ্রগতির জন্যও নারীকে পুরুষের সমান তালে রাখতে হবে। আর এই সমতার জন্য, কাঙ্ক্ষিত সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন নারীশিক্ষা। নারীশিক্ষার যথার্থ প্রসারই পারে সমাজ ও রাষ্ট্রের যথার্থ বিকাশ ঘটাতে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

ভূমিকা : বাঙালি জাতির জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক ইতিহাসের মধ্যে যে-ইতিহাস বাঙালি জনগোষ্ঠীকে মুক্তির সনদ প্রদান করেছিল, তা মুক্তিযুদ্ধ। যে মহাকাব্যিক সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে এনেছিল, তা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি পৃথিবীর বুকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে

মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। দীর্ঘ ত্যাগ, তিতিক্ষা, রক্ত, অশ্রুর বিনিময়ে ছিনিয়ে আনা স্বাধীনতা আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন; আমাদের অহংকার।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি : ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। জন্ম নেয় দুটি রাষ্ট্র। একটি ভারত, অন্যটি পাকিস্তান। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ছিল দুটি অংশ– পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান দুটি অঞ্চলের মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। দুই অঞ্চলের ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই পার্থক্য সত্ত্বেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি অঞ্চল নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। এই রাষ্ট্রকে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষ সেদিন স্বাগত জানিয়েছিল। এমনকি এর পক্ষে ভোটও দিয়েছিল। কারণ, ইংরেজশাসিত ভারতরাষ্ট্রে মুসলমানরা, বিশেষত পূর্ব বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলমানরা ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরি-বাকরি নানা দিক থেকে অবহেলিত ও বঞ্চিত। এই বঞ্চনা, অবহেলা আর দরিদ্রতা থেকে মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে সেদিন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর থেকেই দেখা গেল, পূর্ব বাংলার মানুষের ওই স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যাচ্ছে। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা শুরু থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে তাদের নিজেদের রাষ্ট্র বলে মনে করেছে। পূর্ব বাংলা অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের মানুষকে তারা ভালো চোখে দেখত না। পদ, পদবি, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সবক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার মানুষকে তারা বঞ্চিত করত। ঠিক ইংরেজশাসিত ভারতের মতো। ফলে, পূর্ব বাংলার বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচার, অবিচার, শোষণের শিকার হয়েছে দিনের পর দিন। কিন্তু কিছুকাল পর থেকেই পূর্ব বাংলার মানুষ এই অত্যাচার, অবিচার আর শোষণ মেনে নিতে পারেনি। তারা বিভিন্ন সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে রুখে দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানিদের নানামুখী ষড়যন্ত্র।

মুক্তিযুদ্ধ শুধু নয় মাসের ফল নয়, এর রয়েছে দীর্ঘ ২৩ বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। বহু রক্তস্নাত রাজপথ পাড়ি দিয়ে স্বপ্নের স্বাধীনতার স্বাদ আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছে।

প্রথমে যে আঘাতটি আসে তা হলো ভাষার ওপর। ভাষা হলো একটি সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। তাকে ভেঙে দিলে ঐ জাতির মেরুদণ্ড অনেকাংশে ভেঙে পড়ে। শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষ বাংলায় কথা বলা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায় শতকরা ৪ ভাগ লোকের মুখের ভাষা উর্দুকে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত জনসভায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা'। তাও তিনি ভাষণটি দিয়েছিলেন ইংরেজি ভাষায়। একইভাবে ২৪ মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে উর্দুকেই রাষ্ট্র ভাষা করার কথা বলেন। কিন্তু আমাদের ছাত্ররা না না বলে প্রতিবাদ জানায়। এরপর চলতে থাকে ধারাবাহিক প্রতিবাদ-সংগ্রাম। আর পাকিস্তানি শাসকচক্র এসব আন্দোলন-সংগ্রামের বিরুদ্ধে চালাতে থাকে নানামুখী নির্যাতন। এই নির্যাতনের সূত্রেই শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেকে গ্রেফতার হন। দীর্ঘকাল কারাবরণও করেন। আবার ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় খাজা নাজিমুদ্দিন, জিন্নাহকে অনুকরণ করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার নতুন ঘোষণা প্রদান করেন। এর প্রতিবাদে ছাত্র সমাজ ধর্মঘট, বিক্ষোভ চালাতে থাকে। পাকিস্তান সরকারও এর বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেয়। অবশেষে ছাত্ররা ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট এবং ঐদিন রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেদিন সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করায় পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে আবুল বরকত, জব্বার, রফিক, সালামসহ আরো অনেকে শহিদ হন। এভাবে ভাষার মান রক্ষার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেওয়ার ইতিহাস পৃথিবীতে বিরল। ভাষার মান রক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রবল হয়ে ওঠে এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রবল আকার ধারণ করে। কবি ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন–

হে ভাষা আন্দোলন,
তুমি স্বাধীনতার কেন্দ্রবিন্দু।

কেননা, ভাষা আন্দোলন হলো স্বাধীনতার প্রথম বপিত বীজ।

এরপর ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েও পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র আর অবৈধ হস্তক্ষেপে মাত্র ৫৬ দিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পেরেছিল পূর্ব বাংলার নির্বাচিত সরকার। এটি পূর্ব বাংলার বাঙালিদের মনের মধ্যে গভীর ক্ষত তৈরি করে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা গোড়া থেকে শাসন-শোষণের দিকে বেশি নজর দিয়েছে, যা বাঙালিদের স্বাধীনচেতা করেছে। এরপর ১৯৫৮ সালে সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করলে বাঙালি প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। শিক্ষাকে সংকুচিত করলে

১৯৬২ সালে দেখা দেয় তীব্র প্রতিবাদ। এভাবে দীর্ঘ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শোষণ নিপীড়নের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে স্বাধিকার আন্দোলনের পথকে তিনি প্রসারিত করেন। বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি কেনো ছয় দফা ঘোষণা করলেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন– 'স্বাধীনতার পথে যাওয়ার জন্য সাঁকো গড়ে দিলাম।' অবস্থা বেগতিক দেখে আইয়ুব খান ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনকে ফাঁসিয়ে দিয়ে বিশেষ ট্রাইবুনালে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে বিচারের পায়তারা করেন। ১৯৬৯ সালে রাজপথের গণঅভ্যুত্থান থেকে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহারের দাবি, ৬-দফা দাবি এবং ছাত্র সমাজের ১১-দফা দাবির মুখে স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের সরকার মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান প্রবল হয়ে ওঠে আসাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এক পর্যায়ে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, সাধারণ মানুষ রাজপথে নেমে আসলে আইয়ুব খানের মসনদ নড়ে ওঠে। মূলত ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান একটি বিপ্লবাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। সকল পেশাজীবী সংগঠন ও মানুষ যার যার অবস্থান থেকে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়। অবশেষে অবস্থা বেগতিক দেখে আইয়ুব খান ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তি দেন। এবং নিজে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইয়াহিয়া খান উক্ত পদে আসীন হন এবং ঘোষণা করেন খুব তাড়াতাড়ি নির্বাচন হবে। অবশেষে, ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর 'এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর এতে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হয়। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ। এছাড়া, প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ৩৮০টির মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ। এভাবে জনগণ আওয়ামী লীগের পক্ষে তাদের মত প্রকাশ করে। কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভ করেও আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি করেন ইয়াহিয়া খান। নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, আলাপ আলোচনার ভান করে ৩ মার্চ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এমন পরিস্থিতিতে ৭ মার্চ, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। যেখানে দীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণ, শাসন, নিপীড়িনের ইতিহাস তুলে ধরেন। সেই ভাষণে তিনি মুক্তিযুদ্ধের একটি নির্দেশনাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন– 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।' তিনি আরো বলেন– 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্।' এভাবে বাঙালি ভিতরে ভিতরে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে থাকে।

অবশেষে ১৭ মার্চ টিক্কা খান, রাওফরমান আলী 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর নীলনক্সা তৈরি করে। ২৫ মার্চ সেই বর্বরতম গণহত্যা শুরু হয়। যাকে ইতিহাসে 'কালরাত্রি' হিসেবে অভিহিত করা হয়। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন এবং তা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এর পরপরই আনুমানিক রাত ১টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৭ মার্চ সেনাকর্মকর্তা মেজর জিয়াউর রহমান পুনরায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

যখন জনগণ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা জানতে পারে তখন তারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ : পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্মরণ-কালের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ করে বাংলাদেশের মাটিতে। এ অবস্থায় বাঙালি সেনা, পুলিশ, বর্ডার গার্ড ইত্যাদি বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। অসংখ্য মানুষ ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে থাকে। ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এদিকে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। এই সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এছাড়া ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং অন্যান্য মন্ত্রী নিয়ে গঠিত হয় মুজিবনগর সরকার। এ-সরকার শপথ বাক্য পাঠ করে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১। মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন কর্নেল (অবঃ) আতাউল গণি ওসমানী। বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকার বিদেশিদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের নানা উদ্যোগ নেয়। মুক্তিযুদ্ধের দিক নির্দেশনা, যুদ্ধ কৌশল ও নানা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে গুরুত্ববহ ভূমিকা পালন করতে থাকে এই সরকার। কিন্তু এদেশের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি পাকিস্তানিদের সমর্থনে গঠন করে রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস্ বাহিনীর মতো আরো অনেক বাহিনী। তারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে নানা অপকর্মের সাক্ষী হয়ে আছে। তাদের সহায়তায়, তত্ত্বাবধানে, মদদে আর অংশগ্রহণে বাংলার মাটিতে সংঘটিত হয় গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ

ইত্যাদি মানবতাবিরোধী অপরাধ। আর দেশকে মেধাশূন্য করার জন্য তারা করেছে বুদ্ধিজীবী নিধন। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে তারা পরাজয় নিশ্চিত জেনে এই জঘন্যতম ঘটনাটি ঘটায়। এইসব শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ১৪ ডিসেম্বর পালিত হয় শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস।

এদিকে পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল বাঁধার মুখোমুখি হয়। চীন, যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তি আমাদের বিপক্ষে অবস্থান নিলেও ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো অনেক বন্ধুরাষ্ট্র আমাদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। এভাবে ভিতরে ও বাইরে প্রবল প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানি বাহিনী নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। পাকিস্তানি বাহিনী ভারতের কিছু অংশে আক্রমণ করলে ভারত বাংলাদেশের পক্ষে সৈন্য পাঠায় এবং যৌথ বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানিদের পরাজয়ের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। এভাবে পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সৈন্যসহ নিয়াজী ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ আত্মসমর্পণ করেন। এভাবেই ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জিত হয় আমাদের।

উপসংহার : স্বাধীনতা বাঙালির জীবনে খুব সরলভাবে আসেনি। ৩০ লক্ষ প্রাণ, অসংখ্য মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এবং দীর্ঘ ২৪ বছর সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রটি আমাদের সার্বভৌমত্বের বড় উদাহরণ হিসাবে ধরা দিয়েছে। এ-স্বপ্নের দেশটিকে স্বাধীন করেছিল বাংলার প্রতিটি মানুষ। তাদের স্বপ্ন ছিল এই রাষ্ট্রে শোষণমুক্ত সমাজ, আইনের শাসন, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সাম্য, স্বাধীনতা ও মানবাধিকার নিশ্চিত হবে। এই স্বপ্ন এই চেতনাই মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণই মূলত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্মারক। এখানে 'মুক্তি' বলতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মুক্তিকে বোঝানো হয়েছে আর 'স্বাধীনতা' মানে পশ্চিম পাকিস্তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙালি জাতির সবার মূল চেতনা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ভূমিকা : কিছু কিছু সময় মানুষ ইতিহাসের অংশ হয়ে ওঠে, আবার কিছু কিছু সময় মানুষের কাছেই ইতিহাস ঋণী হয়ে যায়। মানুষ যখন ইতিহাসের নির্মাতা নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে, তখন তাঁদের অমর কীর্তি বর্ণনা ছাড়া কোনো ইতিহাসের পাঠ সম্পূর্ণ হয় না। বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তেমনি একজন মানুষ। তিনি বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসের নির্মাতা। বাংলাদেশের ইতিহাস আর তাঁর ইতিহাস অভিন্ন। মূলত তাঁর জীবনের ইতিহাসই বাংলাদেশের ইতিহাস। অন্যকথায় বলা যায়, বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসই তাঁর ইতিহাস। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কালের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি আজীবন সংগ্রামের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছেন। ক্রমে তিনি হয়ে উঠেছেন 'বঙ্গবন্ধু', 'জাতির পিতা'। শেখ মুজিব থেকে 'বঙ্গবন্ধু' হয়ে 'জাতির পিতা' হয়ে ওঠার দীর্ঘ ইতিহাসে রয়েছে তাঁর ত্যাগ স্বীকারের বিশাল পাহাড়।

জীবন-কথা : বঙ্গবন্ধু ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মাতার নাম সায়রা খাতুন। তাঁর বাবা ছিলেন গোপালগঞ্জ আদালতের নাজির। তিনি চার বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে ছিলেন তৃতীয়। তাঁর বয়স যখন দশ বছর, তখন জ্ঞাতি ভগ্নি ফজিলাতুন্নেসার (রেনু) সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ১৯৪১ সালে মেট্রিক, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৪ সালে আই.এ এবং একই কলেজ থেকে ১৯৪৬ সালে বি.এ পাস করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে ভর্তি হন।

স্কুল জীবনে গোপালগঞ্জ সফরে এলে বাংলার তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নজরে পড়েন শেখ মুজিবুর রহমান। ইসলামিয়া কলেজে আই.এ ক্লাসে পড়াকালীন এই সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়। এ-সময় তিনি আবুল হাশিমের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী বলে কথিত গ্রুপের ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন সময়ে 'নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন', 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ' ও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের' কাউন্সিলার এবং গোপালগঞ্জ মহকুমার মুসলিম লীগ এর সাধারণ সম্পাদক নির্বচিত হন। ১৯৪৬ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকও নির্বাচিত হন।

বাংলার দরিদ্র মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এরপরে ঢাকায় এসে নতুন রাজনীতির ধারায় নিজেকে মেলে ধরেন নতুন রূপে। কিন্তু মুসলিম লীগ সম্পর্কে মোহভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগেনি। মুসলিম লীগ সরকার জনকল্যাণমূলক আর্থ-সামাজিক, গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ না করার প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরো অনেকে মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন।

মুসলিম লীগ সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী স্বৈরাচারী নীতির বিরোধিতা করে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ' গঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। একই বছর ২ মার্চ 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হলে তিনি এর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। একই বছর ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে হরতাল পালন কালে তিনি ঢাকায় গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচরীদের বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত দাবির আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বহিষ্কৃত ও গ্রেফতার হন। ২৩ জুন ১৯৪৯ সালে পুরনো ঢাকার রোজ গার্ডেনে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হলে কারাগারে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি এর যুগ্ম-সম্পাদক হন। তিনি খাদ্য সংকটে বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে আর একবার কারারুদ্ধ হন ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে। এ-অবস্থায় ১৯৫২ সালে ফরিদপুরে জেলখানায় থেকে ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে অনশন ধর্মঘট পালন করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের মার্চে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি, বন ও সমবায় মন্ত্রী নির্বাচিত হন। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয়। ১৯৫৫ সালের ২২ অক্টোবর কাউন্সিল সভায় আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দলকে অসাম্প্রদায়িক করার ক্ষেত্রে গুরুত্বহ ভূমিকা পালন করেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫৬ সালে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের 'শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি দমন' দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এরপর ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করা হলে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় ডজন খানেক মামলা হয়। ১৯৫৯ সালে মুক্তি লাভ করলেও বছর দুয়েক তাঁকে গৃহে অন্তরীণ থাকতে হয়। আবার ১৯৬২ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীকে কারারুদ্ধ করলে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়। এ-পরিপ্রেক্ষিতে আবার শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর সোহরাওয়ার্দীর এনডিএফ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট)-এ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেন। পরবর্তীতে 'তাসখন্দ চুক্তি'-র পটভূমিকায় ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের এক সম্মেলনে ৬ দফা কর্মসূচী পেশ করেন এবং ছয় দফার পক্ষে জনমত গঠনের জন্য প্রচার অভিযান শুরু করেন। ছয় দফা কর্মসূচী ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংবলিত খুবই জনপ্রিয় একটি কর্মসূচী। কিন্তু এই জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে। এ-দিকে জনসাধারণ এ-মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে এবং ৬ দফা কার্যকরের দাবিতে রাজপথে নেমে আসে। শুরু হয় গণ অভ্যুত্থান। ফলে জনদাবির তোপের মুখে পাকিস্তানি স্বৈরশাসক চক্র ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এ-মামলা প্রত্যাহার করে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ এক গণসংবর্ধনায় তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এরপর আইয়ুব খানের পতন হয় এবং ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণের পর নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এদিকে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করেন। বাঙালি জাতিসত্তাকে শাণিত করার লক্ষ্যে 'জয় বাংলা' শ্লোগান উদ্ভাবন করেন। ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের নাম রাখেন 'বাংলাদেশ'। এরপর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বিপুল ভোটে জয়ী হয় আওয়ামী লীগ। কিন্তু অধিবেশন বসাতে গড়িমসি করায় আওয়ামী লীগ এবং বাংলার জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত করাতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এরই মধ্যে ৭ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণটি ছিল খুবই গুরুত্বহ ও দিক নির্দেশনাধর্মী ভাষণ। ঐ উত্তাল সময়ে এই ভাষণ ছিল যেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রথম উচ্চারণ। ভাষণে তিনি বলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এর মধ্য দিয়ে তিনি স্বাধীনতার জন্য একটি নির্দেশনা দিয়ে দেন। যার প্রেক্ষিতে বাঙালি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে। এরপর পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক জান্তারা মিলে ২৫ মার্চ ১৯৭১ 'অপারেশন সার্চলাইট' অর্থাৎ জঘন্য গণহত্যা শুরু করলে বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে 'স্বাধীনতার

ঘোষণা পত্র' ওয়্যারলেসের মাধ্যমে জানিয়ে দেন। ঐ রাতেই আনুমানিক ১.৩০ মিনিটে তাঁকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত স্বাধীনতার ঘোষণার ওপর ভিত্তি করে জনগণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ঐ নির্দেশিত পথেই মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি ছিলেন ঐ সরকারের রাষ্ট্রপতি। তিনিই মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। অবশেষে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশে বীরের বেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক অস্ত্র সমর্পণ এবং ভারতীয় মিত্র বাহিনীর বাংলাদেশ ত্যাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তাঁর শাসনামলে ১০৪টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এছাড়া জাতিসংঘ, কমওয়েলথ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও ইসলামিক সংস্থার সদস্যপদ আদায়ে বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তাঁর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে একটি সংবিধান প্রণীত হয়, যা সত্যিই একটি গুরুত্বহ কাজ ছিল। সংবিধানে বাংলাদেশের চারটি মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরপর তিনি একটি ভঙ্গুর রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭২ সালে ভারতের সাথে মৈত্রী চুক্তি, ১৯৭৪ সালে সীমান্ত চুক্তি, একই বছর ফারাক্কা চুক্তি সম্পন্ন করেন। তিনি 'বিশ্ব শান্তি পরিষদ' প্রদত্ত 'জুলিও কুরী পদক'-এ ভূষিত হন। তিনি ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশনে প্রথম 'বাংলায় ভাষণ' প্রদান করেন। এরপর, তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য সংবিধান সংশোধনের কাজে হাত দেন। সীমান্ত সমস্যা সমাধানে সংবিধান সংশোধন করেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কিছু উশৃঙ্খল সেনা কর্মকর্তা দ্বারা সপরিবারে নিহত হন।

মূল্যায়ন : বঙ্গবন্ধুর মহাকাব্যিক জীবনের মূল্যায়ন করা একটি ব্যাপক, বিস্তৃত ও গভীর বিষয়। ১৯৪৭-এর পরে যে শোষণ, শাসন ও ত্রাসন তা থেকে মুক্ত হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে নিয়ে তিনি অবিভক্ত ভারতের রাজনীতি থেকে তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। কারণ, তিনি জানতেন রাজনৈতিক সচেতনতা ছাড়া এসব অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি প্রথম ছাত্র সংগঠনের অন্যতম সদস্য হিসাবে আত্মনিয়োগ করেন। কেননা তিনি জানতেন ছাত্রদের মধ্যে যে চেতনা তা-ই পারে একটি জাতিকে তার ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে। ১৯৪৯ সালে রাজনৈতিক সংগঠন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি জেলে থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, তৎপরতা আর কর্মনিষ্ঠার কারণে তাঁকে 'যুগ্ম সম্পাদক' করা হয়। মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি এ কৃতিত্ব অর্জন করেন। এরপর তিনি দুইবার মন্ত্রিত্ব পেয়েও নিজের ক্ষমতার দিকে না তাকিয়ে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভেবেছেন। জীবনের একটা বড় সময় পার করেছেন জেলখানায়। তার বর্ণনা আমরা পাই ২০১২ সালে প্রকাশিত শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটিতে। তিনি ৬-দফা দাবি উত্থাপনের মধ্য দিয়ে জনগণের প্রাণের একেবারে অন্দরমহলের নেতা হয়ে ওঠেন। কেননা ছয় দফার মধ্যেই তিনি সাধারণ মানুষের চোখে ধরিয়ে দেন যে, আমরা কিভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছি এবং অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছি। এই ছয় দফার মধ্যেই তিনি স্বায়ত্তশাসন, অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ এবং প্যারা-মিলিটারির প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। বিষয়গুলো পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে কেউ বুঝতে পারলেও উত্থাপন করেনি। এটি নিঃসন্দেহে তাঁর বিচক্ষণতারই পরিচয় বহন করে। ছয়-দফাকে তিনি এবং বাংলার আপামর জনগণ মনে করতেন বাঙালির মুক্তির সনদ।

এছাড়া ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক জয়ের পেছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি জনগণের দ্বারে দ্বারে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অত্যাচার সম্পর্কে বুঝিয়েছেন। এভাবে জনগণ তাঁর দলকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করিয়েছে। ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু মুক্তির সংগ্রাম বলতে– অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির কথা বলেছেন। আর স্বাধীনতার সংগ্রাম বলতে পশ্চিম পাকিস্তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন। এটি তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তার ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফল। এছাড়া ৭ মার্চের ভাষণ যেন প্রতিটি স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রাণের প্রতিধ্বনি। ফলে এ-ভাষণ আর শুধু বাঙালির ভাষণ হয়ে রইল না, এটি মহাকালের ভাষণ হিসাবে পরিগণিত হল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু এক ভাষণে আত্মপরিচয়হীন যুদ্ধ-শিশুদের সম্পর্কে বলেন– যারা যুদ্ধ-শিশু আছে তারা যেন তাদের পিতার নামের জায়গায় আমার নাম লিখে দেয় এবং ঠিকানা ধানমণ্ডির ৩২ নং বাড়ির কথা লিখে দেয়। এখান থেকে বোঝা যায়, তিনি বাংলার মানুষকে কতটা ভালবেসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে কিউবার

মহান বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন– 'আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখে আমার হিমালয় দেখা হয়ে গেছে।' পাহাড়ের মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বঙ্গবন্ধু সত্যিই অতুলনীয়।

উপসংহার : কেউ কেউ পৃথিবীতে তাঁদের কৃতকর্ম দিয়ে ইতিহাসের বিস্ময় হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি আর নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হন না। তিনি হয়ে ওঠেন মহাকালের; সারা পৃথিবীর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তেমনি ব্যক্তিত্ব। তাঁর মহান আত্মত্যাগে বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ড পৃথিবীতে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি এই রাষ্ট্রের স্থপতি, জন্মদাতা, প্রাণদানকারী। তাই ইতিহাস তাঁকে চিরকাল স্মরণ করবে।

আমার প্রিয় কবি

সব বন্ধুই যেমন প্রিয় বন্ধু হয়ে ওঠে না, তেমনি সব কবিই প্রিয় কবি হয় না। প্রত্যেক মানুষের জীবনে সংগ্রাম আছে। আছে তার না পাওয়ার, বঞ্চিত হওয়ার শোষিত হওয়ার ইতিহাস। তেমনি আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে জাতীয় জীবনে যে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শোষণ-শাসন ও ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তা একজন কবির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে। তিনি হলেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। যখন কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা আমি পাঠ করি তখন যেন আমার চেতনারই প্রতিচ্ছবিই তাঁর কবিতার মধ্যে ভেসে ওঠে। তাঁর কবিতার মধ্যে যেমন প্রেম আছে, তেমনি আছে দ্রোহ। যেমন আছে রুদ্র রূপ তেমনি আছে সরল স্নিগ্ধতা। এ-যেন একটি সম্পূর্ণ জীবনের রূপকল্প। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রাম আমাকে মুগ্ধ করে।

নজরুলের জীবন : কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম বর্ধমান জেলার জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে ২৪ মে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দে। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ আর মা জাহেদা খাতুন। তিনি ছিলেন বাবা-মায়ের পঞ্চম সন্তান। পর পর চার ছেলের অকাল মৃত্যুর পর নজরুলের জন্ম। ফলে নজরুল ছিলেন বাবা-মায়ের খুবই কাঙ্ক্ষিত সন্তান। এ-কারণে, শৈশব তাঁর মোটামুটি ভালোই কাটছিল। কিন্তু ১৯০৮ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র নয় বছর, তখন তাঁর বাবা মারা যান। শুরু হয় তাঁর দুঃখের জীবন, সংগ্রামী জীবন। দারুণ অর্থ কষ্টে পড়ে যান নজরুল ও তাঁর পরিবার। দশ বছর বয়সে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে তিনি চুরুলিয়া গ্রামের মক্তব, মসজিদ দেখাশুনার কাজ করে অর্থ উপার্জন শুরু করেন। এগার বছর বয়সে তিনি যোগ দেন লেটো গান ও যাত্রার দলে। নজরুলের এক আত্মীয়ের লেখা থেকে জেনেছি, 'বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল না, তাই নজরুল এইসব লেটোর দলে যান এবং নাটক রচনা করে দিয়ে অর্থ উপার্জন করতেন।' শুনে বিস্মিত হতে হয় যে, নজরুলের বয়স যখন বার কি তের, তখন তাঁর নাটক রচনা এত ভালো হতে লাগল যে, তিনি এক সাথে তিনটি লেটো গানের দলে নাটক রচনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। এমন কি তিনি তাদের জন্য তাৎক্ষণিক গানও লিখে দিতেন। আরো বিস্ময়, তিনি বড় বড় কবিয়ালদের সাথে কবির লড়াইও করতেন মাঝে মধ্যে। এত ছোট মানুষের এত পারদর্শিতা দেখে বড়রা তাঁকে সমীহ করে 'খুদে ওস্তাদ' এবং ইয়ার্কি করে 'ব্যাঙ্গাচি' বলত। তাঁকে 'তারা খ্যাপা', 'নজর আলী', 'দুখু মিয়া' নামে ডাকা হতো। বড় বড় কবিয়ালদের সাথে কবির লড়াইয়ে গেলে খুদে নজরুল তাদের ছেড়ে কথা বলতেন না। কিশোর নজরুলের তেজ আর রসিকতা একটি উদাহরণ–

ওরে ছড়াদার that পালাদার
মস্ত বড় mad
চেহারাটাও monkey like
দেখতে ভারী cad
monkey লড়বে বাবর-কা সাথ্
ইয়ে বড় তাজ্জব বাত
জানে না ও, ছোট্ট হলেও
হামভি Lion cad.

এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থেকেও নজরুলের মুখ এবং মন থেকে হাসিটা কিন্তু মুছে যায়নি। লেখাপড়াও ছেড়ে দেননি। ১৯১১ সালে ঠিকই তিনি ভর্তি হন ষষ্ঠ শ্রেণিতে। কিন্তু টাকার অভাবে সেখানে বেশিদিন পড়তে পারেননি। বর্ধমান রেল স্টেশনের এক গার্ড সাহেবকে দেড় মাইল হেঁটে খাবার পৌঁছে দেয়ার কাজ নেন তিনি। অল্পদিনের মধ্যে এই চাকরিটাও খোয়াতে হয়

নজরুলকে। এরপর কাজ নেন রুটির দোকানে, এক টাকা বেতনে। পুলিশের এক সাব ইন্সপেক্টর রফিজউলাহ নজরুলকে রুটির দোকান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান তাঁর গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের ত্রিশালে। এটাই কিন্তু বাংলাদেশে নজরুলের প্রথম আসা। সেখানে দরিরামপুর হাইস্কুলে দরদি রফিজউলাহ তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেন সপ্তম শ্রেণিতে। এখানে তিনি বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় হয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে আর না পড়ে, নজরুল আবার পাড়ি জমান তাঁর নিজ দেশে। সেখানে সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করে **১৯১৭** সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। শৈশব থেকে যৌবনের শুরু পর্যন্ত নজরুলের জীবন কেবল সংকট আর সংগ্রামে ভরা। এসময় নজরুল মচকেছেন কিন্তু ভেঙে পড়েননি। ঠিকই তিনি একদিন হয়ে উঠলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের জীবনের এই সংগ্রাম আর প্রত্যয় আমাকে নজরুলের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

নজরুলের সাহিত্য : কাজী নজরুল ইসলামের পূর্বে বাংলা কবিতা ছিল মূলত একান্ত ব্যক্তিগত রোমান্টিক আবেগ-অনুভূতি নির্ভর। নিপীড়িত মানুষের হাহাকার, শোষকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, আধিপত্যবাদের বিরোধিতা নজরুলের আগে ছিল না বললেই চলে। কবিতাও যে আণবিক, দাহ্য, সশস্ত্র হতে পারে বাংলা সাহিত্যে এর প্রথম দৃষ্টান্ত কাজী নজরুল ইসলাম। কবিতাও যে প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে এটি নজরুলই প্রথম প্রমাণ করলেন। নজরুলের কবিতা শাসক, শোষক, অত্যাচারীর গায়ে যেন তীব্র কশাঘাতের কাজ করেছে। একারণে একর পর এক নজরুলের কাব্যগ্রন্থ হয়েছে নিষিদ্ধ, বাজেয়াপ্ত। নজরুলের কবিতায় শোষক, আধিপত্যবাদী, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহ দেখে তাঁকে অভিহিত করা হয় 'বিদ্রোহী কবি'। নজরুল নিজেও ঘোষণা করেছেন–

মহা–বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না–
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত!

শুধু বিদ্রোহে নয়, নজরুল সাম্যবাদী চেতনাতেও সমান সোচ্চার। বাংলা সাহিত্যে সাম্যবাদী চেতনার দৌড় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধ্বনি-নির্ধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু নজরুলের সমাম্যবাদ আরো বিস্তৃত। তিনি ধর্মীয় অসাম্য, নারী-পুরুষের অসাম্য, জাতিগত অসাম্য, পাপী-নিষ্পাপ অসাম্য, রাজা-প্রজার অসাম্য, চোর-সাধুর অসাম্য ইত্যাদি সর্ব প্রকার অসাম্যের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছেন। নজরুলের ভাষায়–

গাহি সাম্যের গান–
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

শুধু সাম্য নয়, অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশেও বাংলা কবিতায় নজরুলের জুড়ি মেলা ভার। এক্ষেত্রে নজরুলের সঙ্গে তুলনা চলে বোধ করি কেবল লালন শাহ্-এর।

নজরলের প্রেমিক সত্তা বাংলা কবিতার অন্য কবিদেও থেকে আলাদা করে সহজেই চেনা যায়। অভিমান আর তীব্র মানবিক বিরহ বোধ নজরুলের রোমান্টিক কবি-সত্তাকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে–

হারিয়ে গেছ অন্ধকারে পাইনি খুঁজে আর,
আজকে তোমার আমার মাঝে সপ্ত পারাবার!
আজকে তোমার জন্মদিন–
স্মরণ বেলায় নিদ্রাহীন
হাতড়ে ফিরি হারিয়ে-যাওয়ার অকূল অন্ধকার
এই-সে-হেথাই হারিয়ে গেছ কুড়িয়ে পাওয়া হার !

নজরুল বড়দের জন্য যেমন সাহিত্য রচনা করেছেন, তেমনি ছোটদের জন্যও রচনা করেছেন অসংখ্য ছড়া, কবিতা ও গান। আমার শৈশব-কৈশোরের বই পড়ার আনন্দকে তিনি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। নজরুলের শৈশব-কৈশোর এক নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট আর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কাটলেও তিনি শিশু-কিশোরদের জন্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন এক অসামান্য জগৎ। তাঁর অসংখ্য ছড়া, কবিতা ও গানের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই আমাদের শৈশব-কৈশোরের স্বপ্নকে।

উপসংহার : কাজী নজরুল ইসলাম আমার কৈশোর থেকে ভালো লাগা কবি। তাঁর কিশোর কবিতার মধ্যে আমি পেয়েছি আমার দুরন্ত কৈশোর। দারিদ্র্যের সঙ্গে অবিশ্বাস্য সংগ্রাম করে তাঁর কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে ওঠা শুধু আমাকে নয় অসংখ্য কিশোর-যুবকের বেড়ে ওঠার প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। আর নজরুলের প্রতিবাদ-বিদ্রোহ আমার অধিকতর মানুষ হয়ে ওঠার প্রেরণা। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট মৃত্যুবরণ করলেও প্রিয়তার গভীরতায় আর প্রতিয়িত পাঠের ব্যাপকতায় নজরুলকে আমার কাছে অমর-অম্লান বলেই মনে হয়।

প্রবন্ধের নমুনা

সততা

সংকেত : ভূমিকা, সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, সততার শক্তি, সততার বিরুদ্ধ শক্তি, সততার সামাজিক মূল্যায়ন, মহৎ মানুষদের জীবনে সততা, উপসংহার।

যানজট

সংকেত : ভূমিকা, যানজট কী, যানজটের কারণ ও ফলাফল, যানজট সমস্যা নিরসনের উপায়, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, উপসংহার।

বাংলাদেশের উৎসব

সংকেত : ভূমিকা, উৎসব কী, উৎসবের গুরুত্ব, বাংলাদেশের বিভিন্ন রকম উৎসব ও এর বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশের উৎসব ও এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশের সামাজিক উৎসব, বাংলাদেশের ধর্মীয় উৎসব, বাংলাদেশের সার্বজনীন উৎসব, বাংলাদেশের উৎসবের বর্তমান সংকট, বাংলাদেশের উৎসবের সংকট নিরসনের উপায়, উপসংহার।

আমার প্রিয় শিক্ষক

সংকেত : সূচনা, শিক্ষক বলতে আমি কী বুঝি, আমার প্রিয় শিক্ষকের পরিচিতি, প্রিয় শিক্ষকের সঙ্গে আমার সম্পর্কের ধরন, কেন প্রিয় শিক্ষক, আমার প্রিয় শিক্ষকের গুণাবলি, উপসংহার।

শিক্ষা বিস্তারে গণমাধ্যমের ভূমিকা

সংকেত : অবতরণিকা, গণমাধ্যম কী, গণমাধ্যমের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কের গভীরতা, শিক্ষা বিস্তার ও টেলিভিশন, শিক্ষা বিস্তার ও সংবাদপত্র, শিক্ষা বিস্তার ও চলচ্চিত্র, শিক্ষা বিস্তার ও দূরদর্শন, শিক্ষা বিস্তার ও বেতার, উপসংহার।

বনায়ন

সংকেত : সূচনা, বনায়ন কী, বনায়নের গুরুত্ব, বনায়ন ও পরিবেশ, বাংলাদেশের বনায়নের একাল-সেকাল, বনায়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, বনায়ন ও জীববৈচিত্র্য, উপসংহার।

যুদ্ধমুক্ত বিশ্ব

সংকেত : ভূমিকা, বিশ্বে যুদ্ধের ইতিহাস, বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধ দেশে-দেশে, যুদ্ধের কারণ, যুদ্ধের ফলাফল, বিশ্বব্যাপী মানুষ যুদ্ধমুক্ত বিশ্ব চায়, যুদ্ধমুক্ত বিশ্বের জন্য করণীয়, উপসংহার।

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

সংকেত : সূচনা, জাতীয় পতাকার গুরুত্ব, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার বর্ণনা, জাতীয় পতাকার আকৃতি, জাতীয় পতাকার রঙের প্রতীকী গুরুত্ব, জাতীয় পতাকার ব্যবহার, উপসংহার।

জনসেবা

সংকেত : ভূমিকা, জনসেবা কী, কৈশোর ও জনসেবার মনোভাব, জনসেবার সামাজিক গুরুত্ব, বিশ্বের বিভিন্ন জনসেবামূলক সংগঠন, পৃথিবীর মহৎ মানুষেরা ও জনসেবা, জনসেবা ও মূল্যবোধ, উপসংহার।

ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের সাহিত্য

সংকেত : সূচনা, ভাষা আন্দোলনের পরিপেক্ষিত, ভাষা আন্দোলনের চেতনা, বাঙালির জাতীয় জীবনের সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের সম্পর্ক, ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের কবিতা, ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের উপন্যাস, ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের নাটক, ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের প্রবন্ধ, উপসংহার।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

সংকেত : ভূমিকা, পর্যটন শিল্প কী, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অতীত ও বর্তমান, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সমস্যা, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সমস্যা নিরসনে করণীয়, উপসংহার।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

সংকেত : ভূমিকা, মানব সম্পদ উন্নয়ন কী, বাংলাদেশের মানব সম্পদের বর্তমান চিত্র, মানব সম্পদ উন্নয়নের সুবিধা, মানব সম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন উপায়, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দেশের উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়নে সরকারি পদক্ষেপ, উপসংহার।

বাংলাদেশের জাতীয় খেলা :

সংকেত : ভূমিকা, খেলার বিশেষত্ব, আন্তর্জাতিক অর্জন, খেলার বর্ণনা, উপসংহার।

ক্রিকেট ও বাংলাদেশ

সংকেত : সূচনা, ক্রিকেটের ইতিহাস, বাংলাদেশের ক্রিকেটের ইতিহাস, বাংলাদেশের ক্রিকেটের বিশ্বজয়, বাংলাদেশে ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ, বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলার উন্নতির অন্তরায়, বাংলাদেশে ক্রিকেটের সমস্যা সমাধানের উপায়, উপসংহার।

নিবিড় অরণ্যে একাকী

সংকেত : ভূমিকা, অরণ্যে একাকী, অরণ্যের সৌন্দর্য, অরণ্যে মনের অবস্থা, অরণ্যের সংকট, উপসংহার।

ইউনিট ১১
অনুচ্ছেদ লিখন

উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ে আপনি–

- অনুচ্ছেদ কী তা শিখতে পারবেন।
- অল্পকথায় কোনো বিষয় সম্পর্কে মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারবেন।
- বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করার কৌশল শিখতে পারবেন।
- বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা-অপ্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে সচেতন হবেন।

অনুচ্ছেদ কাকে বলে

প্রবন্ধ বা রচনার সংক্ষিপ্ত রূপই অনুচ্ছেদ। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে অল্প কিছু বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করাকে অনুচ্ছেদ বলে। অনুচ্ছেদ আকৃতি ও প্রকৃতিতে ছোট হলেও এর কাঠামোর মধ্যে তিনটি ভাগ অঘোষিতভাবে রয়েই যায়। এগুলো হলো– সূচনা, মূল বক্তব্য ও সমাপ্তি। এই তিনটি বিষয় রচনা বা প্রবন্ধে দেখা গেলেও অনুচ্ছেদ লেখার সময় এই তিনটি বিভাজন মাথার মধ্যে রাখতে হয়। ইংরেজি Paragraph এর সমার্থক হলো বাংলা অনুচ্ছেদ।

অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য

১. অনুচ্ছেদ একটিমাত্র প্যারা বা স্তবকে সীমাবদ্ধ থাকে।
২. অনুচ্ছেদের প্রতিটি বাক্য গুরুত্বপূর্ণ।
৩. অনুচ্ছেদের প্রতিটি বাক্য পরস্পর সম্পর্কিত থাকে।

গণতন্ত্র

গ্রিক শব্দ Demosও KratiaথেকেDemocracyশব্দটি এসেছে। যার অর্থ হলো গণতন্ত্র। গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত শাসন প্রক্রিয়াই হলো গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে জনগণই হলো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এখানে কোনো প্রকার স্বৈরাচরের স্থান নেই। জনগণের চূড়ান্ত ইচ্ছাতেই পরিচালিত হয় রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম। গণতন্ত্র সম্পর্কে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন তাঁর গেটিসবার্গ ভাষণে বলেছিলেন, 'গণতন্ত্র হলো জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার।' গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। কেননা, জনগণ যদি মনে করে ওই প্রতিনিধি তাদের পক্ষে কাজ করছে না, তখন জনগণ নিজেরাই ওই ব্যক্তিকে পরবর্তীতে নির্বাচিত করবে না। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য একটি উত্তম ব্যবস্থা হিসেবে মনে করেন। একারণে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে গণতন্ত্রের চূড়ান্ত উত্থান লক্ষ করা যায়। এই গণতন্ত্রের জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য আমরা ১৯৭১ সালে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছি। এর ফল এখন আমরা ভোগ করছি। এই ধারা অব্যাহত থাকুক। এদেশে গণতন্ত্রের শতদল ফুটে উঠুক।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা

কোনো দেশের জনসংখ্যা সে দেশের জন্য আশীর্বাদ। কিন্তু তা অভিশাপে পরিণত হয় যখন তা ওই জাতি বা রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হিসেবে দেখা দেয়। যখন একটি রাষ্ট্র ওই দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়, তখন ওই দেশের জনগণ অভিশাপ হিসেবে দেখা দেয়। বাংলাদেশের জন্য এর জনসংখ্যা প্রায় অভিশাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কেননা বাংলাদেশের সম্পদ সীমিত। দেশের আয়তনের তুলনায় ব্যাপক জনসংখ্যা। যাকে তাত্ত্বিকেরা বলছেন জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে যথাযথ শিক্ষা থেকে। মৌলিক চাহিদা পূরণ করাই হয়ে পড়েছে বিলাসিতার মতো। ফলে অধিক জনসংখ্যা পতিত হচ্ছে ব্যাপক বেকারত্বে, অশিক্ষায়, অস্বাস্থ্যে। অত্যধিক মানুষের চাপে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের

ভারসাম্য। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়ায় জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয় অনেক কমে গেছে। কেননা যে বিশাল জনসমুদ্র রয়েছে তাদের মানব সম্পদে পরিণত করা সর্বাংশে সম্ভব হচ্ছে না। এত দিনদিন দুর্দশা বেড়েহে চলেছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূলে রয়েছে, দারিদ্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার, অসচেতনতা ইত্যাদি সমস্যা। তবে এই অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে সরকার থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো। রেডিও, টেলিভিশন, সামাজিক মাধ্যম এবং পত্রপত্রিকায় চালাতে হবে সামাজিক আন্দোলন। তবেই আমরা এই অভিশাপ তেকে মুক্তি পাব।

শিশুশ্রম

আজকের শিশু আগমী দিনের ভবিষ্যৎ। কেননা প্রতিটি শিশুর মধ্যে লুকিয়ে আছে আগামী দিনের অমিত সম্ভবনা। সেজন্য শিশুকে গড়ে তোলা উচিত যোগ্য নাগরিক হিসেবে। তা না হলে এ জাতি হারাবে তার ভবিষ্যতের দিশা। কিন্তু শিশুকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার পথে রয়েছে নানামুখী প্রতিবন্ধকতা। যেমন অশিক্ষা ও দারিদ্যই এর মধ্যে প্রধান। আর একারণেই শিশুকে তার পরিবার ঠেলে দিচ্ছে শিশুশ্রমে। যা শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বড় প্রতিবন্ধকতা। শিশু বঞ্চিত হচ্ছে তার শিক্ষা ও আনন্দময় শৈশব থেকে। আর সে কারণে শিশুশ্রম পরিগণিত হয় অভিশাপ হিসেবে। কারণ শিশুশ্রমের ফলে শিশু যখন বেড়ে ওঠে, সে ভোগে পুষ্টিহীনতায়, বিভিন্ন রোগে। তার মানসিক বিকাশ ভালোভাবে সম্পন্ন হয় না । ওই শিশু যখন বড় হয়, তখন সে শারীরিক মানসিক এবং শিক্ষাগতভাবে দেশের বোঝার মতো কাজ করে। শিশুশ্রম ঘটে বাবা-মার অসচেতনতার পাশাপাশি কিছু অর্থলোলুপ মানুষের কারণে। যারা মনে করে অল্প মূল্যে কাজ উদ্ধার করা গেলে নিজের মঙ্গল। এটিই হলো উন্নয়নশীল দেশের চরম বাস্তবতা। তবে শিশুশ্রম রোধে নির্দিষ্ট আইন রয়েছে। পাশাপাশি শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রও রয়েছে দায়বদ্ধ। তাই এসব কথা মাথায় রেখে যদি শিশুবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা যায তবে আমরা পাব সুখী সমৃদ্ধ এবং উন্নত রাষ্ট্র। তাই জাতির ভবিষ্যতের জন্য সরকারের পাশাপাশি সবার এগিয়ে আসা উচিত শিশুশ্রম রোধ করার জন্য।

বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ

সারা বিশ্বে আর্সেনিক একটি মারাত্মক দূষণ। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। আর্সেনিক দূষণ সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। প্রথমেই জানা দরকার আর্সেনিক কী। আর্সেনিক এক ধরনের ধাতু যা অতিরিক্ত মাত্রায় মানবদেহের জন্যে ক্ষতির কারণ হতে পারে। এর কোনো রং স্বাদ ও গন্ধ নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বাংলাদেশের জন্য প্রতি লিটার পানিতে .০৫ মিলিগ্রামের বেশি আর্সেনিক থাকলে তা মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া গেছে। এক হিসাব মতে ৬১ জেলায় এই আর্সেনিক পাওয়া গেছে। একে ব্যাপক স্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বিশেষজ্ঞরা। আর্সেনিক রোগের দীর্ঘস্থায়ী লক্ষণগুলো হচ্ছে, রোগীর গায়ে কালো কালো দাগ, হাতে পায়ের তালু শক্ত ও খসখসে, ছোট ছোট ফুসকুড়ি, বমিভাব এবং পাতলা পায়খানা। আবার কখনো জিহ্বা ও গায়ের ওপর কালো দাগ হতে পারে। আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় সঠিক কোনো চিকিৎসা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে বাংলাদেশে এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। যেমন, গভীর নলকূপ বসাতে হবে, নদীনালার পানি জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে, বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি ধরে রেখে পরে ব্যবহার করতে হবে, ভূগর্ভস্থ মাটি ও পানি পরীক্ষা করে নিরাপদ স্থানে নলকূপ বসাতে হবে। আর্সেনিক দূষিত পানি পান করা থেকে দূরে থাকতে হবে, আর্সেনিকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এভাবে আর্সেনিক দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে।

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

একটি রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে ওই রাষ্ট্রের নাগরিক যে সুবিধাগুলো ভোগ করে তাই নাগরিক অধিকার। আর এই রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিক যে দায়িত্ব পালন করে তাই নাগরিক কর্তব্য। কেননা নাগরিক অধিকার ভোগের মাধ্যমে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। আর কর্তব্য পালনে রাষ্ট্র উপকৃত হয়। নাগরিকের অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে চলাফেরার অধিকার, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ধর্মচর্চার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের অধিকার, চাকুরি করার অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার ইত্যাদি। আর কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা, রাষ্ট্রের প্রতি

আনুগত্য প্রকাশ করা, ভোটাধিকারের যথাযথ প্রয়োগ করা, ট্যাক্স প্রদান করা, সরকারি কাজে সহায়তা করা, সন্তানকে যথাযথ শিক্ষা দেয়া। আর এই অধিকার ভোগ আর কর্তব্য পালনেই রাষ্ট্র হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ।

গণশিক্ষায় রেডিও-টিভি

রেডিও এবং টেলিভিশন আধুনিক সভ্যতার এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। ঘরে বসে আমরা দূরের নানা অনুষ্ঠান রেডিওর মাধ্যমে শুনতে পাই। তেমনি টেলিভিশনে সরাসরি ছবির মাধ্যমে অনুষ্ঠান দেখেতে পারি। এই দুই মাধ্যমই হয়ে ওঠে গণশিক্ষার আকর। কেননা এই দুই মাধ্যম প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে রয়েছে। যা প্রতিনিয়ত আমাদের নানামুখী বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিয়ে যাচ্ছে। রেডিওর মাধ্যমে শুধু ধ্বনি শোনা যায়, ছবি দেখা যায় না। তবুও গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা সচিত্র শিক্ষামূলক কার্যক্রম দেখি ও শুনি। যেমন– বিতর্ক অনুষ্ঠান, আবৃত্তি, নাচ, গান, সাহিত্য ও কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান। এতে উপকৃত হচ্ছে সমাজের প্রতি স্তরের মানুষ। ছাত্র থেকে শুরু করে কৃষক পর্যন্ত। বলা যায় রেডিও-টেলিভিশন দূরবর্তী মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি, চিন্তার অনন্য সাধারণ বাহন এবং গণশিক্ষার আকর। তাই এর গুরুত্ব গণজীবনে অনস্বীকার্য।

গ্রাম ও শহর

ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন গ্রাম আর মানুষ সৃষ্টি করেছেন শহর। একথা ধ্রুব সত্য। গ্রাম বলতে আমরা বুঝি কৃষিভিত্তিক কাঠামোর মধ্যে গাছপালা, নদীনালা বেষ্টিত একটি অবস্থা। যেখানে মানুষ বসবাস করে সংঘবদ্ধ হয়ে। তাদের প্রধান জীবিকা মূলত কৃষি। আর শহর বলতে কোলাহলযুক্ত যান্ত্রিক যানবাহনে পরিপূর্ণ কলকারখানা ও ইট পাথরের স্তূপকৃত দালানকোঠা। এখানে শ্রমিক কাজ করে কলকারখানায় আর শিক্ষিত শ্রেণি কাজ করে অফিস আদালতে। তবে শহর ও গ্রামের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। শহর যতটা কোলাহলপূর্ণ গ্রাম ততটাই নিরিবিলি ও শান্ত। শহরের বাতাস দূষণে ভরা, কিন্তু গ্রামের বাতাস নির্মল। শহরে নাগরিক সুযোগ সুবিধা বেশি থাকলেও গ্রামের মতো এমন সহজ সরল জীবনের সন্ধান পাওয়া কঠিন। গ্রামে যেমন গ্রামীণ মেলা, জারি, সারি, বাউল গানের আসর বসে, তেমনি শহরে তা কল্পনা করা যায় না। তবে শহরে শিক্ষার সুবিধা বেশি। গ্রামে এই সুবিধা অনেকটা ক্ষীণ। তাই শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে এনে শহরের মানুষকে গ্রামমুখী করতে পারলে আমরা একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ পাব বলে আশা করি।

নববর্ষ

আসিয়া বৈশাখ, কহে দিয়া ডাক কেন আছো ঘুম ঘোর
জ্বরা-জীর্ণতা ত্যাজিয়া আজিকে খোলোনা হৃদয় দ্বোর

কবির এ বক্তব্য নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে। বাংলা নববর্ষ আসে পুরাতন জ্বরা জীর্ণতাকে দূরীভুত করে নতুনের জয়গান গাওয়ার জন্য। নববর্ষে অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে বৃক্ষের ডগায় যে নতুন পর্ণমোচা দেখা যায়, তা যেন সম্ভাবনার কথাই বলে। নতুন সূর্য, নতুন ভোর সবকিছু যেন নবচেতনার উৎসভূমি। আর এ বৈশাখকে কেন্দ্র করে শহর এবং গ্রামে দেখা যায় বিচিত্র মেলার আমেজ। গ্রামের মেলায় ঘোড়দৌঁড়, পুতুলনাচ, মাটির তৈজসপত্র এগুলো যেন আমাদের ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিকে আবার নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়। শত বছর ধরে এটিকে আমরা লালন করি নিজেদের সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে পৃথিবীর বুকে তুলে ধরার প্রয়াসে। শহরে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' সমস্ত অশুভকে পেছনে ফেলারই বার্তা। আর মুক্তিযুদ্ধের আগে ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদী চেতনার উৎস হিসাবে কাজ করেছে এই নববর্ষ। তাই নববর্ষকে আমরা পালন করব সবরকম অশুভ, জ্বরা এবং সাম্প্রদায়িকতাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য; নতুনের জয়গান গাওয়ার প্রত্যয়ে।

ডিশ এন্টেনার প্রভাব

বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের একটি গুরুত্বহ অংশ ডিশ এন্টেনা। যার কল্যাণে সারা বিশ্ব আজ হাতের মুঠোয়। আর এর প্রভাব আমাদের সমাজে ব্যাপক, গভীর এবং বিস্তৃত। ডিশ এন্টেনার কল্যাণে আমরা বিশ্বের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তের খবর চোখের নিমিষে জানতে পারছি। যা পূর্বে কখনো সম্ভব ছিল না। টেলিভিশনের নানা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আমাদের ব্যাপকভাবে বিনোদিত করে। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান মানসিক বিকাশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার

করে আছে। বিশ্বের নানামুখী জ্ঞান আমাদের যেমন সমৃদ্ধ করছে তেমনি, আমাদের ভেতরে এই আকাশ সংস্কৃতির উম্মুক্ততা এক ধরনের বিকারগ্রস্ততা তৈরি করছে। ফলে মানুষের মধ্যে গড়ে উঠছে এক ধরনের মিশ্র সংস্কৃতি। এই বিষয়ে সচেতন না হলে আমরা আমাদের সংস্কৃতির শিকড় থেকে দূরে সরে যাব। যে কারণে আমাদের উচিত ভাল-মন্দ যাচাই বাছাই করে এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থেকে যথাযথ উপযোগিতা ভোগ করা। তবে একটি সুষ্ঠু স্বাভাবিক সমাজ-সংস্কৃতি বিনির্মাণে ডিশ এন্টেনার প্রভাবে আমরা সমৃদ্ধ হতে পারব।

বেকার সমস্যা

বেকার সমস্যা একটি অভিশাপের মতো। সারাবিশ্বেই এই সমস্যা দৃশ্যমান। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। কারণ এখনো পর্যন্ত প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ তরুণ রয়েছে বেকার। বাংলাদেশ জনবহুল দেশ হওয়ায় এখানে এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। কেননা যত বেকার তত কর্মসংস্থান এই দেশে গড়ে ওঠেনি। কারণ ভারী শিল্পায়নের অভাব, কুটির শিল্পের অভাব, স্বকর্মসংস্থানের অভাব, কর্মমুখী শিক্ষার অভাব। বেকারত্বের করাল গ্রাসে যুব সমাজ আজ বিপন্ন প্রায়। পরিবার থেকে সমাজ জীবনে প্রতিনিয়ত সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে যুব সমাজ ঝুঁকে পড়ছে নানামুখী অপরাধের মধ্যে। ছিনতাই, ডাকাতি, মাদকাসক্তি এখন তাদের নিত্য বিষয় হয়ে উঠেছে। ফলে পরিবার থেকে রাষ্ট্রে তা একটি বোঝার মতো অবস্থা সৃষ্টি করেছে। তবে বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন সঠিক নির্দেশনা বা পরিকল্পনা। সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে; যেমন, কারিগরী শিক্ষার প্রসার, কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার, যুব প্রশিক্ষণের প্রসার ইত্যাকার বিষয়। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করলে সম্পূর্ণ বেকারত্ব দূর করা না গেলেও তা লাঘব করা সম্ভব। এর মাধ্যমে জাতি হয়ে উঠতে পারে বেকারত্বের অভিশাপ মুক্ত এবং সমৃদ্ধ।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপার লীলাভূমি। যেদিকে তাকাই শুধু প্রকৃতির রূপচ্ছটা। যা মানুষের দেহ ও মন ভরিয়ে দেবে অবলীলায়। তাই দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে না– এমনটা ভাবা যায় না। বর্তমান পৃথিবীতে পর্যটন শুধু একটি বিনোদনের বিষয় নয়, এটি একটি শিল্পও বটে। বাংলাদেশ তাই স্বাধীনতার পর থেকে এই শিল্পকে ঢেলে সাজানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কারণ বাংলাদেশে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত, ম্যানগ্রোভ বন, পাহাড়, উপজাতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ভরপুর সমৃদ্ধ পর্যটন এলাকা। এগুলো মানুষকে যেমন মনের খোরাক যোগাতে পারবে তেমনি, করবে জ্ঞানে সমৃদ্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প এখানো সঠিকভাবে আলোর মুখ দেখেনি। যেখানে থাইল্যান্ড, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কার মতো দেশ আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। কারণ হিসাবে যা বলা যায় তা হল, অবকাঠামো উন্নয়নের সংকট, নিরাপত্তার অভাব, প্রচারণার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মঘট হরতাল ইত্যাকার কারণে বিদেশি ও দেশি পর্যটকরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আর এই দুরবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারকে ব্যাপকভাবে নানামুখী প্রকল্প হাতে নিতে হবে, যাতে পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশ রোল মডেল হতে পারে।

এইডস

এইডস একটি মরণব্যাধি। এইচআইভি ভাইরাস থেকে এ রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রথম আমেরিকায় **১৯৮১** সালে এই রোগটি ধরা পড়ে। এই রোগ একবার মানুষের মধ্যে বাসা বাধলে তার মৃত্যু অনিবার্য। তাই বিশ্বব্যাপী এই রোগের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে **১** ডিসেম্বর পালিত হয় বিশ্ব এইডস দিবস। এই রোগটি দক্ষিণ এশিয়াতেও এখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় বাংলাদেশও এ ঝুঁকির বাইরে নয়। তবে জানা প্রয়োজন কিভাবে মানুষ এইডস রোগে আক্রান্ত হয়– ক) অবাধ যৌন মিলনের ফলে, খ) রক্তের মাধ্যমে, গ) এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর ব্যবহৃত সূঁচ, সিরিঞ্জ ও অস্ত্রপোচারের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে, ঘ) এইডস আক্রান্ত গর্ভবতীর সন্তান এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগের কিছু লক্ষণ রয়েছে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ওজন কমে যায়, বমি বমি ভাব হয়, শরীর ব্যথা করে , স্মৃতিশক্তি লোভ পায়, ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হয়। এইভাবে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমাগত কমতে থাকে। একদিন মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়ে। তবে এ রোগের কোনো চিকিৎসা না থাকায়, তা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় সচেতনতা। যেমন– অরক্ষিতভাবে যৌন মিলন না করা, রক্ত দেওয়া বা নেওয়ার সময় নতুন সিরিঞ্জ, সূঁচ ব্যবহার করা, সন্দেহজনক ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষা করা

এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা। এসবের মধ্য দিয়ে এ রোগের পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় থেকে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি।

শখ

মানুষ মাত্রই বিনোদনমুখী। কারণ জীবনের নানা জটিলতার মধ্যে মানুষ খুঁজে পেতে চায় নিজের সত্তাকে। আর শখ হল তার অন্যতম মাধ্যম। মানুষের নানা রকম শখ থাকে। যেমন– মাছ ধরা, রান্না করা, ফুলের বাগান করা, গান গাওয়া, খেলাধুলা করা, পাখি পালন করা, ভ্রমণ করা, লেখালেখি করা ইত্যাদি। শখ পুরণের মাধ্যমে মানুষ তার সুকুমার বৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। যদি কেউ কবিতা, গান, প্রবন্ধ, নাটক লিখে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়, তবে মানুষও তা পড়ে আনন্দিত হতে পারে। ফলে আনন্দের ধারা সবখানে প্রবাহিত হতে থাকে। ভালো শখ পালনের মধ্য দিয়ে সব অশুভ হতে পারে দূরীভুত। কারণ মানুষ যখন অবসর থাকে তখন তার মধ্যে নানামুখী চিন্তা ভর করে। যদি সে তার ভালো শখগুলো পূরণ করতে পারে তবে, তার মধ্যে কোনো অশুভ চিন্তা ভর করতে পারবে না। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত কর্মব্যস্ততার ফাঁকে শখের পরিচর্যা করা, যাতে সে নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরে পেতে পারে।

যৌতুক প্রথা ও নারী নির্যাতন

সাধারণভাবে নারীদের সমাজের দুর্বল অংশের মধ্যে একটি অংশ বলে মনে করা হয়। কারণ তথাকথিত পুরুষ শাসিত সমাজে নারী একটি দুর্বল প্রত্যয়। সেই নারীকে নির্যাতনের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ধরা হয়েছে যৌতুক প্রথা নামক এক ভয়াবহ প্রথাকে। যৌতুক প্রথা বহু আগে থেকেই সমাজে বিদ্যমান। কিন্তু আধুনিক সমাজেও তা অহরহ দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে গরিব পিতা-মাতার কাছ থেকে মোটা অংকের যৌতুক নিচ্ছে সমাজের এক শ্রেণির মানুষ। যৌতুক না দিতে পারার দায়ে নারীকে হতে হচ্ছে অগ্নিদগ্ধ; কখনো কখনো এসিড সন্ত্রাসের মতো ভয়াবহ সন্ত্রাসের শিকারও হতে হচ্ছে। এমন কি মৃত্যুর মতো ভয়াবহ পরিণতি বরণ করতে হয় নারীকে। ফলে ঐ নারীর পরিবার হচ্ছে নিঃস্ব এবং সহায় সম্বলহীন। এর পিছনে প্রধান কারণ হিসাবে সমাজবিজ্ঞানীরা অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার এবং অসচেনতাকেই দায়ী করেন। যৌতুক প্রথা আর নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য রয়েছে আইন। আইনের আশ্রয় লাভ করার মাধ্যমে নারী এ ধরনের ভয়াবহ প্রথার কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে। এ ধরনের কুপ্রথা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আইনের পাশাপাশি প্রয়োজন গণসচেতনতামূলক সামাজিক আন্দোলন, শিক্ষার প্রসার এবং দারিদ্র্য বিমোচন। তাহলেই নারীকে আমরা দিতে পারব যথাযথ মর্যাদা বা সম্মান।

যুব সমাজের অবক্ষয়

যুব সমাজ একটি জাতি গঠনের অন্যতম নিয়ামক হিসাবে কাজ করে । যৌবন, তারুণ্য এগুলো মানুষের প্রধান সম্পদ। এসময়ই তারা পারে সমাজকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখাতে। কিন্তু সেই যুবসমাজ যখন নিজেদের সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করে নষ্টদের দলে যোগ দেয়, তখনই জাতির জীবনে নেমে আসে অমানিশার ঘোর অন্ধকার । যুব সমাজের মধ্যে যখন নানা রকম হতাশা ঢুকে পড়ে, তখন তারা নানামুখী অবক্ষয়ের দিকে পা বাড়ায়। যেমন– নেশা করা, ছিনতাই করা, রাহাজানি করা, এসিড নিক্ষেপ করা এবং নারী নির্যাতনের মতো ভয়াবহ খারাপ কাজে তারা লিপ্ত হয়। ফলে জাতি হারিয়ে ফেলে তার দিশা। এর কারণ হিসাবে সমাজ বিশ্লেষকরা মনে করেন দারিদ্র, কর্মসংস্থানের অভাব, বেকারত্ব অশিক্ষা, অপ-আদর্শ, আকাশ সংস্কৃতি, ইত্যাকার বিষয় তাদের অবক্ষয়ের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। তবে তাদের অবক্ষয় থেকে বাঁচানোর উপায় হিসাবে পরিবারকেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ পরিবারই হলো ছোটবেলা থেকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠান। এছাড়া তাদের সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক আবহের মধ্যে বেড়ে উঠতে দিতে হবে, ভালো ভালো বই পড়তে হবে। জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে এ ধরনের অবক্ষয় থেকে বাঁচা সম্ভব। তাই সমাজের প্রতিটি স্তরে সচেতনতা বাড়ালে এ ধরনের মারাত্মক অবক্ষয় থেকে সমাজকে বাঁচানো সম্ভব।

	সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন–আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর	**ড. মো. চেঙ্গীশ খান** অধ্যাপক (বাংলা), ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫ ইমেইল: chenggish@bou.ac.bd এবং **মেহেরীন মুনজারীন রত্না** সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫ ইমেইল: munjarin81@gmail.com

নমুনা প্রশ্ন
বাংলা দ্বিতীয় পত্র
রচনামূলক

সময়-২:১০ মিনিট **পূর্ণমান: ৬০**

১. যেকোনো একটির অনুবাদ করুন। ১×৫=৫

ক. A patriot is a man who loves his country, works for it and is willing to fight and die for it. Every soldier is bound to do his duty. But the best soldiers do more than this. They risk their lives because they love the country they are fighting for.

খ. Modern Science is teaching us that no one lives alone. Co-operation between individuals and then between families, was essential to the life of man when he competed with animals of field and forests.

২. যেকোনো একটির অনুচ্ছেদ রচনা করুন। ১×৫=৫

ক. পরিবেশ দূষণ

খ. চরিত্র।

৩. যেকোনো একটি বিষয়ে পত্র লিখুন। ১×৫=৫

ক. আপনার সাম্প্রতিক পড়া একটি কাব্যগ্রন্থের বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুর কাছে একটি পত্র লিখুন।

খ. আপনার বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান মেলা আয়োজনের অনুমতি চেয়ে প্রধান শিক্ষক বরাবর একটি আবেদনপত্র লিখুন।

৪. যেকোনো একটি সারাংশ বা সারমর্ম লিখুন। ১×৫=৫

ক. কোন সভ্য জাতিকে অসভ্য করার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে তাহলে তাদের সব বই ধ্বংস কর এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে তারা বাঁচে না। দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে ইচ্ছা করলে সাহিত্যের সাহায্যে তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এটাই প্রধাণত সম্পূর্ণ। জাতির ভেতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর, আর কিছুরই আবশ্যকতা নেই।

খ. বসুমতি কেন তুমি এতই কৃপণা?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করে পাই শস্য কণা।
দিতে যদি হয় দে মা প্রসন্ন সহাস;
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শষ্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি, কন বসুমতি–
আমার গৌরব তাতে সামান্যই বাড়ে
তোমার গৌরব তাতে একেবারে ছাড়ে।

৫. যেকোনো একটি বিষয়ে ভাবসম্প্রসারণ লিখুন। ১×১০=১০

ক. স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।

খ. পরের অনিষ্ট চিন্তা করে যেই জন
নিজের অনিষ্ট বীজ করে সে বপন।

৬. যেকোনো একটি বিষয়ে প্রতিবেদন লিখুন। ১×১০=১০

ক. আপনার বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

খ. আপনার এলাকায় বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উদ্‌যাপনের উপর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করুন।

৭. যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন। ১×২০=২০

ক. অধ্যবসায় ।

খ. মানব কল্যাণে বিজ্ঞান।

গ. বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন।

ঘ. বাংলাদেশের ঋতুবৈচিত্র্য।

ঙ. জাতি গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা।

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হয়?
ক. উপমান কর্মধারয় খ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় গ. রূপক কর্মধারয় ঘ. উপমিত কর্মধারয়

২. উপসর্গের কাজ কী?
ক. যদি সংস্থাপন খ. বর্ণ সংস্করণ গ. নতুন শব্দ গঠন ঘ. ভাবের পার্থক্য নিরূপণ

৩. বিশেষ্য, বিশেষণ ও অনুকার অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে যে ধাতু গঠিত হয় তাকে কী বলে?
ক. সাধিত ধাতু খ. বিদেশি ধাতু গ. মৌলিক ধাতু ঘ. নাম ধাতু

৪. কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদকে কী বলে?
ক. ক্রিয়া প্রকৃতি খ. কৃদন্ত পদ গ. প্রকৃতি ঘ. ক্রিয়া পদ

৫. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কী বলে?
ক. প্রাতিপদিক খ. বিদেশি গ. সাধিত ঘ. যৌগিক

৬. অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. দুই খ. তিন গ. পাঁচ ঘ. ছয়

৭. কোন বাক্যে অব্যয় বিশেষণ-এর ব্যবহার আছে?
ক. ধীরে ধীরে বায়ু বয় খ. রকেট অতি দ্রুত চলে
গ. সামান্য একটু দুধ দাও ঘ. ধিক তাকে শত ধিক নির্লজ্জ যে জন

৮. 'শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে।'- বাক্যটিতে ব্যবহৃত হয়েছে-
ক. যৌগিক ক্রিয়া খ. নাম ধাতুর ক্রিয়া গ. প্রযোজক ক্রিয়া ঘ. মিশ্র ক্রিয়া

৯. 'মবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।'- কোন কাল?
ক. সাধারণ অতীত খ. ঘটমান অতীত গ. পুরাঘটিত অতীত ঘ. ঘটমান বর্তমান

১০. সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় কোন ক্রিয়া বিভক্তি হয়?
ক. উন, ন খ. বেন, ন গ. ইও, ইবে ঘ. অ, ও

১১. 'কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা'-এই বাক্যের অসমাপিকা ক্রিয়া কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. সমকাল খ. নিরন্তরতা গ. সূচনা ঘ. সমাপ্তি

১২. ভাষার মূল উপাদান কী?
ক. ধ্বনি খ. অক্ষর গ. বর্ণ ঘ. শব্দ

১৩. আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কী?
ক. সাধু ভাষা খ. চলিত ভাষা গ. উপ ভাষা ঘ. কথ্য ভাষা

১৪. 'মহকুমা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক. ফারসি খ. আরবি গ. তুর্কি ঘ. পর্তুগিজ

১৫. বাংলা ব্যাকরণে প্রদান আলোচ্য বিষয় কয়টি?
ক. দুটি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

১৬. বাক্যতত্ত্বের অপর নাম কী?
ক. রূপতত্ত্ব খ. শব্দতত্ত্ব গ. ধ্বনি তত্ত্ব ঘ. পদক্রম

১৭. বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা–
ক. পঁচিশটি খ. ত্রিশটি গ. পঁয়ত্রিশটি ঘ. চল্লিশটি

১৮. শ, ষ, স-এ তিনটি বর্ণকে বলে–
ক. স্পর্শ বর্ণ খ. শিস বর্ণ গ. উষ্ম বর্ণ ঘ. পার্শ্বিক বর্ণ

১৯. দুটি সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে কী বলে?
ক. সমীভবন খ. বিষমী ভবন গ. স্বর সংগিত ঘ. সমীকরণ

২০. 'ঋ', 'র', 'ষ' এর পরে কী হয়?
ক. ন খ. ণ্ন গ. ণ্য ঘ. ণ

২১. সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদে–
ক. 'ষ' হয় খ. 'ণ' হয় গ. 'ণ' হয় না ঘ. 'ষ' হয় না

২২. 'ধাতুর গণ' বলতে বোঝায়, ধাতুর–
ক. লেখার ধরন খ. বানানের ধরন গ. উচ্চারণের ধরন ঘ. বিন্যাসের ধরন

২৩. 'বাবা বাড়ি নেই'– নিম্নরেখ পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক. কর্মে শূন্য খ. কর্তায় শূন্য গ. অধিকরণে শূন্য ঘ. অপদানে শূন্য

২৪. কোন বাক্যে ব্যতিহার কর্তা রয়েছে?
ক. মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন খ. তোমাকে পড়তে হবে
গ. রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে ঘ. বাঘে-মহিষে একঘাটে জল খায়

২৫. 'বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?'– এ বাক্যে 'বিনে' অনুসর্গটি কোন অর্থ প্রকাশ করেছে?
ক. ব্যতিরেকে খ. সঙ্গে গ. প্রয়োজনে ঘ. নিমিত্তে

২৬. 'শবদাহ' স্থলে 'শবপোড়া' ব্যবহার করলে ভাষা কোন দোষে দুষ্ট হয়?
ক. বাহুল্য দোষে খ. দুর্বোধ্যতা দোষে গ. উপমার ভুল প্রয়োগ ঘ. গুরুচণ্ডালী দোষে

২৭. 'কোনোভাবেই যা নিবারণ করা যায় না'- এক কথায় কী হবে?
ক. দুর্নিবার খ. অনিবার্য গ. দুর্দমনীয় ঘ. অদম্য

২৮. শব্দের আভিধানিক অর্থকে কী বলে?
ক. লক্ষ্যার্থ খ. বাচ্যার্থ গ. আসত্তি ঘ. যোগ্যতা

২৯. 'মণিকাঞ্চন যোগ'– এর সমার্থক বাগধারা কোনটি?
ক. সোনায় সোহাগা খ. দহরম-মহরম গ. শিরে সংক্রান্তি ঘ. কেতাদুরস্ত

৩০. 'পৃথিবী' শব্দের সমার্থক শব্দ–
ক. অর্ণব খ. অম্বু গ. অবনী ঘ. অরণী

৩১. যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা ততোধিক বাক্যের সমন্বয় বুঝাতে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়?
ক. লোপ চিহ্ন খ. উদ্ধরণ চিহ্ন গ. কমা ঘ. ড্যাশ

৩২. নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি কোনটি?
ক. পুনরায় খ. একাদশ গ. পরিষ্কার ঘ. মনোহর

৩৩. কোনটি বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি?
ক. সংস্কৃত খ. তৎসম গ. তস্কর ঘ. পরস্পর

৩৪. 'চিঁক চিক করে বালি কোথা নাই কাদা'– এখানে দ্বিরুক্ত শব্দটি কোন পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. বিশেষ্যের বিশেষণ খ. অব্যয়ের বিশেষণ গ. বিশেষণের বিশেষণ ঘ. ক্রিয়া বিশেষণ

৩৫. 'গীতিকা' শব্দটি কোন অর্থে স্ত্রী লিঙ্গ?
ক. সমার্থে খ. বৃহদার্থে গ. ক্ষুদ্রার্থে ঘ. বিপরীতার্থে

৩৬. কোনটি পূরণ বাচক সংখ্যা?
ক. নবম খ. দোসরা গ. কুড়ি ঘ. দশ

৩৭. 'বচন' ব্যাকরণের কী জাতীয় শব্দ?
ক. তৎসম খ. পারিভাষিক গ. অর্ধ-তৎসম ঘ. বিদেশি

৩৮. কোন বহুবচন বাচক প্রত্যয়টি কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়?
ক. ফুল খ. দাম গ. বৃন্দ ঘ. গুচ্ছ

৩৯. কোন পদাশ্রিত নির্দেশকটি নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা উভয় বুঝায়?
ক. কেতা খ. গাছি গ. গুলিন ঘ. টো

৪০. দ্বিগু সমাস নিষ্পন্ন পদটি কোন পদ হয়?
ক. বিশেষ্য খ. কৃদন্ত গ. বিশেষণ ঘ. সর্বনাম